ছোটোগল্পের পর্ব-পর্বান্তর

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য



প্রতিভাস □ কলকাতা

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক
বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২

মুদ্রক
বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ)
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাষ : ৬৫৪৪-৪৮৯৮

উৎসর্গ

পিতৃদেব সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, পঞ্চতীর্থ স্মরণেষু

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব : ছোটোগল্প প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় পর্ব : ছোটোগল্প এবং ছোটোগল্পকার

ছোটোগল্পের চিত্রকল্প, ভাষার চিত্র

ছোটোগল্পের শৈল্পিক গুণ আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চিত্রকল্পের (Image) উল্লেখ করা হয়। চিত্রকল্পকে অনেকে বলেন ভাবমূর্তি বা বাক-প্রতিমা। এরপরেও বলা যায় চিত্রভাষা বা ভাষার চিত্র। সরলীকরণার্থে কল্পনাকে বা কোন ভাবকে বা ভাষাকে চিত্রায়িত করাই হচ্ছে চিত্রকল্প। বস্তুজগৎ, মানুষের মন ও মস্তিষ্ক এই তিনের সমন্বয়ে চিত্রকল্প বা চিত্র ভাষা গড়ে উঠতে পারে। ভাষা বা শব্দের দ্বারা কোন ভাবকে মূর্ত করে তোলা এবং তাকে প্রকাশ করাটাই চিত্রকল্পের বা বাক্‌প্রতিমার কাজ। প্রতিম বা কল্প কথাটার অর্থই হচ্ছে 'অনুরূপ'। Image থেকে Imagination কল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কথাটা। 'কল্পনা'র অর্থই স্বাধীন চিন্তাভাবনা। এই স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা বাস্তব ও অবাস্তব এই দুইয়েরই প্রতিম হতে পারে। চিত্রকল্প, মূল লাতিন শব্দে এর অর্থটি হচ্ছে 'সাদৃশ্য সৃষ্টি করা'। এবং এই অর্থটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নানারকম সংজ্ঞায় ও শব্দ-সৃষ্টির বিস্তারে, যেমন চিত্রকল্প-বাকপ্রতিমা-চিত্রভাষ বা ভাষার চিত্র, সহজ অর্থে, 'শব্দ দিয়ে তৈরি ছবি'। এই প্রবন্ধে মূলত 'চিত্রকল্প' শব্দটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে। আভিধানিক সংজ্ঞায় ইংরেজিতে বোঝানো হয়েছে 'A mental conception held in common by members of a group and symbolic of basic attitude and orientation'। চিত্রকল্প নানা মানুষের চেতনায় সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিয়ে ধরা পড়ে।

'ছুটি' একটি মাত্র শব্দযোগে একটি পুরো ছোটোগল্পের চিত্রকল্প তৈরি হতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' ছোটোগল্পটি বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রের স্বাদ'। এখানে ব্যঞ্জনা এবং চিত্রকল্প সম্পর্কযুক্ত। আবার পুরো একটি বাক্যই পাঠকমনে চিত্রকল্প ধাক্কা মারতে পারে। যেমন, 'অবশেষে শিবভক্ত দীনদয়াল ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে স্বহস্তে রোপিত মরা বেলগাছটার শুধুমাত্র একটা শুকনো ডালে আত্মহত্যা করল'। সামান্য কয়েকটি শব্দ প্রয়োগে দীনদয়ালের সংসারের একটি চিত্র, পাঠকমনে আঁকা হয়ে যায়। 'স্বহস্তে রোপিত', 'মরা বেলগাছ' 'শুধুমাত্র একটা শুকনো ডালে' এসব শব্দ-প্রয়োগে বোঝা যায় যে নিজের হাতে তৈরি অস্বচ্ছল সংসার দীনদয়াল একা আর বহন করে নিয়ে যেতে পারেনি। বেলগাছ প্রয়োগে বোঝা যায় যে হিন্দুদের পবিত্র বৃক্ষ শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটা আইডিয়া লেখক এখানে গড়েছেন।

তথ্য ও বস্তু সততার উপর চিত্রকল্পকে নির্ভর করতে হয়। চিত্রকল্প কখনও বাস্তবকে অস্বীকার করে না। বাস্তব অভিজ্ঞতায় সামাজিক পরিবেশে শ্রুতি ও দৃষ্টির বোধ ও বোধিতে যে একটা Basic attitude গড়ে ওঠে তার সার্থক রূপই হচ্ছে চিত্রকল্প। চিত্রকল্পকে সুন্দর করে তোলে রূপক, তুলনা, উপমা, প্রতীক, সঙ্কেত, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি। পাঠকমনে লেখকের আইডিয়াকে স্পষ্ট করে চিত্রকল্প। লেখক যখন লেখেন লোকটি লম্বা;

তখন পাঠকমনে 'লম্বা' ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য লেখক আরও কয়েকটি শব্দ যোগ করে লেখেন 'তালগাছের মতো লম্বা'। অথচ তালগাছের মতো লম্বা কোন মানুষই হয় না। অবাস্তব প্রতিম। তখনই পাঠকমনে আইডিয়া জন্ম নেয় এবং পাঠক বুঝে নেয় যে লোকটি সাধারণ লম্বা নয়।

শিল্পে ও সাহিত্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার আধুনিক আবিষ্কার নয়। শিল্প ও কাব্যের জন্ম থেকেই এর ব্যবহার চলে আসছে। তবে আদিতে এর ব্যবহার প্রতীকেই সীমাবদ্ধ ছিল। আদিম কৃষক বৃষ বা ছাগলকে কৃষিক্ষেত্রের উপর রেখে তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতো। কিছু মাংস ছড়িয়ে দেওয়া হতো বীজের মতো, কিছু মাটিতে পোতা হত। এসব হত, কারণ একদা শস্যের প্রতীক ছিল বৃষ বা ছাগ। কালী হচ্ছে শক্তির প্রতীক, কারণ কালী সমাজের অমঙ্গলকে দমন করে। গ্রিক পুরাণেও দেখতে পাই সূর্য ও সমুদ্রের মূর্তিরূপে অ্যাপোলো ও থেটিসকে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে দিগাঙ্গনা, দিগবধূ, দিগবারণ প্রভৃতি প্রতীক লক্ষ্য করা যায়। প্রতীকের সঙ্গে বিজ্ঞান-সম্পর্ক খুবই কম। এই প্রতীকই পরবর্তীকালে চিত্রকল্পে রূপান্তরিত হয়। কম্বের তপোবন শকুন্তলার হৃদয়ের কোনো নিবিড় সহচরের মতোই। সমগ্র মেঘদূত কাব্যখানি এক তুলনাহীন অসাধারণ চিত্রকল্প।

প্রতিটি লেখক তাদের নিজস্ব মানসিকতা (Mental Conception) বা শ্রেণি অবস্থান থেকে চিত্রকল্প প্রয়োগ করে থাকেন। আকাশের চাঁদ দেখে এক কবির মনে প্রিয়দর্শিনীর মুখের ছায়াছবি ফুটে ওঠে, আবার অন্য কবির মনে চাঁদ হয়ে ওঠে ঝলসানো রুটি।

ছোটোগল্পকে যদি শৈল্পিক করে তুলতে হয় তাহলে সার্থক চিত্রকল্প ব্যবহার করতে হবে, কারণ চিত্রকল্প ছোটোগল্পের ভাষা তৈরি করে। খোলামেলা ঘটনার বর্ণনা, শ্লোগান, প্রোপাগ্যান্ডা, ডিটেলস্ ও আঙ্গিক—এ সবের সর্বস্বতা ছোটোগল্প নয়। লোকটার ব্যবহার সাধুর মতো, আসলে লোকটা চোর। ঠকাবার জন্য ব্যবহারকে সাধুর মতো রাখতে হয়েছে, শুধু এটুকু বোঝাবার জন্য টানা একটা গল্প হয়, তবে বানানো অর্থেই তাকে সার্থক ছোটোগল্প বলা যায় না। ভীষণ পরিচিত বাস্তব ঘটনার বর্ণনা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সব খুটিয়ে বলার চেয়ে চিত্রকল্পের সাহায্যে বলতে পারলে ভাষার গুণে ছোটোগল্প সুন্দর ও সার্থক হয়। চিত্রকল্প ব্যবহার ছোটোগল্পের ভাষাকে, বৈশিষ্ট্যকে গুণান্বিত করে, পরিমিতিবোধ জাগায়। অনর্থক আবেগ, উচ্ছ্বাস, বিশালতা এবং নাটকিয়তা ছোটোগল্পকে ক্ষতি করে। পরিমিতিবোধ যথার্থ শিল্পের লক্ষণ। এবং সেটা ভাষার চিত্রেই গড়ে উঠতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে চিত্রকল্পের ব্যবহার যথেষ্ট আছে। তাঁর কবিমনই ছোটোগল্পে চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। কোনো কোনো ছোটোগল্প পরিমিতি বোধের অভাবে চিত্রকল্পের প্রয়োগ সার্থক হয়নি। যেমন, 'কাবুলিওয়ালা' ছোটোগল্পটি। নামকরণটি এখানে ব্যর্থ। জাতি-গোষ্ঠী-দেশ নিয়ে কাবুলিওয়ালা নামের যে বিশালতা তা ছোটোগল্পের নয়। আন্তর্জাতিকতার মোড়কে মধ্যবিত্তের পিতৃস্নেহের সত্য বোঝাতে গিয়ে মিনু ও কাবুলিওয়ালা, জেলখানা ও কাবুলিওয়ালা, মিনুর বিয়ে ও কাবুলিওয়ালা এতসব আয়োজন ছোটোগল্পটিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে পরিমিতি বোধের অভাবে। চিত্রকল্পের ভূমিকা এখানে গৌণ।

সার্থক চিত্রকল্প প্রয়োগও দেখতে পাই কয়েকটি ছোটোগল্পে। রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' ছোটোগল্পটি স্মরণ করতে পারি সার্থক চিত্রকল্পের জন্য। 'আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে, কেবল হাত পাঁচ ছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।' —অথবা, "আমি এই একরাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।" এখানে চিত্রকল্প ব্যঞ্জনার উপর নির্ভর করছে।

শীতল হৃদয়ের তাপে আবদ্ধ দু'জন ভূতপূর্ব প্রেমাস্পদ নির্জনতার ও নিঃসঙ্গতার প্রতীক হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। ঝড় আর বন্যা যেন এখানে মনের নীরব যন্ত্রণা এবং অশান্তিকে টেনে এনেছে। দ্বিতীয় চিত্রকল্পে দেখতে পাচ্ছি যে একটি মাত্র শব্দের প্রয়োগ "মহাপ্রলয়" পাঠকমনে বিশাল উপলব্ধি এনে দিল।

রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' গল্পের সেই বিশেষ স্থানটি যেখানে বোবা সুভার পরিপূর্ণ যৌবন এবং তার মানসিক অবস্থা বোঝাতে গিয়ে পূর্ণিমার চিত্র এঁকেছেন কথাশিল্পী।

'গভীর পূর্ণিমা রাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমা-প্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া— যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন-কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্ থম্ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না।'

রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রকল্পটি এই গল্পকে সার্থক করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' বই-এ অনেক কথিকা ছোটোগল্প অণুগল্পও হয়ে উঠেছে। সেসব গল্প চিত্রকল্প প্রধান। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ফ্যাসীবিরোধী একটি গল্প নাম 'ধ্বংস' এবং 'তোতাকাহিনী'।

শরৎচন্দ্র যথার্থ ছোটোগল্প লেখেননি। তিনি ছোটোগল্পের মেজাজে বড় গল্প লিখেছেন। একমাত্র 'মহেশ'কে একটি ছোটোগল্প বলা যেতে পারে। এই ছোটোগল্পে যে চিত্রকল্প পাই, তা মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। তবে ছোটোগল্পে পরিমিতিবোধের অভাব শরৎচন্দ্রের মধ্যেও যথেষ্ট। 'মহেশ' গল্পে প্রকৃতির রূপের মধ্য দিয়ে গফুরের সংসারের চিত্রটি ফুটে উঠেছে গল্পের শুরুতেই।

'সম্মুখের দিগন্ত জোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে; আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে।'

আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে ধরিত্রীর বুকের রক্ত এখানে গফুরের সংসারের বুকের রক্ত, যে সংসারে আছে আমিনা, গফুর ও মহেশ যা নিরন্তর ধুঁয়া হয়ে মিশে যাচ্ছে। —অথবা

'রুদ্রের যে মূর্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্যন্ত নাই।'

এইসব চিত্র ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা গফুরের অন্তরে প্রবেশ করি। সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম্য সমাজ থেকে গফুর এক ফোঁটা করুণার আভাস পর্যন্ত পায়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে চিত্রকল্প প্রয়োগের পরিবর্তন ঘটল। ছোটোগল্পের একান্ত প্রয়োজনের কথা ভেবেই তিনি সৃষ্টি করলেন বিশেষ রীতির চিত্রকল্প। মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পটির নামকরণই হচ্ছে একটি চমৎকার শব্দচিত্র। গল্পের শুরুতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকমনে শব্দের ধাক্কা দিলেন— 'সমুদ্র দেখিবার সাধটা নীলার ছেলেবেলাকার। কিছুদিন স্কুলে পড়িয়াছিল, ভূগোলে পৃথিবীর স্থলভাগ আর জলভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু তার অনেক আগে হইতেই নীলা জানিত পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল।' এই ভৌগোলিক মানচিত্র যেন নীলার জীবনের মানচিত্রের তিনভাগ দুঃখ একভাগ সুখ।

ঐ একভাগ সুখের মধ্যেই অবশেষে নীলা সমুদ্রের স্বাদ পেল একেবারে গল্পের শেষে— 'আঙুল কাটিয়া গিয়া টপ টপ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে। আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে জল। মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে। কারণ নীলা জানে, নুন নাকি তৈরি হয় সমুদ্রের জল শুকাইয়া।' সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মিশে যেতে পেরেছিলেন বলেই এবং সামাজিক পরিবেশের ভেতর বাস্তবসত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর হাতে এরকম চিত্রকল্পের ব্যবহার সম্ভবপর হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের এবং মানুষের প্রতিটি অংশ পর্যবেক্ষণ করেছেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থেকে। এর জন্যই তিনি চিত্রকল্প ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন। এই পরিবর্তন জীবন-বাস্তবতা এবং রোমান্টিকতার দ্বান্দ্বিকতা। সমুদ্রের জল এবং শরীরের রক্ত, মানসিক দ্বন্দ্বের উদ্ভাস।

এরপর থেকে বাঙলা সাহিত্যে ছোটোগল্প আঙ্গিকের দিক থেকে, বক্তব্যের দিক থেকে এবং চিত্রকল্প প্রয়োগের দিক থেকে পরিবর্তন শুরু হয়। ছোটোগল্পের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হয়ে গেল চিত্রকল্প। এভাবেই ছোটোগল্পের গোত্রান্তর ঘটে।

এই পরিবর্তনের মূলে আবার আছে বিদেশি ছোটোগল্পের প্রভাব। আসলে বিদেশি ছোটোগল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলে এই বিপুল পরিবর্তন পাঠক মনে সহজে ধরা পড়ত না। তাহলে আরও কিছুকাল পূর্বসূরীদের মতো গল্প লেখা হত। দুঃখের বিষয় পরিবর্তন ও পরীক্ষানিরীক্ষা বিদেশিদের চোখে আগে ধরা পড়ে, তারপর আমাদের চোখ ফোটে, এরকম ভাবাটা শোভন নয়। সমসাময়িক বাঙলা ছোটোগল্পে আধুনিক চিত্রকল্পের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আলব্যায়ার কামুর একটি পরিচিত ছোটোগল্প থেকে চিত্রকল্পের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। The Adulterious Woman নামক ছোটোগল্পে তিনি কি ভাবে চিত্রকল্পটি ব্যবহার করেছেন লক্ষ্য করা যেতে পারে; Before her the stars were falling one by one and being snuffed out among the stones of the desert.

The last star of the constillations dropped their clusters a little lower on the desert horizon and became ill.

'The stars are falling' এবং 'The Stone of The Desert' চিত্রকল্পের বা ভাষা-চিত্রের ব্যবহারটি লক্ষণীয়। চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আমরা এক নিঃসঙ্গ এবং বেদনার্ত বিবাহিত সুন্দর মহিলার নিঃশব্দ কামনার কান্নার মধ্যে প্রবেশ করি।

একটি ছোটোগল্প পড়েছি, লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ছোটোগল্পটির নাম

'ছায়া'। ছোটোগল্পের চিত্রকল্পটি এক নতুন পদ্ধতিতে লেখক তুলে ধরেছেন পাঠক মনে : 'দেখলাম, ডানদিকে অনেক নিচে আমারই বিমানের ছায়া। একটা ছোটো কালো পাখির মতো ভেসে চলেছে মাঠের উপর দিয়ে— নদী পার হয়ে— বনের মাথায় মাথায়। এই ছায়ায় আমারও ছায়া আছে, তা মাটিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, নদীর জলকে স্পর্শ করছে, বনের ছায়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তবু সে ছায়া কারোর নয়। অনেক দূর থেকে, অনেক ওপরের আকাশ থেকে প্রক্ষিপ্ত।

নিজেকেও দেখতে পেলুম। ছায়া দিয়েই তো ছুঁয়ে চলেছি সব। অথচ এক নিঃসঙ্গ ঊর্ধ্বলোকে বসে আছি। সেখানে আমার সত্তা শুধু ওই ছায়াটুকু দিয়েই সব ছুঁয়ে গেল— দুহাত বাড়িয়ে মাটিকে আমি ধরতে পারলুম না, এক মুঠো সবুজ ঘাসকে পর্যন্ত নয়।' 'ছায়া' গল্পের এই নামটিতো চিত্রকল্পতার ব্যাপ্তি ঘটায়। বিমানের ছায়া এবং জীবনের ছায়া এই সময়ের নিঃসঙ্গতার এবং বিচ্ছিন্নতার স্বরূপকে চিনিয়ে দিতে পেরেছে।

অথবা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সেই ছোটোগল্পটি, 'নীল পেয়ালা' যার নাম।

ছোটোগল্পটির আরম্ভ, 'আকাশের নীল পেয়ালা উপচে পড়ছে উষ্ণ মধুর রোদে। রোদ তো না, পেয়ালা উপচে জাফরান রঙের চা ঝরে পড়ছে। যত খুশি পান করে নাও, শরীর চাঙা হবে, মন প্রফুল্ল হবে।

অথচ তাঁর বাড়িতে তাঁর টেবিলে ততক্ষণে শৌখিন পেয়ালার ধূমায়িত গরম চা এসে গেছে। কিন্তু বৈদ্যনাথের যেন সেই চায়ে রুচি নেই। ছেলেমানুষের মতন বৈদ্যনাথ আজ তিপ্পানয় পা দিয়ে সতেরো বছর বয়সের স্বপ্ন দেখছেন।

তারপর সেদিনই বৈদ্যনাথের সাথে সতেরো বছরের তরুণের আলাপ হল ক্যানেলের ধারে বাঁকাচোরা পত্রহীন পাকুড় গাছটার নিচে।

ছেলেটির উক্তি : 'তা হলেও আমি মরব, ইচ্ছে করেই মরব।'

এর অনেক পরে বৈদ্যনাথের উত্তর : ' তোমার বয়সে আমি কি করতাম জান?... ওই যে সবুজ ফ্রক পরা ফর্সা মেয়েটি লম্বা বেণী দুলিয়ে স্কিপিং-এর দড়ি ঘোরাচ্ছে, আমি ঠিক তার কাছে ছুটে যেতাম, ভাব করতাম।... আ, মেয়েটার কী সুন্দর গায়ের রং, পা দুটো কেমন লম্বা...

এরপর বৈদ্যনাথ চমকে উঠলেন, দু হাতে চোখ ঢেকে ছেলেটি (সতেরো বছরের তরুণটি) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।'

ছোটোগল্পটি শেষ হচ্ছে : তাঁর (বৈদ্যনাথের) দু চোখ ঝাপসা হয়ে এল, স্থির দৃষ্টি মেলে আকাশের নীল পেয়ালা থেকে উপচে পড়া শীতের রৌদ্র দেখতে লাগলেন।'

বিশুদ্ধ ফ্রয়েডিয়ান হলেও এই ছোটোগল্পটি প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত একটি বিশেষ কথা বলে এবং তা একটি নিটোল চিত্রকল্পের উপর দাঁড়িয়ে থেকে। এইসব ছোটোগল্প, গল্প-প্রধান নয়, যা পূর্বে ছিল। প্রধান হচ্ছে বক্তব্য যা চরিত্রের ভেতর নিয়ে যায়। এইসব ছোটোগল্পে শ্রুতি ও দৃষ্টির বোধ ও বোধিতে পাঠকমনে সৃষ্টি হয় অন্তর্মুখীন ধ্যানতন্ময় চিত্রকল্পতা। ভাষার পরতে পরতে শব্দগুচ্ছের তুলি দিয়ে ভাষার ছবি আঁকা।

ফ্রানৎস্ কাফ্‌কা-র Giant mole ছোটোগল্পের সেই গ্রাম্য বৃদ্ধ শিক্ষকটির কথা

এখানে ভাবতে পারি। এই গল্পের শেষে উত্তম-পুরুষ বলছেন শিক্ষককে তাঁর ছুঁচো আবিষ্কার সম্পর্কে, 'Don't you see that ?'

একবার যাচ্ছে শিক্ষকের কাছে সহানুভূতি নিয়ে, আবার যাচ্ছে সমাজের কাছে তীব্র বিদ্বেষকে বহন করে, অথচ কোনো ক্রমবিকাশময় পরিস্থিতি গড়ে ওঠে নি গল্পে। এইভাবে আধুনিক ছোটোগল্পের চিত্রকল্প অনেক সময় বক্তব্যের সাথে এবং গল্পের সাথে মিশে যাচ্ছে যা আলাদা করবার উপায় নেই। শুধু ছুঁচোকে কেন্দ্র করে দুটো চিন্তা 'সহানুভূতি' এবং 'বিদ্বেষ' ঘুরপাক খায়।

নামকরণ থেকে শেষপর্যন্ত একটি পুরো দীর্ঘ ছোটোগল্পকে চিত্রকল্পের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। সেরকমই একটি ছোটোগল্প লিখেছিলেন চেকোশ্লাভাকিয়ার একত্রিশ বছরের যুবক, ফ্রানৎস কাফ্‌কা। ছোটোগল্পটির নাম 'দ্য মেটামরফসিস্'। গল্পের শুরুতেই চিত্রকল্প, 'একদিন অস্বস্তিকর একটি স্বপ্ন দেখার পর সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই বিছানায় শুয়ে গ্রেগর শ্যামসা দেখতে পেল যে, সে একটা ভয়াবহ পোকায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।' ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় চাকরির কাজে একজন শোষিত যুবকের সাথে পোকার আইডিয়া এবং তার পরিণতি এই ছোটোগল্পের মূল থিম্। চিত্রকল্প যে ছোটোগল্পের ভাষার অন্যতম উপাদান তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'দ্য মেটামরফসিস্'। এখানেই ছোটোগল্পের সাথে উপন্যাসের আকাশপাতাল তফাৎ, শুধুমাত্র পরিণতির ক্লাইমেক্সে নয়।

গোর্কির লেখা 'ইতালির রূপকথা' বই-এ চিত্রকল্প ছড়ানো। এই বইয়ের প্রতিটি ছোটোগল্পের মধ্যে হীরের নাকছাবির মতো চিত্রকল্পগুলো জ্বল জ্বল করছে। 'দুপুর' গল্পটিতে ছোটোগল্পের টানটান চেহারা না থাকলেও ভালোবাসা ও সুখ সম্পর্কে দুটি জেলের কথাবার্তায় দুপুর হয়ে উঠেছে জীবন্ত মানবিক চরিত্র। যেমন— ছোকরার কথা 'মাঝে মাঝে অবাক লাগে দুনিয়ায় এতোগুলো ভাষার দরকার কি?' বুড়োটা একটু ভেবে উত্তর দেয়, 'লোকে বলে, একদিন এসব বদলে যাবে'।

দুপুর সমুদ্রের দূর নীলাঞ্চল সাদাটে কুয়াশার মধ্যে নিঃশব্দে ভেসে যায় একটা সাদা স্টিমার। মনে হয় যেন মেঘেরই একটি ছায়া।' ইতালির রূপকথার অন্যতম ছোটোগল্প 'বিকলাঙ্গ'-এর চিত্রকল্প 'আকাশের স্বচ্ছ ফিকে নীল চোখ সস্নেহে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। সে চোখের অগ্নিময় মণি-টা যেন সূর্য।' প্রাকৃতিক ব্যঞ্জনায় জীবন বাস্তবতার সাথে জড়িয়ে থাকা ভাষাচিত্রটি এতোই সহজ-সরল যে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। অথবা এই গল্পের— 'উলের বল পোশাকের তলায় কোথায় যেন লুকানো আছে, মনে হয় যেন লাল রঙের সুতোটা বুঝি বেরিয়ে আসছে সোজা হৃৎপিণ্ড থেকে।'

ছোটোগল্পে চিত্রকল্পের মাধ্যমে জীবনানন্দ যে ভাষা সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব ঘরানায় তা অ-তুলনীয়, লক্ষ্য করুন, : এখনও এক এক সময় চমকে উঠে অন্ধকারকে একটা পাখীর সুডৌল কোমল বুকের মতো মনে হয়। কামনাতুর উচ্ছ্বাসের আহ্বান পাই, পালকের গন্ধ পাই, জননীর দেহের মতো ধানসিঁড়ির জলের গন্ধ পাই। (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

'গ্রাম ও শহরের গল্প'র সেই অংশটি যা পাঠককে নাড়া দেয় : চকচকে ছুরিটাকে একবার ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে সেটার সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস পোষণ করে ধর্মবিশ্বাসীর মতো উজ্জ্বল মুখে মুরগীটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে করতে প্রকাশ বললে...।

কিম্বা মনে পড়ে সেই চিত্রকল্পটি যেখানে সতীনাথ ভাদুড়ী 'আন্টাবাংলা' গল্পের শেষে লিখছেন : গত যুগের সাক্ষী পাকুর গাছটির কান্ডের ক্ষত হইতে রস ঝরিয়া পড়ে, নূতন মাঙ্গলিক বসুধারার মতো। এখানে উপমান এবং উপমেয় কে-কার অলংকার বোঝা দায়।

এভাবেই একজন সার্থক ছোটোগল্পকার তাঁর অভিজ্ঞতা এবং ছোটোগল্পের প্রয়োজনে চিত্রকল্প নির্বাচন করে থাকেন। চিত্রকল্প নির্মাণে লক্ষ্য রাখতে হয় সরলতা ও ব্যঞ্জন মুখ্যতার দিকে। গতানুগতিক বা কষ্ট-কল্পিত শব্দের চিত্র বা চিত্রকল্প ছোটোগল্পের ভাষাকে আড়ষ্ট করে, গতিকে ব্যাহত করে। একজন ইংরেজ সমালোচকের মন্তব্য মনে পড়ছে, সমালোচকের নামটা স্মরণ করতে পারছি না : Now-a-days reading of poetry is not for pleasure, but for understanding। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে চিত্রকল্পের প্রয়োগে সমালোচকের এই মন্তব্যটি মেনে নিতে দ্বিধা নেই।

সাহিত্যের তথা ছোটোগল্পের ভাষা ও ভাষার স্বভাব

আমি মনে করি না, মানুষের জীবনে-মনে রসে-বশে-শরীরসেঁকা আনন্দ সৃষ্টির জন্য একটা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা গড়ে তুলতে হবে। ভাষা তো চিন্তা বা ভাবেরই প্রকাশ। ভাব বা চিন্তা আসে সামাজিক পরিবেশে গড়ে ওঠা মানুষের জীবন থেকে, জীবনের অনুভব থেকে এবং প্রকৃতির কাছ থেকে। আর তখনি ভাষার গুণে জীবন এবং প্রকৃতি এক হয়ে যায়। এই একাত্মতাই, সাহিত্যের ভাষা।

ভাষার জাত দুটি, মুখের ভাষা, কলমের ভাষা। জাত দুটি পরস্পর নির্ভরশীল। মুখের ভাষা প্রয়োজনের ভাষা, বেঁচে থাকার ভাষা, তাগিদের ভাষা, মিলনের ভাষা। বাস্তবতার সাথে তাল রেখে সে চলে। কলমের ভাষা ইঙ্গিতের ভাষা, বুদ্ধিশাসিত ভাষা, ভাবাবার ভাষা যা ব্যবহারিক ভাষা থেকে আলাদা রাখে। বোবা মানুষ কথা বলে ইঙ্গিতে। ইঙ্গিত বুঝে নেয় আরেক বোবা মানুষ। আদিম মানুষের গুহাচিত্রের কথা সবাই জানে। কিভাবে শিকার করেছে, বা কিভাবে শিকার করবে মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে আঁকার মাধ্যমে সেসব আয়ত্ত করেছে। এভাবেই ব্যঞ্জনাধর্মী অঙ্কন বা চিহ্ন বর্ণ হয়ে যায়। সেই বর্ণ জাতে ওঠে কলমের ডগায় এসে। সাহিত্যের ভাষা তৈরি করার মাধ্যম পেয়ে যায় লেখক। ব্যবহারিক ভাষা থেকে সাহিত্যের ভাষা সরে আসে।

কলমের স্বাধীনতাকে অবশ্যই স্বীকার করি। তবে সেই স্বাধীনতা যেন সমাজ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন না করে, সেই স্বাধীনতা যেন এক মানুষ থেকে অন্য মানুষকে বিচ্ছিন্ন না করে। স্বাধীনতা মানে একক ব্যক্তির খেয়ালখুশী মতো ভাষার বর্ম তৈরি করা নয় যা মানুষকে ঢুকতে বাধ্য করে না। ভাষা যাতে মানুষকে বুঝতে পারার স্পষ্টতা এনে দিতে পারে, সেরকম ভাষাই সাহিত্যের বা ছোটোগল্পের ভাষা হওয়া উচিত। আমি আমার মধ্যে থাকতে চাই না, আমি সবার মধ্যে যেতে চাই এরকম মনোভাবের উপর আমি ভাষাকে রাখতে চাই।

ইতিহাসের গতি তো তাই বলে। দুর্গেশনন্দিনী থেকে চলে আসা যায় গদাধর চট্টোপাধ্যায় (রামকৃষ্ণ) কৃত কথামৃত-এ। দু বছরের তফাতে প্রায় সমবয়সী দুজনের ভাষার আকাশপাতাল পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'রজনী'তে এসেও 'কথামৃতে'র ভাষার কাছে আসতে পারেননি। বলা যেতেই পারে কথামৃতের ভাষা মুখের ভাষা, সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয় না। যাঁরা বলবেন, তাদের জেনে রাখা ভাল, ভাষার গতি ঐসব বলার অপেক্ষা রাখে না। ভাষার গতিকেই কলমের ডগা দিয়ে বাড়িয়ে তুলতে হবে। নিষ্প্রাণ ভাষা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাঠকের বাহবা পেতে পারে। সাহিত্যের বা ছোটোগল্পের ভাষাকে অবশ্যই গতিময় এবং পাঠকের বোধগম্য হয়ে উঠতে হবে। সারল্য মানে বোকামি নয়, সহজ বুদ্ধির বিকাশ, যেখানে বোধ এবং অন্তর একাত্ম হয়। অসহজ

বুদ্ধিই মানুষকে জটিল করে, দুর্বোধ্য করে এবং তার ভাষাকেও। বোধ এবং অন্তরকে একাত্ম হতে দেয় না।

কথামৃতের ভাষা রামকৃষ্ণ পেলেন কোথা থেকে যা বঙ্কিমচন্দ্র পাননি। রামকৃষ্ণ লোকসাধারণের ভাষা এবং তাদের লৌকিক রুচি ও দেশীয় সংস্কৃতি যেরকম জানতেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেরকম জানতেন না। সাধারণ দেশিয় লোকদের সাথে রামকৃষ্ণের যেরকম মেলামেশা ছিল, একাত্মতা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সেরকম ছিল না। বিদেশি-মানস এবং বিদেশি ভাষার রীতি-নীতি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। তবে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সহজতার কারণ তাঁর বিদেশী মানসের প্রভাবমুক্তি। সোজা কথা এই, জনসাধারণের কাছ থেকে আমাদের ভাষা শিখতে হবে। জনসাধারণের কাছ থেকে ভাষা জানতে বুঝতে হবে এবং সেই ভাষা সাহিত্যের ও ছোটোগল্পের কাজে লাগাতে হবে। বিদেশি বই পড়ে, অভিধান দেখে ভাষাকে মাজাঘষা করে নাগরিক মর্যাদায় আচরিত করে টানটান করলে বা ঢিলেঢালা তা হয়ে ওঠে কৃত্রিম অথবা ভাষাবলির সাহিত্যের চাদর। সমাজ তৈরি হয় কাজের ভিত্তিতে, কাজের সূত্রেই মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক ও সংযোগ ভাষার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। অতএব এটাই বলব, সামাজিক মানুষের ভাষাই সাহিত্যের ভাষা। হুবহু লোকায়ত মানুষের ভাষাই বা ছোটোগল্পের সাহিত্যের ভাষা হতে পারে না। শব্দ-বিন্যাসের ভিতর দিয়ে মানুষের ভাষা সুচিন্তিত হয়ে, আকর্ষণীয় শব্দের প্রাঞ্জল প্রয়োগে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়।

বাংলা ভাষার স্তর অনেক রকম, যেমন সাধু, চলিত, গ্রাম্য, শহুরে, জেলাভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক। এই যে ভাষায় ভাষায় স্বাতন্ত্র্য তার জন্য আমরা গভীর সমস্যায় পড়ি। সাহিত্যের ভাষায় এরকম স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গেলে কমুনিকেশনের সমস্যা আরও বাড়বে। শিক্ষার ফলে বাঙলা ভাষার নানান রূপ একটি ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। সেটা চলিত ভাষার অভিশ্রুতি রূপ। সেই অভিশ্রুতি রূপকে দেশি ও আঞ্চলিক ভাষার সাধারণ শব্দ দিয়ে, সমৃদ্ধশালী করতে হবে।

সাহিত্যের ভাষা অন্তরের ভাষা, অনুভবের ভাষা, বোধবুদ্ধির ভাষা। অলংকারপূর্ণ স্বতস্ফূর্ততা তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এখনও শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ। অনেকে আছেন নিজের মতো করে সাহিত্যের ভাষা তৈরি করেন। বিদেশি ভাষার গঠনে নিজের মাতৃভাষাকে গঠিত করেন, বিদেশি শব্দের আভিধানিক বাংলা করেন, সাহিত্যে বহু ব্যবহৃত শব্দকে ক্লিশে মনে করে অভিধান থেকে মরা (অপ্রচলিত অর্থে) শব্দ (অনেকে মনে করেন নতুন শব্দ, ধারণা ভুল) ব্যবহার করেন, চলিত ভাষার সাথে তৎসম শব্দ যোগে কৃত্রিম ভাষা গঠন করেন। এভাবে ঐ শ্রেণির লেখক সাহিত্যের ভাষার নামে কৃত্রিম ভাষা তথা অপাঠ্য ভাষা তৈরি করেন। আসলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে, দেশিয় ভাষার জ্ঞানের অভাবে এবং সীমাবদ্ধতা থেকে ঐ মনোভাব গড়ে ওঠে। এখানে কথা-সাহিত্যিক কমলকুমার ও অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাম করা যায়। তারা তাদের সাহিত্য রচনায় কৃত্রিম ভাষার আবরণ তৈরি করেছেন, অনেক সমালোচক বলে থাকেন কমলকুমারীয় ভাষা। এই গতিহীন ভাষাকে কেউ গ্রহণ করেননি। বর্জিত হয়, যদিও কমলকুমারের লেখক-শিষ্যরা চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি, ডুবেছেন। কমলকুমার মজুমদারের ভাষা উপন্যাসে জটিল, ছোটোগল্পে সাবলীল।

আহ্লাদে ফুটিফাটা, কস্তাকস্তি, খান্ডার বৌ, চালচুলো, আছার পাছাড়, দরাজ হাত, চুন্ডি গণেশ, ধানগাছের তক্তা, পানসে চোখ, বুড়া হনুমান, বোতলপার করা, ভাতার পুত, লম্বা কোঁচা, শুয়োর বিয়োনী, সাজো কাপড়, সাজা দই, হাবজা গোবজা, আঁকুপাঁকু, ঝকমারির মাশুল, গাবদা মাগি, জলভসকা, এরকম দেশীয় অনেক শব্দ এবং শব্দগুচ্ছ আছে যা এখনও মানুষের কথায় চলাফেরা করে। আমরা মার্জিত রুচিশীলেরা শুনতে পাই না। শব্দের জন্য, ভাষার জন্য আমরা 'লোক'-এর কাছে যাই না। বাংলা ভাষায় রচিত অ্যাকাডেমিক সাহিত্য, বিদেশি ভাষায় রচিত সাহিত্য, পত্র-পত্রিকায় এবং টিভিতে ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনের ভাষা এসব থেকে ধারদেনা করে তৈরি করি যে ভাষা, সেই ভাষা আর যাই কিছু হোক না কেন, সাহিত্যের ভাষা কখনোই হতে পারে না।

এখানে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সাহিত্যের ভাষা প্রসঙ্গে The English Novel গ্রন্থে Ford Madox Ford-এর কথা কয়টি : Since writing is primarily for communication, you have to keep your reader constantly in mind as you write. This is not always so easy to do. Faced with an intense or convoketted writing task, you may often become very inward-looking, struggling to put your thoughts into words and get the words down on paper. You will then need to force yourself continually to emerge from this self-absorption.

...You must keep your eyes forever on your Reader. That alone constitutes Technique.

সাহিত্যের ভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো ভাবা যেতে পারে। তিনি বলেন : 'সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায় স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ার সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।...

সাহিত্যে যে স্বতঃপ্রকাশ সে আমাদের নিজের স্বভাবের। তার মধ্যে মানুষের অন্তরতম পরিচয় আপনিই প্রতিফলিত হয়।...

ভাষার অবিমিশ্র কৌলিন্য নিয়ে খুঁতখুঁত করেন এমন গোড়া লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুই মুখো করে তার দুই বাঁণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষায় এরকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে আচারের শুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্যকর্ম নয়, এখন আর এটা সম্ভব হবে না।'

এরকম ভাবেই এখনও আত্মসুখী-লেখকেরা সাহিত্যে ভাষার অসাধু কাজটা করে চলেছেন।

ছোটোগল্পের সৃষ্টিশীলতা সমাজের, সভ্যতার, মানুষের পরিবর্তনের সাথে সাথে ছোটোগল্পের গতিমুখও পালটে দেয়, ভাষার গতিও পালটে যায়। ছোটোগল্পের আঙ্গিকও পালটে যায়। সীমাবদ্ধতা ও কৃত্রিমতা ভেঙে যায়, সাহিত্যের ভাষাও তখন আর অপরিবর্তিত থাকে না। এবং সেটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই চলে আসে।

সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি ও ছোটোগল্পকারদের ভূমিকা

১

অপসংস্কৃতির বিপক্ষে বলতে গিয়ে বস্তুবাদী সমালোচকগণ সাহিত্যে নাটকে সিনেমায় অশ্লীলতা ব্যাভিচার যৌনতা হতাশা প্রতিহিংসা এসবের আধিক্যের উদাহরণ দেন। তখন ভাববাদী সমালোচকগণ বস্তুবাদী সমালোচকদের যুক্তি খণ্ডন করে প্রাচীন শিল্পকলা ও কাব্যের উদাহরণ দিয়ে বলেন কোনারকের শিল্প, কালিদাসের নাটক ও বিদ্যাপতির কাব্য বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরী যদি অশ্লীল না হয়ে যথার্থ মনন শিল্প হতে পারে তাহলে আজকের নাটক-কবিতা-কথাসাহিত্য শিল্প। তখন তথাকথিত বস্তুবাদী সমালোচকগণ সংশোধনবাদের পক্ষে রায় দিয়ে বলেন আজকের সাহিত্য আজকের যুগ দিয়ে বিচার করতে হবে। এভাবে তারা ভাববাদীর যুক্তি এড়িয়ে যান। অথচ কিছুতেই স্পষ্টভাবে বলতে পারেন না যে প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যকেও আমাদের তখনকার সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার এবং সংগ্রামশীলতা, সমাজ-চেতনার এবং শ্রেণি-চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

২

সংস্কৃতি শব্দটির প্রতিশব্দ 'কৃষ্টি'। কর্ষণ বা কৃষিকর্ম থেকেই 'কৃষ্টি' শব্দটির উৎপত্তি। সংস্কৃতির সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার একটি নাড়ির সম্পর্ক আছে। আবার উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির গভীর সম্পর্ক আছে।

যেহেতু সমাজের অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ত যুগ থেকে ধনতন্ত্রের যুগ পর্যন্ত সামন্তপ্রভু ও পুঁজিবাদীরাই নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে, সেহেতু সাহিত্য-সংস্কৃতি সামন্তপ্রভু ও পুঁজিবাদীদের অধীন ছিল। তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি সর্বদা চেষ্টা করত জীবনের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক থেকে সংগ্রামী মানুষদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা। সমাজের শোষিত মানুষদের জীবন-সংগ্রাম বিমুখ করে রাখার জন্য সামন্তপ্রভুরা ও পুঁজিবাদীরা সংস্কৃতিকে শরীর ও মনের বিনোদনের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাত। তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল দুটি, ধর্ম ও যৌনতা। বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ভোগবাদের প্রধান দুটি অস্ত্র সেজন্য প্রাচীনকাল থেকেই শিল্প-কাব্য-সাহিত্য-নাটক ইত্যাদির মধ্যে ধর্ম ও যৌনতা পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে স্থান নিয়েছে। খাজুরাহো, পুরী ও কোনারক মন্দিরের গায়ে নরনারীর সঙ্গমের ভাস্কর্যে এর নিদর্শন মেলে। কালিদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র এদের কাব্যে-নাটকে ধর্ম ও যৌনতার নিদর্শন পাওয়া যাবে। মহাভারতের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলোই হচ্ছে অবৈধ সন্তান। এরকম আরও ভুরি ভুরি নিদর্শন আছে। তখনকার কবিরাও

রাজাদের অনুগ্রহে লালিত-পালিত। অতএব রাজারা যে তাঁদের অপসংস্কৃতির পক্ষে কাজে লাগাবে না, এ কথাটা কার্ল মার্কসের যুগে ভাবা যায় না। আমরা প্রাচীনকালের ভাস্কর্য-শিল্প-কাব্য-নাটক থেকে ওদের ভাষার ব্যবহার, শৈল্পিক সৃষ্টির গঠনপ্রণালী গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু বিষয়বস্তু, অশ্লীলতা, ধর্ম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র পরিত্যাগ করতে পারি।

প্রাচীনকাল থেকেই পাশাপাশি শারীরিক পরিশ্রমের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সংস্কৃতি জন্মলাভ করেছে সেটা হচ্ছে লৌকিক সংস্কৃতি। প্রচুর লৌকিক কাহিনী নিয়ে এসব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তাদের সামাজিক অবস্থান এক ঐতিহাসিক সত্য। যেমন, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র বা জাতক কাহিনী। এগুলোর মধ্যে demotic value আছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের কালে এরূপ সংস্কৃতির উপর ঐতিহাসিক গবেষণা হয়নি বললেই চলে, সামন্ততান্ত্রিক-পুঁজিতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর প্রতি গবেষকদের দাসত্ব মনোভাবের ফলে। এখানে আরেকটি কথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে, শ্রমজীবীর সংস্কৃতি চর্চার উৎস হল তাঁর সংগ্রামশীল জীবিকা। তার কঠোর শ্রমের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতি-চর্চা তাঁর কাছে কেবল মনোরঞ্জন বা বিনোদনের ব্যাপার নয়। চাষি বা শ্রমিক যখন গান করে সেই গান তাঁর কাজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে গানের কথা ও সুর সৃষ্টি করে। এই গান, এই সুর মনকে হালকা বিনোদন রসে সিক্ত করা নয়, প্রেরণা, প্রাণশক্তিকে বাড়িয়ে তোলা।

এভাবেই সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা ও অবিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়, জীবন বিমুখতার পক্ষে এবং জীবনসমুখতার পক্ষে।

৩

সংস্কৃতির মধ্যে দুই লাইনের দ্বন্দ্ব ঢুকে আছে। (১) ভাববাদী সংস্কৃতি, (২) ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী সংস্কৃতি। ভাববাদী সংস্কৃতির মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে, ভালগার কালচারের সাথে মেটাফিজিক্যাল কালচারের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ অপসংস্কৃতির সাথে জীবনবিমুখ অ-সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। যে সকল কৃষ্টিবানেরা পুরোপুরি শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহ লাভ ছাড়াও তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থসুলভ ভূমিকা গ্রহণ করে সংস্কৃতির মধ্যে ধর্ম ও যৌনতা বা প্রেম ও যৌনতা ঢুকিয়ে দিয়ে ভালগার কালচারের সামাজিক পরিবেশ তৈরি করেন, তারাই অপসংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রচারক। এতে দুটি অর্থ আসে বিনা আয়াসে। নন্দনতাত্ত্বিক গোষ্ঠী অর্থাৎ মেটাফিজিক্যাল কালচার-গ্রুপ, শোষক ও শাসকদল সৃষ্ট অপসংস্কৃতির পরিমণ্ডলে থেকে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। এভাবে তারা স্থিতিশীল ও জীবনবিমুখ অ-সংস্কৃতি জন্ম দেন। অ-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকগণ সমাজের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার কার্য-কারণ সম্পর্ক থেকে পাঠকদের চিন্তা-ভাবনাকে সরিয়ে এনে সৌন্দর্য, ধর্ম, স্বপ্ন, কল্পনা, ভোগ, ত্যাগ এসবের প্রতি মোহগ্রস্থ করে তোলেন। অ-সংস্কৃতি তাকেই বলা যায় যে সংস্কৃতি স্থিতিশীল ও জীবন-বিমুখ, গতিশীল নয়।

আবার বস্তুবাদী সংস্কৃতির মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে। ভালগার রিয়েলিটির সাথে রাজনীতি-সচেতনতার এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব। জীবন-সংগ্রামের সাথে ধর্ম ও যৌনতার

প্রলেপ দিয়ে এঁরা ভালগার রিয়েলিটি বা সমাজ-বিচ্ছিন্ন রিয়েলিটি সৃষ্টি করেন। তারাও অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শ্রেণির সেবায় নিয়োজিত।

একমাত্র যারা শ্রেণিবিভক্ত সমাজ সম্পর্কে সচেতন, রাজনীতি সচেতন, পরিবর্তনশীল সমাজের দ্বন্দ্বগুলি বুঝতে সক্ষম এবং শোষিতের সংগ্রাম মানব যে তার পক্ষে, তারাই প্রগতিশীল, তারাই সমাজের অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন সংস্কৃতিকর্মী এবং কথাসাহিত্যিক (তথা নাট্যকার, কবি, চলচ্চিত্রকার) হিসেবে। তারাই একমাত্র অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন। আসলে এটাই ইতিহাস। সংস্কৃতি ও অ-সংস্কৃতির দ্বন্দ্বে কেউ শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর পরিষেবা করে থাকেন, অপসংস্কৃতির পরিবেশ তৈরি করেন, আবার কেউ এদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে মানব সংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন। আর যারা মাঝখানে আছেন তারা সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়ের ধারায় বিরাজ করছেন।

ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, চলচ্চিত্র, শিল্প এইসব চর্চার ভিতর দিয়ে সংস্কৃতির পরিবেশ ও প্রসার গড়ে ওঠে। এমত কারণে ছোটোগল্পকারদের দায়িত্ব সংস্কৃতির পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ও তলস্তয় দুজনেই ছোটোগল্প লিখেছেন। তাঁরা নিজ নিজ শ্রেণিতে অবস্থান থেকে ছোটোগল্প সৃষ্টি করেছেন। ওরা ছিলেন জমিদার। পার্থিব আকর্ষণ তাদের কাছে সুন্দর, আনন্দময় ও প্রেমময়। তলস্তয় সম্পর্কে লেনিন স্পষ্টই বলেছেন : 'তলস্তয়ের মতবাদ নিশ্চয়ই স্বপ্নরাজ্যের ব্যাপার এবং মর্মবস্তুর দিক থেকে সেটা প্রতিক্রিয়াশীল'—কথাটি যথাযথ প্রগাঢ় অর্থেই। সেজন্য তলস্তয়ের সংস্কৃতি আরোপিত সংস্কৃতি। প্রতিক্রিয়াশীল তকমাটি রাজনীতি-ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটাই যথার্থ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী কথাটাই যথার্থ। আমাদের অবিরাম চলার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

আর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে নবমূল্যায়ণ শুরু হয়েছে তাতে তিনিও যে একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অন্য শ্রেণির কবি ও সাহিত্যিক তা এখন প্রমাণিত। একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই সেটা স্পষ্ট হবে। কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবীরাও কমিউনিষ্ট প্রচারের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ থেকে উদাহরণ দেন। আবার কংগ্রেস বুদ্ধিজীবীরাও কংগ্রেসের ও ব্যক্তিতান্ত্রিকতার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ থেকে উদাহরণ দেন। তাহলে রবীন্দ্রনাথ কাদের? তবে কি তিনি নিরপেক্ষ এবং উভয়ের, এমত মূল্যায়ন মার্কসবাদী সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে না। আন্তর্জাতিক কমিউনিজম-পরিবেশে থেকেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সাম্যবাদের সপক্ষে কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। সাম্যবাদ সম্পর্কে পাওয়া যায়, কিন্তু 'সম্পর্কে' এবং 'সপক্ষে' এক কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ ও তলস্তয় উভয়ে ঈশ্বরে, প্রেমে, অহিংসায়, সৌন্দর্যে, কর্মে বিশ্বাস করেন। ব্যক্তিগত মালিকানা ও অধিকার থেকে শোষণের সৃষ্টি ও শোষণ থেকে যে দুঃখ-কষ্ট ও অভাবের জন্ম—একথা তারা জেনেও বিশ্বাস করেন না। এসকলের মধ্যেই দরিদ্র-সমাজ মুক্তি পেতে পারে। তাদের লেখায় দরিদ্রের, দুঃখকষ্টের ও অভাবের বিশাল ছবি আছে কিন্তু তাদের দুঃখকষ্টের সামাজিক কার্য-কারণ-সন্ধান নেই।

'মানুষ কিসে বাঁচে' (What men live by) বা 'যেখানে প্রেম, সেইখানেই ঈশ্বর' (Where love is) তলস্তয়ের এসব গল্পের মূল বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরের সেবা। সে জন্য তলস্তয় যখন 'একটি মানুষের কতটা জমি দরকার, (How much land does a man need)' গল্পটি লিখলেন তখন চেখভ 'গুলবেরিজ' গল্পে সেই গল্পের প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'একটি মানুষের প্রয়োজন সাত ফুটের (শবদেহের জন্য) বেশি জমি, গোটা ভূ-সম্পত্তির চেয়েও বেশি, বস্তুতপক্ষে গোটা পৃথিবীটাই তার প্রয়োজন।'

বদনাম, কাবুলিওয়ালা, শাস্তি এসব ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথ শ্রমিক আন্দোলন, শোষণ ও শ্রেণি-বিভাজন প্রেম, স্নেহ, অভিমান, মায়ামমতা এ সবের আড়ালে ঢেকে রেখেছেন। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে টাকা-শোষণকারীর মধ্যেও যে পিতৃস্নেহ আছে, তারই কাহিনি। পিতৃস্নেহ যেমন একজন শোষকের আছে তেমনি একজন শোষিতেরও আছে। প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে পিতৃস্নেহ সত্য। কিন্তু এই পিতৃস্নেহকেওতো শোষণ-নিপীড়িত সমাজ দূষিত করছে। যার জন্য এমন ঘটনাও ঘটে যে একেবারে নিঃস্ব দরিদ্র পিতাকে বা মাতাকেও সন্তান বিক্রি করে দিতে হয় বা খুন করে ফেলে বা গঙ্গার জলে বিসর্জন দেয়। স্নেহ তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে না। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে সমাজের সম্পদ ও তার সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক। স্নেহ মানুষকে টেনে রাখে। 'শাস্তি' গল্পে জমিদারের জবরদস্তি, অপমান, মজুরি ঠকানো, দুভাইয়ের নিদারুণ দারিদ্র ও একমুঠো ভাতের অভাবে স্ত্রী খুন— রবীন্দ্রনাথ গল্পে এসব উপাদানগুলিকে আশ্রয় না করে উপাদানগুলিকে আড়ালে রেখে বের করে নিয়ে এলেন নারীর প্রেম, মর্যাদা ইত্যাদির প্রতি নরের অসম্মান অপমান ও অবশেষে নরের আত্মশুদ্ধি। অবশ্যই দারিদ্রকে, ভাতকে কেন্দ্র করে জমিদারের অবিচারের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'শাস্তি' একটি উঁচুদরের গল্প হতে পারতো। শ্রেণিগত কারণেই রবীন্দ্রনাথ ওপথে যাননি।

'বদনাম' গল্পে বিপ্লবী অনিলকে পুলিশের স্ত্রীর মায়ার বাঁধনে নিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করালেন রবীন্দ্রনাথ। এই গল্পে বিপ্লবের সাথে অনিলের সম্পর্ক কি তার কোন কাহিনি নেই। গোটা গল্পে ছড়িয়ে আছে দারোগার স্ত্রীর সাথে বিপ্লবী অনিলের রাগ অনুরাগের লুকোচুরির রসসিক্ত কাহিনি। এই গল্পেও সেই নারীর ভালোবাসা, স্নেহ মায়ামমতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে বৈপ্লবিক সত্তাকে। ফলত রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

এসব কারণেই মার্কসবাদী সমালোচক বলেন, শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ধর্মনিষ্ঠা, ভগবদ্ ভক্তি, সৌন্দর্যতত্ত্ব, মায়ামমতা-স্নেহ প্রচার করেছে শাসক শ্রেণির স্বার্থে, প্রয়োজনে। এটাও ঐতিহাসিক সত্য, প্রতিটি যুগ পরিবর্তনের সময় স্থিতিশীল-সংস্কৃতির মধ্যে প্রগতিশীল সংস্কৃতির বীজ রোপিত থাকে। তলস্তয় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল।

গোর্কি, শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমেন চন্দ, এঁদের শ্রেণিগত অবস্থান ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে। এরা সবাই দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অভাব ও শোষণের জগতে এরা লালিত পালিত ও বর্ধিত। এঁরা যে সংস্কৃতি পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন তার সাথে সামাজিক-অর্থনৈতিক-উৎপাদন ব্যবস্থার গভীর সম্পর্ক আছে। নিচের তলার

মানুষদের আপসহীন সংগ্রামের কাহিনি লিখে গেছেন, বিশেষভাবে গোর্কি ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গোর্কি সৃষ্ট চেলকাশের মতো সংগ্রামী আপসহীন চরিত্রের কথা ভোলা যায় না। 'ঝঞ্ঝা-বিজয়ী পেট্রল পাখীর গান'—নামক গোর্কির প্রথাবিরোধী ছোটোগল্পে ফুটে উঠেছে জারতন্ত্রের হিংস্র রূপের বিরুদ্ধে বিপ্লবী তরুণ, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রাম। শরৎচন্দ্রের গফুর মিঞাও জমিদারের অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু আপস করেনি। সে বুঝতে পেরেছে এককভাবে উপরন্তু মুসলমান জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। তাই সে চলে যায় চটকলে কাজ করতে। কারণ সেখানে হাজার গফুর মিঞারা আছে একত্রিত হয়ে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। কলে কারখানায় মুসলমান বলে বা গরিব বলে কেউ দূরে সরিয়ে দেবে না বা ঘৃণা করবে না। শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে চাষি থেকে শ্রমিকে পরিণত হওয়ার উত্তরণ, অ-সংস্কৃতির উত্তরণ। জীবনের স্থিতিশীলতা থেকে গতি-শীলতায় উত্তরণ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সম্পর্কে স্পষ্টই বলেছেন 'মার্কসবাদ আজ আমার এ সংঘাতের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছে। এ সংঘাত হলো ভাববাদ ও বস্তুবাদেরই সংঘাত, সমাজ জীবনে আজ যা প্রকট হয়েছে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।' এই কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে অতসীমামী, দিবারাত্রির কাব্য ইত্যাদি অনেক গল্প রোমান্সে ঠাসা কাহিনি বলে নিজের সৃষ্টিকে অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন—'ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবতাকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল।' আর কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী সোমেন চন্দ যখনই বস্তুবাদী সাহিত্য সৃষ্টিতে হাত দিয়েছেন, তখনই ফ্যাসিষ্ট বাহিনী তাকে হত্যা করল (ষড়যন্ত্র মূলক) ঢাকা শহরের রাস্তায় লাল মিছিল বের করার অপরাধে। তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ ছোটোগল্প সৃষ্টির মাধ্যমে যে সংস্কৃতি পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন তা নিয়তির পক্ষে এবং প্রকৃতির পক্ষে। ভাববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়। সুস্থ সমাজ-সচেতন সংস্কৃতির পক্ষেই রায় দেন। এদের হাতে দরিদ্র-জীবন এসেছে কিন্তু দরিদ্র জীবনের সাথে বৃহত্তর জীবনের শোষণ ভিত্তিক অর্থনৈতিক বাস্তব সংঘাত আসেনি। গরিব মানুষ ও তাদের দুঃখ-কষ্টের পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তের রোমান্টিকতায়, নিয়তিবাদে এবং সৌন্দর্যানুভূতিতে। যেমন তারাশঙ্করের অগ্রদানী গল্পে অভাবের যন্ত্রণা ও তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আপসহীন সংগ্রামের পরিবর্তে পূর্ণ চক্রবর্তীকে লোভি ও বেঁচে থাকার জন্য জমিদারের সাথে আপসের শর্তে এক মেরুদণ্ডহীন চরিত্র বানিয়ে ছেড়েছেন তারাশঙ্কর।

সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে বর্তমানকালের ছোটোগল্পকারদের আশু কর্তব্য শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমেন চন্দের তৈরি জমিতে অবস্থান করে প্রাচীন সংস্কৃতির বিকাশের ধারাটি বিশ্লেষণ করা, সামন্তবাদী ও বুর্জোয়া চিন্তা-ভাবনার আবর্জনাগুলো ঝেড়ে ফেলে দেওয়া ও সমাজতান্ত্রিক সারবস্তুটুকু গ্রহণ করা, প্রাচীনকালের লোকসংস্কৃতি উদ্ধার করা ও বর্তমানকালে অপসংস্কৃতির যে মরণ কামড় শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। ফলত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের যথার্থ কথা পুনরাবৃত্তি করা যায় : সমাজের প্রবল ভাঙচুর, সমাজব্যবস্থার নতুন নতুন শক্তি ও উপাদানের সংযোগ প্রভৃতিব

ফলে মানুষের গভীর ভেতরের রদবদলের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত ছোটোগল্পের শরীরেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য।...

"রাষ্ট্রের কোমরে বাঁধা দড়ির প্রান্তটি যে-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে তাকে লক্ষ্য করাও তো ছোটোগল্প লেখকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।... বিজ্ঞানচর্চা বাদ দিয়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফল ভয়াবহ, এর ফল নিদারুণ সাংস্কৃতিক শূন্যতা এবং অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটে।...

বিদেশি কিংবা অপরিচিত উচ্চবিত্তের জীবনযাপনের হাস্যকর অনুকরণকে বলি অপসংস্কৃতি। এর উটকো চেহারা এত উদ্ভট, এত কিম্ভূতকিমাকার যে একে সহজেই কষে গাল দেওয়া যায়।...

বাংলা ছোটোগল্পে ভোগ্য ও ভৌমের অবস্থান

বাঙলা ছোটোগল্পের ইতিহাসের দিকে যদি মনস্ক নজর রাখা যায় তাহলে দুটি প্রবাহ পাশাপাশি উঠে আসে: (এক) ছোটোগল্পে ভোগবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব এবং (দুই) ছোটোগল্পে ভৌম সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব। একশো বছরের বেশি বাঙলা ছোটোগল্পের ইতিহাসের সূত্রপাত থেকেই এই দুটি প্রবাহের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বিদেশি ছোটোগল্পের প্রভাব-অনুকরণ-অনুসরণ বাঙলা ছোটোগল্পে প্রথম থেকেই চলে এসেছে। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছে ভোগবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতি, ভৌম জীবনবোধ থেকে নয়, বাঙালি-জীবনের পাঠশালা থেকে নয়। ইতিহাসের গোড়া থেকেই কিন্তু দ্বিতীয় প্রবাহ ভৌম সাহিত্য-সংস্কৃতির অবস্থানটাকেও খুঁজে পাওয়া যায় ছোটোগল্পে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের আদি থেকেই স্বদেশের মৃত্তিকা থেকে উঠে আসা যে জীবনবোধের এবং জীবনচর্চার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়, সেই জীবন্ত জীবনবোধ এবং জীবনচর্চাটাই হচ্ছে ভৌম-সংস্কৃতি। এই দুটি প্রবাহ রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' ছোটোগল্প থেকেই বয়ে চলেছে এখনও পর্যন্ত, একবিংশ শতাব্দীর সূচনা-পর্ব পর্যন্ত এবং তারপরেও।

বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) ছোটোগল্পটিকে প্রথম যথার্থ ছোটোগল্প ধরা হয়। সেই গল্পে ইবসেনিয় নারী-চেতনার প্রভাব লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা (কন্যা দায়গ্রস্থতা) থেকে গল্পের কাহিনি আহৃত হওয়া সত্ত্বেও এবং ইবসেনিয় নারী-চেতনা লক্ষ্য করা গেলেও 'দেনাপাওনা' গল্পে যে জীবনবোধ ও জীবনচর্চা উঠে এসেছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক ভৌম সাহিত্য-সংস্কৃতির বাইরে যেতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ ইবসেনের নাটক পড়তেন! তখন থেকেই স্ত্রী-পুরুষ ও দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিয়ে ভাবিত ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ সেসময় বিদেশি ছোটোগল্পকারদের যে সকল ছোটোগল্প পড়তেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন গল্পকারদের নাম: এডগার এ্যালেন পো, ওয়াশিংটন আরভিং, গোতিয়ে, জর্জ এলিয়ট, গলসওয়ার্দি প্রমুখ। এদেরই গল্পের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায় গুপ্তধন, কঙ্কাল, জীবিত ও মৃত, ক্ষুধিত পাষাণ, অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথের এইসব ছোটোগল্পে, তার প্রথম দিকের রচনায়।

এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক প্রতাপরঞ্জন বিশ্বাস তাঁর গ্রন্থ, 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বসাহিত্য'-এ। মূলত ১৮৯০/৯১ থেকে বাঙলা ভাষায় বিদেশী ছোটোগল্পের অনুবাদ থাকত সে সময়কার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। তারপর থেকে ছড়িয়ে পড়ে ভারতী-সবুজপত্র-সাহিত্য-কল্লোল পত্রিকায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমকালীন ইউরোপিয় গল্পকারদের সঙ্গে পাঠ-পরিচয় ছিল। ইংরেজি ও ফরাসি দুটো ভাষাই তিনি জানতেন এবং তিনি ফরাসি-রুশ-স্পেন এসব দেশের ছোটোগল্প অনুবাদও করেছিলেন।

এসব বিদেশি ছোটোগল্পের চর্চার ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বিদেশি ছোটোগল্প রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু অকপটে স্বীকার করতে হয় ভূমি-সংস্কৃতি থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। কারণ তাঁর দীর্ঘকালীন সামাজিক ও পারিবারিক অভিজ্ঞতা তাকে মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। ভৌম সাহিত্য সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেশের সামাজিক ও ভৌগোলিক ইতিহাস-চেতনা, সমাজ ও মানব-জীবনের স্পষ্ট অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে এসব বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য বেশ স্পষ্ট।

অনুবাদে সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর কথায় এটা স্পষ্ট, 'এ যুগের বাঙলার ছোটোগল্প মপাঁসার ছোটোগল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে'। জমিদার ও আভিজাত্য পরিপূর্ণ লেখক প্রমথ চৌধুরীর কল্পনা এবং বিদেশি ছোটোগল্পের পাঠ-মসৃণ অভিজ্ঞতা তার অনেক ছোটোগল্পকে প্রভাবিত করেছে। তবে তখনও ছোটোগল্পে সামাজিক ইতিহাস চেতনা ও নৈতিকতা থেকে গেছে। কারণ ভোগ্য সাহিত্য-সংস্কৃতি Concept-টা তৈরি হয়নি। এই Concept-টা তৈরি হল প্রথম মহাযুদ্ধের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে, বলা যায় ত্রিশের দশক থেকে। সে সময় Concept-টা তৈরি করে দেয় 'কল্লোল' নামে একটি ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য-পত্রিকা। বিদেশি ছোটোগল্প নিয়ে মাতামাতির চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছয় কল্লোল যুগ। তৈরি হয় কল্লোল-গোষ্ঠী। তাঁদের ছোটোগল্পে দুটি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, এক) প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, দুই) ফ্রয়েডবাদ (লক্ষ্য যৌনতা)। ওদের লেখাতেই প্রথম যৌনজীবন ও যৌনবিক্‌তি প্রাধান্য পায় ছোটোগল্পে। সেটা ভিখিরি বা ফুটপাতবাসী ও বস্তিবাসীরাও হতে পারে। ধনী শ্রেণীরাও হতে পারে। প্রথম পর্বে (সবুজ পত্র পর্যন্ত) বিদেশী অনুপ্রাণিত ছোটোগল্পে সুস্থ যৌনবোধ ছিল, কিন্তু আদিমতা (যৌনবিকৃতি) ছিল না। ছিল Originality এবং আত্তীকরণ, ছিল ভৌম-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব এবং বিস্তার, আর ছিল নেতিবাচক সমাজমনস্কতা। দ্বিতীয় পর্বে (কল্লোল থেকে) শুরু হল আদিমতা, লালসা, রিরংসাপ্রবৃত্তি এবং যৌনবিকৃতি, তার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে নেতিবাচক সমাজ বাস্তবতা, সেখানে জড়িয়ে থাকে হতাশা-বিষণ্নতা-বিচ্ছিন্নতা। ফলে কল্লোল-গোষ্ঠীর ছোটোগল্পকারেরা যথা বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ স্যান্যাল, মণীশ ঘটক এরা কেউ প্রথম শ্রেণির ছোটোগল্পকার হয়ে উঠতে পারেন নি. পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও। কারণ তাদের অবস্থানটা ভৌম সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে ছিল না, তাঁদের চিন্তা-ভাবনার ভৌগোলিক অবস্থানটা ছিল বিদেশি ঘরানা ও আবহের মধ্যে। পরবর্তীকালে পঞ্চাশ দশকের ছোটোগল্পকারদের এরাই শাসন করত এবং তাদেরকে উৎসাহিত ও প্রাণিত করত 'দেশ' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা যার জন্ম ত্রিশের দশকেই।

ত্রিশের দশকেই 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হবার কয়েক বছর পরেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এখনও চলছে। এই পত্রিকার লেখকদেরকেই বলা হয় পরিচয়-গোষ্ঠীর লেখক সম্প্রদায়। ফ্রয়েড প্রভাবিত কল্লোল-গোষ্ঠী এবং কার্ল মার্কস প্রভাবিত পরিচয় গোষ্ঠীর ধারালো কলম থেকে বেরিয়ে আসে ভোগ্য সাহিত্য-

সংস্কৃতি এবং ভৌম-সাহিত্য সংস্কৃতি। ত্রিশের দশক থেকেই সাহিত্যের মতাদর্শ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে ভোগ্য এবং ভৌম সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। ভোগবাদী সাহিত্য পণ্য ও বিনোদনের প্রতি দায়বদ্ধ। ভূমিবাদী সাহিত্য পরিবর্তনশীল সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। কল্লোল-গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনায় প্রতিফলিত হয় প্রতিক্রিয়াশীলতা, নেতিবাচক জীবনচর্চা, বুর্জোয়া ডেকাডেন্স, বিদেশি ঘরানা ও আবহ এবং ফ্রয়েডবাদ। পরিচয়-গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনায় প্রতিফলিত হয় প্রগতিশীলতা, ইতিবাচক জীবনচর্চা, দ্বন্দ্ব-মূলক বস্তুবাদ, স্বদেশী ঘরানা ও আবহ।

ত্রিশ/চল্লিশ দশকের ছোটোগল্পকারেরা পঞ্চাশের দশকেও প্রচুর ছোটোগল্প লিখেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে এবং পর থেকে। তাদের ছোটোগল্পকে মতাদর্শগত দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দ্বিধাবিভক্ত চেহারাটা দেখা যাবে। তাঁদের ছোটোগল্পে একদিকে প্রতিফলিত হয়েছে অবক্ষয়ে ভাসিত সমাজ এবং অন্য দিকে প্রতিফলিত হয়েছে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ, স্থিতিশীলতার গতিরোধ এবং সুস্থ জীবনচর্চার দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণা। একদিকে রয়েছে কালোবাজার, অর্থলোভ এবং অর্থকষ্ট, হিংসা-প্রতিহিংসা, কামনা-বাসনা এবং নারী-শরীর, অন্য দিকে রয়েছে সুস্থ জীবনের প্রতি টান, বাঁচার অধিকার, বাঁচার জন্য ভালোবাসা, পারিবারিক-সামাজিক লড়াই এবং সংগ্রাম। এই রূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের এবং বিভাজনের উপর দাঁড়িয়ে আছে তাদের ছোটোগল্প। ভৌম সংস্কৃতির আকর্ষণে যাঁরা অসাধারণ এবং বলিষ্ঠ ছোটোগল্প লিখে গেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন: তারাশঙ্কর (অগ্রদানী/তারিনী মাঝি/ডাইনী); বিভূতিভূষণ (ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল/সই/বিরজা ডোম ও তার বাবা); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (গায়েন/দিক-পরিবর্তন/মাটির মাশুল); সুবোধ ঘোষ (কুসুমেষু/কর্নফুলির ডাক/ফুলজানি-নামা); আশাপূর্ণা দেবী (বিবি বেগমের শিবতলা) নরেন্দ্রনাথ মিত্র (সেতার/চোর/মহাশ্বেতা); নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (পাশাপাশি /বনতুলসী/বীতংস); নবেন্দু ঘোষ (ত্রিশঙ্কু/পোস্টমর্টেম/চিমনির ধোঁয়া); সৌরী ঘটক (ভাঙা নৌকার মাঝি); ননী ভৌমিক (ত্রাণকর্তা/সলিমের মা/পলাশ-সন্ধ্যা); সমরেশ বসু (পাড়ি/ছেঁড়া তমসুক/ষষ্ঠঋতু); জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (গিরগিটি/সমুদ্র/টিনের ঘরের চিত্রকর); সতীনাথ ভাদুড়ী (চকাচকি/বন্যা/গণনায়ক); ঋত্বিক ঘটক (পরশপাথর/কমরেড); কমলকুমার মজুমদার (নিমঅন্নপূর্ণা/লুপ্ত পূজাবিধি), সাবিত্রী রায় (রাধারানী/অন্তঃসলিলা) এবং আমার নিজস্ব পঠন-পাঠনের বাইরে আরও ছোটোগল্প ও ছোটোগল্পকার আছেন।

এবার পঞ্চাশের দশক। তথাকথিত স্বাধীন দেশ আমাদের। কারণ প্রাপ্ত স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক আছে, খণ্ডিত বঙ্গদেশ নিয়ে বিতর্ক আছে, এ নিয়ে ছোটোগল্পও লেখা হয়েছে ছোটো কাগজে। পঞ্চাশের দশক, অর্থনৈতিক সংকটের দশক। কালোবাজারি-মুনাফাবাজি-ধান্দাবাজিদের দশক। উদ্বাস্তুদের বন্যার স্রোতের মতো আছড়ে পড়', উপচে পড়া এই প. বঙ্গে। শ্রমিক ও গরিব, শোষণ-অত্যাচার-নির্যাতন, কলকারখানা উঠে যাচ্ছে, সামন্ত-প্রথা জেকে বসেছে। বেকার জীবনের চরমতম সঙ্কট। প্রতিরোধ-আন্দোলন-সংগ্রাম। জীবনের মূল্যবোধ অন্ধকারে পথ খোঁজে। ফলত পঞ্চাশের দশকে

যাঁরা ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছে তিন শ্রেণির লেখক। এক শ্রেণির লেখক খ্যাতি-যশ-অর্থের লোভে বেছে নিয়েছেন কার্য-কারণ সম্পর্ক না ভেবেই যৌনজীবন-অধ্যাত্মজীবন-শরীরী আনন্দ, রোমান্টিকতা, কল্পনা-বিলাস এবং হতাশা-ব্যর্থতা-বিষণ্ণতা-বিচ্ছিন্নতা-হিংসা-প্রতিহিংসা-বিদ্বেষ-নিয়তি এবং অবক্ষয়। নারী তাদের কাছে পণ্য, পুরুষ তাদের কাছে চতুর, প্রতারক ও ভণ্ড। দ্বিতীয় শ্রেণির ছোটোগল্পকারেরা বেছে নিয়েছেন অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-সংঘর্ষ এবং ভূমিপুত্রদের মলিনতা এবং অসহায়তা। জীবনের পক্ষে মানবিক দর্শন এবং ইতিবাচক দর্শন। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়েন দুনৌকয় পা দিয়ে চলা এক ধরনের সুযোগ-সন্ধানী ছোটোগল্পকারেরা। এরা জিরাফেও আছেন ধর্মেও আছেন। তবে লক্ষ্য বিনোদন, ভোগবাদ ও ভাববাদ-বস্তুবাদ সমন্বয়।

প্রথম শ্রেণির ছোটোগল্পকারেরা ধরে রেখেছেন ভারতী-সবুজপত্র এবং কল্লোল-গোষ্ঠীর ধারাবাহিকতাকে। তাঁদেরকে আর্থিক এবং খ্যাতির আশ্রয় দিয়েছে বিনোদনী ও বাণিজ্যিক পণ্য পত্র-পত্রিকা। এবং তাদেরকে তোয়াচ করছে বেশ-কিছু লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরা, ওইসব কাগজে লেখার প্রয়োজনে, যশের লোভে। এঁরাই ভোগ্য ও পণ্য সাহিত্যের ধারক-বাহক। এরাই বিদেশি ছোটোগল্প পড়ে প্লট এবং স্টাইল-ফর্ম (আঙ্গিক) চুরি করেন প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে। এঁদের সামাজিক অভিজ্ঞতা সংবাদপত্র পাঠ, বিদেশি সাহিত্য পাঠ, ফেস্টিভ্যালের চলচ্চিত্র, সিরিয়াল এবং অর্থ-সচ্ছল কৃত্রিম পরিবার। এঁদের দর্শন ফ্রয়েড এবং ফ্রয়েডবাদ। হ্যাভলক এলিসের যৌন-তত্ত্বের সার দিকটির পরিবর্তে অসার যৌনবিকৃতির দিকটি এদেরকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় শ্রেণির গল্পকারেরা ধরে রেখেছেন প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা এবং লিটল ম্যাগাজিন। এরা প্রগতিশীল এবং পরিবর্তনশীল সমাজ-দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। মূলত মার্কসীয় সমাজ-দর্শন। জীবনের পাঠশালা থেকে এরা পাঠ গ্রহণ করেন। এদের চিন্তাভাবনাকে বৈজ্ঞানিক সমাজ-দর্শন বা বস্তুবাদ প্রাণিত করে। এরা ভৌম সংস্কৃতির ধারক-বাহক। এরা যেমন বিদেশি ছোটোগল্প পাঠ করেন আরও অধিক পাঠ করেন লোক-সমাজ, লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কিত পঠন-পাঠন, যেমন বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণের কথামৃত। এরা পারিবারিক বৃত্তের বাইরে সামাজিক বৃত্তেও ঘুরে বেড়ান, গ্রামে গঞ্জে শহর ও শহরতলিতে। সামাজিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বেড়ান। ছোটোগল্প তাঁদের কাছে একটি উৎপাদন শিল্প (Productive Art)। তৃতীয় শ্রেণির ছোটোগল্পকারেরা মূলত সমন্বয়পন্থী এবং ছোটোগল্পের ট্র্যাডিশনে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী, চলে আসছে চলুক। এই তিন শ্রেণির ছোটোগল্পকারদের চিহ্নিত করে তাঁদের ছোটোগল্পের বিচার-বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়, এটা গবেষকদের কাজ। আমি স্বাধীনতা-উত্তর কিছু ছোটোগল্পকারদের (আমার পঠন-পাঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ) দু-একটি ছোটোগল্প তুলে ধরব, যে সকল ছোটোগল্পে শুধুমাত্র ভৌম সংস্কৃতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সন্ধান পাওয়া যায়। এঁরা প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার ধারক-বাহক; সমাজকে গতিশীল করে তোলে। নারী এদের কাছে জীবন-সংগ্রামের অর্ধেক আকাশ। পুরুষও নারীর

কাছে জীবন-সংগ্রামের অর্ধেক আকাশ। দলীয় রাজনীতি নয়, ভোগবাদ নয়, অবিজ্ঞান আদর্শ নয়, মানবিক জীবনচর্চা, গতিশীলতা এবং ইতিবাচক জীবনবোধ এদের আদর্শপথ। সমাজে সংঘাতময় নেতিবাচক ভূমিকাকে এঁরা অস্বীকার করে না। এঁদের মধ্যে আছেনঃ কার্তিক লাহিড়ী (দহেজ/মহিষ); সৌরি ঘটক (কমরেড/অরণ্যের স্বপ্ন); অসীম রায় (অনি/ধোঁয়া/ধুলো-নক্ষত্র); দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বয়ম্বর সভা/মহাকাব্যের ঘোড়া); দেবেশ রায় (দহনবেলা/সাধারণ চক্কোত্তির জীবনসূত্র); কৃষ্ণ চক্রবর্তী (পা'টা নামিয়ে বসুন/আগুনের উৎসব/ক'সের দুধ লাগে মামলা করতে); অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (ভুখা মানুষের কোন পাপ নাই/সাদা অ্যাম্বুলেন্স); ব্রজেন মজুমদার (খোদ হাতির ডাক/দোস্তালির গল্প); সত্যপ্রিয় ঘোষ (মায়ের বাসা); অমিত গুপ্ত (যুধিষ্ঠিরের কুকুর/ভাঙাচোরা মানুষ আর সোজা জীবনের বৃত্তান্ত); সমরেশ মজুমদার (পরিবর্তিত পরিস্থিতি/অক্টোপাস); চিত্ত সিংহ (দুখচরের কুশারাম); মিহির আচার্য (আজ-কাল-পরশু/পূর্বমেঘ উত্তর মেঘ); টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ (তালপুকুরের উপাখ্যান/বাইপাস সার্জারি); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী/গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প); জ্যোৎস্নাময় ঘোষ (হরদেও দোসাদ ও ভারতবর্ষ/বৃত্ত); প্রবোধবন্ধু অধিকারী (শঙ্খচূড়/পার্টিশন); অমিয়ভূষণ মজুমদার (সাদা মাকড়সা/পুকুরের মুক্তো); সুশীল জানা (অম্মা/সাঙ্গাত); বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (অরণ্যের স্বপ্ন/জব চার্ণকের কলকাতা); অদ্বৈত মল্ল বর্মন (সন্তানিকা); তপোবিজয় ঘোষ (ডোম-চরিত/উত্তরের জানালা); সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (রানির ঘাটের বৃত্তান্ত/ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন); সুলেখা সান্যাল (ঘেন্না/গাজন সন্যাসী); মহাশ্বেতা দেবী (আলতা/যশবন্তী); পূর্ণেন্দু পত্রী (ছ্যাঁকা/গৌর্নিকা) সুধাংশু ঘোষ (শিকড়ের টান/ডুমুর পাতা) ইত্যাদি এবং আরও অনেক অসাধারণ ভৌম ছোটোগল্পকার আছেন যা আমার পঠন-পাঠনের বাইরে।

ষাট-সত্তরের দশক। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এক উত্তাল সময়। তীব্র খাদ্য সঙ্কট এবং খাদ্য আন্দোলন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসদল দ্বিখণ্ডিত। পুব-বাংলার উদ্বাস্তুদের পুনরায় আগমন। খুন-হত্যা-ব্যক্তিহত্যা। রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসা। নকশাল-কংশাল দুই ভাগ। সমাজ পরিবর্তনের ধারক-বাহক। পূর্বসূরী মনীষীদের মূর্তিভাঙার রাজনীতি, সামাজিক মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ শুরু। তর্ক-বিতর্ক শুরু। রাজনৈতিক-সংঘর্ষ এবং দ্রব্য-মূল্যের অস্থিতিশীলতা। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় নানান্ দলের অভ্যুত্থান। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পট-পরিবর্তন। ষাট-সত্তরের শ্রমিক আন্দোলন, ভূমি-সংস্কার আন্দোলন, শরিকি সংঘর্ষ, রাষ্ট্রপতি শাসন ও অত্যাচার, রেল ধর্মঘট, আভ্যন্তরীন জরুরি অবস্থা জারি, আটক-বন্দি-গুলি ইত্যাদি। তকমা-আটা কৃষি-বিপ্লব এবং কলকারখানা বন্ধ। একদিকে গ্লোবালাইজেসন কালচার ও বুর্জোয়া কালচারের নতুন বাঁক, অন্য দিকে হিউম্যান কালচার এবং সোসাল কালচার। মাঝখানে এসে দাঁড়াল সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ, পুনরায় ধর্মান্ধতার আবির্ভাব। এসব এড়িয়ে ভোগবাদী ছোটোগল্পকারদের গল্পের বেশির ভাগ চরিত্ররা ঢুকে গেলেন কাচের ঘরে মেয়ে মানুষ নিয়ে, হাতে মদের গ্লাস নিয়ে, মেয়েরাও ঢুকে গেলেন অর্থ-সচ্ছল পুরুষদের নিয়ে। আর ভৌম

ছোটোগল্পকারদের গল্পের চরিত্ররা শোষণ-বঞ্চনা-অন্যায়-অবিচার-ধর্ষণ এসবের বিরুদ্ধে। পরিবর্তনশীল সমাজে নানারকম সংকট এদের প্রভাবিত করে। ফলে তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ নানা আকার নেয়।

ষাটের দশক থেকেই ছোটোগল্পের ছক ভেঙে যায়, আবার নতুন ভাবে ছোটোগল্পের ছক তৈরি হয় প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এই দশকের ছোটোগল্পকারেরা বিদেশি ছোটোগল্পের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ছক ভাঙেন, নিষ্প্রাণ ছক। সবাই নয়, কেউ কেউ। এদের মধ্যে অনেকেই পরে কৃত্রিম গদ্য ভাষার ও পণ্য সাহিত্যের সাজানো-গোছানো সীমানার ভেতর ঢুকে যায়। আবার অনেক ছোটোগল্পকারেরা আছেন ভৌম সাহিত্যের সনাতনী সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করেন। তাঁরাও ছক ভাঙেন, ছক গড়েন। মনের বিবেক এবং ভাঙা-গড়া সমাজের বিবেক অনুসারে এদের ছোটোগল্প নতুন ভাষ্য তৈরি করে। কি বলতে চায় ছোটোগল্পে এসব ছোটোগল্পকারেরা? সেখানে জীবন-ভাষ্যের একটা ব্যঞ্জনা থেকে যায়। তাদের মধ্যে আছেনঃ শৈবাল মিত্র (হরধনু কাহিনির পুনর্লিখন/ধর্মের কল/পঞ্চ মোড়লের ভূয়োদর্শন); মিহির ভট্টাচার্য (ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া/মণিরামের শেকড় ও ডালপালা); সৌরীন গুহ (রাধাকেষ্ট প্রামাণিকের জীবন-বিচিত্রা); মণি মুখোপাধ্যায় (গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার/ক্ষেতু বাগচির স্বাধীনতা); মনোজ চাকলাদার (আত্মজীবনী/কণ্ঠস্বর); বারিদবরণ চক্রবর্তী (সবুজ দ্বীপের মাঝি/সুন্দর বনের সানাই); সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য (কালী প্রসঙ্গে কালী পরিকল্পনা/রক্ত গোলাপের চাষ/দ্রৌপদীর বস্ত্র/ন্যুড স্টাডি); কালীকুমার চক্রবর্তী (দ্বিপাদভূমি/জীবনকে ভালোবাসতে শেখো); চিত্ত ঘোষাল (ভবনাথের কালী পুজা/ সুলেমানের হেপাজত); অ-কু-সা (তলিয়ে যাওয়ার আগে); রথিন দে (পুরোনো হ্যারিকেনের আলোয়); নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায় (চতুষ্কোন); শুকদেব চট্টোপাধ্যায় (সুজন হাসদার গল্প/তরাইয়ের মা); প্রভঞ্জন হালদার (বান); তপন চক্রবর্তী (জাগ্রত দেবতা/ আবু হোসেনের গল্প); বিজিত ঘোষ (ধ্বস্ত/টানাপোড়েন); শৈলেন চৌধুরী (গগনরাম ছুটছে/ফেরা); স্বর্ণমিত্র (প্রসব/বাঘ শিকার); এ মান্নাফ (ননীহারার তালাক); রমা মহিন্তা (রঘুয়া ও বাখিয়া); দিলীপ মিত্র (আইডেন্টিটি কার্ড/আততায়ীর মুখ চিনতে পারিনি আমরা); অশোক মুখোপাধ্যায় (পিতৃগৃহ/কে কোথায় দাঁড়িয়ে) শৈলেন্দ্রনাথ বসু (হ কত্তা ছাই কোলন হতি পারে); জীবন সরকার (পরী); মোহন নস্কর (পটকথা); অশোক রায় চৌধুরী (আতর আলীর ঘোড়া); অসিতকৃষ্ণ দে (নিয়ন্ত্রণ); কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (স্বাধীন দাস ও সপ্তদশ অশ্বারোহী); ঊষা রায় (মনুঠাকুরের জন্ম বেতান্ত); নকুল মৈত্র (স্মৃতি তাড়িত রজত); গণেশ সাধুখাঁ (চিরাগ); মুকুল নিয়োগী (অজন্তা-প্রদর্শনী); সনৎ বসু (মাঠ ময়দানে শহিদ বেদী/গৃহযুদ্ধ); নন্দ চৌধুরী (ক্রস কানেকশন); রঘুপতি বসু (দরোজা, ঘাস); আনন্দময় রায় (জল মাগা); সত্য প্রকাশ (শাইলক); সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (সুবর্ণরেখা/রূপনারায়নের কূলে) ইত্যাদি।

অনেকে ভেবে থাকেন বামফ্রন্টের দীর্ঘকালীন শাসনের ফলে যে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সুবিধাবাদ দেখা যায় সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের, অন্যায়-প্রতিবাদের

ছোটোগল্প লেখা দেখা যায় না। যৌন-জীবন, যৌন-বিকৃতি, ধর্ষণ, মদ্যপান, মার্কেটিং শপিংমল, পারিবারিক দুঃশ্চিন্তা (টেনশন), অত্যাচারিত সমসাময়িক ও ভোগবাদী নারী জীবন, এসব প্রাধান্য পায়। এসব নিয়ে ছোটোগল্প লেখা হয়, লেখা হচ্ছেও। এভাবেই ভোগ্য সাহিত্য বিস্তৃতি লাভ করে। প্রকাশকেরা এগিয়ে আসে। ফলে আশি নব্বই এবং পরের দশকে ছোটোগল্প আর এগোতে পারছে না, স্থিতিশীল সীমানার মধ্যে বিচরণ করছে। এই ফাঁকে বিদেশের নানারকম বিচ্ছিন্নতার মতাদর্শ ব্ল্যাক রিয়ালিজম, ম্যাজিক রিয়ালিজম ও পোস্ট মর্ডানইজম ঢুকে পড়ে একশ্রেণির মধ্যবিত্ত মানসিকতার বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ভাবনাকে গ্রাস করে নেয়। ভোগবাদী ও পণ্য সাহিত্যের নগ্নতা আরও প্রকট হয়ে উঠে আসছে রমণীয়া লেখিকাদের এবং লেখকদের কলম ধরে। এছাড়াও সাদাসিধে সরলীকরণ আটপৌরে গল্প, আদৌ ছোটোগল্প নয়, ভৌম গল্পকে চিহ্নিত করে লেখা হতে থাকে শহর, শহরতলির অনেক লিটল ম্যাগাজিনে।

সাহিত্য-সংস্কৃতির বিজ্ঞজনেরা ভেবে থাকেন, সামাজিক প্রতিবাদী আন্দোলন আলোড়ন না থাকলে সৃজন-সাহিত্য এগোতে পারে না। উথাল-পাথাল তাড়না ছিল বলেই ত্রিশ-চল্লিশ-ষাট-সত্তর দশকে সৃষ্টিশীল ভৌম সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। সর্ব অর্থে এই বক্তব্য মানা যায় না। এটা যথার্থ, আশি-নব্বই এবং পরের দশকের সময়টা ভয়ঙ্কর রকমের উথাল-পাথাল সময় নয় ঠিকই, রাজনৈতিক শরিকি সংঘর্ষ সমাজের উপর সেরকম চাপ সৃষ্টি করে না ঠিকই, কিন্তু অন্তঃসলিলার মতো বিশ্বায়নের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নানারকম অসামাজিক ও ব্যক্তি স্বার্থের টানাপোড়েন ব্যক্তি ও সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে নীরবে নিঃশব্দে। ফলে স্থিতিশীল সীমাবদ্ধতাকে ভাঙছে, গড়ছে। কারণ স্বার্থপরতা, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রমোটার-রাজের মুনাফা-প্রতারণা-বঞ্চনা, ধর্ষণ-নারীনির্যাতন, শাসকগোষ্ঠীর এবং শাসক-দলের একটি শ্রেণির আত্মসন্তুষ্টি, আত্মসমালোচনা শূন্য মনোভাব ও অসহযোগিতা, বাক্-স্বাধীনতার দাসত্ব, মূল্যবোধের অভাব-অবক্ষয়, শাসক-দলের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একশ্রেণির বেপরোয়া মনোভাব এবং পেশি-শক্তি, সমাজ বিচ্ছিন্ন প্রকট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র ও অহংকারী মনোভাব, প্রশাসনিক অন্যায়-অবিচার-দুর্নীতি, বিরোধীদলের জিঘাংসা-আদর্শহীনতা, বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট এবং ভন্ডামি, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার, জাত-পাত-বর্ণ-বর্গ-ধর্মের-প্রভাব এবং বিদ্বেষ এবং রাজনৈতিক দলদাস ইত্যাদি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে তীব্র করে তুলছে। সামাজিক মূল্যায়নের এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের এন্টিথিসিস তৈরি করে দিচ্ছে। এসবই প্রমাণ করে বাইরের উথাল-পাথাল তাড়না না থাকলেও ভিতরের তাড়নাকে জাগিয়ে রাখছে। পরিবর্তনশীল সমাজে লড়াইটা হয় কখনো ভিতরে, কখনো বাইরে। আবার কখনো বাইরে-ভিতরে একসাথে, তখন লড়াইটা তীব্র হয়, সামাজিক বিস্ফোরণ ঘটে। সামাজিক সংগ্রাম ও লড়াই কখনো স্থিতিশীল থাকে না। ফলে আশি-নব্বই ও তারপরের দশকেও যথেষ্ট ভাল ভৌম ছোটোগল্প লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। যারা লিখছেন তাঁরা হলেন: কিন্নর রায় (ভারতবর্ষ ১৯৯০/ধর্ম সংকট); স্বপ্নময় চক্রবর্তী (স্বস্ত্যয়ণ/ভূমিসূত্র); তীর্থঙ্কর নন্দী (মুখ-গণনা); গৌতম দে (কড়ি চুম্বন/আত্মপক্ষ); নীলিম

গঙ্গোপাধ্যায় (অ্যানাকোন্ডা এবং অন্যান্য সাপগুলো/জলমগ্ন নির্ঝর); দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় (খুনির শাস্তি চাই/ঢাকি); মাখনলাল প্রধান (পাখিদের কথা); সিরাজুল ইসলাম (অছিমনের ঘর-সংসার); সত্য মণ্ডল (স্বপ্নের মধ্যে ঃ কে এই অর্ক); প্রগতি মাইতি (চক্রব্যূহ/কাজের মেয়ে); প্রণব চক্রবর্তী (মোমবাতি বেহাল এবং সেই মেয়েটা); সুখেন্দু রায় (পথ); শান্তনু সাহা (ঘর বাঁধার গল্প); রক্তিম ইসলাম (হ্যামলিনের বাঁশি); নীহারুল ইসলাম (গোদানা/দাঙ্গা); বাবলু রায় চৌধুরী (পুণ্যি); অরূপ আচার্য (জল কন্যা সমাচার); সুমন মহান্তি (হানাদার ও বোবামানুষ); সোহারাব হোসেন (ডানা ভাঙা হাঁসপাখি) ইত্যাদি। ভৌম্যবাদের ছোটোগল্প বাঙলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে অনেক গল্প লেখা হয়েছে। আমার পড়াশোনার অসম্পূর্ণতার জন্য এখানে কয়েকজনের নামমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ছে : ভারতীয় সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়; একদলের মতে পাশ্চাত্যের সবকিছু ভাল। ও আমাদের সবকিছু খারাপ। আর এক দল বিশ্বাস করে ভারতীয়দের কোনো দোষ থাকতেই পারে না, সবকিছু দোষ-ত্রুটি সাহেবদের। প্রথম দল পাশ্চাত্যের সবকিছু অন্ধঅনুকরণের দিকে ঝোঁকে, দ্বিতীয় দল পাশ্চাত্যের প্রকৃত উৎকর্ষকেও অবহেলা ও অবজ্ঞা করে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের স্রোতে আমরা আত্মহারা হয়ে পড়েছি।

স্বামীজীর এই কথার, এই মন্তব্যের ধারাবাহিকতা এখনও চলছে। স্বাধীনতার ষাট বছর পরেও এই হীনম্মন্যতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পাশ্চাত্য ছোটোগল্পকারদের নির্বোধের মতো অনুকরণ করতে গিয়ে বাঙালি ছোটোগল্পকাররা অনেক সময় যে ছোটোগল্প লেখেন তাতে আগাগোড়া বিজাতীয় ছাপ থাকে। এখনো।

গল্প-লেখার গল্প : গপ্‌পো নয়

ষাট দশকের গোড়া থেকেই গল্প লিখে আসছি। আমার ষাট বয়সের স্মৃতি যে ভাষায় কথা বলে, তাতে মনে হয় 'পূর্ব পুরুষের আয়না' (১৯৫৯/৬০) আমার লেখা প্রথম গল্প। তখন আমার বয়স বিশের ধারে-কাছেই হবে। বোধ হয় 'নববঙ্গ' লিটল ম্যাগাজিনে আমার ঐ প্রথম গল্পটি বের হয় কলকাতার বৌবাজার থেকে। তখন লিটল ম্যাগাজিন কথাটি সাহিত্যে আসেনি। যদ্দুর মনে পড়ে, ঐ ম্যাগাজিনের কভারে লেখা ছিল নজরুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত 'নববঙ্গ', নবপর্যায়ে প্রকাশিত। নজরুল গবেষকরা বলতে পারবেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম কোন এক সময়ে ঐ 'নববঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কিনা। ঐ বয়সে শতকরা আশি ভাগ যুবক লেখক হওয়ার ইচ্ছে নিয়ে লিখতে আসে প্রেমকে বিষয় করে। আমার জীবনেও সেসময় প্রেম ছিল, নারী ছিল। কিন্তু নর-নারীর প্রেম নিয়ে আমার প্রথম গল্প ছিল না। আমার ঐ প্রথম গল্পটাই ছিল সমাজ-সচেতনতা নিয়ে, বেঁচে থাকার লড়াই নিয়ে। পুরোনো বাড়ির মতো স্মৃতির দুয়ার খুলে 'পূর্ব পুরুষের আয়নায়' আমি বলতে চেয়েছি, বিধবা মায়ের অর্ধ-শিক্ষিত মেয়ে একটি চাকরির (বোধহয় নার্স) জন্য ইন্টারভ্যু দিতে গিয়েছিল একটি ব্যক্তিগত সংস্থায়। যিনি ইন্টারভ্যু নিচ্ছিলেন, তিনি কাজের দক্ষতার বিচার করছিলেন না, তার ব্যক্তিগত ইচ্ছে যে পূরণ করতে পারবে সেই চাকরি পাবে। যুবতী মেয়েটি সেটা বুঝতে পেরেছিল ভদ্রলোকের ইসারা এবং মুখের ভাষার কৌশল দেখে। এ রকম একটা বিষয় নিয়ে আমার প্রথম গল্পটি লেখা হয়েছিল। গদ্য ছিল দুর্বল। কারণ সেসময় কমল মজুমদার বা অমিয়ভূষণ মজুমদার বা বাণিজ্যিক কাগজের গদ্যকারদের ভাষার অনুকরণ বা অনুসরণ করতাম না। ভাষা আমার হাতে একদিন কোনদিন নিজেই গড়ে উঠবে, এটা ছিল আমার বিশ্বাসের জায়গা। কি ভাষার ক্ষেত্রে, কি গল্পের স্টাইল-ফর্মের ক্ষেত্রে চিরকাল বৃত্তের বাইরে চলে আসতে আমি চেষ্টা করেছি।

সমাজ-সচেতন গল্পলেখার প্রেরণা আমি কোথা থেকে পেলাম? এ রকম কোন প্রশ্ন আমার মনে কোনদিন রেখাপাত করে নি, এখনও না। এর কারণ বোধহয়, আমার চারপাশে তাকালেই এরকম প্লট তুলে নেওয়া যায়। ওরকম বেসরকারি অফিসে (পূর্বপুরুষের আয়না) সামান্য বেতনের চাকরি কোন নারী গ্রহণ করে, কোন নারী গ্রহণ করে না। আমি 'গ্রহণ করে না'র দলেই রয়ে গেলাম। কারণ অফিসারটি একা ঘরে তাকে জাপটে ধরেছিল। বিধবার মেয়েটি ঘরে ফিরে এসে পূর্বপুরুষের আয়নায় নিজের মুখ দেখে এবং হাত থেকে আয়নাটা পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সে চাকরির আশ্বাস পেয়েও জয়েন করল না। এই সমাজ-চেতনা স্বাভাবিকভাবেই আমার মধ্যে এসে গেছে। পরবর্তীকালে, সেই সত্তরের দশকে মার্কসীয়-চেতনা আমাকে শাণিত করে। আমাকে ভাবতে শেখায়, আমাকে নিয়ে গল্প নয়, সমাজকে নিয়ে গল্প। সমাজকে বাদ দিয়ে আমি নই, আমাকে বাদ দিয়ে

সমাজ নয়। এরকম দুই সত্তা নিয়ে মানবজীবনের পরিপূর্ণতা। ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা—এই দুটি সত্তার আড়ালে সামাজিক-পরিবর্তনশীলতা সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ভাবে কাজ করে যায় আমার মধ্যে।

ব্যক্তির জীবনে ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই গল্প চলে আসে, শুধু একটু সাজিয়ে নেওয়া ভাষা প্রয়োগে, উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারে, নানারকম উপমায়, চিত্রকল্পে। আবার এমন কিছু সামাজিক ঘটনা আছে যার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নেই, ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা নেই, তখন সেই সামাজিক ঘটনা নিয়ে ছোটোগল্প— নির্মাণ করতে হয় বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে। লাতিন আমেরিকার ছোটোগল্পকার কার্লোস ফুয়েন্টেস এ রকমই একটি কথা বলেছিলেন একটি ইন্টারভ্যুতে (সাক্ষাৎকার): 'আমি বই লেখার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কল্পনা অনেক বেশি বিশ্বাস করি।' সাক্ষাৎকারটি আমাকে প্রভাবিত করে একটি উদাহরণ দিই, যুদ্ধ নিয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। আমি যুদ্ধ দেখিনি, দাঙ্গা দেখেছি। ইরাকের যুদ্ধ নিয়ে আমাকে গল্প লিখতে বলা হয়েছে। একদিকে লেখার প্রবল ইচ্ছে, অথচ সংবাদ পড়া-দেখা, আর্টিক্যাল পড়া ছাড়া আমার কোন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নেই। আমি প্রথমে জানালাম, আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু আমার ভেতরটা ইরাক যুদ্ধের ভয়াবহতা তোলপাড় করছে। ভাবছি, কেন পারব না লিখতে। আমি কলম ধরলাম। আমি নানারকমভাবে যুদ্ধের কোলাজ তৈরি করলাম। তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম একটি পরিবারের শোনা কাহিনি, ব্যতিক্রমী বাস্তবতা, যে বাস্তবতার নেপথ্যে ইরাক যুদ্ধের ভূমিকা আছে। গল্পের নাম দিলাম 'যুদ্ধের কোলাজ'। তিনটি লিটল ম্যাগাজিনে এই ছোটোগল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল চতুষ্কোণ, নক্ষত্র, ইসক্রা।

অনেক লেখক আছেন পাতার পর পাতা টেবিলে বা বুকে বালিশ রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে গল্প উপন্যাস একটানা লিখে যান। কোথায় থামতে হবে ভাবেন না ফলে গল্প বড়ো হয়ে যায়। তারপর নামকরণ নিয়ে সমস্যায় পড়েন। আপনার বিষয়-ভাবনাই আপনাকে বলে দেবে কোথায় থামতে হবে, কি নাম রাখতে হবে। একক বিষয় এবং নামকরণ ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় গল্প এসে যায়, গল্প লেখা শুরু হয়ে যায়। গল্প শেষও হয়ে যায়, নামকরণ আসে না। তখন বার দুয়েক গল্পটা পড়ে, কেন্দ্রীভূত বিষয়টা বের করে নামকরণ করতে হয়। এ রকম সমস্যায় আমাকে অনেকবার পড়তে হয়েছে।

আমাকে কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প লেখার জন্যে। অনেক অনুশীলন করতে হয়। সামাজিক ঘটনা বা ব্যক্তিগত ঘটনার ফলে প্রথমে মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে বিষয়ভাবনার জন্ম, তারপর রাফ-গল্পটাকে লিখে সামনে রেখে ধরে ধরে ফেয়ার করা এবং সেখানে উপযুক্ত ভাষা-বিন্যাস শব্দ-বিন্যাস সঠিক উপমা-চিত্রকল্প-মিথ প্রয়োগ করা, তারপর দু-একজনকে শুনিয়ে এডিটিং করা, পাশের মার্জিনে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা। সেসময় অনেক রেফারেন্স বই ঘাটতে হয়। এভাবেই আমার লেখা একটি গল্প মেধার গর্ভ-যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসে। অর্থের লোভে এবং খ্যাতির মোহাচ্ছন্নতায় সিজারিয়ান অপারেশনের মতো বছরে বিশ-ত্রিশটা অনায়াসী ও বিনোদনী গল্প আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে না। সমাজে একশ্রেণির জন্য ওসব গল্পেরও প্রয়োজন আছে, এটা আমি

অস্বীকার করি না, যেমন সিনেমার পরিচালকদের মধ্যে স্বপন সাহাও আছেন, ঋত্বিক-সত্যজিৎও আছেন।

এমন অনেক লেখক থাকতে পারেন, যাঁরা গল্প উপন্যাস পড়তে পড়তে প্লট পেয়ে যান, Film Festival-এর সিনেমা দেখতে দেখতে বিষয়ভাবনা মাথায় ঢুকে যায়। সংবাদপত্র পড়তে পড়তে প্লট এসে যায়, বিদেশী সাহিত্য পড়তে পড়তে প্লট এসে যায়। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এঁরা দূরত্ব রেখে চলাফেরা করেন। ভালোবাসা-প্রীতি-সহৃদয়তা ও নিঃস্বার্থপরতার অভাবের জন্যে এঁরা মানুষের কাছাকাছি আসতে পারেন না, থাকতে পারেন না, কয়েকজন নির্দিষ্ট স্বার্থমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের পরিবার ছাড়া। দিনরাত অর্থের জন্য, সুনামের জন্য, স্টেটাসের (Status) জন্য জীবন সংগ্রামের পর অতটুকুই ওদের অভিজ্ঞতার ফসল। নানারকম বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য তাদের ত্যাগ কোথায়?

কিন্তু আমাকে কোনদিনই দেশ-বিদেশের Film Festival-এর গল্প বা কোন দেশ বিদেশের লেখকদের গল্প-উপন্যাস বা কারোর মুখে শোনা তার নিজের গল্প গল্পলেখার জন্য আমাকে প্রাণিত তাৎক্ষণিকভাবে করতে পারেনি। তবে দু-একটা Film-এর ঘটনা থেকে বা বিদেশি গল্পের প্লট থেকে ভাবনা আমাদের জীবনধারার সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পেলে মনকে নাড়া দেয়। মনে গেঁথে থাকে, তিন/চার বছর বাদে আমার মতো করে এসে গেলে লিখতে বসি। এখনও পর্যন্ত আমার জীবনের কোন চাক্ষুষ ঘটনা এবং সামাজিক সত্য ঘটনার টান-পোড়েন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত আমার গল্প লেখার গল্পের উৎস হয়ে আছে। আমি দেশ-বিদেশের উপন্যাস পড়ে সময় নষ্ট করি না, বছরে হয়তো একটা কি দুটো পড়ি, Film Festival-র সিনেমা দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ি না এবং এভাবে লেখার সময় নষ্ট করি না। মাঝে মধ্যে লাইন দিয়ে যেরকম Film পাই, সেটাই দেখি। আমি অবসর সময় কাটাই আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গিয়ে, পরিচিত মানুষজনের বাড়ি গিয়ে, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি গিয়ে, এমনকি আমাদের বাড়িতে যারা কাজকর্ম (পরিচারিকা) করে তাদের বাড়ি গিয়ে। নষ্ট চরিত্রের মেয়েদের বাড়িতে গিয়ে আমি লক্ষ করেছি ওদের জীবনের ইতিবাচক বাস্তবতা।

যখন আমি একটি ছোটোগল্প নির্মাণ করি, তখন সেখানে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থাকে এবং সামান্য ঘটনাও থাকে। আমি যখন বেলুড়ে থাকতাম, তখন হাওড়া স্টেশনে ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে—একটি সাদা ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা একটি মৃতদেহের মাথায় এবং পায়ের কাছে ধূপকাঠি আর মোমবাতি জ্বালানো ছিল, পাশে রাখা ছিল একটা ভাঁজ করা ময়লা ছেঁড়া চাদর। সেখানে প্রতিদিনের ট্রেনযাত্রীরা ব্যস্ততার মধ্যেও একটু থেমে পয়সা ছুড়ে দিচ্ছিল এবং কপালে আঙুল ঠেকাচ্ছিল। ঐ দৃশ্য দেখে আমি একটি আমার মতো করে ছোটোগল্প নির্মাণ করেছিলাম। একজন রিপোর্টার ঐ দৃশ্যের প্রতিবেদন বানিয়ে লিখছিল বিদেশি কলমে ইংরেজি সংবাদ পত্রিকার জন্যে আর একজন গল্পকার তার দেশি কলমে এই দৃশ্যের নোট টুকে রাখছিল তার ডায়রিতে। আমি কিন্তু ঐ মৃতদেহ দেখে মৃতের খেতে না পাওয়া পরিবারের কথা বানিয়ে লিখতে পারতাম বা এই দৃশ্য একটা প্রতারণার বিষয় বা অর্থ উপার্জনের বিষয় হয়ে উঠতে পারে—এটা ভেবেও বানিয়ে লিখতে পারতাম। কিন্তু

লিখলাম না, কারণ বানিয়ে লেখা গল্পকে আমি সাধারণতঃ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। গল্প বলার সাথে সাথে নিজের অনুভব অনেক সময় গল্পের প্রয়োজনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গল্প-নির্মাণের আরেকটি উদাহরণ, এক বার বালিব্রিজ পার হচ্ছিলাম, দেখলাম এক ভিখারিনি মা কোলের মেয়ে-সন্তানটিকে গঙ্গার জলে টুক করে ফেলে দিল। ঐ সামান্য ঘটনাটা নিয়ে 'আসামি' (১৯৬৮) নামে একটি ছোটোগল্প নির্মাণ করলাম। অনুভব ভিত্তিক গল্প। এসব ভেবেই বা আধুনিক গল্প পড়েই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রবন্ধকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একসময় লিখেছিলেন : 'কবিতার এবং গল্পের মর্মার্থ একসারিতে চলে আসবে একদিন'। আমার গল্প-লেখার স্টাইল-ব্যতিক্রমতা-পরীক্ষানিরীক্ষা এবং বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। আমি মজা পাই। কারণ সমালোচকের বোধ এবং বুদ্ধি আমার কাছে ধরা পড়ে যায়। ফলত সমালোচকের সমালোচনা বিষয়ে আমি তর্ক করি না। চুপচাপ থাকি, শুনি। বরং সেই সমালোচনা থেকে যদি কিছু পাওয়ার থাকে আমি গ্রহণ করি। যেমন অশিক্ষিত বাসকর্মচারী বাসে লেখে, 'মা আমায় টাক দিলি, একটা 'আ' দিলি না।' তখন ঐ অশিক্ষিত কর্মচারীর কাছ থেকেও আমাকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। ওর অভাব এবং বাঁচার জন্য অর্থের প্রয়োজনটুকু আমার ঘুমন্ত অনুভবকে জাগায়। যারা আমার চিন্তা-ভাবনাকে পছন্দ করে না (তারা সাধারণত বাণিজ্যিক বা এ্যাকাডেমিক গল্পকারদের গল্প পড়ে অভ্যস্ত), তারা আমার গল্পকে অপছন্দ করে। যাঁরা আমার সামাজিক চিন্তাভাবনাকে পছন্দ করে, তাদের কাছে আমার গল্পের ইতিবাচকতা অন্যমাত্রা পায়। আসলে আমি টানা ছোটোগল্প লিখি না, ছোটোগল্প নির্মাণ করি। এই নির্মাণ-কার্যে আমাকে প্রেরণা দেয় মিখাইল শলোকভের গুরুত্বপূর্ণ কথাটি : I would like my books to help people become better and purer in heart, to arouse love for man and a desire to become an active fighter for the ideals of humanism and human progress. (উৎস : নোবেল-পুরস্কার গ্রহণ-সম্ভাষণ)

অনেক সম্পাদক লেখেন রাজনীতি ও যৌনতা বর্জিত লেখা বা গল্প চাই। আমি এই শ্লোগানে বিশ্বাস করি না। আমি ভোট দেব এবং রাজনীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করব, অথচ রাজনীতির বাইরে থাকব এটা হয় না। আমি গোপনে বা নর-নারীর ভালোবাসার কথার টানে বা যৌন-আকর্ষণের টানে মিলিত হব, অথচ লেখার সময় যৌনতা বর্জিত লেখা লিখব, এটা হয় না। Sexual Vulgarity বাঁচার জীবন নয়, ওটা একটা যৌন-অসুখ। এরকম গল্প-লেখা আমার পছন্দ নয়। যৌন-যন্ত্রণা নিয়ে আমি ছোটোগল্প লিখতে পছন্দ করি। দলীয় পার্টির বাইরে থেকেও, সদস্য না হয়েও রাজনীতির বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে হয়, লিখি, তবে নিন্দা-মূলক নয়, সমালোচনামূলক। ছোটোগল্প আমার কাছে দুভাবে ধরা দেয়। কখনও অভিজ্ঞতামূলক সামাজিক ঘটনা আমাকে গল্প লেখার প্রেরণা জোগায়, আবার কখন লৌকিক idea বা impression আমাকে গল্প লেখার প্রেরণা জোগায়। একটি সিরিয়াস ছোটোগল্প লেখা ভীষণ কষ্টদায়ক।

এই কষ্ট আমাকে কিছুই দেয় না, শুধু সৃজনতার আনন্দ দেয়। সেজন্য আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, লিখে কি হবে, কেউ পড়ে না। জীবনানন্দের প্রবাদ বাক্যটি অন্যভাবে বলতে হয়, কেউ কেউ পড়ে।

বাংলা ছোটোগল্পের ক্রমবিবর্তন ও ত্রিশের-চল্লিশের দশকের বাঙলা ছোটোগল্প

সমাজ গতিশীল। সমাজ এক জায়গায় থাকে না। সমাজ বদলে যায়, সমাজের পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শাসন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর। পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাভাবনাও পালটে যায়। রাজনৈতিক ভাষায় বলা যায়, ইতিহাসের বিবর্তনেই সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হতে থাকে। সামাজিক বিবর্তনের অগ্রগতি ঘটে সামাজিক বাস্তবতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিরিখে। সামাজিক বাস্তবতার পেছনে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করে। একটি পিছিয়ে থাকা শক্তি, অপরটি এগিয়ে যাওয়া শক্তি। কোন্ শক্তি এগিয়ে থাকে এবং কোন্ শক্তি পিছিয়ে যায় তার কিছু সহজ সরল উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারা যায়।

আমাদের সমাজে নানাশ্রেণির মানুষ, নানাজাতের মানুষ, নানাধর্মের মানুষ, নানারকম জীবিকার মানুষ বসবাস করে। ফলে শ্রেণি অবস্থান থেকে, ধর্মের অবস্থান থেকে, জাতের অবস্থান থেকে, জীবিকার অবস্থান থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ গড়ে ওঠে। সেখানে তাদের কাছে মানবিকতা ও সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতি বড় কথা নয়। সেখানে তাদের নিজস্ব অবস্থানটাই বড়ো। আবার এক শ্রেণি আছেন তাদের প্রথম আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে তারা মানুষ, একটা দেশের মানুষ। দেশটাই তাদের কাছে বড়ো, তৈরি করা নিজস্ব অবস্থানটা নয়। এরা পরে স্থান দেন শ্রেণি, জাত, ধর্ম, জীবিকা। আরেক শ্রেণি সামাজিক মানুষের কথা বলি, যারা নিজেদের অবস্থানকে, ঠাটবাটকে আড়ালে রেখে মানবিকতার কথা বলেন, তারা মাস্ক পড়েন হিপোক্রেসির। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই তিন শ্রেণির মানুষদের দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম নিয়েই সাংস্কৃতিক ইতিহাস। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ১৮৯১ 'দেনাপাওনা' গল্পের জন্ম। লিখেছেন একত্রিশের এক যুবক, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে একশো বিশ বছর আগে যে সমাজচিত্র দেখি, এখনও পর্যন্ত সেই সমাজচিত্র অপরিবর্তিত। এর কারণ, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে (ব্যক্তি-স্বার্থ ও সমাজ-স্বার্থের দ্বন্দ্ব) সনাতনী ভাবধারার সঙ্গে সংস্কার মুক্ত ভাবধারার লড়াই যা তখনও ছিল, এখনও আছে। তবে পণপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সচেতনতা আগের চেয়ে অনেক গুণ বেড়েছে, যদিও সংবাদপত্রে পণপ্রথাজনিত বীভৎস সংবাদ পাঠ করে থাকি মাঝেমধ্যে।

সংস্কার ও সামাজিক দ্বন্দ্বগুলো কিভাবে সমাজে চলতে থাকে তার কিছু উদাহরণ দিলে ধারণা স্পষ্ট হবে। ব্রাহ্মণদের কেউ-কেউ পূজা-আহ্নিক-উপনয়ন এসব মেনে চলেন,

আবার এমন অনেকে আছেন এসব মেনে চলেন না। এছাড়াও আছেন বাস্তবে মানেন না, কিন্তু লোক দেখাবার জন্য মেনে চলেন। ধর্ম, বর্ণ, জাত নির্বিশেষে অসামাজিক বিয়ে যার চলতি কথা লাভ ম্যারেজ অনেকে পছন্দ করেন। আবার সামাজিক বিয়ে, পণপ্রথা, দেয়ানেয়া অনেকেই পছন্দ করেন না। এমন অনেক নারী আছেন যারা সতীত্বের চেয়ে নারীত্বকে বড়ো করে দেখেন, আবার অনেক নারী আছেন যাদের কাছে সতীত্ব মহান। একশ্রেণির পুরুষের কাছে নারীমাত্রই ভোগ্যপণ্য। এই মনোভাবটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন পাত্রী দেখতে গিয়ে ফরসা ও মেদুল মেয়েদের অধিক মূল্য দেওয়া হয়। আবার একশ্রেণির পুরুষ আছেন, নারীকে মনে করেন সহযোদ্ধা। নারীকে মনে করেন প্রেম-প্রীতি-স্নেহের আধার। এভাবেই পাশাপাশি দুটি শক্তির মতান্তর চলতে থাকে যাকে সহজ কথায় বলা যায় সামাজিক সংস্কারের দ্বন্দ্ব।

সামাজিক দ্বন্দ্বসমূহের ওপর নির্ভর করে সামাজিক বিবর্তন এবং পরিবর্তন। এই বিবর্তন এবং পরিবর্তন প্রভাব ফেলে ছোটোগল্পের ওপর। বিষয়বস্তুর পালাবদল দশকে-দশকে পরিবর্তিত হয় না। পালাবদল ঘটে গুণগত ও পরিণামগত ভাবে। গুণগত পরিবর্তন ভালোমন্দের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে থাকে। পরিণামগত পরিবর্তন দ্রুত গতিতে কাজ করে। সেখানে ব্যক্তির ভূমিকা বা রাষ্ট্রের ভূমিকা ভীষণভাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—ব্যক্তির ভূমিকা। আবার অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রাম, সামাজিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি রাষ্ট্রের ভূমিকা। এ সবেরই পরিপ্রেক্ষিতে ছোটোগল্পের পালাবদল ঘটে থাকে।

ত্রিশের এবং চল্লিশের দশকে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব ফেলেছিল ভীষণভাবে সমাজে এবং ব্যক্তিমানসে। স্থিতিশীল মানুষের জীবনকে ওলোটপালোট করে দিয়েছিল ১ম ও ২য় মহাযুদ্ধ। সরাসরি এই যুদ্ধে আমাদের দেশ যুক্ত ছিল না। কিন্তু আর্থিক বুনিয়াদকে নাড়িয়ে দিয়েছিল ভয়ংকরভাবে। এছাড়া ত্রিশ-চল্লিশের দশককে গান্ধীজীর আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, জীবিকার লড়াইয়ে ধর্মঘট, ওই দুই দশকের সামাজিক অবস্থানকে পালটে দিয়েছিল। এই সময়ে ৩০শে এপ্রিল ১৯৩৭-এ 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ আবেদন করেন, 'যে হাজার হাজার চটকল শ্রমিক ধর্মঘট করছেন, ...এই যন্ত্রণা ও বিপদের দিনে চটকল শ্রমিক এবং তাদের অসহায় নারী ও ছেলে মেয়েদের সাহায্যদানের জন্য আমি আমার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানাচ্ছি।'

ছোটোগল্পে তার প্রমাণ আছে যথেষ্ট পরিমাণে। ত্রিশের এবং চল্লিশের দশক থেকেই ছোটোগল্পে দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায়, আধুনিক ছোটোগল্পে ও প্রগতিশীল ছোটোগল্প।

২

গঠনরীতি (Form) এবং প্রতিভাসরীতি (Style) ছোটোগল্পকে দ্রুত পালটে দিতে পারে। পরিবর্তিত বিষয়বস্তু, গঠনরীতি ও প্রতিভাসরীতি একাত্ম হতে পারলেই যথার্থ একটি ছোটোগল্প তৈরি হতে পারে। গঠনরীতি ও প্রতিভাসরীতি এক নয়। গঠনরীতি হচ্ছে কিভাবে ছোটোগল্প গঠিত হয় তার কিছু শর্ত, যেমন, সিন্ধুতে বিন্দুর স্বাদ, ছোটো প্রাণ ছোটো কথা, bull's eye lantern, suggestive indirectness, unity of impression, unity of time one and only informing idea ইত্যাদি। Style বা প্রতিভাসরীতি হচ্ছে Complete fusion of personal and the universal (J.M.Murry), a man's style is the reflection of his mind (মধুসূদন দত্ত), স্বকীয় লিখন নীতি (রবীন্দ্রনাথ)। এ কথার গভীর তাৎপর্য স্টাইলে প্রাণ থাকবে, সজীবতা থাকবে। আমরা কল্লোল যুগ থেকে সত্তর-আশির দশকে ছোটোগল্পের অনেক স্টাইল দেখেছি যা এক প্রকারের কেতাবি স্টাইল, নিষ্প্রাণ। এসবের বিচারে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র প্রথম ছোটোগল্পকার। রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্পের জগতে পঞ্চাশ বছর ছিলেন তাঁর ছোটোগল্পের সৃজন প্রতিভা নিয়ে। যথার্থ ছোটোগল্প 'দেনা পাওনা'কে (১৯৯১) যদি ধরা যায়, তাহলে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয় 'মুসলমানীর গল্পে' (১৯৪১) তবে পঞ্চাশ বছর ধরে গল্পলেখার ধারাবাহিকতা ছিল না। সমাজের কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে তিনি এত গল্প, প্রায় একশো খানেক লিখেছেন তা জানার একটা আগ্রহ থাকে এই কারণে, যে রবীন্দ্র-পরবর্তী সময়ে বা সমকালে যাঁরা ছোটোগল্প লিখেছেন তারা সে সকল বিষয় ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন কিনা তা বুঝে নেবার জন্য। সমাজের অনুদার এবং অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার সাথে তিনি দেখিয়েছেন পণ-প্রথার ব্যভিচার (দেনাপাওনা, ১৮৯১), অবৈধ যৌন সম্পর্ক (ইচ্ছাপূরণ, ১৮৯৬), জমি নিয়ে সামাজিক দুর্নীতির লাঞ্ছনা (উলুখড়ের বিপদ), বিধবা যুবতির প্রেম সমস্যা (কঙ্কাল, ১৮৯২), পারিবারিক জীবনে স্বার্থপরতা ও অসততার দ্বন্দ্ব (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ১৮৯২), নিয়তি-নির্ভর ছোটোগল্প (পুত্রযজ্ঞ, ১৮৯৯ শুভদৃষ্টি, ১৯০০, দৃষ্টিদান ১৯০০), স্বদেশী যুগের পটভূমিকায় ইংরেজ তোষামোদকারী জমিদার শ্রেণি (পণরক্ষা ১৯১২, রাজটিকা ১৮৯৮, বদনাম ১৯৪১), শাসক শ্রেণির অন্যায়-অবিচার নিয়ে গল্প (দুর্বুদ্ধি ১৯০০), কৃষক-জীবন নিয়ে গল্প (শাস্তি ১৮৯৩)।

মূলত পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়েই অকৃত্রিম গল্পগুলো তৈরি। যেটার অভাব সেটা হল তৎকালীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যা এবং ভূমিরাজস্ব ও ধর্মঘট সমস্যা নিয়ে তিনি সরাসরি কোন ছোটোগল্প লেখেননি। সে সময়ও রাজনৈতিক ও ধর্মঘট আন্দোলন ছিল। তবে বক্তব্য রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগের দশকে রাজনৈতিক তৎপরতা, ধর্মঘট, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের যে আলোড়ন সমাজভূমি নাড়িয়ে দিয়েছিল তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-মনস্ক ঠাকুর বাড়িতে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর রবীন্দ্র-চেতনা প্রতিভাসিত হবার পরেও তাদের কোনো প্রভাব পড়েনি রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক বছর আগে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশ। ১৮৭৯ সালে ক্ষৌরকর্মীদের ওপর ১২ টাকা হারে লাইসেন্স ফি ধার্য করে ইংরেজ তার অর্থনীতিকে পুষ্ট করতে চেয়েছিল। সেই ১২ টাকা লাইসেন্স ফি বন্ধ করার জন্যে ক্ষৌরকর্মী গর্জে উঠেছিল। ১৮৭৬ সালে ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল ছাত্ররা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কলকাতা ছাত্র অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৭৬ সালেই শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বেই বাংলার ছাত্র সমাজ দুর্বার হয়ে ওঠে। সে সময় থেকেই শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তায় বাংলার ছাত্র সমাজকে বিভিন্ন গণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়। ১৮৮২ সালে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং ধর্মঘট পালন করেছিল বাংলার ছাত্র সমাজ। ১৮৮১ সালে মুসুরী কটনমিলের শ্রমিকরা মজুরী কমাবার বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর থেকেই এসব ঘটনা ঘটে। রবীন্দ্রনাথ এসব বিষয় নিয়ে গল্প লেখেননি। সে সময় রবীন্দ্রনাথ কি পড়েননি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঁকাউল্লার দপ্তরে', মীর মুশারফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', লালবিহারী দে-র ইংরেজি লেখা 'Gobinda Samanta'? অথচ 'গোবিন্দ সামন্ত' পড়ে বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন বলেন, 'how much pleasure and instruction I derived from reading a few years ago Govinda Samanta'। কোথায় রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে জমিদারের নির্মম অত্যাচার, দারোগাদের অত্যাচার, কোথায় নায়েব গোমস্তাদের অন্যায় অত্যাচার, কোথায় দরিদ্র প্রজাদের সোচ্চার প্রতিবাদ ইচ্ছামতো 'মাথট' আদায়ের বিরুদ্ধে? এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল ত্রিশ-চল্লিশের দশকের জন্য, কল্লোল যুগের জন্য নয়, বা এই সময়ে রবীন্দ্র-রচিত ছোটোগল্পের জন্যে নয়।

তিরিশের এবং চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ যে সকল ছোটোগল্প লিখেছেন সেগুলো হল : চিত্রকর, চোরাই ধন, রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি (?), বদনাম, প্রগতিসংহার, শেষ পুরস্কার ও মুসলমানীর গল্প। রবীন্দ্রনাথ যখন 'চোরাই ধন' ও 'শেষকথা' লিখছেন, তখন তিনি সত্তর পেরিয়ে গেছেন। প্রেমমূলক গল্প হলেও স্বদেশি আন্দোলনের যুগচিত্রতার স্পষ্টতা আছে, যেমন 'বাঁচতে যদি চাই আদিম যুগের হাত দুখানায় যে কটা নখ আছে তা দিয়ে লড়াই করা চলবে না। এ যুগের যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা' বা 'আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলাম, সে যেন আতসবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়া কপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়েনি ব্রিটিশ রাজত্বে। (শেষকথা)।' ব্যক্তি সমস্যা নিয়ে গল্প 'চিত্রকর'। কতগুলো ব্যথা আছে যা ব্যক্তির নিজস্ব, চারদিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই—এই বিষয়-সমস্যা নিয়ে 'চিত্রকর'। সুনেত্রী এবং তার স্বামী। তাদের দাম্পত্য জীবনের ইতিকর্তব্য নিয়ে লেখা 'চোরাইধন'। 'শেষ পুরস্কার' লিখেছেন অহংকারী এক নারীকে নিয়ে। পরে দেখিয়েছেন নারীর অহংকারের পতন। অহংকারী বিমলা জগদীশপ্রসাদকে একদিন অপমান করেছিলেন। জগদীশ পরে বিচারক হলে সেই বিমলাকেই তার কাছে যেতে হয়েছিল। 'প্রগতি সংহার' নারী প্রগতির নামে যে বিকৃতি নারী সমাজে দেখা দিয়েছে তারই শ্লেষাত্মক সমালোচনাধর্মী গল্প। পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যে বেশভূষা করা এবং পুরুষের দাসত্ব

করা নারী কখনও আর করবে না, 'পুরুষের মন ভোলাবার জন্যে মেয়েরা সাজবে, গয়না পরবে, এ অপমান মেয়েরা অনেক দিন ইচ্ছে করে মেনে নিয়েছে, কিন্তু আর চলবে না।' এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম নিজেই ঢুকিয়েছেন। এটা আত্মপ্রচারও হতে পারে, গল্পের প্রতিভাস রীতিও (style) হতে পারে। পরে এর প্রভাব অনেকের ছোটোগল্পে পড়েছে।

'মুসলমানীর গল্প' রবীন্দ্রনাথের এক দুঃসাহসিক কাজ। এই কাজটি তিনি করেছেন মৃত্যুর কাছে এসে। হিন্দু-মুসলমান বিবাদ তখন তুঙ্গে। লাহোর সম্মেলনে মুসলীম লীগ পাকিস্তান বিষয়ে প্রস্তাব নিয়েছে। আর সে সময় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন হিন্দু নারীর স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়ার কাহিনি।

তিরিশের ও চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি ছোটোগল্প লিখেছিলেন তাদের মূলকথা হচ্ছে উগ্র মতবাদে নারী মত্ত হলে নারী তার স্বভাব মাধুর্য হারিয়ে ফেলে। তার মধ্যে দেখা দেয় বিকৃতি স্বভাব। 'প্রগতি সংহার' গল্পে নারী সম্পর্কে তাঁর চেতনা তিনি প্রকাশ করেছেন, 'চিত্রাঙ্গদা লড়াই করতে জানত, কিন্তু পুরুষের মন ভোলাবার বিদ্যে তার জানা ছিল না...।' এ সময়ের গল্পে দেখা যায় দেশপ্রেমের অন্তঃসারশূন্যতা ও নারী স্বাধীনতার নামে নারী স্বভাবের বিকৃতি। সব ছোটোগল্পেই সমকালীন জীবনের বাস্তবতা থাকে। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সেই বাস্তবতার যোগসূত্র থাকা-না-থাকা ছোটোগল্পকারের শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে জীবনের বাস্তবতা আছে, আটো-সাটো গঠনরীতি আছে, লেখার প্রতিভাসরীতি (style) আছে, কিন্তু অভাব যেটা লক্ষ্য করা যায়, সেটা সামাজিক পরিবর্তনের সেই বাস্তবতার যোগসূত্রের। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথও আধুনিক ছোটোগল্পকার, তবে ভাববিলাসী ও রোমান্টিক নন মূলত। রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিকতার পথটা তৈরি করে দিলেন সেই পথ ধরে এগিয়ে এল ভারতী-গোষ্ঠী, সবুজপত্র-গোষ্ঠী এবং শনিবারের চিঠি।

৩

১৮৭৭-এ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'ভারতী' পত্রিকার পরবর্তী চেহারাটা ভারতী গোষ্ঠীরূপে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিকাশ লাভ করে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অমল হোম, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, মোহিতলাল মজুমদার—এরাই একসময় 'ভারতী গোষ্ঠীর লেখক' বলে বিখ্যাত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অনিয়মিতভাবে এই আসরে আসতেন। এদের ভাষা ছিল মার্জিত, পরিশীলিত। চিন্তা ভাবনা ছিল স্বচ্ছ। তবে এরা ছিলেন মূলতঃ রোমান্টিক। এদের ছোটোগল্পের পরিবর্তন ঘটেছে বিদেশী ছোটোগল্পের প্রভাবে। বিদেশি সাহিত্য অনুবাদ করা এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তাশীলদের রচনা ও ভাব জগতের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন এই গোষ্ঠী। এরাই গল্পে প্রথম স্থান দেন অবৈধ প্রেম ও পতিতা জীবন। পতিতা জীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে এঁরা লেখেননি। সামাজিক স্তরে নারীর ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন। পতিতা হলেও এদের মধ্যে আছে মাতৃত্ব, নারীত্ব, মায়া-

মমতা বাৎসল্য। ফলতঃ পতিতারা ঘৃণ্য নয়, মহীয়সী। কেন পতিতা হল—এঁদের চিন্তার বিষয় ছিল না। এদের লেখায় ফুটে উঠছে, বস্তীজীবনের চালচিত্র : সাপুড়েদের কথা, কুষ্ঠরোগী, জেলফেরত সৎ লোক, হতভাগ্য নারী ও হিংস্র মদ্যপ স্বামী, কামনার্ত প্রাইভেট টিউটর, সমাজের ভন্ডামি ইত্যাদি। সনাতন চলমানতার বাস্তবতা, পরিবর্তনশীলতা নয়।

ভারতী-গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পকার হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের তিনটি ছোটোগল্প উল্লেখের দাবি রাখে। একটি ছোটোগল্প 'যশের মূল্য' যেখানে এক শিল্পী প্রিয় পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে ছবি আঁকেন। অন্যটি 'কেরানী'। এই ছোটোগল্পটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত গল্প 'শুধু কেরানি'কে প্রভাবিত করেছে। তৃতীয় ছোটোগল্পটি 'চোর'। সেই গল্পের সুনীতি অসুস্থ। কোনো উপায় না দেখে চিকিৎসার ব্যয়ের জন্য সুনীতির স্বামী অন্য বাড়িতে চুরি করতে যায়, যে বাড়িতে চুরি করতে যায় সেই বাড়ির স্ত্রী সুনীতির চোর-স্বামীকে নিজের বিছানায় লেপ চাপা দিয়ে রক্ষা করে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের স্বামীর কথা ভেবে, কারণ গৃহকর্ত্রীর স্বামী রাতে বাড়ি ফেরে না। তৈরি করা এই গল্প (গপ্পো) নিয়ে পরবর্তীকালে প্রচুর গল্প লিখে গল্পকাররা সাময়িকভাবে বাহবা কুড়িয়েছেন জীবিত অবস্থায়। মৃত্যুর পর ওদের কথা কেউ মনে রাখেনি। কল্পনা গল্পকে চমকপ্রদ করে তোলে, কিন্তু সামাজিক ভাবনার উন্মেষ ঘটাতে পারে না। তবু গল্পটি উল্লেখযোগ্য চমৎকারিত্বের জন্যে।

'সবুজপত্র গোষ্ঠী'র আবির্ভাবকাল ১৯১৫, ২৫ বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে। এই গোষ্ঠীর ছোটোগল্পকারগণ রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। এবং অনেকাংশে প্রভাব মুক্ত। 'সবুজপত্র গোষ্ঠী'র গল্পকারদের ছিল আবেগ, কল্পনা, বুদ্ধি ও যুক্তি। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী লিখলেন, 'নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নতুনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিস্কার করে প্রকাশ করার জন্য।' অন্নদাশঙ্কর রায়, 'প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি' গ্রন্থে 'সবুজপত্র'কে চিহ্নিত করেন 'সাহিত্য মানুষকে অন্ন দিতে পারে না, কিন্তু চেতনা দিতে পারে। সেই চেতনা থেকে বঞ্চিত ছিল আমাদের দেশ। ...সবুজপত্র চেতনা সঞ্চারের ভার নিল।' সবুজপত্র গোষ্ঠীর ছোটোগল্পকারদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, কিরণশঙ্কর রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা ছোটোগল্পের পটপরিবর্তন ঘটে। নকল স্বদেশীয়ানার বিরুদ্ধে 'নামাঙ্কুর গল্প' (১৯২৬) এবং 'সংস্কার' (১৯২৯) গল্প লেখেন। স্যাডলার কমিশনের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করে লেখেন বিখ্যাত গল্প 'তোতাকাহিনী'। এই গল্পের প্রতিভাসরীতি (style) সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'তোতাকাহিনীকে' আগে ছোটোগল্প বলা হত না। ছোটোগল্পের রীতি-নীতি পালটে যাওয়া সত্ত্বেও এখন 'তোতাকাহিনী'ও ছোটোগল্প। এ সময়ের রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রগতিশীলতার ধরনধারণ লক্ষ্য করা যায়। স্বীকার করে নিতেই হয়, প্রগতিশীলতার বৈশিষ্ট্য যে উদ্দেশ্য মূলকতা ও সামাজিক পরিবর্তনশীলতা, অগ্রমুখিতা তা নিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে সবুজপত্র গোষ্ঠীর ছোটোগল্পকারদের এক প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে প্রগতিশীলতা। 'সবুজপত্রের গোষ্ঠী'র প্রধান লেখক প্রমথ চৌধুরী যিনি কলম ধরেছেন ইংরেজের করভারের বিরুদ্ধে, জমিদারদের ইংরেজিসুলভ আচার-আচরণের বিরুদ্ধে, শক্তিহীন-ম্রিয়মান ও মৃতকল্প সমাজের বিরুদ্ধে।

তবে তাদের কোনো গল্পেই কৃষক, ভূমিব্যবস্থা, জমিদারের অত্যাচার বা শোষণ আসেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম—এই দুইয়ের প্রভাব তাদের গল্পে পড়েনি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী কমিউনিজম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭-এ একটি প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীকে সচেতন করে দিয়ে লিখেছিলেন 'আজ তাই যখন্‌ শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে—মহাজনকে লাগাও বারি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। (সবুজ পত্র ১৩৩৩)'। সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক দর্শনকে বিদেশি তক্‌মা লাগিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না। কমিউনিজম একটি দর্শন, মার্কসীয় দর্শন। ব্যক্তি-স্বার্থের দর্শন নয়।

এরপর ১৯২৩-১৯৩০, 'কল্লোল' পত্রিকার শুরু থেকে শেষ। ছ-সাত বছর চলেছিল। 'আমি কল্লোল শুধু কলরোল দিশাহীন' নিজের কবিতা দিয়ে দীনেশরঞ্জন দাশ শুরু করলেন 'কল্লোল' পত্রিকা। সঙ্গে নিলেন রোমান্টিক গোকুল নাগকে। ওদের কলরোল যে দিশাহীন ছিল তা 'কল্লোলগোষ্ঠী'র লেখা পড়লেই বুঝতে অসুবিধা হয় না। কল্লোলীয়রা বুঝতে পেরেছিল রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য দখল করে নিচ্ছে। তাঁর বিরোধিতা করতে না পারলে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নেওয়া কঠিন। মূলত রবীন্দ্রানুসারী হয়েও রবীন্দ্রনাথের লেখায় যা অনুপস্থিত তা তাঁরা উপস্থিত করলেন পাঠকের সামনে, যথা—১) জীবনের আদিমতম প্রবৃত্তির অশ্লীল প্রতিফলন, ২) সামাজিক কার্যকারণ সম্পর্কহীন দারিদ্রের ছবি (ফটোগ্রাফ), ৩) ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রয়োজনে সামাজিক নিয়ম-কানুন অস্বীকার এবং স্বেচ্ছাচার, ৪) রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধাচরণ, ৫) উদ্দাম আশাহীনতা ও বেকারত্ব। 'কল্লোলগোষ্ঠী'দের মধ্যে প্রধান ছিলেন অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-শৈলজানন্দ-বুদ্ধদেব। তাদের রচনায় এসেছে অভিজাত শ্রেণির ভন্ডামি ও আপস, ভদ্র ও ভদ্রেতর শ্রেণির দ্বন্দ্ব। এ ছাড়া হাড়ি, মুচি, ডোম, সারেঙ, কিষাণ, ফেরিওয়ালা ইত্যাদির জীবন যাপনের ফটোগ্রাফ। 'কল্লোলগোষ্ঠী'র প্রধান অস্ত্র যৌনচেতনা ও মিথুন প্রবৃত্তি। এই প্রসঙ্গে কবি বিষ্ণু দে-র শরবিদ্ধ মন্তব্যটি হচ্ছে যে তিনি কল্লোলের যৌনধর্মিতা আগেই খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প 'ল্যাবরেটরি' (১৯৪০) ও 'বাঁশরী' (?) গল্পে।

তৎকালীন সামাজিক ঘটনাবলি—(১) রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সফলতা, (২) প্রথম মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি, (৩) গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, (৪) বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ও তার বিকাশ, (৫) আরও নানারকম ধর্মঘট ও আন্দোলন। এসব ঘটনাবলি 'কল্লোলগোষ্ঠী'র রোমান্টিক চিন্তাভাবনাকে ইস্পাতমুখর করে তুলতে পারেনি। তারা রবীন্দ্রনাথ ও সবুজপত্রগোষ্ঠীর পথানুসারী হয়েও তাদের আধুনিকতাকে অন্যপথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন কিছুটা প্রেমেন্দ্র মিত্র। কল্লোলগোষ্ঠীর মানব জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যত না ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল কল্পনাবিলাস, ভাববিলাস, আবেগ। এসবই হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বিদেশি ছোটোগল্প পড়ার পরিণাম যা দেশজ পরিবেশ ও পরিমন্ডল থেকে জীবনকে সরিয়ে নিয়ে যায় অন্য পরিবেশে।

এরপর এলো 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৫)। প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক; পরে মাসিক (১৯২৮)। 'শনিবারের চিঠি'র ছোটোগল্পকারগণ একদিকে ছিলেন আধুনিক, অন্যদিকে আধুনিকতার নামে অশ্লীলতার তীব্র বিরোধী, রক্ষণশীল। সম্পাদক সজনীকান্ত দাস লিখলেন, 'আমাদের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল ভাণের বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কানি লেহনের বিরুদ্ধে।' এই গোষ্ঠীর লেখকরা হচ্ছেন প্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। এদের মধ্যে বনবিহারী মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে বনবিহারীর হাতেই যথার্থ আধুনিক ছোটোগল্প জন্ম নিয়েছে, আধুনিকতার শক্ত পথটি তৈরি করেছেন। আঙ্গিক বা গঠনরীতি অসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কল্লোলগোষ্ঠী পর্যন্ত যে আধুনিকতার কথা আমি উল্লেখ করেছি সেখানে ছিল আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতবিহীন সমকালীন (অধুনা) বাস্তবতার আলেখ্য। যথার্থ আধুনিক ছোটোগল্প এখন সেই ছোটোগল্পকেই বলা যায় যেখানে সমকালীন বাস্তবতা, সাংকেতিকতা, ভাষার নিজস্বতা এবং চেতনাপ্রবাহ একাত্ম হতে পেরেছে। বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা ছোটোগল্প 'নরকের কীট' সেই অর্থে যথার্থ আধুনিক ছোটোগল্প। সেই ধারাটি এখনও বর্তমান। দূরদর্শী সজনীকান্ত দাস 'নরকের কীট' প্রসঙ্গে সত্যিই বলেছেন, 'বাঙলাসাহিত্যে একটি মাইলস্টোন'। আধুনিক সাহিত্যের যৌনভাবনার বাড়াবাড়িকে কেন্দ্র করেই ১৯২৯-এ লেখা হয়েছিল 'নরকের কীট' ছোটোগল্পটি। বনবিহারী মুখোপাধ্যায় যিনি একটিও ছোটোগল্পের বই বের না করেও বিখ্যাত গল্পকার হয়ে উঠতে পারেন একটি গল্পের মাধ্যমে যার নাম, 'নরকের কীট'।

৪

ত্রিশের এবং চল্লিশের দশকে ছোটোগল্পের বিচার-বিশ্লেষণে আমরা একটা নতুন শব্দ পাই 'প্রগতিশীল'। ত্রিশের দশকে ছোটোগল্পকার সরোজনাথ ঘোষের লেখা একটি ছোটোগল্প 'প্রতিক্রিয়া'তে প্রথম 'প্রগতি' ও 'কম্যুনিজম' শব্দ দুটি পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'বিংশ শতাব্দীর প্রগতির যুগে মনের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। আধুনিক মনীষীরা ঢক্কানিনাদসহ প্রতীচ্য দেশে তাহারই জয় ঘোষণা করিতেছেন। বন্যার প্রবাহ প্রাচ্যদেশের তটভূমিতে আঘাত না করিয়া পারে না। প্রতীচ্য শিক্ষায় যে মন গড়িয়া উঠিতেছে, রুশিয়ার কম্যুনিজম তাহার কাছে লোভনীয় এবং শ্রেয়।' গল্পে উল্লিখিত হলেও তিনি কিন্তু প্রগতি ও কমিউনিজমকে প্রশংসা করতে পারেননি। কমিউনিজম একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। রাশিয়া থেকে ধার করে আনা কোনো বস্তু বা নীতি নয়, তিনি হয়তো সেটা বুঝতে চাননি বলেই হিন্দুত্ব তাঁর কাছে অতি প্রিয় বিষয়।

প্রগতির সঙ্গে কমিউনিজমের একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় ১৯২১-এ। তিরিশের দশক থেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মার্কসবাদ প্রবেশ করে এবং চল্লিশের দশকে মার্কসবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রগতিশীল কথাটা সাহিত্যের জমিতে শিকড় পায়। প্রগতিশীলতার দর্শন গড়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক

সমাজবাদকে ভিত্তি করে। ত্রিশের দশকে 'কল্লোল' উঠে যায়। 'বিচিত্রা' ও 'শনিবারের চিঠি' তখনও বের হতে থাকে। ত্রিশের দশকেই 'দেশ' সাপ্তাহিক বের হয় ১৯৩৩-এ। 'কল্লোলগোষ্ঠী'র গল্পকাররা 'দেশ'-এ চলে যান। প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা 'দেশ'য়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত গল্প 'মহানগর' বের হয়। ১৯৩৬-এ বের হয় প্রবোধকুমার সান্যালের গল্প 'আগ্নেয়গিরি'। ১৯৩৭-এ বের হয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'প্রতিনিধি'। ঠিক এ সময় 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রগতিশীল ছোটোগল্প খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পেয়েও যান। যাঁকে পেয়ে যান, তার নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসে ত্রিশের-চল্লিশের দশকের ছোটোগল্পের ধারাটাকেই পালটে দিলেন। মার্কসবাদকে ভিত্তি করে তার মধ্যে সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয়। আধুনিক ছোটোগল্পকাররা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসের পরিণামকে লক্ষ্য করেন। প্রগতিশীল ছোটোগল্পকাররা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুধু পরিণাম নয় কার্য-কারণ সম্পর্ক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনকে লক্ষ্য করেন, অনুভব করেন। আধুনিক ছোটোগল্পকাররা ফ্রয়েডের মধ্যে খুঁজে পান তাদের দার্শনিক কৌলিন্য এবং প্রগতিশীল ছোটোগল্পকাররা জীবনকে খুঁজে পান মার্কসীয় ধ্যানধারণায়, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যে। ত্রিশের দশক থেকেই শুরু ছোটোগল্পের এরকম শ্রেণিগত অবস্থান বা বিভাজন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মহেশ' (১৯২৬) গল্পটি প্রথম প্রগতিশীলতার পথ প্রশস্ত করে দেয়। গফুরের পারিবারিক সমস্যার চেয়ে সামাজিক সমস্যাকেই বড়ো করে তুলেছেন শরৎচন্দ্র। ভৌম নিষ্ঠুরতাই কৃষককে শ্রমিকে পরিণত করে, এই পরিবর্তনটাই প্রগতিশীলতার একটি লক্ষণ। শুধু পথ করে দিয়ে যাননি শরৎচন্দ্র, প্রগতিশীল গল্পকারদের নির্দেশও দিয়ে গেছেন, 'এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মতো যেদিন সে আরও নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে' (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)। যারা আধুনিক ছোটোগল্পকার তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের দিকে নয়, নির্বিশেষে মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যার দিকে। সেখানে শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে না। প্রগতিশীল ছোটোগল্পকারদের দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক পরিবর্তনের দিকে, মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যার দিকে নয়। এখানে দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে ছোটোগল্পের 'Bull's eye Lantern' যে আলোকরশ্মি বিশেষ একটি পরিবর্তিত লক্ষ্যবস্তুর ওপর পড়ে তাকে উদ্ভাসিত করে তোলে। প্রথম যথার্থ আধুনিক ছোটোগল্প 'নরকের কীট'-এর শেষ বাক্য 'হ্যাঁ ওই শ্মশানঘাট বাঁধাবার একটা estimate দিও—Good night.' কিছু ব্যক্তির মানসিকতাকে একটা 'Great Irony'-র মধ্যে ধরে রেখেছেন লেখক। প্রথম যথার্থ প্রগতিশীল ছোটোগল্প 'মহেশ'-এর শেষ কথা 'তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল যারা দখলে রেখেছে তারা ক্ষমার যোগ্য নয়।' একটা সামাজিক তাৎপর্য বহন করে, কৃষক থেকে শ্রমিকে পরিণত হওয়া। এই প্রগতিশীলতার পথ ধরে ত্রিশের-চল্লিশের দশকে যে-সকল ছোটোগল্পকাররা এসেছেন তারা হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মৈত্র, নবেন্দু ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র ঘোষ এবং আরও অনেকেই।

আধুনিক ছোটোগল্পকারদের হাতে মানবিকতার বিশাল ক্যানভাসে ঢাকা পড়ে যায় সমাজের শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা এবং এসবের সাথে কার্যকারণ সম্পর্ক। ঠিক সেরকম প্রগতিশীল ছোটোগল্পকারদের হাতে সামাজিক শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়নের বিশাল ক্যানভাসে ঢাকা পড়ে যায় মানবিকতা বোধের অন্তর্গত সূক্ষ্মতা। এই যান্ত্রিকতা ত্রিশের-চল্লিশের ছোটোগল্পে দেখা যায়।

৫

সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পটভূমি, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন উদ্দাম রোমান্টিকতা মনীন্দ্রলাল বসুর ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে কয়েকটি গল্পে। তার উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পের বইয়ের নাম ঋতুপর্ণা (১৯৩৭)। মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ যে কিভাবে মানুষের জীবনকে ওলট-পালট করে দিয়েছে, তার গল্প লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কাঠ-খড়-কেরোসিন (১৩৫২), চাষাভূষা (১৩৫৪), হাড়ি-মুচি-ডোম (১৩৫৫) গল্পগ্রন্থে। এসব গল্প শোনাকথার বা ফাইল-রিপোর্টের ছবি হয়ে উঠেছে। মূলত তিনি রোমান্টিক এবং ভাববিলাসী। তাঁর প্রথম দিকের গল্প 'অরণ্য'-এ যৌনতা এবং আত্মচেতনা একশ্রেণির পাঠককে প্রলুব্ধ করে। প্রচলিত মাতৃত্বের পবিত্র সত্তার মধ্যে লুকিয়ে আছে স্বার্থপরতা, ক্ষুধা বিকিয়ে দিচ্ছে পবিত্র নারী-শরীর এসব অচিন্ত্যের বিষয় ভাবনা। তিনি প্রচুর দেশজ শব্দ ছোটোগল্পে ব্যবহার করেছেন। এই প্রয়াস ছোটোগল্পকে নিষ্প্রাণ-মুক্ত করে খানিকটা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের পার্থক্য ছোটোগল্পের শৈল্পিক উপস্থাপনা নিয়ে। অচিন্ত্য ফটোর ছবি আঁকেন, প্রেমেন্দ্র জীবনের ছবি আঁকেন। তবে ত্রিশের-চল্লিশের দশকের সদর্থক চিন্তাভাবনা তারে গল্পে প্রভাব ফেলতে পারেনি। নৈরাশ্য এবং হতাশা তারে গল্পের দর্শন হয়ে থাকে। 'বৃষ্টি' নামক ছোটোগল্পে লেখেন 'উদাসীন অন্ধকার অপেক্ষা করে আছে সমস্ত স্ফুলিঙ্গের জন্য।' দারিদ্র্য-দর্শন মেরে ফেলে, অভ্যাস ও কুসংস্কারের কাছে যৌবনের স্বপ্ন মিলিয়ে যায়, পতিতা নারীর জীবন ক্ষুধা, এইসব বিষয়গুলিকে তিনি বিভিন্ন ছোটোগল্পে ধরে রেখেছেন। তবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মহানগরে'র চেয়ে অনেক তীব্র, বলিষ্ঠ গল্প তিনি লিখেছেন, যেমন পুন্নাম, বেনামাবন্দর, মৃত্তিকা, শুধু কেরানী, একটি রাত্রি।

প্রবোধ সান্যাল এসব বিষয়ের বাইরের গল্পকার নয়। তবে তিনি বিষয় সচেতন ছিলেন বলেই বলতে পারেন, 'একালের চরিত্র সৃষ্টিতে সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনা সম্মিলিতভাবে যেমন প্রকট, এর আগে তেমন ছিল না'। তিনি আরও প্রগতিশীল কথাবার্তা বলেন, 'নিছক আর্টের আনন্দ বিতরণ করব, ফুল-চাঁদ-লতা-মৌমাছি আর বিরহ-মিলন নিয়ে কাহিনি ফাঁদব—এ আমি কোনোকালেই পারিনি।' অন্য জায়গায় বলেছেন, 'আমি বড়োলোক নিয়ে কিছু লিখতে পারতুম না। আমি লিখতুম, মজুর, জেলে,

রাজমিস্ত্রী, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে—এইসব চরিত্র নিয়ে।' এ সবই কল্লোলীয়দের নিষ্প্রাণ দারিদ্র বিলাস এবং রবীন্দ্রনাথের লেখার ফাঁকটাকে বুজিয়ে দেওয়া। তবু প্রবোধ সান্যাল বেশ কিছু সদর্থক গল্প লিখেছেন, ঐতিহাসিক, অসামান্য, লীডার, অঙ্গার ইত্যাদি। এছাড়া যৌনতার আভাস পাওয়া যায় অনেক গল্পে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিপথগামী মায়াদিদিকে নিয়ে লেখা 'বনমানুষের হাড়'। এদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও শৈলজানন্দ সেই অর্থে সদর্থক গল্পকার নন। নেতিবাচকতার আড়ালে থাকে তাঁদের বিষয় ভাবনা। বুদ্ধদেব বসু পুতুল-পুতুল চরিত্রের মনোজগতের বাসিন্দা। কল্লোলীয়রা নিজেদের দুর্বলতার কথা নিজেরাই বলেন, 'মেয়ে-পুরুষ চরিত্রগুলোকে লেখকের হাতে পুতুল মনে হতো' (প্রবোধ সান্যাল)। আর শৈলজানন্দ আঞ্চলিক জগতের সংগ্রামী বাসিন্দাদের স্বভাব থেকে নিয়ে এসেছেন কৃত্রিম যৌনকামনা ও দেহজ প্রেম যা ষাট-সত্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবাণিজ্যিক লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছে। বাণিজ্যিক কাগজের অর্থ এবং খ্যাতির লোভে আঞ্চলিক বাসিন্দাদের সংগ্রামী জীবনের বর্শামুখকে তারা দেহজ প্রেম এবং যৌনকামনা দিয়ে ভোঁতা করে দিয়েছে। তবে শৈলজানন্দের যথেষ্ট ভাল গল্প আছে যা জীবনকে নাড়া দেয়।

ত্রিশের দশকের প্রগতিশীল ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। মানুষের ওপর নির্মম শোষণ, জীবনের প্রতি আগ্রহ, ধর্মের নামে জুয়া খেলা, ব্যভিচারী ও দুর্নীতিগ্রস্থ মানুষ, লীগ শাসনের অসঙ্গতি স্বদেশী আন্দোলন এসব বিষয় তার গল্পের বিষয়বস্তু। তাঁর লেখা ছোটোগল্পের বই, বাস্তবিকা (১৯৩২) ও ত্রিলোচন কবিরাজ (১৯৩৩), থার্ডক্লাস (১৩৩৫), উদাসীর মাঠ (১৩৩৮)। উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প, উদাসীর মাঠ, ক্যানভাসার, সংস্কারক, দিবাস্বপ্ন, রহিমী আমল ইত্যাদি। তাঁর গল্পে ক্ষুরধার বিদ্রূপ আছে, সমকালীন রাজনীতি আছে, আছে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। 'উদাসীর মাঠ' গল্পে গল্পকার উদাসীর জীবনের মাঠের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। নয় বছরেই উদাসী বিধবা হয়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক হলে স্বদেশী গায়ক ললিতের কাছ থেকে সে ভালোবাসার কথা শোনে। উদাসীকে বিয়ে করার কথা দিয়ে ললিত কলকাতায় ফিরে যায়। আর আসে না। ফলে একদিন উদাসী সাতপুতের ঘাটে দুবাহু দিয়ে একটি প্রাণহীন শিশুকে জড়িয়ে ধরে নিষ্প্রভ চোখে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। উদাসীর দেহে জীবন নেই। 'ক্যানভাসার' গল্পে রসিক ক্যানভাসার ধন্বন্তরি বটিকার জয়গান করে, 'কাশি সারে, হাঁপি সারে, উৎকাসি খুৎকাশি, যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা...সকলরকম ব্যাধি সারে।' হাঁকে আর কাশে রসিক, কাশিটা ভালো নয়। রসিকের কাশি সারে না। এরকম নেতিবাচক গল্প লেখেন রবীন্দ্র মৈত্র যার প্রভাব পরবর্তী লেখকদের লেখা অনেক গল্পে পাওয়া যায়। ভাববিলাসী, কল্পনাবিলাসী বাস্তবতা নয়, জীবনের নির্দয় অভিজ্ঞতা।

ত্রিশের-চল্লিশের দশকের প্রায় অনেকটা জুড়ে একাই প্রতিনিধিত্ব করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটোগল্পের যে চিন্তা-ভাবনা ও উপস্থাপনা তা ত্রিশের দশকের আগে কিম্বা পরে ভাবা যায়নি। এই গল্প যেন সমাজে সমাজেতর নির্মম জগতটাকে তুলে এনেছে। আমরা জানতে পারলাম ভিক্ষাবৃত্তি একটি জীবিকা, তার নানারকম কৌশল আছে। ওপর থেকে দেখা গল্পে নয়, শোনা কথা নিয়ে গল্প নয়

কন্টিনেন্টাল লিটেরেচার পড়ে কাল্পনিক গল্প নয়, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে সমাজের গোড়া ধরে টান মেরেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশটি ছোটোগল্পের বই বের হয়েছে ত্রিশের-চল্লিশের দশকে। তার ছোটোগল্পে চাষি, মাঝি, জেলে, তাঁতি পুতুল-পুতুল নিষ্প্রাণ চরিত্র হয়ে যায়নি। তাদের ভাষা, ভাবনা সামাজিক দ্বন্দ্ব যেন তাদেরই, মানিকের শ্রেণি গত অবস্থানের ভাষা নয় বা সেখান থেকে দেখা নয়, সেখানে আছে জীবন-জিজ্ঞাসা। মানিককে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগে আছে ফ্রয়েড, দ্বিতীয় ভাগে আছে মার্কস। যান্ত্রিক ভাগটাকে মেনে নেওয়া যায় না। বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসাই তার জীবনে প্রথম থেকে শেষ অবাধি কাজ করে গেছে। ফলে চল্লিশের দশক থেকে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদকেই গ্রহণ করেছেন। ত্রিশের দশকে দু-চারটি গল্প প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ ছাড়া যৌন-জীবন নিয়ে তার গল্প নেই বললেই চলে। এমনকি পরবর্তী জীবনেও দু-একটি গল্পে ফ্রয়েডিয়ান মনোবিকলন ভাবনা এসেছে। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পেও অনেক সমালোচক মনে করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যৌন-প্রবৃত্তির অন্ধকারের কথা বলেছেন। ঠিক কি তাই? ওটাতো পাঁচী ও ভিখুর জীবনের অন্ধকারের ও ভালবাসার কথাকেই অর্থবহ করে তোলে না? সমাজের অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও শোষণ, রাজনৈতিক সচেতনতা-আন্দোলন-মিছিল ও রাজনৈতিক ভন্ডামি, নরনারীর বাঁচার পথে অনাবিষ্কৃত নানারকমের জীবন-জটিলতার সন্ধান, কমিউনিস্ট ও তেভাগা আন্দোলনের পরিণতি ইত্যাদি ত্রিশের-চল্লিশের দশকের সামাজিক পটভূমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতিশীল ছোটোগল্পকারদের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এইসব গল্পগুলো 'মিহি ও মোটা কাহিনি', 'আজ-কাল-পরশুর গল্প', 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী', 'ফেরিওয়ালা', 'মাটির মাশুল' ওই পর্যায়ে পড়ে।

'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর কনিষ্ঠ লেখক হলেও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখার জাত ভিন্ন। তিনি Unconventional। 'রিয়ালিস্ট' ছোটোগল্পের নায়কের নাম রেখেছেন শিল্পী 'ক-বাবু'। কোনো ব্যক্তি জীবনের গল্প নয়। প্রগতিশীলতার একটা স্টাইল। ক-বাবুর যক্ষ্মা রোগগ্রস্তা স্ত্রীর অসুস্থতার চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা ব্যঙ্গরসে আশ্চর্য সফল। তাঁর স্বভাবে আছে experiment। গল্পেও সেটা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গল্পে, গল্পের চেয়ে বিশ্লেষণ বেশি। ত্রিশের সামাজিক লক্ষণগুলো নিয়েই তার বিশ্লেষণ।

চল্লিশের দশকের যুগ-লক্ষণ চিহ্নিত করেন সোমেন চন্দ, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, সোমনাথ লাহিড়ী, সতীনাথ ভাদুড়ী স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য এরপরে আসেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং আরও অনেকে। এঁরা এই ছোটোগল্পকাররা প্রগতিশীলতাকে বস্তুনিষ্ঠ ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁদের বিখ্যাত ছোটোগল্পগুলো হচ্ছে, নবেন্দু ঘোষের 'ঘুমের ওষুধ'। এই গল্পের বিষয় বেকারত্ব ও দারিদ্র, বখে যাওয়া ছেলের অসহৃদয় আচরণ, গর্ভবতী হওয়া কুমারী মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা, বাড়িভাড়া বাকি ফেলার জন্য বাড়ি ওয়ালার শাসানি, ব্ল্যাকমেলের শিকার। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের বিখ্যাত ছোটোগল্প 'ওঝা'। আত্মদর্শন ও আত্মসমীক্ষার গল্প। অতি আধুনিক প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও কর্মের অসঙ্গতিও স্বর্ণকমলের নজর

এড়াতে পারেনি। নজর এড়ায়নি কমিউনিস্টদের উন্মাদনা ও আত্মতৃপ্তি। এখনও প্রাসঙ্গিক। ফলে তিনি লিখলেন 'ওঝা'। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ডজন দেড়েক ইংরেজি-বাংলা প্রবন্ধ লিখেছেন যিনি সেই অধ্যাপক পরিতোষ সেনকে মুসলমান বলে ভুল করে বসল কোনো এক মুসলমান ব্যক্তি। এ নিয়ে তিনি নতুনভাবে গল্পের পরিবেশ তৈরি করেছেন 'ওঝা' গল্পে। তাঁর উল্লেখযোগ্য আরেকটি ছোটোগল্প 'পোস্টার'। স্বর্ণকমলের অধিকাংশ গল্পই তিরিশ দশকের মধ্যভাগ থেকে পঞ্চাশের প্রথমদিক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

মোট তেরোটি ছোটোগল্প লিখে যিনি বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন তিনি সোমনাথ লাহিড়ী। তাঁর ছোটোগল্পের মূলকথা শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামী মনোভাব, সামাজিক শোষণ-জনিত দোষ-পাপ-অসঙ্গতি, যৌনতা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। বিভূতিভূষণের 'অশনি-সংকেত'কেও ছাপিয়ে গেছে সোমনাথ লাহিড়ীর দুর্ভিক্ষ-আশ্রিত দুটি গল্প, '১৯৪৩' এবং '১৯৪৪' এই নামে। জেলখানায় নারীর ওপর পুলিশী অত্যাচার নিয়ে সোমনাথের বিখ্যাত ছোটোগল্প 'কামরু' আর 'জোহরা'।

ত্রিশের-চল্লিশের দশকের প্রগতিশীল ছোটোগল্পকারদের কথা বলতে গেলে সোমেন চন্দের কথা বলতে হয়। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'ইঁদুর'। তবে ছোটোগল্প যে টান-টান ভাষা ও প্রতিভাস-রীতির (style) ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তা এই গল্পে নেই। 'ইঁদুর' গল্পটি রূপকের আড়ালে মধ্যবিত্ত জীবনকে কুড়ে-কুড়ে খাচ্ছে। কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনায় মাঝে-মাঝেই এই সমাজে অনর্থক দাঙ্গা-হাঙ্গামা-মারামারি-কাটাকাটি-রক্তারক্তি বেঁধে যায়। অথচ হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষ শ্রেণিস্বার্থে অভিন্ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোমেন চন্দ লিখেছেন 'দাঙ্গা' গল্পটি।

ত্রিশের থেকে চল্লিশের বাংলা সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠ ধারাকে যারা এগিয়ে নিয়ে গেছেন রমেশচন্দ্র সেন তাদের মধ্যে একজন। রমেশ চন্দ্র সেনের গল্পগ্রন্থ চারটি, মৃত ও অমৃত, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, ওরা তিনজন, কয়েকটি গল্প। দাঙ্গার পরিবেশে অনেকেই যখন সুস্থমূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছিলেন, সে সময়ে রমেশচন্দ্র সেন দাঙ্গার পটভূমিকায় লিখলেন 'সাদা ঘোড়া'। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প ডোমের চিতা, ভাত, ওরা তিনজন, একফালি জমি, ভিখারির জন্ম ইত্যাদি। রমেশচন্দ্র লেখায় যুগচেতনা আছে, দুঃখ-গ্লানি-জৈব লিপ্সা ও কুরূপতাও আছে। রমেশচন্দ্র আঙ্গিক বা গঠনরীতির প্রকরণে যথেষ্ট পরিশীলিত নন। ভাষার ও শব্দের শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। তবে মানুষের প্রতি গভীর মমতায় ও আত্মীয়তাবোধে তিনি মানবিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধ গল্পকার। ওর গল্প ছবি হয়ে চোখে ভাসে, কিন্তু প্রাণে সাড়া জাগায় না।

চল্লিশের দশকে ননী ভৌমিকের তিনটি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প 'অহল্যা', 'সলিমের মা' ও 'তিনপুরুষ'। 'সলিমের মা' বেরিয়েছিল পরিচয় পত্রিকায়, ১৩৫৩ সালে। গ্রামের মুসলমান পরিবার করম আলি ও মঈনুদ্দিনকে নিয়ে ঘাত-সংঘাতের গল্প। পরিবারের ও মুসলমানদের মান-সম্মানের জন্য মঈনুদ্দিনের বউ (সলিমের মা) পারিবারিক দুঃখকষ্ট থাকা সত্ত্বেও বের হতে দিত না মঈনুদ্দিন। কিন্তু জোতদার করম আলি যখন লাঠিয়াল

আর সিপাহী নিয়ে মাঠের তোলা ধান কেড়ে নিতে এল চাষিদের কাছ থেকে তখন সলিমের মা সেই ধান বুক দিয়ে আটকে দিল। তা দেখে মঈনুদ্দিন মান-সম্মানের কথা ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে যায়। এখন এই সমস্যা নেই। এখন গ্রাম বদলে গেছে। এই গল্প এখন ইতিহাস। প্রশ্ন হতে পারে যে গল্প ইতিহাস হয়ে যায়, সে ধরনের গল্প লিখে কি লাভ? লাভ আছে, কারণ ইতিহাসের শিক্ষাই পরবর্তী ইতিহাস তৈরি করতে সাহায্য করে। এখনও চাষের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তখন মালিক জোতদার ছিল। এখন আছে রাজনৈতিক দলের স্বার্থদুষ্ট নেতারা। এই গল্পে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও যেমন ঠোকর, দেওনিয়া, গাইন, খোলান, তকরা, আধিয়ার কৃত্রিম গ্রামের ভাষা ব্যবহার করার ফলে গল্পটি তার সজীবতা হারিয়ে ফেলেছে। 'অহল্যা' গল্পে আছে, নিম্ন মধ্যবিত্ত এক ঘরের মেয়ে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। 'দুশো বছর লেগে গেল ইংরেজের পতাকা সরাতে, আর তার ঝান্ডা (হিন্দুস্থানের ঝান্ডা) সরাতে তিনদিনও সময় লাগল না'— 'গণনায়ক' ছোটোগল্পের একটি অর্থবহ অংশ। লিখেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। চল্লিশের দশকে সতীনাথ ভাদুড়ীর পাঁচটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছিল, 'গণনায়ক', 'বন্যা', 'আন্টাবাংলা', 'ওয়ার কোয়ালিটি', 'আন্তর্জাতিক'। তিরিশের দশকে একটি ছোটোগল্প পাই, 'জামাইবাবু'। পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর জেলার রাজবংশীরা, কুশীনদীর ধারে রহিকপুরার আদিবাসীরা, তরাইয়ের বন্যা প্রকৃতির ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষেরা তার গল্পে জীবন্ত ও সংঘর্ষময় সুখদুঃখ নিয়ে বাঁচার তাগিদে জীবনসংগ্রাম অবিরত চালিয়ে যায়।

প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে আরও কয়েকজনের নাম তাদের ছোটোগল্পের প্রাসঙ্গিকতার জন্য উল্লেখ করতে হয়। সুলেখা সান্যালের 'সিঁদুরে মেঘ', 'বিবর্তন'। চরকাশেম উপন্যাসের লেখক অমরেন্দ্র ঘোষের ছোটোগল্প 'একটুখানি নুন' ও 'কসাই'। শোষণ বিরোধী ও প্রতিবাদী ছোটোগল্প। সুশীল জানার 'কুকুর' গল্পটি যথেষ্ট জোরালো না হলেও বাস্তবায়িত করে তুলেছেন। 'কুকুর' গল্পে চালের ভান্ডার রক্ষাকারী সেপাই ইসমাইলের চোখে চল্লিশের দুর্ভিক্ষ ফুটে উঠেছে। কুকুর এখানে প্রতীক, গণেশপ্রসাদ। সুশীল জানার ভুলে-না-থাকার দুটি গল্প 'দ্বিতীয় জীবন', 'এক যে ছিল প্রজা'। সলিল চৌধুরী, মূলত ছোটো গল্পকার না হলেও, চল্লিশের দশকের জন্যই 'ড্রেসিং টেবিল' গল্পটি উল্লেখ করতে হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা চল্লিশের দশকের উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প 'ইজ্জত', 'আমার দেশ', 'টোপ'। 'টোপ' গল্পটি একটি সত্য ঘটনার যথাযথ বর্ণনা, তবে শোনা কথা। টোপ গল্পে ভয়াবহতা ও নৃশংসতা আছে। চাষির ছোট্ট ছেলেকে সামন্ততান্ত্রিক শিকারী 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

তিরিশের-চল্লিশের দশকের এমন কিছু ছোটোগল্পকার আছেন যাঁদের আধুনিকতায় বা প্রগতিশীলতায় বেঁধে রাখা যায় না। এঁরা স্বভাব-ছোটোগল্পকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথায় বলা যায় 'এখনও ব্যক্তিবাদী'। এরা কখনও নিয়তি-তাড়িত, আবার কখনও অভিজ্ঞতা-তাড়িত। এদের লেখায় গ্রাম-গ্রামের সংগ্রামী মানুষ, চাষ-চাষের মাঠ, জোতদার ও চাষি, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত, শহর-শহরের সংগ্রামী মানুষ সবাই আছে। নেই বাস্তবতাকে কার্য-কারণের দ্বারা অনুধাবন করা, নেই সামাজিক বাস্তবতাকে উৎপাদনশীল

ও অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা। আধুনিকতার দিকচিহ্ন বা প্রগতিশীলতার লক্ষণ তাদের গল্পে নেই। এরা গল্প শোনাতে ভালোবাসেন, সেমত গল্প লেখেন। তবে গল্পে আছে বলিষ্ঠতা ও অসাধারণত্ব। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ। কারণ এরা বাংলার গ্রামকে, গ্রামের পরিবেশকে ও গ্রামের মানুষকে যেরকম আন্তরিকভাবে চেনেন, অন্যরা সেরকম ভাবে চেনেন না। তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণ মানুষের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে কোনোদিন অবস্থান করেননি। তারাশঙ্করের 'মেলা' গল্পটি নিখুঁত ছোটোগল্পের সংহতি বা গঠনরীতি দাবি করে না, কিন্তু ভ্রষ্টা নারীর মধ্যে জননী আবিষ্কার গল্পটিকে মহিমান্বিত করে। 'আঃ—ওই যে মসজিদ—ওই যে তার হাতে গড়া মিনার'-এই সংলাপই বুঝিয়ে দেয় তারাশঙ্করের বিখ্যাত গল্প 'ইমারতের মর্মকথা'। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প অগ্রদানী, কালাপাহাড়, তারিনী-মাঝি, জটায়ু, পুত্রেষ্টি, চারহাটির স্টেশন মাস্টার। তার গল্পে কবি-স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কথামৃত-আশ্রিত রামকৃষ্ণের কথকতার সঙ্গে তারাশঙ্করের বেশকিছু গল্পাশ্রিত কথকতার সাদৃশ্য আছে। তারাশঙ্কর ঐতিহ্য অনুরাগী।

১৯২২-১৯৫০-এর মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুশো আঠারোটি গল্প লিখেছেন। কিন্তু কোনোদিন 'সবুজপত্রে' বা 'কল্লোলে' ছোটোগল্প লেখেননি। অথচ বিভূতিভূষণ বেঁচে আছেন, 'সবুজপত্র' ও 'কল্লোলে'র লেখকেরা ইতিহাস হয়ে আছেন। 'সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে সুস্পষ্ট'— বিভূতিভূষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ওই মন্তব্য ছোটোগল্প সম্পর্কেও মানানসই। নতুন জিনিস বলতে নতুনভাবে বাংলাদেশকে দেখা এবং পুরাতন পরিচিত বলতে বাংলার গাছপালা-পথঘাট-মেয়েপুরুষ-সুখদুঃখ এবং ওদের ধারাবাহিক জীবন-যাপন ইত্যাদি। মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকেই বিভূতিভূষণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে। ফলে ছোটোগল্প আজও পুরোনো নয়। চেনা ছবি, চেনা আচার-আচরণ, চেনা চলাফেরা, চেনা সুখদুঃখ এবং দারিদ্র তাঁর ছোটোগল্পে উপস্থিত। বিভূতিভূষণের 'গল্প নয়' গল্পটি থেকে মনে পড়ছে, 'সেদিন সে ট্রেনের মধ্যে গুটিকয়েক ক্ষণের জন্য বিংশ শতাব্দী ছিল না, ছিল সমাজদ্রোহী, কালো বাজারপুষ্ট, লোভী বিংশ শতাব্দী। ছিল সেই অমরমাতৃলোক, বিশ্বের সমগ্র জীবনজগৎ যার করুণাধারায় বিধৌত।' তাঁর 'নাস্তিক' যথেষ্ট বলিষ্ঠ, যথেষ্ট প্রগতিশীল একটি ছোটোগল্প। ঐশ্বরিক ধর্মের চেয়ে মানবধর্ম শ্রেষ্ঠ— 'নাস্তিক' গল্প এ কথা বলে। তার কয়েকটি স্মরণযোগ্য গল্প— একটি কোঠা বাড়ির ইতিহাস, পারমিট, অত্যাশ্চর্য কান্ড, দ্রবময়ীর কাশীবাস, ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল ইত্যাদি। চল্লিশের দশকের গল্পের বিষয়বস্তু থেকে তিনি সরে থাকেননি নিসর্গের ছাতিম তলায়। তিনি জানেন বলেই বলেন, 'সাহিত্য সমাজের মাপকাঠি। সমাজের বাস্তব পটভূমিতে রসশিল্প রচিত হয়, শিল্পীমানসের প্রকাশভূমি যাহা, তাহাই সাহিত্য।" ফলত যুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্নীতি, কালোবাজারী, দেশভাগ ইত্যাদি থেকে তিনি সরে থাকতে পারেননি।

১৯৩১-৩৩-এ লেখা জীবনানন্দের কিছু গল্প আবিষ্কৃত হয়েছে। পরে আরও হয়েছে গল্পগুলি— পূর্ণিমা, মেয়েমানুষ, হিসেব-নিকেশ, কথা শুধু—কথা কথা কথা কথা কথা,

গ্রাম ও শহরের গল্প, সঙ্গ-নিঃসঙ্গ, রক্তমাংসহীন ইত্যাদি। তিরিশের-চল্লিশের দশকে যুগ-লক্ষণ থেকে সরে এসে কিছু গল্পকার স্বচ্ছল পরিবারের সুখদুঃখ, ভিত্তি করে তাদের মানসিক যন্ত্রণা ও অন্তঃপ্রবণতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখেছেন। জীবনানন্দ দাশ তাদের মধ্যে একজন হলেও তাঁর গল্পে সামাজিক ও পারিবারিক বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। অমলেন্দু বসু যাকে বলেছেন, 'বস্তুনিষ্ঠা জীবনানন্দের কল্পনায় প্রথম থেকেই প্রবল'।

শেষকথা

এই আলোচনার শেষকথাটি বলতে হয়। তিরিশের-চল্লিশের দশকে বাংলা ছোটোগল্পে যে পরিবর্তন এবং বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এখানে তাকে দুভাগে চিহ্নিত করা হয়েছে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বে এবং মার্কসিয় তত্ত্বে। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'তিরিশের দশকে শুধু বাংলা কেন সমস্ত আলোকিত পৃথিবীর পক্ষেই অগ্রসরতম মিথুন-সমীক্ষণ যে-গল্পের প্রেরণা', এই মিথুন-সমীক্ষণই হচ্ছে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের এক প্রধান সমীক্ষা। ঠিক সেভাবে তিরিশের-চল্লিশের দশককে চিহ্নিত করতে গিয়ে পান্নালাল দাশগুপ্ত, একজন রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজ-মনস্ক বলেন—'কল্লোলের ফ্রয়েডিয় যুগের পরে সাহিত্যে মার্কসিয় যুগ আসে।' এই দুই ভাবধারার সঙ্গে আরও একটি ভাবধারা পাশাপাশি সে সময় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথকেই উলটে-পালটে অনুসরণ করা বা রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যাওয়া। পরবর্তী দশকে, আমাদের মনে হয়েছে, ষাটের পর থেকে বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পকাররা যান্ত্রিক বিভাজন বা শিবিরের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে যথার্থ ছোটোগল্পকার হয়ে উঠছেন সমাজের কাছে, মানুষের কাছে এবং দায়বদ্ধতার কাছে। কারণ এই সময়ের ছোটোগল্পকারেরা দেখেছে, বুঝতে পেরেছে যে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের ও মার্কসিয় তত্ত্বের যান্ত্রিকতার বাড়াবাড়ি।

ছোটোগল্পকার সুধীন্দ্রনাথ : তৎকালীন এবং সমকালীন

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯), জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সহজ সরল জীবনের মধ্যে জটিলতার যে দ্বন্দ্ব লুকিয়ে আছে তাকেই ছোটোগল্পে প্রতিফলিত করেছেন প্রাঞ্জল ও গতিসম্পন্ন ভাষার মাধ্যমে। তাঁর ছোটোগল্পের বই চারটি, মঞ্জুষা, চিত্ররেখা, করঙ্ক (জলপাত্র) এবং চিত্রালি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে দশের দশক পর্যন্ত হচ্ছে ছোটোগল্পগুলির রচনার সময়কাল।

দু'একটি ছোটোগল্পে সে সময়কার স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫) রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পেরেছে। বেশির ভাগ গল্পেই আছে গার্হস্থ্য জীবনের জটিল অনুসন্ধান। কোন কোন গল্পে সমাজ জীবনের সংঘাত বিদ্যুতের মতো চমক সৃষ্টি করেছে। তবে সহজ সরল পারিবারিক জীবনের স্নেহ ও বাৎসল্য তাঁর বেশির ভাগ গল্পকে প্রভাবিত করেছে। ইংরেজের অত্যাচার ও অপমানের দ্বন্দ্ব, জমিদারি চেতনার সাথে পিতৃত্বের দ্বন্দ্ব, ধর্ম ও জীবনের দ্বন্দ্ব এবং সমাজে ভদ্রেতর শ্রেণি দাস-দাসি ও ডাকাতের মানসিক অবস্থান ইত্যাদি গাল্পিক উপাদান ছোটোগল্পকে গতিশীল করে। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্পগুলিকে শুধুমাত্র নিছক গল্প বলে সরিয়ে রাখা যায় না। রীতিমতো তিনি একজন উল্লেখযোগ্য গল্পকার ও গদ্য-শিল্পী। প্রতিটি ছোটোগল্পে সুধীন্দ্রনাথ পরিমিত ভাষাবোধ ও চিত্রকল্পকে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন বলেই তিনি একজন উল্লেখযোগ্য গদ্য-শিল্পী এখনও।

তাঁর 'খ্রীষ্টানের আত্মকথা' গল্পে ধর্ম, সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। পরিবারের সুখী মধ্যবিত্ত বাঙালি চাকুরিজীবী খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। সেই কারণে ভদ্রলোককে তার স্ত্রী পরিত্যাগ করে কলকাতায় পিত্রালয়ে চলে যান। এখ'নে স্ত্রী-স্বাধীনতা স্মরণীয়। একদিন তিনি পুত্রের উপনয়নের দিন স্ত্রীর কাছে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনি উপহাসিত হন। তখন বুঝতে পারেন যে তিনি সমাজ ছাড়া একাকী এবং নিঃসঙ্গ। এখানেই শুরু হয় মানসিক দ্বন্দ্ব। তিনি তার নিজের ধর্মের কাছেও ফিরে যেতে পারছেন না। অন্যদিকে নতুন ধর্মের আশ্রয়ে মানসিক সান্ত্বনাও পাচ্ছেন না।

'রসভঙ্গ' গল্পে বড়লোক বাড়ির দাসি লক্ষ্মীর হৃদয়ের দ্বন্দ্বই এই গল্পের দিশা। দাসি লক্ষ্মী এক সময়ে বাল্যবিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিল তখন তার নাম ছিল মৃণালিনী। নতুন করে বাঁচার আশায় ধনীপুত্রের প্রেমের শিকার হয়েছিল। সেই দাসি লক্ষ্মী মনোরঞ্জনের সদ্যবিবাহিত স্ত্রী প্রভাকে তার অতীত জীবনের ভালোবাসার কথা বলতে বলতে তার প্রেমের অপমানের কথা বলেছে যে কিভাবে একসময় লক্ষ্মীর প্রণয়ী তাকে প্রেমের অভিনয় করে ভুলিয়ে নিয়ে গেছিল বরানগরের বাগান-বাড়িতে, যেখানে ধনীপুত্র পতিতাদের এনে আসর বসায়। তারপর একদিন সেই প্রণয়ী ধনীপুত্রটি লক্ষ্মীকে গলাধাক্কা

দিয়ে বাগান-বাড়ি থেকে বের করে দেয় যখন আর একজন নারীকে শিকার করে আনে। অবশেষে সেই লক্ষ্মী বিদ্রোহী হয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে প্রভার স্বামী মনোরঞ্জনই হচ্ছে তার অতীত জীবনের প্রণয়ী এবং এই বাড়িটিই হচ্ছে বরানগরের বাগান বাড়ি। এরকম আরও গল্প লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'বিচারক' লিখেছেন। সুবোধ ঘোষ 'বারবধু' লিখেছেন। কিন্তু কেউ লক্ষ্মীর মতো পুরুষের লাম্পট্যের মুখোস খুলে দিতে পারেননি। সুধীন্দ্রনাথ পেরেছেন। আরও অবাক করে সুধীন্দ্রনাথের শিল্প কুশলতা যখন তিনি পৌরাণিক লক্ষ্মী নামটা মৃণালিনী বেশ্যায় পরিণত হওয়ার পর ব্যবহার করেছেন। এভাবে তিনি মিথ্‌কে অসারে পরিণত করেছেন।

'লাঠির কথা' গল্পটি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার দরুণ একশ্রেণি জমিদার ও বাঙালি ব্যক্তিত্বের ইংরেজ বিদ্বেষকে নিয়ে লেখা হয়েছে। ছোটোভাই সমস্ত আত্মসাৎ করলে এক বৃদ্ধ নাবালক পৌত্র সতীশকে নিয়ে থাকে। একদিন সেই বৃদ্ধ ও সতীশ ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। এক ইংরেজ বৃদ্ধকে 'ইউ ড্যাম নিগার' বলে সজোরে ধাক্কা মারলে সতীশ বাঘের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধের লাঠি দিয়ে ফিরিঙ্গির মাথায় সজোরে আঘাত করে। শহরের এক ধনীলোক এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে সতীশকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করে এবং সতীশকে পুরস্কার স্বরূপ সেই লাঠিটির মাথা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেন।

'স্নেহের জয়' গল্পে উল্লেখযোগ্য জমিদারি মনোভাবের সাথে পিতৃত্বের সংঘাত। গোপাল রায় শাঁখালির মস্ত জমিদার। তিনি তাঁর মতের বিরুদ্ধতা কোন মতেই সহ্য করতে পারতেন না। যদি কেউ তাঁর মতের বিরুদ্ধতা করত, তিনি তাকে ভিটেছাড়া করতেনই। মতের বিরুদ্ধতা করেছিল একজন। গোপাল রায়ের গরিব জামাতা বিধুভূষণ। এখানেই সংঘাত। মেয়েও বাবার অমতে এক বস্ত্রে চলে যায় স্বামী-গৃহে। অবশেষে পিতৃত্বের কাছে গোপাল রায়কে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

'সহধর্মিনী' গল্পে ধর্মীয় গুরুদেবের ভন্ডামি উল্লেখযোগ্য। উপেন সম্পদশালী এবং বিবাহিত। সে সুখী। একদিন তার বন্ধু উপদেশ দেয় এই সুখ, সম্পদ, কামিনী, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা সবই মায়া এবং অনিত্য। স্মরণীয়, সে সময় সমাজে একশ্রেণি রামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) ও বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) ধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন। এই প্রভাবের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভন্ডামি দেখানো সুধীন্দ্রনাথের এক দুঃসাহসিক কাজ এবং প্রগতি-মানসিকতার দিশা পাওয়া যায়। উপেন তারপর বন্ধুর কথামতো পার্থিব সকল মোহ ত্যাগ করে। অবশেষে একদিন উপেন দেখতে পেল তার উপদেশ-গুরু হঠাৎ মায়াবাদ ত্যাগ করে একটি স্ত্রীলোকের মায়াবদ্ধ। উপেনের কাছে তখন সহসা গীতাপাঠ, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ নিরর্থক বলে মনে হল। সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় সুন্দর ও সুখী জীবনের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পূর্বের সেই সহজ সরল জীবন উপেন পুরোপুরি ফিরে পেল না। কারণ এক সময় মায়াবাদী উপেনের অবহেলা উদাসীনতা সহ্য করতে না পেরে তার স্ত্রী ধর্মান্ধতাকে কৃত্রিমভাবে আঁকড়ে রইল। উপেনের স্ত্রী হয়তো সেই শিক্ষাই উপেনকে আমরণ দিয়ে যেতে চায়। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝখানে উপেন দাঁড়িয়ে। এটাই এ গল্পের বাস্তবতা। এটা কি ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব? হলেও ক্ষতি নেই। ভালোই। কারণ সেসময় ব্রাহ্মধর্মের প্রয়োজন ছিল, হিন্দু ধর্মের সনাতনতাকে ভাঙতে।

সুধীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় নারীর প্রতি সহানুভূতি, পুরুষের অবিচার ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের বিরোধিতা। এর ব্যতিক্রমও আছে। 'ঠাকুর দেখা' গল্পে নায়িকা মঞ্জুভাষিণীকে দেখতে পাই স্বাধীন। পুরুষের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ-শিখা। সে স্বামীর নিষেধ না শুনে স্বামীর পিসতুতো ভাই সতীশের সঙ্গে মেলামেশা করত। অশান্তি হলে সে চলে যায় বাপের বাড়ি। স্বামী ডেকে পাঠায়, আসে না। স্বামীর গুরু ডেকে পাঠায়, আসে না। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি সুধীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত মঞ্জুভাষিণীকে গৈরিক-বেশে সাধুতে পরিণত হওয়া সেই পূর্বের স্বামীর কাছেই নিয়ে যায় পুরীতে। এখানে সুধীন্দ্রনাথকে ব্যতিক্রান্ত ছোটোগল্পকার বলতে পারি না। ঠাকুর বাড়ির ধারার ধারক। মনে হয়, গল্পটি তিনি শেষ বয়েসে লিখেছেন।

শিশু ও বালকদের নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ অনেক গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে 'পাড়াগেঁয়ে' ও 'কাসিমের মুরগী' উল্লেখযোগ্য। 'কাসিমের মুরগী' এক বড়লোক মুসলমান পরিবারকে নিয়ে লেখা। কাসিম সেই পরিবারে বিধবা মাকে নিয়ে থাকে কাকা আবদুল্লার সাথে। বাবা ছোটোবেলাতেই মারা গেছেন। কাসিম পাখি ভালোবাসত। মা কিনে দিলে সে দুধের মতো সাদা তিনটি মুরগী পুষতে শুরু করে। চামড়ার ব্যবসা করলেও আবদুল্লার ঘর অপরিষ্কার হয় বলে মুরগী পুষতেন না। একদিন কাসিম দেখল তার দুটো মুরগী। সে অনেক খুঁজল, কোথাও পেল না। "হঠাৎ রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পড়ায়" সে বুঝতে পারল। তখন সে বাকি দুটি বন্ধুর বাড়িতে রেখে দিয়ে এল। কাকা মুরগী দুটিকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'মুরগীগুলো কোথায়?' কাসিমের উত্তর, 'জানি নে'। আহার বিলাসী কাকার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নেই বোঝা যায় কেন তিনি দরদ দিয়ে মুরগীর খবর নিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত কাসিমের বন্ধু নিজের বাড়িতে রাখার অসুবিধা জানিয়ে মুরগী দুটো কাসিমের কাকার হাতেই ফেরৎ দিয়ে আসে। মুরগী দুটোর প্রতি পুনরায় আবদুল্লার খাওয়ার লোভ হয়। তিনি একটা মুরগীকে হত্যা করতে যান, এমন সময় কাসিম চিৎকার করে, ' মেরো না কাকা। মেরো না। আমার পোষা মুরগী। দুটি পায়ে ধরি। আমাকে মারো কাকা...।' এরপর সুধীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'মুহূর্তে পক্ষীর অর্ধ ছিন্ন কণ্ঠ ঝুলিয়া পড়িল...। কাসিম ভূমিতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।'

একই প্রাণি কেউ ভালোবাসে, কেউ হত্যা করে। আবদুল্লার ব্যবসায়ী মনোভাবকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত করেছেন। 'তোমার যেমন ভালোবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষা'—মুসলমান সমাজের প্রতি এই ঘৃণ্য প্রবাদটির মূলেও চরম কুঠারাঘাত করেছেন সুধীন্দ্রনাথ কাসিমের এবং তার মায়ের চরিত্রটিকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

বালক মনের আরও একটি সার্থক রচনা 'পাড়াগেঁয়ে'। এ গল্পের বালক চরিত্র রমানাথ। রমানাথ গ্রামকে ভালোবাসত। শহুরে চাকরিজীবী নগেন্দ্রনাথের ছেলেকে জল থেকে বাঁচিয়েছিল বলে তিনি রমানাথকে মাসির কাছ থেকে, গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে এলেন। এখানে সবাই রমানাথকে বোকা বলে ঠাট্টা করে যেহেতু সে সত্য কথা বলে। একদিন তাকে ভুল বুঝে নগেন্দ্রনাথ চোর ভেবে রমানাথকে প্রহার করে। রমানাথ জ্বর নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে আসে। ভুল বুঝতে পেরে নগেন্দ্রনাথ পুনরায় রমানাথকে ফিরিয়ে নিতে আসে। রমানাথ কিন্তু ফিরে যায় না। গ্রামে তার সন্ধ্যামণির গাছটির কাছে

সে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। এই গল্পটির সাথে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের সাদৃশ্য আছে। 'ছুটি' লেখা হয়েছিল ১২৯৯-এ এবং 'পাড়াগেঁয়ে' গল্পটি লেখা হয়েছিল ১৩১২ সালে। তেরো বছর পর। 'ছুটি' গল্পে বাস্তব পটভূমিকে ডিঙিয়ে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিরঞ্জিত করে তোলা হয়েছে সেটা সুধীন্দ্রনাথের 'পাড়াগেঁয়ে' গল্পে পাওয়া যাবে না।

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গল্পটি লিখে উচ্চ-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সেই উল্লেখযোগ্য গল্পটির নাম 'চিত্ররেখা'। তবে তিনি এই গল্পে মানবিক সত্যকে জাতিবৈরিতা ও হত্যার উপরে স্থান দিয়েছেন। এক ইংরেজ বালিকার মমত্ব ও হৃদয়ের গভীরতাই এই গল্পের মৌলআশ্রয়।

সুধীন্দ্রনাথই প্রথম ছোটোগল্পের গঠন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ডায়রির আকারে তিনি যে গল্পটি লিখেছেন তার নাম 'সন্তোষিণীর ডায়ারি'। বিভিন্ন দিনে লেখা ডায়রির সংকলন। ডায়রির মধ্যে কোন এক গৃহস্থ বধূর কয়েকটি দিনের তুচ্ছ ঘটনা সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'দুঃখের বোঝা' গল্পটি সতীশ এবং তার বৌদির কয়েকটি চিঠি জোড়া দিয়ে বলা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে গল্পের এই প্রকার গঠন-রীতি এই প্রথম।

সুধীন্দ্রনাথ অচেতন পদার্থকে বিষয়বস্তু করে ছোটোগল্পের পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ছাতার কথা', 'লাঠির কথা' এবং 'জুতার কথা'। বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথের আগে এরকম অন্য ধরনের গল্পের সন্ধান মেলেনি। আত্মকথার ঢঙে লেখা, রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন।

ভাষার চিত্রধর্মিতা বাংলা ছোটোগল্পে সুধীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য অবদান, উদাহরণটি লক্ষ্যণীয়, 'মুখে ডায়মন্ড কাটা বসন্তের দাগ, বাম পদে গজেন্দ্রচরণ দর্পহারী প্রকাণ্ড গোদ, নাকে সুদর্শন চক্র ঝুলিতেছে' বা 'এই সুন্দর পুলটিকে ঘেরিয়া, পুরুষভাবের কন্টকলতা বাড়িয়া উঠিয়াছিল।' অথবা সুধীন্দ্রনাথ ''রসভঙ্গ'' গল্পে লক্ষ্মীর অন্তরের প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন চমৎকার প্রতীকের সাহায্যে, উদাহরণটি লক্ষ্যণীয়, 'লক্ষ্মী অধর দংশন করিয়া কহিল, ''তবে শোন।'' হঠাৎ দশদিকের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া একটা বজ্র ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।'

সুধীন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর আটেক বড় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা'-র প্রভাব থাকলেও 'বিচারক' ও 'ছুটি' গল্পের প্রভাব সুধীন্দ্রনাথ মুছে ফেলতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ সেখানে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বিচারক' গল্পের ভাষা সাধুভাষায় লেখা হলেও তৎসম শব্দের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে জটিল ও দুর্বোধ্য হয়েছে। গল্পের আন্তরিক ভাব ও গতির ছন্দ ঢাকা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষীরোদা প্রতিবাদী নয়, বলিষ্ঠ নয়, দুর্বল। সে শিক্ষিত মানুষ জজ মোহিতমোহনের লাম্পট্যের বোঝা সারা জীবন বহন করে চলে, মানিয়ে নেয়। এভাবেই একশ্রেণি গল্পকারেরা রবীন্দ্রনাথের মতোই পাঠক-পাঠিকাদের মানিয়ে নেবার শিক্ষা দেয়। 'রসভঙ্গ' ছোটোগল্পে সুধীন্দ্রনাথের লক্ষ্মী প্রতিবাদী ও বলিষ্ঠ। ভাষা সাধুভাষা হলেও গতিসম্পন্ন এবং গল্পের আন্তরিক ভাবকে ধরে রাখতে সক্ষম। 'ছুটি' গল্পের দার্শনিকতা গল্পের চরিত্রকে ব্যাহত করেছে। সুধীন্দ্রনাথ গল্পের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শিশু মনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন

বেশি 'পাড়াগেঁয়ে' গল্পে। ছোটোগল্পে সরাসরি দার্শনিকতা সুধীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। অনেক সময় দার্শনিকতার আড়ালে ছোটোগল্পের ব্যঞ্জনাই সে কাজটি করে দিতে পারে। সুধীন্দ্রনাথ সেটা ভাল বুঝতে পেরেছেন।

সে সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিদ্যুতের মতো তাঁর কোন কোন গল্পকে চমকিত করলেও তিনি ছিলেন মূলতঃ গার্হস্থ্য-জীবনের গল্পকার। কোন কোন গার্হস্থ্য জীবনের দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে তিনি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। স্বামী-স্ত্রীর জীবনের মূলে যে সামন্তবাদ, ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণার ও বুর্জোয়াবাদের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল সে সময়, তর মৌল দ্বন্দ্বগুলোকেই তিনি স্থাপিত করেছেন পুরুষ-শাসিত গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনিগুলিতে। মধ্যবিত্ত ও উঁচু মধ্যবিত্তের পরাধীন জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যাকে তিনি অনুভব করেছেন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন জীবনে প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, স্বাধীনচেতনা, বাৎসল্য এসব মূল্যবোধগুলি মানুষ হারালে পারিবারিক জীবনে সঙ্কট দেখা দিতে বাধ্য। উঁচু মধ্যবিত্ত সমাজের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ ভদ্রেতর জীবনের সমস্যাগুলোকেও তিনি এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিচার করেছেন। যে ধর্মীয় প্রভাব সামন্তবাদকে সমাজে টিকিয়ে রাখে, সেই ধর্মীয় অবস্থানের বিরুদ্ধেও সুধীন্দ্রনাথ কলম ধরেছেন। তাছাড়া পরাধীন সমাজব্যবস্থা ও উপনিবেশীয় আর্থিক বন্ধন থেকে মানুষ কি করে তার ব্যক্তিগত স্বাধীন মনোভাবগুলোকে বিকশিত করতে পারে, সুধীন্দ্রনাথের কোন কোন গল্পে তারই ইঙ্গিত বহুতা লক্ষণীয়। এদিকে ইংরেজ শাসন, আর্থিক শোষণ ও পরাধীনতা এবং অপরদিকে ধর্মীয় প্রভাব ও সামাজিক অনুশাসন সেকালের সমাজ-জীবনে স্বাধীন মনোভাবের বাঁধাস্বরূপ ছিল। এই বাঁধা ডিঙোতে হলে হয় সংগ্রাম-প্রতিরোধ-প্রতিবাদ নতুবা সমন্বয়ের পথে ইতিবাচকতার লক্ষ্যে যেতে হয়। প্রতিবাদী চৈতন্য থাকা সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথকে অবশেষে সমন্বয়ের পথে যেতে হয়। সুধীন্দ্রনাথ কোন কোন ছোটোগল্পের পরিণতিতে পজিটিভ দিক দেখাতে না পেরে নায়ক বা নায়িকাকে মেরে ফেলেছেন বা সন্ন্যাসী করে দিয়েছেন যা সেকালের অনেক ছোটোগল্পকারগণ করতেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীও এ কাজ থেকে বাদ যাননি। 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ গল্পিয়ে ছিলেন না, তিনি ছিলেন যথার্থ গল্প-শিল্পী। তাঁর গল্প বাস্তবতার ফটোগ্রাফি হয়ে ওঠেনি। তাঁর ছোটোগল্পে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় প্রগতিশীলতার এবং আধুনিক মনস্কতার প্রথম পদক্ষেপ। ফলত: তিনি তৎকালীন এবং সমকালীন, কখনো কখনো ব্যতিক্রান্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উল্লেখযোগ্য যে কৃষক-বিদ্রোহ ও শ্রমিক-ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল তার কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্পে না থাকলেও তিনি ঠাকুর পরিবারে এক ব্যতিক্রান্ত ছোটোগল্পকার। প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী চৈতন্যের পূর্বাভাসের জন্য শুধু ঠাকুর পরিবারে কেন, তৎকাল ও সমকাল বাঙলা সাহিত্যের পরিবারেও তিনি স্বতন্ত্র। সাম্যবাদী বিপ্লবের তত্ত্বে বিশ্বাসী সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই পুত্র।

সাবিত্রী রায়ের ছোটোগল্পে দ্বান্দ্বিক অবস্থান

ক. উপেক্ষিত সাবিত্রী রায় এবং ওনাদের পাণ্ডিত্যের দারিদ্র।

কথা-সাহিত্যিক সাবিত্রী রায়কে, যিনি চল্লিশের দশক থেকে লিখতে শুরু করেছেন এবং ১৯৮০তে এসে থেমেছেন, খুঁজে পাওয়া যাবে না তথাকথিত বাঙলা ছোটোগল্প বা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে গবেষণামূলক মোটা মোটা গ্রন্থে। খুঁজে পাওয়া যাবে না শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য়, ভূদেব চৌধুরীর 'বাঙলা সাহিত্যের ছোটোগল্প এবং গল্পকারে', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটোগল্পে', সরোজমোহন মিত্রের 'বাঙলায় গল্প ও ছোটোগল্প', এবং বিজিত ঘোষ সম্পাদিত দশটি খণ্ডে বাঙলা ছোটোগল্পসংকলনে, সুব্রত রায়চৌধুরীর 'বাঙলা কথাসাহিত্যে মন্বন্তরে'। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে সাবিত্রী রায়ের জন্য দুলাইন মাত্র দিয়েছেন। তাও ভুল বার্তা। সাবিত্রী রায় সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'প্রসঙ্গত পঞ্চাশের দশকের লেখিকা...।' সাবিত্রী চল্লিশেব দশকের লেখিকা, ১৯৪৫/৪৬ থেকে লিখতে শুরু করেছেন। তারপর সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সাবিত্রী রায়ের মাত্র দুটি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করেছেন, (১) সৃজন (২) পাকা ধানের গান। 'সৃজন' লেখা হয়েছিল ১৯৪৬, মতান্তরে ১৯৪৮ সালে।

এরকম আরও গবেষক এবং পণ্ডিতেরা আছেন যাদের মোটা মোটা গ্রন্থে ঔপন্যাসিক-গল্পকার-গদ্যকার সাবিত্রী রায় উপেক্ষিত। প্রস্তুতি-তালিকাকে দীর্ঘ করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু কেন? অতিসরলীকরণে বলে দেওয়া যায়, এ কি অজ্ঞতা, নাকি পাণ্ডিত্যের দারিদ্র!! হয়তো ধরাবাঁধা বিশ্ববিদ্যালীয় পড়াশোনায়, গবেষণায় এরকম প্রোফেশনাল মানসিকতা গড়ে ওঠে, এটা তারই প্রতিফলন।

খ. ব্যক্তি সাবিত্রী রায় থেকে লেখক-পাড়ার অপরিচিত সাবিত্রী রায়।

কলকাতার গঙ্গা এবং ঢাকার বুড়িগঙ্গার জলপাখার বাতাসে বড় হয়ে উঠেছে অনেক বলিষ্ঠ লেখক-লেখিকা, অসাধারণ। সাবিত্রী রায় তাদের মধ্যে একজন। ঢাকার বুড়িগঙ্গার ধারে মানুষ। ঢাকা শহরের অভিজাত অঞ্চল উয়াড়িতে জন্ম সাবিত্রী রায়ের, ১৯১৮ সালের ২৮ এপ্রিল, সমাজতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ সোভিয়েত দেশে, এই পৃথিবীতে। সেন পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান তিনি। বাবা নলিনীরঞ্জন সেন, প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মা সরযূবালা, বিখ্যাত পরিবারের মহিলা। ফরিদপুর জেলায় পালং গ্রামে তাঁর আদি-পিত্রালয়। কিন্তু তাঁর শৈশব কাটে ফরিদপুরের উপসিগ্রামে, প্রায় দশ বছর ভূমিপুত্রকন্যাদের সান্নিধ্যে। ১৯৩৪ সালে প্রাইভেটে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন।

এবার কলকাতার গঙ্গা, কলকাতা শহর। বেথুন কলেজে পড়াশোনা। গোপাল হালদারের স্ত্রী অরুণা হালদারের সাথে একত্রে হোস্টেলে থাকা, সাহিত্য-রাজনীতি-প্রেম নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকে। বেথুন কলেজের সামনের রাস্তা ডিঙোলেই হেদুয়া পার্ক। হয়তো কোন একদিন একা বসে হেদোর জলের দিকে তাকিয়ে কত কথা ভেবেছিলেন, তার মধ্যে শান্তিময় রায়ের কথা, তাদের ভালোবাসার কথাও আছে নিশ্চয়ই। স্নাতকে ভাল ফল করেও সাবিত্রী রায়ের দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পড়া হল না। বিয়ে করে নিলেন শান্তিময় রায়কে, একজন সাংবাদিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং রাজনীতিবিদ, অসবর্ণ বিয়ে (১৯৪০), রেজিস্ট্রি অফিসে বসে। নানারকম চাকরি, শিক্ষকতা তো আছেই, করতে করতে কলম ধরলেন, শাণিত কলম। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা, যেমন পি.সি. যোশি/জ্যোতি বসু সাবিত্রী রায়ের বাড়িতে মিটিং ও পরামর্শ করতেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে নয়টি উপন্যাস, এগারোটি ছোটোগল্প, একত্রিশটি ছোটো কবিতা, শিশু এবং কিশোরদের দুটি বই, পঞ্চাশটি চিঠি যে চিঠিসমগ্রে সাহিত্যের উষ্ণতা পাওয়া যায়, তিনি লিখেছেন। হয়তো আরও লিখেছেন, জানা যাবে পরে, কারণ তিনি মারা যান ১৯৮৫ সালে।

সাবিত্রী রায়ের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে উঠে এসেছে কংগ্রেসী রাজনীতি, কমিউনিস্ট রাজনীতি, সাম্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিকতা, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, ব্রিটিশ-বিরোধী জঙ্গি আন্দোলন। তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যাবে যুদ্ধের, দুর্ভিক্ষের এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ ছবি, নারী-নিগ্রহ, ছাত্র-আন্দোলন। তাঁর লক্ষ্যের মধ্যে আছে, গণতন্ত্রের ছদ্মনামে ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ। কারণ তিনি রাজনীতি-করা পরিবারের মধ্যে বড় হয়েছেন। দাদা এবং ভাই, দেবপ্রসাদ সেন এবং শিবপ্রসাদ সেন সাম্যবাদী রাজনীতি করতেন। সাম্যবাদী রাজনীতির প্রতি সমর্থন থাকলেও সাবিত্রী রায়ের রাজনৈতিক গোড়ামি ছিল না। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন রাজনীতির ভুলভ্রান্তি-সংকীর্ণতা, মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদ, নেতৃত্বের স্বার্থপরতা, শঠতা, কামুকতা, ভোগলিপ্সা, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব। বিষণ্নতা সাবিত্রী রায়ের কথা-সাহিত্যের একটি প্রশাখা। প্রেমের বিষণ্নতা এবং প্রকৃতির বিষণ্নতা উপন্যাসে এবং ছোটোগল্পে ধরা আছে। এর সাথে ধরে রেখেছেন দারিদ্র, কুসংস্কার, নারীজাতির অসম্মান, সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার, পারিবারিক দীনতা এবং দৃঢ়তা, ধ্বস্ত মানবিকতা, ভণ্ডামি ও প্রতারণা।

প্রণব নায়ক 'দেশ-বিদেশের সাহিত্যে প্রগতি চেতনা' গ্রন্থে কথাসাহিত্যিক সাবিত্রী রায়ের লেখকসত্তাকে সুন্দরভাবে-সহজভাবে তুলে ধরেছেন, 'সাবিত্রী রায় সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিকে উন্মোচিত করে দ্বন্দ্বগুলির বাস্তবোচিত সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়েই।' ফলত সাবিত্রী রায়ের গভীর জীবনবোধ-সমাজবোধ-ব্যাপক অভিজ্ঞতা তাঁর রচনার শিকড়ে।

গ. ছোটোগল্পের সাবিত্রী রায়।

সাবিত্রী রায়ের ছোটোগল্প-সংকলন একটি, মাত্র একটি, যদি কিশোর-পাঠ্য 'হলদে ঝোরা' বইটিকে আলাদা করে দেখি। ছোটোগল্প-সংকলনটির নাম 'নূতন কিছু নয়'।

বেঙ্গল পাবলিশার্স এই বইটিকে প্রথম প্রকাশ করেন ১৩৫২ সালে। বইটিকে সাবিত্রী রায় উৎসর্গ করেছেন: ১৩৪৩-এর অকালে যারা প্রাণ হারাল তাদের স্মরণে। 'নূতন কিছু নয়' গল্পগ্রন্থটি তাঁর মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ। তিনি লিখেছেন, 'ছাপার অক্ষরে প্রথম নিজের লেখা দেখবার যে আনন্দ, সে আনন্দ পাবার সুযোগ পেয়েছি আমি, শ্রীযুক্ত সুধী প্রধানের বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তায়।' এই গ্রন্থে এগারোটি ছোটোগল্প আছে। এখন পর্যন্ত আর কোন গল্প পাওয়া যায়নি। সন্ধান চলছে। কিশোর-পাঠ্য 'হলদে ঝোরা' গল্পগ্রন্থটিতে চারটি গল্প আছে, যথাক্রমে, হলদে ঝোরা, যাদুর বেহালা, কৃতজ্ঞ কাক, ফুলের বন্ধু। এই চারটি গল্পকে এখানে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে। সাবিত্রী রায় এগারোটি ছোটোগল্পই ছোটোপত্রিকায় লিখেছেন। ছোটোগল্পগুলি লেখা হয়েছে অরণি (৫টি ছোটোগল্প); মহিলা (২টি ছোটোগল্প); অভ্যুদয়; অভিজ্ঞান-এই চারটি পত্রিকায়, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে যদিও তখনও লিটল ম্যাগাজিন concept-টা বাঙলাসাহিত্যে প্রবেশ করেনি। concept-টা তৈরি হয়েছে ষাটের দশকে। তখন তিনি আরও ছোটোগল্প লিখেছেন কিনা তার সন্ধান এখনও মেলেনি। তাহলেও বলা যায় তিনি লিটল ম্যাগাজিনেরই লেখিকা, আমাদের পথিকৃৎ। মাটির মানুষ (১৯৪৫ মে, প্রথম প্রকাশিত হয় ছোটোপত্রিকা 'অরণি'-তে)। গ্রামের মাটি থেকে উঠে আসা মানুষজনদের নিয়ে লেখা একটি পরিপূর্ণ ছোটোগল্প। সামন্ত-সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে গাজনমেলায় সন্ন্যাসীদের উৎসব। এই সময়ে, চৈত্র মাসে গাজনের সন্ন্যাসীরা গ্রামকে উৎসবে মাতিয়ে তোলে। তারই মধ্যে জেগে ওঠে প্রেম, সদ্য প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর মুক্ত প্রেম-ভালোবাসা। এই ছোটোগল্পটিতেও গাজনমেলার পটভূমিতে জেগে উঠেছে নিকুঞ্জ এবং যমুনার মনের ভিতরে প্রেম-ভালোবাসা, যার প্রকাশ চোখেমুখে চাহনিতে আচার-আচরণে। কিন্তু পরিণতি লাভ করে না। প্রেম-ভালোবাসা আটকে যায় বিয়ের পণ দিতে না পারায়। কারণ যমুনার বাবা গরিব, কিন্তু নিকুঞ্জের বাবা সচ্ছলতায় পরিপূর্ণ। চৌদ্দ-পনের বছরের যমুনার বিয়ে হয় এক বুড়োর সাথে। একদিন যমুনা পালায় বৃষ্টির ভিতর দিয়ে, গভীর-রাতের গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে, আশৈশবের অতি পরিচিত গ্রামের উদ্দেশ্যে। এই ছোটোগল্পটির শেষ বাক্যটিতে বিষয়ের গতানুগতিক গণ্ডিটিকে ভেঙে দিয়ে লেখিকা লিখেছেন, 'অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, তবু চেনাপথের অঙ্গুলি নির্দেশে যমুনা ঠিক পথেই চলে।' শেষের চারটি শব্দ ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল। ছোটোগল্পের পরিণতির নির্দেশনামা।

'নূতন কিছু নয়' (অরণি, ১৯৪৫-এ প্রকাশিত) গল্পের এই নামকরণের ভিতর দিয়ে যে মর্মার্থটি বেরিয়ে আসে সেটা হচ্ছে, এমন কিছু নয়, সাধারণ কিছু একটা। এই নামকরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ এবং তাচ্ছিল্য। এই ছোটোগল্পটিতে আছে ভাস্কর্য শিল্পী শোভন, শোভনের বন্ধু ডাক্তার এবং ডাক্তারের স্ত্রী। এদের পাশাপাশি অবস্থান করছে মন্বন্তর-পীড়িত গ্রামের মানুষ যারা শহরে ঢুকেছে দুর্ভিক্ষের একমুঠো বা এককণা ভাতের স্বপ্নে বা সন্ধানে। এই গল্পটিকে চিত্রনাট্য-ছকে সাজালে এইরকম দাঁড়াবে—

১) অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড এক বাড়ি, বারান্দায় পোষা বিলিতি কুকুর। সামনে টেনিস লন। পেছনের দিকে রান্নাঘর।

২) রান্নাঘরের নর্দমা দিয়ে ফ্যান গড়াচ্ছে। অনেকগুলো দুর্ভিক্ষের হাত একসঙ্গে ভিড় করে পচা-দুর্গন্ধ নর্দমাটা থেকে ভাত মেশানো থকথকে ফ্যান হাতের তালুতে নিয়ে চেটেপুটে খাচ্ছে। তাদের মধ্যে সতের-আঠারো বছরের একটি মেয়ে আছে।

৩) মেয়েটি থাকে পরিত্যক্ত জমির পাশে। সেখানে একটি ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলার ব্যালকনি থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত যুবতীটিকে প্রতিদিন দেখে এক ভাস্কর, নাম শোভন।

৪) শোভন দেখে একটি মন্বন্তর-পীড়িত পুরুষ, সাথে রোমওঠা নেড়ি কুত্তা এবং সেই জীর্ণ-শীর্ণ যুবতীটি।

৫) আরও একদিন ভাস্কর শোভন দেখে যুবতীটির চেহারা পালটে যাচ্ছে, গড়ন পালটে যাচ্ছে।

৬) শোভন কাদাছানতে শুরু করে। ওই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত যুবতিটির মূর্তি গড়ে, শরীরে ভাষা দেয়, 'ভাবী মাতার এক অব্যক্ত যাতনার রূপ।' সে এবার 'ভাস্কর্যের পাঁজর বাহির করা অর্ধনগ্ন মূর্তিটির সঙ্গে বাইরের যুবতীটির সাথে মিলাইয়া দেখিতেছে—।'

৭) মূর্তিটি দেখে শোভনের এক বন্ধু বিদ্রূপ করে বলছে, 'পূর্ব দক্ষিণ খোলা বসবার ঘরে এর পাসপোর্ট মিলবে না।' শোভন বলেছিল, 'মাটির সন্তানরা একটু না হয় পুজো পেল।' সাবিত্রী রায় এখানে একটা ধাক্কা মেরেছেন, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। বিবেক এবং বিবেক-বর্জিত প্রোফেশনালইজমের দ্বন্দ্ব।

৮) পোয়াতি যুবতীটির যন্ত্রণার চিৎকার মাঝরাতের নির্জনতাকে ফাটিয়ে দিচ্ছে। পাড়া-প্রতিবেশী এক ডাক্তারের স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। ডাক্তার-স্বামীকে ডেকে বলে, 'তুমি একবার যাও, একটা ইনজেকশন না হয় দিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি খালাস হোক।' ডাক্তার উত্তর দেয়, 'ও আর নতুন কিছু নয়, শুয়ে পড়ে।'

৯) ভোর হয়। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শোভন দেখে, একটু দূরে মেয়েটি মরিয়া পড়িয়া আছে। তারই পাশে একটি নবজাত ক্ষুদ্র শিশুর মৃতদেহ।

গল্পটিতে মোটাসোটা টানা দুখুদুখু কাহিনি বলতে কিছুই নেই। মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে কতগুলি স্পটকে ছুঁয়ে সাবিত্রী রায় একটি বৃত্ত তৈরি করে গাণিতিক নিয়মে বোঝাতে চেয়েছেন, এই হচ্ছে চল্লিশ দশকের মধ্যবর্তী সামাজিক অবস্থান। স্পটগুলি হচ্ছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ, তাদের খিদে, যৌনতা এবং মাতৃত্ব, সচ্ছল পরিবারে ভাস্করের শিল্প-সত্তা, ডাক্তারের অমানবিকতা, স্ত্রী এবং নারীজাতির মাতৃত্ব ও সমবেদনা। সামাজিক কটাক্ষ এবং ভাসমান জীবনের কথা বলেছেন ভিন্নধারায়, ভিন্ন আঙ্গিকে।

১৯৪৫ অক্টোবরে লেখা 'অভ্যুদয়' পত্রিকায়। 'রাধারানী' ছোটোগল্পটিতে মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত ঘটেনি। দাসির মেয়ে রাধারানী (বয়স ১৭) নামে এক বিধবাকে নিয়ে এই ছোটোগল্পটি। এই প্রসঙ্গে নারীবাদ সম্পর্কে সাবিত্রী রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দু-একটা কথা বলা যায়, যেমন যথার্থ নারীবাদ হচ্ছে সমতার অধিকার, আর্থিক স্বাধীনতা, পরিশ্রমের মাধ্যমে নারীর বেঁচে থাকার স্বাধীনতা এবং অধিকার। ধনিকশ্রেণির বা বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীবাদ হচ্ছে যৌন-স্বাধীনতা এবং সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার মুক্ত স্বাধীনতা। এখানে সতেরো বছর বয়সের বিধবা রাধারানী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায়। সার্থক ছোটোগল্পের লক্ষণ হচ্ছে গল্পের শুরুতেই বীজ পুঁতে দেওয়া। গল্পের শুরুটা এই

রকম : রাধারানী খামারবাড়িতে কাজ নিয়াছে। চায়ের কেটলি লইয়া ঘাটে যায়। কেটলি মাজিতে মাজিতে গুনগুন করিয়া গান করে, 'কালা তোর তরে কদমতলায় বসে থাকি...'। রাধারানী অন্ন-সংস্থানের জন্য পরিশ্রমী কাজ করে এবং সতেরো বছরের বিধবা যুবতীর যৌন-আর্তি। এখান থেকেই রাধারানীর ভিতরের অনুভাবনা 'কী যেন চায় সে, কী যেন পায় নাই। একটা ক্ষীণ ব্যথার চাপ বুকের মধ্যে।' সে বাঁচতে চায়, সে সুস্থজীবন চায়, সে স্বপ্ন দেখে 'একটি টিনের দোচালা/গোবর দিয়া লেপা উঠানে ধান শুকায়/রাধারানী রান্নার ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়া উলটাইয়া দেয় ধান/উলঙ্গ ছেলেপুলাগুলি ধুলায় একাকার হইয়া উঠে।' রাধারানীর স্বপ্নে মজুর পরিবার জেগে থাকে 'সংসার পাতিয়াছে এক মজুর পরিবার/মাটির হাড়িতে ভাত ফোটে/শুধু ভাত একটু নুন দিয়া মাখিয়া খায় ছেলেপুলেগুলি।' রাধারানীর এই স্বপ্ন, বেঁচে থাকার এই ছোটো ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছার অধিকার কেড়ে নেয় নারীর শরীরের প্রতি পুরুষের লালসা-কামনা। রাধার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয় পচু (জমিদারের চাকর), বৃদ্ধ জমিদার (পচুর প্রভু) ও তার পুত্র, কোম্পানির ম্যানেজার, ডাক্তার। এই ক্ষেত্রে পুরুষের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, শ্রেণি নেই। রাধা স্বপ্নের ভগ্নস্তূপ থেকে উঠে আসে। রাধারানীর রক্তিম জীবন, যেখানে স্বপ্ন জন্ম নেয় না, স্বপ্নকে খুন করে সামন্ত-সংস্কৃতি। ফলত রাধা অন্যরকম হয়ে যায়, হতে বাধ্য বাঁচার তাড়নায়। অন্য রাধার, ছদ্মপ্রেমের শরীর, উপহার গ্রহণ করে—চিরুনি, গন্ধতেল, টাকা। আর তখনি সাবিত্রী রায়ের শাণিত কলমের শব্দরা গর্জে ওঠে, 'সতীত্ব সুনাম সবই মিথ্যা মনে হয় দুনিয়াতে। অদ্ভুত। অথচ ছদ্মবেশের অন্ত নাই মানুষের।' মনে হয় নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে লেখিকার এই তোপ, যেন আজকের তোপ, একবিংশ শতাব্দীর তোপ, চলছে।

'অন্তঃসলিলা' ছোটোগল্পটি লেখা হয়েছে ১৯৪৯-এ। 'অন্তঃসলিলা' কথাটির একটি বয়ান দেওয়া যাক, যার জলধারা অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত, ফল্গুধারা নদীর মতো, উপরে কাঁকর-বালি মেশানো, তলায় নদীর প্রবাহ। এরকম ব্যঞ্জনাধর্মী বয়ানটি মাথায় রেখে সাবিত্রী রায় 'অন্তঃসলিলা' নামে অসাধারণ ছোটোগল্পটি লিখেছেন। ছোটোগল্পটির শেষ বাক্যে অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটি তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। লিখেছেন, 'এই মধ্যবিত্ত সংগ্রামের আড়ালেই কি বয়ে চলেছে লেখিকার জীবনের অন্তঃসলিলা প্রাণের প্রবাহ।' গল্পের এই লেখিকাটির নাম শকুন্তলা সেন। সাবিত্রী রায়ের লেখক-জীবনের খানিকটা অংশ এই গল্পে ধরা আছে। শকুন্তলা সেনের জীবন কাটে দারিদ্রের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে। তিনি থাকেন স্বামী-শিশু-কন্যাসহ ভাঙাচোরা স্যাতস্যাতে একটি ঘরে। শকুন্তলার স্বামী সামান্য বেতনে কলেজে পড়ান ও টিউশনি করেন। লেখিকাটি স্বামী, কন্যা, দেওর ও বিধবা শাশুড়ি সামলে উপন্যাস ও ছোটোগল্প লেখেন। প্রকাশক এবং পত্রিকার সম্পাদক দেবব্রত শকুন্তলা সেনের গল্প নিতে ঘরে এসে অবাক হয়ে যান লেখিকার জীবনসংগ্রাম দেখে। অথচ উপন্যাসে ছোটোগল্পে নির্মম ও কঠোর জীবনসংগ্রামের ভিতর দিয়ে অলক্ষ্যে প্রাণের প্রবাহ বইয়ে দেন শকুন্তলা। এই প্রবাহ মানুষের প্রাণের প্রবাহ। এই ছোটোগল্পটি সাবিত্রী রায়ের নিজস্ব ঢঙে লেখা। স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। এই গল্পে প্রথমেই শকুন্তলার ছোটোগল্পেব টেকনিক নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আছে, প্রকাশক দেবব্রত মন্তব্য করছেন, 'একমাত্র

টেকনিকটুকুই গল্পের প্রাণ নয়, আত্মাও নয়।' সাবিত্রী জানতেন, টেকনিক এবং প্রাণ বা আত্মাই হচ্ছে ছোটোগল্পের বলিষ্ঠতা, অসাধারণত্ব। 'অন্তঃসলিলা' সেরকমই একটি ছোটোগল্প।

'ওরা সব পারে' ছোটোগল্পটি সাবিত্রী রায়ের একটি সাধারণ আটপৌরে গল্প হলেও তার মধ্যে আছে এক গভীর ব্যঞ্জনা। কাজের মেয়ে গোলাপী এক শিক্ষকের পরিবারে কাজ করে। সেই শিক্ষক এবং শিক্ষকের স্ত্রী গরিবদের কথা ভাবে, দুর্ভিক্ষের কথা ভাবে। গোলাপী সকালে কন্যা-সন্তানের কারণে দেরি করে এলে এরা গোলাপীকে চা করে খাওয়ায়, যা বাজার করে অর্ধেক গোলাপীর ঘরে যায়, হাত কেটে গেলে ওষুধ লাগিয়ে দেয়, গোলাপীকে পুরোনো শাড়ি-ব্লাউজ দেয়। গোলাপী ওদের সম্পর্কে ভাবে, 'ওনারা ভাল করে বকতেও জানে না'। পরে গল্পের শেষে শিক্ষক এবং তার স্ত্রী সম্পর্কে গোলাপীর সব ধারণা পালটে যায় যখন শিক্ষকের স্ত্রী বলে গোলাপীকে, 'একজোড়া দুল হারিয়েছে, দেখেছ কী?' বাবুটিও বলে, 'আর কে নেবে? ও-ই নিয়েছে। কেউ তো আর নেই বাড়িতে।'

সচ্ছল পরিবারের গরিব-দরদী ভালোমানুষদের নেতিবাচক মানসিকতার সাথে লেখিকা পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন। স্বার্থপর এবং সুবিধাবাদী মানসিকতার স্তর পেরিয়ে আসতে না পারলে দেশের কাজ, গরিবদের জন্য কাজ করা যায় না, সেটা তখন লোকদেখানো শৌখিন মজদুরিতে পরিণত হয়ে যায়। লেখিকা তথাকথিত প্লটটাকে সাজিয়ে গভীর সত্যটাকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন। এটাই এই গল্পের সফলতা।

'মহিলা' পত্রিকায় ১৯৪৯-এ তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লিখেছিলেন। সে সময় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাবাজি নিয়ে রগরগে অনেক গল্পকাহিনি লেখা হয়েছিল যথা, মারামারি-কাটাকাটি, ঘরবাড়ি-জ্বালানো, ধর্ষণ, ধর্মীয় ডাক বন্দেমাতরম-আল্লা হো আকবর ইত্যাদি। এর বাইরেও দৃষ্টান্তমূলক অন্যরকম দাঙ্গা-বিরোধী গল্পও লেখা হয়েছিল সমরেশ বসুর 'আদাব', রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদাঘোড়া', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' এবং যার খবর রাখেন না সেটি হচ্ছে সাবিত্রী রায়ের 'স্বর্গ হইতে বিদায়'।

বাংলার গ্রামে-গঞ্জে-শহরতলিতে কনভারটেড বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের মিলেমিশে থাকার যে একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, যে মানবিক আনন্দ-সুখ গড়ে উঠেছিল, সেটাকে নেতৃত্বপ্রধান রাজনীতির জালিয়াতির বিষাক্ত হাওয়া বিষিয়ে দেয়। ঐতিহ্যের মূল্যবোধ ভেঙে দেয়। তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বেদনা-বিধুর এই ছোটোগল্পটি। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মিলেমিশে থাকার যে আনন্দ, যে সুখ, যাকে আমরা বলে থাকি স্বর্গরাজ্যে বাস করা, তা থেকে কিভাবে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে পশ্চিমে, পশ্চিমবাংলায় তারই একটা নিঃশ্বাস-চাপা বেদনার নীরব আর্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন লেখিকা বড়ই মুন্সিয়ানার দাপটে খামারবাড়ির পরবাসী বৃদ্ধা পরিচারিকা তারাকে প্রধান চরিত্র করে। স্বামীহারা তারার আজীবন আশ্রয়দাতারা সবাই তারাকে বিশাল খামারবাড়ির শূন্যতার বন্দিশালায় একা ফেলে পশ্চিমে চলে গেছে। এই গল্পের শেষ বাক্যটি তারার ম্লানময় শেষ জীবনটাকে উসকে দেয়, 'আঁচলের কোণায় চোখের জল মুছিয়া বসে সে সন্ধ্যার বাতি

ধরাইতে।' এখানে যেন আবার শেষ জীবনের (মৃত্যু) সন্ধ্যার বাতির কথা বলেছেন অনুভবের লেখিকা সাবিত্রী রায়। ছোটোগল্পের সমাপ্তির অন্যরকম ভাবনা (concept)।

'সমঝদার' এবং 'হাসিনা' ছোটোগল্পদুটি যথার্থ ছোটোগল্প হয়ে উঠতে পেরেছে কি? স্কেচ হয়েছে, গল্পের স্কেচ, Photographic Story-elements। এরকম গল্প অনেক আছে বাঙলা গল্প সাহিত্যে। ড. সুকুমার সেনের কথায় বলা যায় 'গল্পচিত্র'। লেখিকার চোখের ক্যামেরায় উঠে এসেছে কলকাতার রাস্তায় ভিখিরি পরিবার। ১৯৪৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা, তখনও দেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়নি। কালোবাজারি এবং দুর্ভিক্ষের চরমতম রেশ কাটেনি। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই দুটি গল্প-চিত্রে। ভিখিরিদের নিয়ে আগে-পরে সে-সময় আরও গল্প লেখা হয়েছে, মূলত তাদের যৌনজীবন নিয়ে, যেমন মনীশ ঘটকের 'পটলডাঙার পাঁচালি'। সাবিত্রী রায়ের গল্পদুটি অন্যরকম, অন্যজাতের। 'বাঁচতে চাই' এরকম জীবনবোধ নিয়ে এই গল্প। 'সমঝদার' এবং 'হাসিনা' গল্পচিত্র দুটি একই মুদ্রার (একই কাহিনির) এপিঠ-ওপিঠ। একই চরিত্র দুটি গল্পে স্থান পেয়েছে। আউলবাউল অন্ধ ভিখিরি গায়ক, তার ছেলে টোকানি, টোকানির প্রেমিক হাসিনা, এক মুসলমান মেয়ে, কিশোরী। মনে হবে কোন উপন্যাসেরই দুটি অংশ। অথবা হতে পারে গল্পের স্বাতন্ত্র্য, নিজস্বতা। থাক এই প্রসঙ্গ। একতারা বাজিয়ে অন্ধ গান গেয়ে পয়সা উপার্জন করে নিজের জন্য, সন্তানের জন্য, উপরি এসে জুটেছে হাসিনা। হাসিনাকে সে কন্যাসম আপন করে নিয়েছে। এই অন্ধ সবরকম গান গায়—ভজন, কীর্তন, ভাটিয়ালি, বাউল। তার আদি বাসস্থান পদ্মাপারে। সেখান থেকে সে এসেছে টোকানিকে নিয়ে শহর কলকাতায় এক ফাঁকা মাঠে বকুলগাছের তলায়। শহর কলকাতার মানুষজনকে অন্ধ হলেও বিদেশের মানুষ বলে মনে হয়, নিজের দেশের মানুষ বলেই মনে হয় না, কিন্তু যখন সে কয়েকটা বকুল ফুল তুলে নাকের কাছে নিয়ে ভাবে, বকুলই তো? শহরেও আছে এই গাছ? 'তাহা হইলে একেবারে অনাত্মীয় নয় এদেশের মাটি।' এবং এই দেশের মানুষেরা আত্মীয় নয়। এই মহান ব্যঞ্জনাটি কলমের অসাধারণত্ব না থাকলে বেরিয়ে আসতে পারে না। গোটা অখণ্ড বাঙলাদেশ অন্ধের নাকের ডগায় ধরা দিয়েছে বকুল ফুলের গন্ধে। ধন্য সাবিত্রী রায়, ধন্য। শুধু তাই নয়, অন্ধ হলেও ভিখিরি বুঝতে পারে ক্ষুধার্ত পুত্রের শুকনো মুখ। 'টোকানিরে তোকে আমি রুটি খাওয়ামু।' পিতৃস্নেহের ব্যথাতুর বার্তা ছড়িয়ে পড়ে অন্ধ গায়কের গানে, একতারায়। এই টোকানিকে হাসিনা ভালোবাসে। তারপরে গল্প-চিত্রটি হাসিনাকে নিয়ে। হাসিনা স্বপ্ন দেখেছিল 'সে আবার টোকানিকে নিয়ে ঘর পাতিবে।' কিন্তু টোকানি জেলখানায়। অপরাধ, সে বস্তার ফুটো দিয়ে পচা চাল বের করে নিয়েছিল। এইসময় সাবিত্রী রায় গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়েন, বলেন, 'তাহারা খাইতে পায় না, আর চাউল পচাইতেছে ঐ বড়লোকরাই।... অদম্য প্রচেষ্টায় জীবনধারা বহিয়া চলিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর অসাম্যের অভিশাপ জমা হয় সে কাতর চাউনিতে।' Photographic Story-elementsও ছোটোগল্প হতে পারে, গল্পচিত্রকেও ছোটোগল্প করা যায়। দেখিয়েছেন সাবিত্রী রায়।

• 'প্যারামবুলেটার' সাবিত্রী রায়ের একটি নেতিবাচক ছোটোগল্প হলেও চারদিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে গল্পের সাদামাটা অলংকার হিসেবে ব্যবহার

করেছেন। ছোটোগল্পটি মুদ্রিত হয়েছিল 'অভিজ্ঞান' পত্রিকায় ১৯৪৮-এ। সুশান্ত এবং মালার ভালোবাসার বিয়ে। তাদের একমাত্র সন্তান, কন্যাসন্তান। ওদের অনেক দিনের ইচ্ছে মেয়েকে প্যারামবুলেটরে বসিয়ে নতুন জামা পরিয়ে সবুজ পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবে। পার্কে নয়, সবুজ পার্কে। 'সবুজ' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। একটি মাত্র শব্দ গল্পের বিশাল ব্যঞ্জনা এনে দিতে পারে, সাবিত্রী জানতেন। প্যারামবুলেটর কিনে দিয়েছিল, পার্কে নিয়েও গেছিল। কিন্তু সত্যাগ্রহী ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যে পুলিশ গুলি চালাতেই একটা কন্যার বুকে এসে লাগে। 'প্রাণহীন দেহটুকু এলিয়ে পড়ে মায়ের বুকে।' সুশান্তের সাহিত্যনিষ্ঠা, মালার একাগ্র ভালোবাসা, দারিদ্র ও স্নেহের সংঘাত, যুদ্ধ ও কালোবাজারি, লরি বোঝাই সঙ্গিনধারী মিলিটারি, সত্যাগ্রহী ছাত্রদের আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনাসকল বিঠোফেনের বিষণ্ণ আবহ-সংগীতের কাজ করেছে। ফলে নেতিবাচকতা পাঠককে মরবিড করবে না। আসলে সাবিত্রী রায় মরবিড গল্পকার নন।

১৯৪৫-এ লেখা, 'সাময়িকী' ছোটোগল্পটি ব্যতিক্রমী ছোটোগল্প। প্রকাশিত হয়েছিল অবাণিজ্যিক ছোটোপত্রিকা 'অরণি'তে। এক খোঁড়া বোবা ভিখিরির জীবনযাপনকে কেন্দ্রবিন্দু করে সাবিত্রী রায় কম্পাসের বৃত্ত রচনা করেছেন। বৃত্তটিকে ঘিরে রেখেছে মধ্যবিত্ত পরিবারের অহমিকা-শিক্ষা-রুচি, সাম্য-রাজনীতিতে বিশ্বাসী নাগরিক, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, ক্রিকেটপাগল পরিবার, প্রগতি-লেখক সঙ্ঘের সদস্যরা এবং বড়লোক বাড়ির প্রৌঢ়াগৃহিনী। এদের আলোচনার বিষয় ভারতীয় বাবুর্চির বিদেশী রান্না, মিষ্টির দোকানের বড় বড় রসগোল্লা, ক্রিসমাস কেক, রাশিয়ায় ডাক্তারি শাস্ত্রের উন্নতি, ক্রিকেট খেলা, প্রগতি-লেখক সঙ্ঘের সাহিত্য-রসের বিচার, অসকার ওয়াইল্ড, সোভিয়েট দেশের সাহিত্য-চর্চা ইত্যাদি। এরা খোঁড়া বোবা রাস্তার ভিখিরিটার খবর রাখে না। তার খবর লেখিকা পৌঁছে দেন পাঠকের কাছে। বোবাটি আগে ভিখিরি ছিল না। কামারের কাজ করত। রোজগার ভালই করত। বৌকে ডুরে শাড়ি কিনে দিত। মা-দাদার সাথে ঝগড়া করে একটা ঘর তুলে বৌ উল্লাসিনীকে নিয়ে আলাদা ছিল। পরে ১৯৪৫ সালের কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের মরণকামড়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল দারিদ্রের অসহায় জগতে, এই কলকাতায়। এর পরেও বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছায় ভিক্ষাকে জীবিকা করে বেঁচে থাকে উল্লাসিনী একমাত্র শিশুপুত্রকে নিয়ে। প্রোফেসারের শিক্ষিত বোন উর্মির চোখে পড়ে কুৎসিত বোবা খোঁড়াটার উপর। সে তখন ভাবে, বিধাতার এ অপূর্ব সৃষ্টির (প্রকৃতির সৌন্দর্য) ছন্দপতন ঐ কুরূপ খোঁড়াটা। কষ্ট হয় তার এই কদর্য রূপহীনের জন্যে।...এ যেন অসাম্যের মূর্ত অভিশাপ। এ দুঃখের অবসান কবে হবে। এই ছোটোগল্পটি এক বিশেষ সময়ের ছবি ফ্রেমে বাধা হলেও একটি ভিন্ন ছোটোগল্প। গল্পচিত্র বলব? তাও বলা যাবে না।

ছোটোগল্পটির নাম 'ধারাবাহিক' (১৯৪৫)। এই ছোটোগল্পটির পরিণতিতে কোন ব্যঞ্জনা নেই, 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'—এ রকম বার্তাও নেই। 'ধারাবাহিক' নামকরণটি সার্থক এই কারণে সমাজের আশেপাশে সামনে-পিছনে অনেক রকম ঘটনা আছে যা ঘটতেই থাকে, চলতেই থাকে। পটলা-ধোপা বাবুদের পাট করা ভাল ধুতি পবে

মদের আসরে যায়, যেতেই থাকে। গভীর রাতে মদের নেশায় ঘরে ফিরে চেঁচায়, 'দুয়ার খোল, দুয়ার খোল বজ্জাত মাগী।' চেঁচাতেই থাকে। পুত্র-কন্যাদের উপর পিতৃস্নেহ, বজ্জাত মাগির (স্ত্রী) উপর মায়া-মমতা ও পরিশ্রমী জীবিকা থাকা সত্ত্বেও এরকমই চলতে থাকবে। সাম্যবাদী নেতা ও প্রগতি-সাহিত্যের ধারক-বাহক বিশ্বনাথ পোস্টার লিখতেই থাকবে। সোভিয়েট ফিল্ম দর্শকেরা ফিল্ম দেখতেই থাকবে। এভাবেই পটলা এবং বিশ্বনাথের জীবনধারা-কর্মধারা চলতেই থাকবে। এই গল্পে জীবনের যান্ত্রিকতা ছাড়া গভীর জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং নেতিবাচকতা প্রভাবিত নৈরাশ্যবাদ একটু পাঠকমনে উসকে দিয়েছেন লেখিকা। পরিবর্তনশীল সমাজে অনেকটা চলতে থাকা স্থিতিশীল জীবনধারা, যান্ত্রিক এবং গতানুগতিক (conventional)।

ঘ. ছোটোগল্পে চিত্রকল্প ও উপমার ব্যবহার, কিভাবে সাবিত্রী রায় ব্যবহার করেছেন।

চিত্রকল্প এবং উপমা ছোটোগল্পের অলংকার। চিত্রকল্প এবং উপমা ছোটোগল্পকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে বা লেখকের চিন্তাভাবনাকে নির্দিষ্ট জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে পারে। একমাত্রিক ছোটোগল্পের বিষয়কে সীমাবদ্ধ এবং ঘনীভূত করতে পারে, সৌন্দর্য বাড়াতে পারে। আমাদের এখানে স্মরণ রাখতে হবে, চিত্রকল্প শুধু চিত্র নয়, শব্দচিত্র বা অক্ষরপট। শব্দ ও ভাষার সঙ্গে মিশেছে কল্পনার অভিজ্ঞান। কবি হলেও এখানে এজরা পাউন্ডকে টেনে আনা যায়। তিনি বলেন, 'An Image is that which present on intellectual and emotional complex in an instant of time. সাবিত্রী রায়ের চিত্রকল্পে 'intellectual and emotional' complex লক্ষ করা যায়। তার কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) রাধারানীর চারপাশে কিলবিল করিতে তাকে লোলুপ দৃষ্টি আর ইঙ্গিতভরা চাহনি। নারীসুলভ আভিজাত্যের গরিমায় টলমল করিয়া উঠে মন। পচা কুকুরের পরিত্যক্ত এঁটো-কাটা নয় সে, যে হ্যাংলাগুলি কুকুরের মতো জিভ চাটিতে থাকে (রাধারানী)। এখানে তিনটি শব্দের ব্যবহার কিলবিল-টলমল-পরিত্যক্ত এঁটো-কাটা পাঠক-কল্পনাকে প্রসারিত করে। পুরুষের লালসাকে জাগ্রত করে।

(খ) জ্যোতির্ময় দেবতার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে প্রকাণ্ড বাড়িটা ঘুমাইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। শুধু ঘুম নাই বৃদ্ধ জমিদারের চোখে। রাধারানী বাতাস করে (রাধারানী)। এখানে কল্পনার অভিজ্ঞান 'ঘুম' শব্দটি।

(গ) দূর দিগন্তে মিলাইয়া যাওয়া পীতাভ তৃণপ্রান্তরের উপর দিয়া খোঁড়াইয়া চলিয়াছে খঞ্জ ভিখারি। মৌন সন্ধ্যার বেদনার্ত মুহূর্ত একটি (সাময়িকী)। মৌনসন্ধ্যা, খঞ্জ ভিখারি, প্রকৃতি ও মানুষ বেদনাকে কেন্দ্র করে এই চিত্রটি কল্পনাকে উসকে দেয়।

(ঘ) বিশ্বনাথের মন কঠিন হইয়া উঠে—আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে। জলের উপর তেলের মতো সর্বদাই নিজেকে ভাসাইয়া রাখার কী সযত্ন প্রয়াস (ধারাবাহিক)। আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবী এবং জলের উপর তেল—বাক্যাংশ দুটির ব্যবহারে চিত্রকল্প ও উপমার পাশাপাশি অবস্থানটি লক্ষ করার মতো।

(ঙ) শিশুটি যেন সবই বোঝে। দন্তবিহীন মাড়ি দুটির ফাঁকে একগাল হাসি ঢেলে দেয় সে। ঐন্দ্রজালিক ফোয়ারা। চোখ ফেরাতে পারে না স্নেহাতুর পিতা (প্যারামবুলেটার)। ঐন্দ্রজালিক, ফোয়ারা শব্দদুটির প্রয়োগ ছোটোগল্পটির সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

(চ) কাজেই সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়। একটা দমকা কালো মেঘে বিকেলের সোনালি আলোটুকু যেন ম্লান হইয়া যায় এক মুহূর্তে (মাটির মানুষ)। লক্ষণীয়, সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়া এবং দমকা কালো মেঘের উপমা এবং আরও কিছু ভাবনাকে কল্পনা এগিয়ে দেয়।

যে সকল চিত্রকল্পে ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে আছে একটিমাত্র বাক্যের মধ্যে তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন : ১) ওদিকে পঞ্চমুখীর জবার লাল অভিনন্দন বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে। ২) মাটির রঙ ধরিয়া গিয়াছে কাপড়ে বহুদিনের ময়লা জমিয়া। ৩) আগুনের হল্কা মেশানো উত্তপ্ত আলোচনা। ৪) একটা ছাইরঙা উড়ন্ত মেঘের তলায় ডুবিয়া যায় মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য। ৫) স্তূপীকৃত বালিশের বিপুল উচ্চতা বড় বেশি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিচ্ছে যেন এ বাড়ির জনসংখ্যা। ৬) তাহার এ বিলম্বিত জীবনে স্বর্গের সুর নামিয়া আসিয়াছে যেন। চিত্রকল্পের যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করলে বুঝতে পারা যায় একজন ছোটোগল্পকারের শিল্পমনকে, রোমান্টিকতার ব্যঞ্জনাকে এবং কথা বলার সীমাবদ্ধতাকে। মানুষের জীবনবোধের সাথে এসব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যথার্থ, সার্থক চিত্রকল্পের ব্যবহার করতে পারলে গল্পকারকে বেশি কথা বলে অনর্থক গল্পকে মেদবহুল করতে হয় না। বেশি কথা বলে অনর্থক গল্পকে লম্বা বা মোটা করা ছোটোগল্পের ধর্ম নয়।

এইসব ছোটোগল্পে সাবিত্রী রায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়ে মানবজীবনে আত্ম-মর্যাদার সূক্ষ্ম নিপীড়ন আর তিক্ত আত্মগ্লানি। এই প্রসঙ্গে সাবিত্রী রায়ের ধ্যানজ্ঞান বুঝতে পারা যায় বেশ কয়েকটি ছোটোগল্পে। নিজস্ব ঢঙে ছোটোগল্প লিখতে-লিখতে, বলতে-বলতে সাবিত্রী রায় মন্তব্য করেনঃ (১) সতীত্ব-সুনাম, সবই মিথ্যা মনে হয় দুনিয়াতে। অদ্ভুত। অথচ ছদ্মবেশের অন্ত নাই মানুষের। (২) এ জীবনকে খান খান করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে পুঞ্জীভূত বিদ্বেষে। আত্মমর্যাদার সূক্ষ্ম নিপীড়ন আর তিক্ত আত্মগ্লানি। (৩) কিন্তু জীবন জীবনই। বাঁচিয়া থাকার অদম্য প্রচেষ্টাময় জীবনধারা বহিয়া চলিয়াছে। (৪) সমস্ত পৃথিবীর অসাম্যের অভিশাপ জমা সে কাতর চাহনিতে। (৫) লেখার মস্ত একটা প্রয়োজনীয় কায়দাই হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কথাগুলো ছেঁটে ফেলতে শেখা। (৬) মধ্যবিত্ত সংগ্রামের আড়ালেই বয়ে চলেছে জীবনের অন্তঃসলিলা প্রাণের প্রবাহ।

এইসব টুকরো মন্তব্য ছোটোগল্পকে খাটো করতে পারেনা, বরং ছোটোগল্পকে উজ্জ্বল করে। ছোটোগল্পের প্রাণকে এবং আত্মাকে জাগ্রত করে রেখেছে বিষয়ের সাথে একাত্ম হয়ে। সবসময় ছোটোগল্পের সংজ্ঞা ধরে গল্প লিখতে হলে নিজস্ব-রীতিনীতি বা টেকনোলজি গড়ে ওঠে না। ছোটোগল্পের সংজ্ঞা এখন বিস্তৃতি লাভ করছে, একমাত্রিক ছোটোগল্প যেমন আছে, থাকবে, ঠিক তেমন বহুমাত্রিকতাকে একমাত্রিকতার মধ্যে নিয়ে আসাটাও ছোটোগল্পের আধুনিক টেকনোলজি। সাবিত্রী রায়ের ছোটোগল্প সম্পর্কে এ কথা বলা যায়। তাঁর ছোটোগল্পে যেমন স্বাতন্ত্র ও ব্যতিক্রমতা আছে, আবার ছোটোগল্পের ধারাবাহিকতাও আছে। বলা যায় সাবিত্রী রায় কাহিনিকার নন, তিনি যথার্থ একজন ছোটোগল্পকার।

ঙ. সাবিত্রী রায়ের ছোটোগল্পের অনন্যতা এবং উপসংহার।

সাবিত্রী রায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির চোখ দিয়ে দেখেছেন নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, সমস্যা-সংশয়, প্রেম-ভালোবাসা, সুস্থ-অসুস্থ জীবনযাপন, কর্ম-প্রেরণা, বেঁচে থাকার জন্য জীবনসংগ্রাম। অবিনাশী প্রাণশক্তির শিকড়ের সন্ধান তিনি দিতে পেরেছেন তাঁর ছোটোগল্পে বাস্তব এবং কল্পনার আশ্রয়ে থেকে। এ প্রসঙ্গে সাবিত্রী রায়ের মূল্যবান মন্তব্য: 'কোন চরিত্রই মিথ্যা নয়, বাস্তবেরই ছায়া। আবার কোন চরিত্রই সত্য নয়, কল্পনারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র।' জীবনবোধের এই দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই তাঁর অধিষ্ঠান।

জীবন-সংগ্রাম এবং গভীর জীবনবোধকে অনুপ্রাণিত করে প্রেম-ভালোবাসা এবং ইতিবাচক মানবিক চেতনা। সাবিত্রী রায়ের মধ্যে এই ভাবনাটা কাজ করে। তিনি ছোটোগল্পে লক্ষ্য রেখেছেন, একজন ফুটপাথবাসী ভিখিরি ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ থেকে মধ্যবিত্ত মানুষজনের মধ্যে এই প্রেরণাটিকে। শুধু মার্কসবাদ নয়, চৈতন্যবাদও তাকে অনুপ্রাণিত করেছে বলে মনে হয়। সেজন্য মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতার মধ্যেও কোমলতা ও ভালোবাসা ছুঁয়ে যায় অনেক গল্পে। রাজনীতি-সচেতন সাবিত্রী রায় লক্ষ্য করেছেন বামপন্থী সংসারে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবকে। তিনি আরও লক্ষ করেছেন মধ্যবিত্তশ্রেণির স্বভাবে রয়ে গেছে প্রগতিবিলাস এবং ধরাবাঁধা পাণ্ডিত্যের কখনও বিনীত, কখনও উগ্র অহংকার। সেজন্য বলা যায়, সাবিত্রী রায়ের ছোটোগল্পে তথাকথিত মুষ্টিবদ্ধ হাততোলা লাল শ্লোগান নেই। অথচ সমাজতান্ত্রিকতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানতে বুঝতে পারা যায় তাঁর ছোটোগল্প পাঠে। মূলত তাঁর ছোটোগল্পে শহরকেন্দ্রিক সচ্ছলতা এবং দারিদ্রের পাশাপাশি দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতার অবস্থানটি লক্ষ করা যায়। তবে একটা বিশেষ বিচ্যুতি ধরা পড়ে, তাঁর গল্পে উঠে আসেনি শ্রমিক ও তেভাগা আন্দোলন।

পরিশেষে সাবিত্রী রায়ের সাহিত্যে একনিষ্ঠতা সম্পর্কে, গোপাল হালদারের মন্তব্যটিকে গ্রহণ করা যায়, 'সাবিত্রী রায়ের সংকল্পের অভাব ছিল না। জীবনকে তিনি প্রথম থেকেই সত্য বলে গ্রহণ করতে চেয়েছেন।' ('প্রথমত' ১৯৯৪ সাবিত্রী রায় সংখ্যা থেকে)। সাবিত্রী রায় কথাসাহিত্যে সত্য বলার সাহসিকতার সাক্ষ্য রাখতে পেরেছেন, যে সাহসিকতাকে পি.সি. যোশী চিঠিতে জানিয়েছেন 'I admired your courage before.' ('প্রথমত' ১৯৯৪ সাবিত্রী রায় সংখ্যা থেকে)।

সামাজিক অর্থে যথার্থ গল্প-শিল্পী শৈলজানন্দ

১

'প্রবাসী' পত্রিকায় অগ্রাণ ১৩৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ গল্পকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেছিলেন, সেটি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। 'শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনার দারিদ্র ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্য সভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্রের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি। 'নবযুগের সাহিত্যে নূতন একটা কাণ্ড করছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখিনি—দরিদ্র নারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যেসব চিত্র দেখেছি, তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই, ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি-ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।'

এই মান্য-মন্তব্যটি থেকে শৈলজানন্দের গল্প বিষয়ের স্বরূপ-লক্ষণের স্পষ্টতা প্রকাশ পায় : (১) দারিদ্র্য জীবনের অভিজ্ঞতা, (২) নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি, (৩) নবযুগের সাহিত্যে নূতন একটা কাণ্ড করছি—এ রকম কৃত্রিম মনোভাব তাঁর ছিল না, (৪) দরিদ্র নারায়ণের পূজারির মতো তিনি কপালে তিলক কাটেননি, (৫) দারিদ্রের এবং যৌনতার কারি-পাউডার ব্যবহার করে গল্পকে ভঙ্গি-সর্বস্ব করে তোলেননি। এসব লক্ষণ ছাড়াও এমন কিছু শ্রেষ্ঠ গল্প আছে শৈলজানন্দের যেখানে মানবিক, পারিবারিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবাদ-প্রবচনের মতো শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি কয়লাকুঠির লেখক, ফলত তিনি আঞ্চলিক লেখক। এ রকম সীমাবদ্ধ মন্তব্যের সঙ্গে আরও দুটি বিশ্লেষণ যোগ করা হয় যে তিনি যৌনবিলাসী এবং ভাববিলাসী লেখক। এভাবেই তিনি চিহ্নিত হয়ে উঠেছেন এক শ্রেণির পাঠকের কাছে। এছাড়াও পরবর্তীকালে কলকাতার আকাশবাণীতে নাট্য-বিভাগে যোগদান (১৯৫৬), চিত্রনাট্য রচনা ও সিনেমা-পরিচালনা সাহিত্য-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল শৈলজানন্দকে। তিনি সারা জীবনে ষোলটি সিনেমার কাহিনি ও চিত্রনাট্য নিজে লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিনেমার নাম : নন্দিনী (১৯৪১), বন্দী (১৯৪২), শহর থেকে দূরে (১৯৪৩), অভিনয় নয় (১৯৪৫), মানে না মানা (১৯৪৫), ঘুমিয়ে আছে গ্রাম (১৯৪৮), ব্লাইন্ড লেন (১৯৫৩), আমি বড় হবো (১৯৫৭)। আকাশবাণীতে বহু নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন যেমন, গ্রহচক্র, কালরাত্রি, রাহু, কবি ইত্যাদি। এরপরেহ চলচ্চিত্র জগতে সত্যজিৎ রায় এসে গেছেন এবং শৈলজানন্দ ফিরে গেছেন আবার

সাহিত্যের জগতে। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আবার তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন।

তবে 'কল্লোল' পত্রিকার (১৯২৩) সময় থেকে ত্রিশের দশক পর্যন্ত প্রথম পর্বে তাঁর কলম থেকে যেসব অসাধারণ বলিষ্ঠ গল্প পেয়েছি সেই অসাধারণ বলিষ্ঠ গল্প দ্বিতীয় পর্বের কলম থেকে পাওয়া যায়নি।

শৈলজানন্দ যখন গল্প লেখা শুরু করেন (১৯২২), তখন সামাজিক অবস্থানটাকে নিয়ন্ত্রণ করত অর্থনৈতিক মন্দা (ফলে দেখা দিয়েছিল চরম দারিদ্র্য-অভাব-অনটন-বেকারিত্ব, ব্রিটিশ অত্যাচার ও অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভাবন, মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনার প্রসার, সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর ন্যুট হ্যামশুন, বিদেশি সাহিত্য ও মার্কসীয় প্রভাব। এর ফলে ত্রিশের দশকে কথা-সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে দুটি ধারা দেখা যায়—(১) রোমান্টিক ধারা, (২) অভিজ্ঞতা-নির্ভর বাস্তবতার ধারা। শৈলজানন্দ মূলত দ্বিতীয় ধারায় অবস্থান করেছিলেন। যদিও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে গল্প লিখে গেছেন। শৈলজানন্দকে যেমন কল্লোলীয় ফ্রয়েড-ভাবনা, বিদেশি সাহিত্য বা ন্যুট হ্যামশুন প্রভাবিত করতে পারেনি, ঠিক সেভাবেই বলা যায় তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন এবং সামাজিক আন্দোলন তাঁর লেখনিকে রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। শৈলজানন্দ যখন লেখা শুরু করেন কয়লাখনি অঞ্চলকে বিষয় করে, তখন ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলে কয়লাখনির শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট-সংগ্রাম চলছিল (১৯২১)। সেই ধর্মঘট সফল হয়েছিল। ৫০ ভাগ মজুরি বৃদ্ধি হয়েছিল। ১৯৩০ সালে রানিগঞ্জ অঞ্চলেও কয়লাখনির শ্রমিকদের মজুরি-বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। তখন পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি ছিল মাসিক ১২ থেকে ১৬ টাকা এবং নারী শ্রমিকদের মজুরি ছিল ৮-১২ টাকা। সেই সময়ে লেখা শৈলজানন্দের গল্পে রানিগঞ্জ ও ঝরিয়ার কথা বারবার এসেছে। অথচ আন্দোলনের কথা গল্প প্রসঙ্গেও আসেনি। শৈলজানন্দকে বলা যায় শ্রেণিবিভক্ত মানবসমাজে শোষিত-নির্যাতিত-দারিদ্র ক্লিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল মানবদরদী গল্পকার। শৈলজানন্দ মুসলমান সমাজ নিয়েও কিছু মূল্যবান ও মূল্যবোধের গল্প লিখেছেন বিশের দশকে যেমন জোহরা, লুৎফার রহমান, পলায়ন, ডাকাত ইত্যাদি।

২

'আজ তাহাদের মতো ছোটোজাতের দুঃখ-বেদনায় কার কি আসে যায়।' শৈলজানন্দের প্রথম গল্প 'কয়লাকুঠি' থেকে গৃহীত উপরের অংশটি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায়, একুশ বছরের গল্পকার সদ্য তরুণ শৈলজানন্দ আগামী দিনে কাদের কথা লিখবেন এবং কেমন করে লিখবেন। গল্প লেখার সূচনাতেই সেই প্রতিভার পরিচয়পত্রটি উন্মোচিত করেছেন। এর আগে তিনি কবিতা লিখতেন। যদিও বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'কয়লাকুঠি' উন্নত মানের এক অসাধারণ গল্প নয়, তবু এই গল্পে গদ্যশিল্পী ও গল্পশিল্পী শৈলজানন্দকে

আবিষ্কার করতে বেগ পেতে হয় না। তিনি এই গল্পটি লেখেন সাধুভাষায় ১৯২২ সালে (জ. ১৯০১) এবং কার্তিক সংখ্যায় 'মাসিক বসুমতী'-তে গল্পটি মুদ্রিত হয়। গল্পটি সাড়া তুলতে পেরেছিল ভাষা-বর্ণনা-চিত্রকল্প-আঞ্চলিক শব্দ ইত্যাদির জন্যে। একটা বিশেষ অঞ্চলকে (রানিগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল) তিনি নিখুঁতভাবে তুলে আনতে পেরেছিলেন কলমের ক্যামেরায়। তিনি কলমকে প্যান করতে জানেন। 'কয়লাকুঠি' অবশ্যই একটি বড় গল্প। চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রের যৌথ নিয়মানুসারে লেখা এগোয়নি বলে নিখুঁত ছোটোগল্প বলা যাবে না। তবে ঘটনার একটি একমুখী গতি আছে, সেই গতির শাখা-প্রশাখা নেই। গল্পের পুরুষ চরিত্র দুটি, নানকু ও রমনা। ওরা দুজনে সাঁওতাল। নারী চরিত্রও দুটি বিলাসী ও মাইনু পিয়ারি। বিলাসী বাউরি। মাইনুরের কোনও পরিচিতি নেই। কিছুক্ষণের জন্য আরেকটা চরিত্র এসেছে। সে বিষণ, এক কিশোর। এই গল্পে বিষমের কোনও গুরুত্ব নেই। ছেঁটে ফেলা যেত।

বিলাসী ঝরিয়া কয়লাখনি ছেড়ে প্রেমিক নানকুর সঙ্গে চলে আসে, রানিগঞ্জের কাছে জোড়াজানকী কয়লাকুঠিতে কাজ করতে। তারপর সেখানে বিলাসী-নানকু-মাইনু-রমনা এই চারজনকে নিয়ে একটা প্রেমের ছক তৈরি করেছেন তরুণ গল্পকার শৈলজানন্দ। বিলাসী ভালোবাসে নানকুকে, নানকু ভালোবাসে মাইনু পিয়ারীকে, রমনা ভালোবাসে বিলাসীকে। বিলাসী নানকুকে বিয়ে করেছে। বিয়ের পরেও নানকু পড়ে থাকে মাইনুর কাছে। সুযোগ থাকলেও কিন্তু এর সুযোগ নিতে পারে না বিলাসী। কারণ বিলাসী রমনাকে ভালোবাসতে পারেনি। কিন্তু যখন সে শোনে মাইনুকে নিয়ে নানকু পালিয়ে গেছে, তখন বিলাসী বিয়ে না করেই রমনার ঘরে চলে গেছে, বলে রমনাকে, 'হাঁ থাকব বোটে, কিন্তু ঝুড়ি মাথায় নিয়ে আমি কাজ করতে লারব। খেতে দিতে হবেক।'

একদিন বিষণ এসে বিলাসীকে খবর দেয় খাদের ভিতর নানকুকে খুন করা হয়েছে এবং মাইনুকে মৃত অবস্থায় খাদের উপর পাওয়া গেছে। কীভাবে খুন হল, কেন খুন হল এর কোনও গল্প লেখেননি গল্পকার। নানকুর খুনের কথা শুনে বিলাসী রাতের বেলায় খাদে নামে। ইঞ্জিন চালক রমনা তাকে খাদে নামতে সাহায্য করে। খাদে নেমে বিলাসী নানকুর মৃতদেহ দেখতে পায়। শারীরিক পরিচিতিতে বিলাসী গভীর অন্ধকারেও বুঝতে পারে নানকুর শরীরটাকে। তারপর বিলাসী আর বাঁচতে চায় না। তবুও একবার বাঁচার কথা ভেবেছিল সে, 'বিলাসী একবার ভাবিল, নানকুকে লইয়া উঠিয়া যাইবে নাকি। আবার ভাবিল,—না সে উঠিবে না। মরিবে, সেও মরিবে।' এরপর বিলাসী নানকুকে কাঁধে নিয়ে কীভাবে মরল তার একটা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা উল্লেখ করে 'কয়লাকুঠি' গল্প লেখা শেষ করলেন তরুণ গল্পকার : 'উপরের ঝোলা কয়লার মস্ত চাংড়া ধড়াস করিয়া ছাড়িয়া তাহাদের মাথার উপর সশব্দে নামিয়া পড়িয়া একসঙ্গে দুইজনকে সেই বিরাট কয়লাস্তূপের নীচে সমাধিস্থ করিয়া দিল।' তারপর মাত্র দুইটি বাক্য আছে। শেষ বাক্যটি ছোটোগল্পের ধারানুসারে ব্যঞ্জনাময় : 'বিলাসী ঘণ্টা বাজালেই ইঞ্জিন চালাইয়া তাকে তুলিয়া লইবে রমনা।' মৃত্যুর ঘণ্টা নয়, জীবনের ঘণ্টা, পথ চলার ঘণ্টা।

এই 'কয়লাকুঠি' গল্পটিকে অনেক সমালোচক কয়লাখনির শ্রমজীবীদের সংগ্রামেব গল্প বলে উল্লেখ করেছেন এবং এমিল জোলার 'জার্মিনালের' সঙ্গে তুলনাও করেছেন।

বোধহয় গল্পটি তাঁদের পড়া ছিল না। গল্পটি কয়লাখনির সাঁওতাল, বাউরি শ্রমিকদের প্রেমকাহিনি। প্রেমের গল্পের ভিতর দিয়ে কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনসংগ্রামের কলম-ছবিও বেরিয়ে আসেনি। তবে সাঁওতালি পরিবেশ গড়ে তুলতে পেরেছেন গল্পকার, সাঁওতালি সমাজের গান-মাদল নাচ এবং আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারে। এই গল্পের একমাত্র উৎকর্ষ বিষয়বস্তুতে নয়, এই গল্পের উৎকর্ষ ভাষাশৈলি, চিত্রকল্প এবং আঞ্চলিক পরিবেশ ও শব্দ ইত্যাদিতে। 'কয়লাকুঠি' থেকে কিছু সাঁওতালি শব্দ এখানে উদ্ধৃত করা হল : খালভরা (গালাগাল), খাদ ভসকা (খাদের মুখ), মদের রসি, খুব মস্তে (আরাম করে), টব-গাড়ি (কয়লা রাখার গাড়ি), র‍্যাংটেং (আসবাবপত্র), চুটি (চুরুট), রোনাই (ভাটিখানা), বাঁশের ধুচলি ও ঘুগি (আসবাবপত্র), কৎকে (কত দামে), ছিদাম (এক পয়সা), আড়-বাঁশী, ছাত-পরব (উৎসব), লাগফেনি ও বোয়ান (ঝোপঝাড়), চানক (গহ্বর), কাঁথি (কয়লাকাটার থাক), চাংড়া (বড় টুকরো)। এইসব শব্দাবলি আঞ্চলিক পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

১৯৩৭ সালে সাধুভাষায় লেখা গল্পটির নাম 'প্রতিনিধি'। সহজ সরল একটি গল্প। বন্ধ্যা রমণীর মাতৃত্বের সমস্যা। বর্ধমান শহরের কাঠের ব্যবসায়ী হারাধন। তাঁর অর্থ ও বিষয়সম্পত্তির অভাব নেই। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং বিষয়সম্পত্তিও করেছেন। পায়নি সন্তান। 'বিষয়সম্পত্তি ধনদৌলতের কথা উঠিলেই তাহাদের মনে হয়, সবই বৃথা। এত কষ্ট করিয়া আজীবন সঞ্চিত যে অর্থ-সম্পদ তাহারা রাখিয়া যাইবে—পাঁচভূতে হয়তো তাহা একদিন লুটিয়া লইবে। ভগবান কেন যে এমন করিলেন কে জানে।'

হারাধনের একটি খালি বাড়ি ভাড়া নেয় রণজিত, তার অসুস্থ স্ত্রীর দীর্ঘকালীন কবিরাজি চিকিৎসা করাবার জন্যে। রণজিতের একটি মেয়ে আছে তিন-চার বছরের। বুলা নাম। বুলাকে দেখাশোনা করে হারাধনের স্ত্রী কামিনী। কামিনী এই প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ পায়। ভাড়াটে রণজিতের স্ত্রী মালতী চূড়ান্ত অসুস্থতার সময় বলে যায় কামিনীকে, 'একে (বুলা) দিয়ে গেলাম দিদি, ও তোমারই মেয়ে।' কিন্তু মালতী মারা গেলে বুলা আর ওদের মেয়ে থাকে না। বুলার বাবা বিপর্যস্ত রণজিতের পিতৃত্ব বুলাকে নিয়ে চলে যায়। এখানে পারিবারিক মূল্যবোধের কথা বলেছেন শৈলজানন্দ। স্ত্রীর প্রতি সফল ব্যবসায়ী হারাধনের ভালোবাসা ও পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের কষ্টদংশিত অভাব দক্ষতার সঙ্গে ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অর্থ ও বিষয়সম্পত্তির চেয়ে একটি সুস্থ পরিবারের মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব অনেক মূল্যবান, তাদের স্থান অনেক উঁচুতে। ধনদৌলতের বন্ধনে নয়, স্নেহের বন্ধনেই মানুষ বেঁচে থাকে। এখানে ভাবা যেতে পারে, শৈলজানন্দও ছিলেন নিঃসন্তান।

'মর্যাদা' গল্পের একটি অংশ : 'মোহিনীর মনের ভেতর আগুন জ্বলে উঠল। প্রতিহিংসার আগুন। মনে হল, এই জানোয়ারটাকে যদি সে হত্যা করতে পারত। কামড়ে ছিঁড়ে, টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত, তাহলে বোধহয় সে শান্তি পেত।' এই হল মোহিনী। এক বিধবা সোমত্ত মায়ের মনের কথা এইভাবে তুলে ধরেছেন শৈলজানন্দ 'মর্যাদা' নামক গল্পে। ১৯৫৫ সালে (১৩৬২) লেখা একটি অসাধারণ গল্প, ভাষায়-শিল্পরীতিতে-বিষয়বস্তুতে। সোমত্ত বিধবা যুবতী মোহিনীকে ব্যবহার করে এই গল্পে

গল্পকার শৈলজানন্দ যৌনরসে সিক্ত এক রসাল গল্প লিখতে পারতেন। কিন্তু স্বতন্ত্র শৈলজানন্দ কল্লোল কালের লেখক হয়েও নিজের মহিমাকে এবং গল্পের মহিমাকে জীবনসংগ্রামের ও মূল্যবোধের পদমর্যাদায় উন্নীত করেছেন। বিধবা মোহিনী চরিত্রটিকে পারিবারিক-সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সংগ্রামী করে তুলেছেন।

বিয়ের দু-বছর পরেই বিধবা হয়েছে মোহিনী। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল ষাট বছরের বৃদ্ধ রোগজীর্ণ শয্যাশায়ী স্বামীর সেবা করতে দু-বছরের জন্য। তারপরেই স্বামী মারা যায়। মোহিনী ফিরে আসে কলকাতায় শ্রমজীবী দাদার সংসারে। ওর দাদা পাঁচু সামন্ত মোটর কারখানায় কাজ করে। পাঁচু সামন্তের অভাব-অনটনের সংসার। ফলে শুরু হয় মোহিনীর জীবনসংগ্রাম। এই জীবনসংগ্রামে মোহিনীকে হাতছানি দেয় যৌনতা, নষ্টতা, অভাব, লাঞ্ছনা ইত্যাদি। বিধবা হয়ে দাদার কাছে ফিরে আসতেই দাদার স্ত্রী প্রথমেই বলে, 'শ্বশুরবাড়ির থেকে চলে এলে ঠাকুরঝি, এটা খুব ভাল কাজ হল না।' এখান থেকেই শুরু হল দাদার বাড়িতে লাঞ্ছনার সূত্রপাত। এরকম আরও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মোহিনী পাড়ার এ-বাড়ি, সে-বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে পাড়ারই একটা বাড়িতে তার চাকরি জুটে গেল। সেই বাড়িতেই থাকবে খাবে, মাসে দশ টাকা মাইনে পাবে। সেখানে এক বুড়ো আর দাসু নামে এক চাকর মোহিনীর যৌবন লুটে নিতে চায়। দাসু বলে মোহিনীকে, 'রাগ করছ কেন? চল না গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।' দাসুর আরও কথা, 'ছেঁড়া কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কাপড় কিনে দেব। দু-চারটে টাকা দরকার হলে—।' মোহিনী রুখে তাকাল তার দিকে। শৈলজানন্দ এক অসহায় বিধবা নারী সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, 'তাকে (মোহিনীকে) শুধু প্রয়োজন, তার এই যৌবনোদ্ভিন্ন দেহটাকে—কামাতুর লম্পট দাসুদের ক্ষুধার আগুনে আহুতি দেবার জন্যে।' এভাবেই মোহিনী এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করে। পারে না। পরাজয়ের কাছে মাথা নত করে আত্মহত্যা করতে যায়। তারপরেই সে জীবনকে খুঁজে পায়। আত্মহত্যা করা হয় না। মানবিক সুস্থ লোক এই সমাজে আছে। তারাই মোহিনীকে উদ্ধার করে হতাশাময় জীবন থেকে। শৈলজানন্দের গল্পে লক্ষ্য করা যায় অমানবিক চরিত্রের সঙ্গে মানবিক চরিত্রের দ্বন্দ্ব।

'পূজারী' গল্পে পঞ্চাশ দশকের জীবনসংগ্রামের প্রতারণামূলক ছবিটা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তুলে এনেছেন শৈলজানন্দ : 'পূজারী এক উড়িয়া বামুন। কলকাতা কর্পোরেশনের জলের কুলি। ভোররাত্রে হোস পাইপ দিয়ে রাস্তায় জল দেয়, দুপুরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাশে একটা গাছের তলায় ভাগ্য গণনার ছক নিয়ে বসে।' এই উড়িয়া আবার বাজার থেকে একটা পাথরের শিল কিনে এনে লাল রঙের কাপড় জড়িয়ে খুব খানিকটা তেল-সিঁদুর মাখিয়ে বসিয়ে রেখেছে কালীঘাটের মন্দিরের আশেপাশে। সেখানে উড়িয়া বামুনটি প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় যায়। ফলে শনিবার দিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাকে দেখা যায় না। 'ফুলের মালায় আর বেলপাতায় শনিঠাকুরের সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে সে এক বিচিত্র সজ্জায় ঠাকুরকেও সাজায়, নিজেও সাজে। কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা নেয়, ঘষা চন্দন দিয়ে নিজের বুকে হাতে মুখে তিলক কাটে, লাল রঙের পাটের ধুতির পরে সিল্কের উড়নি গায়ে

দেয়।' এভাবেই মানুষ বেঁচে আছে কলকাতায়, এখনও। এরকম নিখুঁত বর্ণনা আমরা খুঁজে পাই শৈলজানন্দের তির্যক কলমে।

'নারীর মন' গল্পে শেষ অংশে উল্লেখ আছে যে অস্থির চঞ্চল টুরনীকে খুঁজে ফিরছে আড়কাঠি। ভুলি এসে দাঁড়ায়। টুরনীর বদলে সেই যাবে আসামযাত্রী কুলি দলের সঙ্গে। কিন্তু সে কী করে হয়! টুরনী যে আগাম নিয়েছে ২৫ টাকা আড়কাঠির কাছ থেকে, তার কি হবে? ভুলিকে তো আবার টাকা দিতে হবে।

কুলি-মজুর, আড়কাঠিদের নিয়ে গল্প নয়। গল্প বলার প্রসঙ্গে আড়কাঠি প্রসঙ্গ এসেছে। এক সময় বাংলাদেশ থেকে সাঁওতাল নারী-পুরুষদের কুলি-মজুরের কাজে আসামে পাঠানো হত। এভাবেই শৈলজানন্দের অনেক গল্পে সামাজিক অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'নারীর মন' গল্পটি দুই যুবতি সাঁওতাল বোনকে নিয়ে লেখা হয়েছে। গল্পটি লেখা হয়েছে সাধুভাষায়। কল্লোলে (১৯২৩) প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়। দুই বোন ভুলি ও টুরনী। পৌরুষ এবং উদ্দামতা লক্ষ্য করে ভুলি বিয়ে করেছে পীরু মাঝিকে, কিন্তু ভোলা নামে এক সাঁওতাল যুবক ভুলিকে ভালোবাসতো। ভুলি জানে। ক্রমে পীরু বুঝতে পারে ভুলি বন্ধ্যা, সন্তান হবে না। আবার পিতৃত্ব নিয়ে এসেছেন শৈলজানন্দ। পীরু ভুলির মতো আদিম উদ্দামতা নিয়ে থাকতে চায় না, সে সন্তান কামনা করে। ফলে সে ভুলির বোন টুরনীকে নিয়ে চলাফেরা করে। ভুলি পছন্দ করে না। সে টুরনীকে বাধাহীন মার মারতে থাকে পীরুর সামনে। পীরু ভুলির এই নির্দয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সেও ভুলিকে আঘাত করে। চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে। এসব দেখে এবং বুঝে পীরুকে ভুলির কাছেই রেখে টুরনী চলে যেতে চায় আসামে কুলি-মজুর হয়ে। ফলে সে আড়কাঠির কাছ থেকে ২৫ টাকা আগাম নেয়। ভুলি জানতে পারে। সেও স্থির করে বোনকে (টুরনীকে) পীরুর কাছে রেখে সে আসাম চলে যাবে। অবশেষে ভুলি টুরনীর বদলে আসাম চলে যায়। কিন্তু যাবার কথা ছিল টুরনীর। 'ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ দুইটা এতক্ষণে ছলছল করিয়া আসিল। দূরের পলাশ বনের ভিতর দিয়া টুরনী ছুটিতে ছুটিতে স্টেশনের দিকে আসিতেছিল। ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল।' 'নারীর মন' গল্পটি এখানেই শেষ হলে ভুলির ত্যাগের ব্যঞ্জনা প্রসারিত হতে পারত। এর পরেও একটু এগিয়ে নিয়ে গল্পটি শেষ করেছেন। এই গল্পটিকে মূলত প্রেমেরই গল্প বললে দায়সারা কাজ হবে।

এই গল্পেও গল্পশিল্পী ও গদ্যশিল্পী শৈলজানন্দের পরিচয় পাওয়া যায় যেমন, জ্যোৎস্নালোকিত নিস্তব্ধ ধাওড়া উৎসব, রাতে সাঁওতাল নরনারীর মদির আনন্দ, বাসন্তী পুজোর মেলা, কোথাও কবিগান, কোথাও যাত্রা, পীরু মাঝি এবং টুরনীর তন্ময় হয়ে যাত্রা দেখা ইত্যাদি।

চব্বিশ বছর বয়সে শৈলজানন্দ 'মরণ-বরণ' গল্পটি লেখেন সাধুভাষায়। এ বয়সে অনেকেই অসংযত, রোমান্টিক, ফিকশনাল, ভাববিলাসী, জৈববিলাসী গল্পকার হয়ে থাকেন, কিন্তু শৈলজানন্দ সংযত, নন্-ফিকশনাল এবং সমাজ-সচেতন। অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে লেখার প্রবৃত্তি তরুণ বয়স থেকেই শুরু, বিশের দশক থেকেই। 'মরণ-বরণ'

গল্পটির শুরুতেই শৈলজানন্দ সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। 'সম্মুখে একটা বহু পুরাতন নীলকুঠীর জীর্ণ ভগ্নাবশেষ ধনী ও শ্রমিকের বহু অত্যাচার নির্যাতনের অতীত সাক্ষ্যরূপে এখনও দাঁড়াইয়া আছে।' কয়লা-কুঠির ইংরেজ মালিকদের তিন রকম শোষণ-প্রক্রিয়া আছে—(১) অর্থশোষণ, (২) শ্রমশোষণ, (৩) শারীরিক শোষণ। নারীদের ক্ষেত্রে যৌন শোষণ শারীরিক শোষণের একটি অঙ্গবিশেষ। একটা জনশ্রুতির উপর গল্পটিকে দাঁড় করিয়েছেন শৈলজানন্দ। বহুল-প্রচলিত জনশ্রুতিটি হচ্ছে যে কয়লাকুঠির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা সাঁওতাল রমণীদের ভাস্কর্যতুল্য সুঠাম শরীর ভোগ করত দাপটের সঙ্গে এবং তাদের গর্ভজাত সন্তানের গায়ের রং হত গৌরবর্ণ। এই জনশ্রুতিকে কাহিনির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন এই গল্পে। অর্থ-সম্পদ-জমিজমা মানুষের জীবনে সুখের কারণ হয় না। প্রশ্নটা স্বাভাবিক, কে ভোগ করবে এই অর্থ-সম্পদ-জমিজমা যদি সন্তান না থাকে? পরিবারের সন্তানের সুখের জন্যই জীবন-সংগ্রাম। অন্যান্য গল্পের মতো এই ব্রতের কথাই তিনি শুনিয়েছেন 'মরণ-বরণ' গল্পে। এই গল্পের সাঁওতাল ভাটুল মাঝি খাদের নিচে ব্লাস্টিং-এর কাজ করতে করতে ছয় সন্তানের পিতা হয়। তারপর ছেলেরা বড় হলে খাদে নামে, জোড়াজানকীর কয়লাকুঠির খাদে। অর্থ আসে। পাঁচ বিঘা জমি কেনে ভাটুল মাঝি। সুখের সংসারে প্রবেশ করে দুঃখ। প্রথমে ভাটুলের স্ত্রী মারা গেল। তারপর একদিন ছয় সন্তানকে খাদ টেনে নেয়। 'পাতালপুরীর অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে তাহার ছয়টি ছেলেই একসঙ্গে সমাধিস্থ হইয়া রহিল।' গল্পশিল্পী শৈলজানন্দ এটাকে দৈবদুর্ঘটনা বলেছেন। সত্যটা তা নয়, সত্যটা হচ্ছে মালিকের উদাসীনতা, অবহেলা এবং গাফিলতি। এই কারণে এই দুর্ঘটনা, এটাই কয়লাখনির শ্রমিকের বাস্তব ঘটনা। তারপর বৃদ্ধ ভাটুল মাঝি আবার বিয়ে করে রুকি নামে সাঁওতাল যুবতীকে। 'তাই রূপ-যৌবন-সম্পন্না রুকিকে ভাটুলের হাতে সমর্পণ করিয়া তাহার (রুকির) প্রতিপালক ভ্রাতা নিশ্চিন্ত হইল। এদিকে আকণ্ঠ শরীরী পিপাসা লইয়া রুকি এই মরুবক্ষে হাহাকার করিয়া ফিরিতে লাগিল।' রুকির এই দেহ পিপাসার সুযোগ নিল কোল-কোম্পানির এক উচ্চপদে আসীন ইংরেজ কর্মচারী। সাঁওতালরা তাদের সাহেব বলে। রুকির আশা এই সাহেবই, যে রুকির যৌবন লুটে নিয়ে রুকির গর্ভে সন্তান এনে দিয়েছে, তাকে শেষ আশ্রয় দেবে। কিন্তু সাহেব আশ্রয় দেয়নি। সন্তানসহ রুকির এইরকম অসহায় সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সমাজ-সচেতন গল্পকার মন্তব্য করেন, 'এ দেশের নারীর মূল্য, না মাটির গুণ জানি না, অন্নের সংস্থান থাকিলে শ্মশান-যাত্রীর হাতেও কন্যা-সম্প্রদান করিতে কেহ কুণ্ঠিত হয় না।' শৈলজানন্দ সমাজটাকে কাটাছেঁড়া করে দেখিয়েছেন এবং অসাধারণ মন্তব্যটি করেছেন। একেই বলে একজন নিষ্ঠাবান গল্পকারের সমাজ-বাস্তবতাবোধ।

সমাজের মানুষ বাঁচতে চায়, পরিবার-সন্তান নিয়ে সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে চায় অভাব-অনটনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। শৈলজানন্দ এভাবেই গল্পের কলমকে শাণিত করেছেন। ভাটুল যখন রুকিকে এবং নিজেকে মারবার জন্যে নির্জন খাদের মুখে রুকিকে নিয়ে যায় তখন রুকি ভাটুলের ইচ্ছা বুঝতে পেরে বলে, 'তুই আমাকে মারবি নাকি?' দাঁতে দাঁত চাপিয়া বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে ভাটুল আর্তনাদ করিয়া উঠিল, 'হুঁ—খুন করব।

নিজেও মরব।' প্রাণপণে বৃদ্ধ ভাটুলের কঠোর বাহুপাশ হতে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে রুকি বলে, 'তুর পায়ে পড়ি ভাটুল,—আমার ফাগু। ফাগু।'

ভাটুল জানে ফাগু ওর সন্তান নয়, সাহেবের সন্তান। কিন্তু রুকি তো ওর মা। পুত্রের বেদনা ভাটুল বেশ ভালরকম জানে। 'সন্তান-বিচ্ছেদ ব্যথিতা জননীর আর্তনাদ শুনিয়াই নিমেষে ভাটুল যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। নিজের দুই বাহুর আবেষ্টন শিথিল করিয়া দিয়া বলিল,—যা।' মুক্ত হয়ে রুকি শুনল 'পাতালভেদী এক বিরাট শব্দ' নিজের হাতে তৈরি ব্লাস্টিং-এ ভাটুল আত্মহত্যা করল। এই হচ্ছেন শৈলজানন্দ যিনি শোষিত মানুষের পক্ষে কলম ধরেন। তাদের মধ্যে মানবিক-যন্ত্রণা, সন্তান-যন্ত্রণা আবিষ্কার করেন। সেখানে জৈবিক প্রবৃত্তি ও যৌনলালসা চাপা পড়ে যায়। মাতৃত্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, বৈধ-অবৈধ বিচার করতেন না। শৈলজানন্দের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়।

'সাঁওতাল-পল্লী' গল্পটি পড়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবতে হয়, কবে যেন একটা নাটক পড়েছি বা একটা গল্প পড়েছি যেখানে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে মা তার পুত্রকে নিজের হাতে হত্যা করেছে। গোর্কি হতে পারেন। 'ইতালির রূপকথায়' থাকতে পারে। এই গল্পেও শৈলজানন্দ দেখিয়েছেন, মা তার একমাত্র পুত্রকে পরিবারের প্রতি, সাঁওতাল সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে বিষ-তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে। বিষয়বস্তু এ রকম : সাঁওতাল কন্যা কিন্নির সঙ্গে বিয়ে হবে কিন্নির মায়ের সইয়ের একমাত্র পুত্র সুখনের সাথে। সুখনের মা আর কিন্নির মা—বাল্যকালের বান্ধবী তারা। তাই তাদের অনেক দিনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে চলেছে এক সন্ধ্যায়। সেই বিয়ের রাতে কিন্নির মায়ের একমাত্র ডাকাত ছেলে মুংরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বলে মাকে, ভুতু মাঝির ছেলে গারাং-এর সঙ্গে কিন্নির বিয়ের প্রতিশ্রুতি বাবা দিয়েছেন। কিন্নির মা সেটা জানত। অভাবের তাড়নায় কিন্নির বাবা আড়কাঠির খপ্পরে পড়ে আসামের চা বাগানে মজুরি খাটতে গিয়েছিল। সর্বনাশা অসুখ নিয়ে সে ফিরে এসেছিল। তখন ভুতু মাঝি তাদের সাহায্য করেছিল। ইচ্ছা, ছেলে গারাং-এর সঙ্গে কিন্নির বিয়ে দেবে। আর এই ভুতু মাঝির ছেলে গারাংও ডাকাত। মুংরা এবং গারাং মিলে ডাকাত দল খুলেছে। সেজন্য কিন্নির মা গারাং-এর সঙ্গে কিন্নির বিয়ে দিতে চায় না। ফলে কিন্নির ডাকাত দাদা এসে এই বিয়েতে বাধা দিয়ে বলে যে গারাং-এর সঙ্গে কিন্নির বিয়ে দিতে হবে। কিন্নির মা এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারে না। 'আমার এমন সুন্দর মেয়ে কিন্নির বিয়ে দেব ওই কয়েদ-খাটা ডাকাতের ঘরে?' তবু বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েকে নিয়ে কিন্নির মা সুখনের মায়ের কাছে থাকে।

তারপর একদিন রাতের অন্ধকারে মুংরা এবং গারাং ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কিন্নিকে তুলে নিয়ে পালাতে যাবে, সে-সময় কিন্নির মা প্রথমে গারাংকে, পরে নিজের সন্তান মুংরাকে বিষ-তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। গল্পের নামকরণ 'সাঁওতাল-পল্লী' না হয়ে বিষয়-কেন্দ্রিক নামকরণ করা হলে, গল্পের মূল ভাবনাটা ইঙ্গিতধর্মী হতে পারত। নামকরণটি মূল ভাবনার পথ ধরে এগোয়নি।

এই গল্পটি পড়তে পড়তে একটি সামাজিক সত্যকে শৈলজানন্দ উল্লেক করেছেন গল্পের অনুষঙ্গ হিসেবে, যেখানে কিন্নির মা বলছে, 'দুঃখের দিনে একটা সাহায্য করে না যে ছেলে, সে-আজ চরম শত্রুতা করে দিয়ে গেল। মানুষের এর চেয়ে সর্বনাশ আর কী হতে পারে।' এ ছাড়া শৈলজানন্দ বিয়ের সময় সাঁওতাল-পল্লীর পরিবেশ বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরেছেন ভাষার ক্যামেরায়। সাঁওতালদের বিয়ের গান সংগ্রহ করেছেন : মেৎ এপোস হ্ আরসি মেনাঃ/ অলাং এপেল্ হ্ বানু আ/ (আমাদের মুখ দেখাবার আরশি আছে—কালো পাথরের ওপর নিস্তরঙ্গ ঝরনার জল; কিন্তু সখি, তোমার এই মুখখানি দেখবার আশা আর নেই।) একটা নয়, এ রকম আরও কয়েকটি সাঁওতালি বিয়ের গান আছে।

১৯২৪ (১৩৩১) কার্তিক সংখ্যায় প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল একটি অসাধারণ ছোটোগল্প 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা'। ২৩ বছরের এক যুবক এই অবিকল্প গল্পটি লিখেছিলেন সাধুভাষায় যার জন্মশতবর্ষ পার হয়েছে, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯০১), যিনি অসাধারণ বিষয়বস্তু নির্বাচনে, চরিত্রবিশ্লেষণে, সমাজের প্রতি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ -বিদ্রূপে, চিত্রকল্প নির্মাণে, নিখুঁত ভাষা ব্যবহারে এবং সর্বোপরি সমাজ-বাস্তবতার অন্বীক্ষণে। এই গল্পটির শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে আছে জাতিভেদ, জাতিমিলন, ধর্মভেদ, ধর্মের প্রতি ব্যঙ্গ, দারিদ্র-ক্ষুধা-অভাব-অনটন, প্রতারণা, ভণ্ডামি, মানসিক যন্ত্রণা, বস্তিবাসীদের পক্ষে-বিপক্ষে মেসের চাকুরিজীবী ও শিক্ষিত বাসিন্দাদের বুদ্ধির প্যাঁচ। এই গল্পের প্রধান চরিত্রটির চিন্তাভাবনা এবং আচার-আচরণ প্রগতিশীল, মানবিক এবং সহানুভূতিশীল। প্রধান চরিত্রটির নাম অজিতনাথ লাহিড়ী। সে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসেছে চাকরির সন্ধানে। সে কালীঘাটের কাছে একটি মেসে উঠেছে যে মেসে থাকে রমেশদা, অজিতদের গ্রামের প্রতিবেশী। মেসজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই শৈলজানন্দ লিখেছিলেন এই গল্পটি। তিনি থাকতেন চক্রবেড়ে রোডের উপর এক জরাজীর্ণ মেসবাড়িতে। অজিতও সেরকম একটি মেসে উঠেছে কালীঘাটে রমেশদার সুপারিশে। সে চাকরি পাবার আগে কলকাতার রাস্তা, গলি ঘুরেছে দুপুরে বিকেলে। দেখেছে বস্তিবাসীদের অভাব-দারিদ্র-ক্ষুধা-লাঞ্ছনা। দেখেছে মেসের মালিক-ম্যানেজারের জাতিভেদ-ধর্মভেদ-বর্ণভেদের উগ্রতা। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অজিতকে মেস ছাড়তে হয়। রমেশদা তার পাশে এসে দাঁড়ায় না। নির্বিবাদে মেনে নেয় নিঃসঙ্গ অজিত মালিকের অন্যায় প্রস্তাব। এখানেই অজিতের সঙ্গে পরিচয় হয় বস্তিবাসী দারিদ্রক্লিষ্ট অতসীর এবং অতসীর মায়ের সঙ্গে। অতসী বালিকা মাত্র এবং ওর মায়ের বয়স কুড়ি-বাইশ, গৌরবর্ণা, শীর্ণা যুবতী। গল্পশিল্পী শৈলজানন্দ লিখছেন, 'দারিদ্র এবং রোগ যৌবনের ভাণ্ডারে ডাকাতি করিয়া তাহাকে পথে বসাইয়া দিয়াছে।' মণীশ ঘটকের পটলডাঙার পাঁচালির মতো বা অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত গল্পের মতো দারিদ্রকে উপলক্ষ্য করে শৈলজানন্দ যৌনতার দাসত্ব করেননি। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র ২৩ বছর বয়স থেকেই।

এই অতসীর মাকে অজিত দেখেছে, মুখে একটা শরের কাঠি লাগিয়ে, বোবা সেজে হাতে একটা মাটির পাত্র নিয়ে ভিক্ষে করতে। 'অভাবের তাড়নায় মিথ্যার মুখোশ পরিয়া

দ্বারে দ্বারে সে প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়ায়—'। ক্ষুধার রাজ্যে বেঁচে থাকার জন্যে এই প্রবঞ্চনাই সত্য। এই প্রবঞ্চনার পেছনে মুনাফা নেই, আছে বাঁচতে চাওয়া। এটা বুঝতে পারে অজিত এবং আশাতিরিক্ত দান করে অতসীর মাকে। এর মধ্যে অজিত ছোটোখাটো চাকরি পেয়ে গেছে এবং প্রাইভেটে ছাত্র পড়ায়। এ গল্প এখানেই শেষ। দারিদ্র এবং ক্ষুধা মানুষকে কীভাবে ক্ষয় ও ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, গল্পকার তাঁর অনুভবতার স্বাক্ষর রেখেছেন এই অসাধারণ গল্পটিতে। নির্দিষ্ট কোনও প্লট নেই। ধারাবাহিকতায় এবং দৃশ্য-দৃশ্যান্তরে গড়ে উঠেছে এই গল্পের শরীর। এখানে দুটি চরিত্র—(১) বস্তিবাসী এবং দারিদ্র, (২) মেসের চাকুরিজীবীরা এবং তাদের সুবিধাবাদী অবস্থান। এই গল্প পড়ার পর আমরা গর্ব করে বলতে পারি না যে গপ্লো ছাড়া গল্প ষাট-সত্তর থেকে শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শৈলজানন্দ স্মরণীয়।

'গরীব' নামে যে ছোটোগল্পটি লিখেছেন শৈলজানন্দ সেটি একটি দারিদ্র্যের ছবি হয়েছে ঠিকই, তবে ছোটোগল্পের সূত্র লঙ্ঘিত হয়নি। গল্পকারের গাল্পিক ভাষার নিপুণতা লক্ষ্যণীয় : 'মা এবং মেয়ে দু'জনেই বিধবা, কাজেই একবেলা আহার বিধাতা তাহাদের তুলিয়া দিয়াছেন, শাপে বর হইয়াছে। কিন্তু প্রসন্নময়ীর কন্যা আন্নাকালীর সাত-আট বছরের একটা মেয়ে আছে—নাম ডাবি। এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। সুতরাং বিধবা হইবার দেরি আছে।' দেশের দারিদ্র্য বোঝাতে এই বুদ্ধি-শাণিত ছবিটাই যথেষ্ট। কিন্তু অপমানিত হয়ে প্রসন্নময়ীকে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছিল। প্রসন্ন বাড়ির ভিতরে গিয়া দেখিল মেয়েদের ঘরে ভয়ানক একটা গোলমাল চলিতেছে।'... বিমলের মেজ মেয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গা...। মেজদির মাথার একটা সোনার কাঁটা হারিয়েছে—দেখেছ?' এখানে কিন্তু বিমলের মেয়ে প্রসন্নময়ীকে পিসি বলে একবারও সম্বোধন করেনি। তারপর প্রসন্নময়ীকে চোর ভেবে কাপড়-ঝাড়া করানো হয়েছে। 'অবশেষে সত্য-সত্যই প্রসন্নকে ঝাড়িয়া দেখাইতে হইল।' গরিবেরা সর্বত্রই এভাবে অপমানিত হয়ে আসছে। গরিব নামকরণের সার্থকতা এখানেই। এই অপমানের জ্বালার তাপ শৈলজানন্দের মানবিক মনে ধাক্কা মেরেছে। তুচ্ছ হলেও মানবিকতার কারণে বিষয়টাকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। এরকম ঘটনা নিয়ে পরবর্তী সময়ে সংখ্যাহীন গল্প লেখা হয়েছে। এটা গল্প নয়, যথার্থ ছোটোগল্প, তবে নামকরণটি নয়।

ছোটোগল্পের সূচনা যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' (১৮৯২) থেকে ধরা যায় তাহলে এই একশো বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে নির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ পঁচিশটি ছোটোগল্পের মধ্যে শৈলজানন্দের 'নারীমেধ' গল্পটি রাখতে হবে। এমন অনন্যসাধারণ একটি গল্প পাঠকের আড়ালে রয়ে গেছে এখনও। শৈলজানন্দ একসময়ে লেখা ছেড়ে চলচ্চিত্র পরিচালক হয়েছিলেন। তিনি নিজের অনেক উপন্যাস (শহর থেকে দূরে, মানে না মানা, ব্লাইন্ড লেন, আমি বড় হব—এরকম ষোলটি উপন্যাস) নিজেই চিত্রনাট্য তৈরি করে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু 'নারীমেধ' ছোটোগল্পটি চলচ্চিত্রে রূপ দিতে পারেননি। লেখা সম্ভব হলেও শৈলজানন্দের পক্ষে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না। তখন অন্য ধারার ছোটোগল্পকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা সহজ এবং সাধ্যের কাজ ছিল না। এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল ঋত্বিক ঘটকের জন্য। সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক'

ছোটোগল্পটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তবে 'নারীমেধ' গল্পটি ঋত্বিকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

১৯২৮ সালে সাধুভাষায় লেখা 'নারীমেধ' গল্পটির বিষয়-আঙ্গিক-ভাষা, শৈল্পিক উপস্থাপনা, সমাজ-মনস্কতা পাঠকের চিন্তাভাবনাকে এবং অনুভূতিকে তছনছ করে দেয়, তটস্থ করে দেয়। 'নারীমেধ' নামকরণের মধ্যেই নারী এবং নারীত্বের পূজারি ভণ্ড নারীলোলুপ পুরুষদের প্রতি দুর্বার ব্যঙ্গের প্রত্যয়সিদ্ধ ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়।

গুরুদেব মারা গেলে গুরুমা তার সাত-আট বছরের সন্তান ও অসহায় এক কুড়ি বছরের শূদ্র সুন্দরী যুবতী ছবিকে নিয়ে এলেন রানিগঞ্জের বাকুলিয়া গ্রামে শিষ্য পরাশরের বাড়িতে। পরাশরের স্ত্রী নয়নতারাও গুরুমার শিষ্যা। নয়নতারার অনুরোধে গুরুমা শূদ্র এক চাষার কন্যা ছবিকে রেখে যায়। নয়নতারার কাছে থাকে নয়নতারার ভাই পঞ্চু। পঞ্চু বিয়ে করেছে। স্ত্রীর নাম মায়া। সেই পরিবারে ছবি ঝিয়ের কাজ করে। এই ছবিকে একদিন ধর্ষণ করে পঞ্চু। ধর্ষণের কোনও জৈবিক পরিবেশ তৈরি করে পাঠকের লালসা প্রবৃত্তিকে উসকে দেননি গল্পকার। ধর্ষণের পরিবেশ রচনারও যে একটা শৈল্পিক ভাষা ও ভাবনা থাকতে পারে তার পথ-প্রদর্শক শৈলজানন্দ হতে পারেন। তিনি ধর্ষণ নিয়ে আদৌ গল্প লেখেননি। ধর্ষণের পরিণতি কতটা নিষ্ঠুর-নির্দয় হতে পারে, তার শৈল্পিক বর্ণনায় সাতাশ বছরের শৈলজানন্দ যে নিষ্ঠা এবং দক্ষতা দেখিয়েছেন তা আমাদের বিস্মিত করে, কিছুক্ষণের জন্য বাক্‌রুদ্ধ করে দেয়। ধর্ষণের দিন রাতের কথা লিখছেন : 'সহসা তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিন্তু নিরুপায়/ নিস্তব্ধ রাত্রি/ চারিদিক অন্ধকার/ ঘরের ভিতর হইতে রোগীর আর্তকণ্ঠ শোনা যায়.../ চেঁচাইবার উপায় নাই। মুখে কাপড় চাপা।/ এ কি নৃশংস অত্যাচার।/ নিঃসহায় নারী আর ক্ষুধার্ত জানোয়ার!/ ছবির সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল।/ সমস্ত অঙ্গ তাঁহার ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতেছিল—'

এখানে একমাত্র সাউন্ড 'রোগীর আর্তকণ্ঠ'। এই রোগীটি হচ্ছে যে ধর্ষণ করছে তার স্ত্রী, পঞ্চুর স্ত্রী মায়া। কবিতার মতো লাইন ভেঙে সাজিয়েছেন শৈলজানন্দ। ছ'মাস যায়। ছবি বুঝতে পারে সে গর্ভবতী। পঞ্চুকে জানায়। ছবি কিছু দিনের জন্য ছুটি চায়। পঞ্চু দিদি নয়নতারাকে বলে ছবিকে ছুটি দিতে। নয়নতারা ভাইয়ের মানবিকতা দেখে খুশি হয়ে ছবিকে ছুটি দেয়। পঞ্চুই ছবিকে নিয়ে যায় খেয়াঘাট পর্যন্ত। নয়নতারাকে পঞ্চু বলে, ছবিকে পার করে দিয়ে সে ফিরে আসবে। পঞ্চু রাত বারোটায় ফিরে আসে। তার পরের দিন বাকুলিয়া গ্রামের ঘোড়া-চড়া মানবিক ডাক্তার দেখে পুরোনো কয়লাখাদের কাছে শ্যাওড়া গাছের তলায় অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় ছবি পড়ে আছে। যন্ত্রণায় ছবি ছটফট করছে। বিড়ালছানার মতো একটি মৃত মানবশিশু শুকিয়ে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। 'সর্বাঙ্গে তাহার পিঁপড়া ধরিয়াছে।' মুমূর্ষ ছবি ওই অবস্থাতেই কোনরকমে বলতে পারল 'পঞ্চুবাবু—এ সর্বনাশ আমার—পঞ্চুবাবু—',পঞ্চু টাকা দিয়ে আদিবাসী ধাইকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে। তখন লাঞ্ছিত অর্ধমৃত ছবি ডাক্তারের পা-দুটি জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে, 'বাঁচান, আমায় বাঁচান বাবু।' ছবির এই কাতর কণ্ঠ পাঠকের মনে এমন ধাক্কা মারে যে তখন ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'র যক্ষ্মায় আক্রান্ত সংগ্রামী যুবতি নীতার কণ্ঠস্বব ভেসে আসে, 'দাদা, আমি বাঁচতে চাই।' একজন পুরুষের দ্বারা ধর্ষিত, অন্যজন দারিদ্র্যের

দ্বারা ধর্ষিত। দুটি ঘটনাই সামন্ততান্ত্রিকতার ও ধনতান্ত্রিকতার ফসল। কিন্তু 'নারীমেধে'র শূদ্রকন্যা ছবিকে এবং শক্তিপদ রাজগুরু লিখিত 'মেঘে ঢাকা তারা'র ব্রাহ্মণকন্যা নীতাকে ডাক্তার এবং দাদা বাঁচাতে পারেনি।

ছবি মারা যায়, ছবিকে মেরে ফেলা হয়। ছবির মৃত্যুর পর তার দেহটি পঞ্চু এবং কোঁড়াদের একটি ছেলে ছবির পা-দুটো ধরে ধসে পড়া খাদের মুখে তুলে ধরেছে। কালো চুলের গোছা সমেত মাথাটা ঝুলে পড়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। কোমরের কাছটা ভেঙে পড়েছে। এভাবে ধরাধরি করে ছবির মৃতদেহটা বারকতক দোলা দিয়ে খাদের মুখে ছুঁড়ে দিল। ডাক্তার দূর থেকে এই ভয়ানক দৃশ্যটি দেখলেন, কারণ তিনি বাঁচাতে এসেছিলেন। সাধুভাষায় এরকম অসামান্য বর্ণনার পর গল্পকার লিখেছেন, 'গভীর খাদের নীচে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে সেটা তলাইয়া গেল কে জানে। পতনের শব্দটি পর্যন্ত কানে আসিল না।' এরপর পঞ্চু ডাক্তারকে এবং গ্রামের প্রতিবেশীদেরকে বোঝাল পরাশরের (নয়নতারার স্বামী) গোপন পাপের ফলে ছবির ওই দশা হয়েছে। একমাত্র পঞ্চুর স্ত্রী মায়া পঞ্চুর গুজবকে বিশ্বাস করতে পারেনি। অপরাধ যে কার মায়া তা জানে। মায়া আতঙ্কগ্রস্ত হয় নিজের পরিণতির কথা ভেবে। ২৭ বছরের গল্পকার 'নারীমেধ' গল্পটি শেষ করলেন : 'পঞ্চু কিন্তু মারিল না, শাস্তিও দিল না। প্রবল বেগে মায়াকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া সোহাগ করিয়া সজোরে একটা চুমা খাইল মাত্র।'

শৈলজানন্দের সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের বঞ্চিত-শোষিত-নির্যাতিত নারী ও পুরুষের প্রতি প্রসারিত। ছবি তারই প্রতিনিধি। জৈবিক প্রবৃত্তি তাড়িত পঞ্চুর মতো এক পাশবিক চরিত্রের পাশে সরল নয়নতারা, বুদ্ধিমতী মায়া, সাংসারিক পরাশর ও মানবদরদী ডাক্তারকে শৈলজানন্দ রেখেছেন বলেই গল্পটি ফ্রয়েডিয়ান লিবিডো তত্ত্বের অন্তরালে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে পেরেছে। 'নারীমেধ' নামকরণের তাৎপর্য—দেবতাদের উদ্দেশে নারীদ্রব্যটিকে খাদের মুখে ছুঁড়ে ফেলা। এভাবেই যজ্ঞের দ্রব্য হয়ে ওঠে নারী, এখনও পর্যন্ত আমাদের সমাজে অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীরা। 'নারীমেধ' গল্পে শৈলজানন্দের সমাজ-বাস্তবতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায় যেমন, (১) 'ভাত-কাপড়ের অভাব তো অনেকেরই থাকে না, রূপের গৌরবও অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু—ওই কি শেষ? জীবনের মূল্য কি আর কোথাও কিছুই নাই? (২) লোভের লাভের সংগ্রাম শেষ হইয়া গেছে, ধরিত্রীর বুকটাকে ফোঁপরা করিয়া দিয়া নিষ্ঠুর ব্যবসায়ীর দল উধাও হইয়াছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়লাখনি প্রসঙ্গে গল্পকারের দ্বিতীয় মন্তব্য। অভাব-অনটন-দারিদ্র এমন এক সামাজিক অবস্থান যেখানে রূপ-সৌন্দর্য ও জীবনের মূল্যও হার মানে। ছবির জীবনের মূল্য প্রসঙ্গে গল্পকারের প্রথম মন্তব্য। শৈলজানন্দের এইসব মূল্যবান মন্তব্যের ভিতরেই গল্পকারের জীবনদর্শন বুঝতে পারা যায়, তিনি ভাববিলাসী বা জীবনবিলাসী নন, শৈলজানন্দ জীবন-সংগ্রামের পক্ষে, জীবনবোধের পক্ষে। 'নারীমেধ' গল্পটি বড় গল্পের শর্ত পালন করেছে। ছোটোগল্পের শর্ত পালন করতে পারেনি। গল্পের মেদ কমানো যেত।

এরকমই আরেকটি গল্পের নাম 'যকের ধন'। যক্ষের ধন থেকে পরিবর্তিত হয়ে যকের ধন হয়েছে। এই গল্পে তিনকড়ি হচ্ছে যক্ষ। সে শুধু অসাধু উপায়ে পয়সা উপার্জন করতে

এবং জমাতে শিখেছে। তিনকড়ির দুটি বোন আছে। ওদের নাম তেনানী ও ত্রিগুণী। অর্থের অপচয় ভেবে তিনকড়ি বোনেদের বিয়ে দেয়নি। ভাইয়ের সংসারে বাঁচার প্রয়োজনে নির্যাতিত ও অপমানিত হয়েও সেখানে ওদের অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়, নারীত্বের অবমাননা সহ্য করে। তিনকড়ির নির্মমতা ও নির্দয়তা পাঠককে বাক্‌রুদ্ধ করে দেয়। এ জন্যেই ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'যকের ধন' বাংলা ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ গল্প।

কাচের মতো ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবন যে ভঙ্গুর এবং ক্ষণস্থায়ী—এই সত্যটা শৈলজানন্দ সযত্নে লালিত করেছেন 'ভঙ্গুর' গল্পে। এই গল্পটি নিখুঁত ছোটোগল্প হলেও শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিচার্য হতে পারে না। প্রভাকর কলকাতায় থাকে। সে ডালহাউসি স্কোয়ারে চাকরি করে। গল্পের শুরুতেই আছে 'প্রভাকর রাস্তা পার হইতেছিল নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে। অন্যমনস্ক হইবার কারণ সেজো ছেলেটাকে আজ সে শাসন করিয়াছে। চড়টা এত জোরে মারিয়াছে যে আর একটু হইলেই ছেলেটা বোধ করি অজ্ঞান হইয়া পড়িত। মারা তাহার উচিত হয় নাই। মাত্র একটা কাচের গেলাস ভাঙার অপরাধে এতো বড় শাস্তি দেওয়া অনুচিত।

ঠুনকো একটা কাচের গেলাস। ক-দিনই বা থাকে। মানুষের জীবনই তো ঠুনকো।

তারপর রাস্তা পার হতে গিয়েই বাস দুর্ঘটনা ঘটে। একটুর জন্যে প্রভাকর বেঁচে যায়। গল্পকারের ভাষায় : 'জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটি মাত্র সেকেন্ডের তফাত। এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হইলেই আজ সে মরিয়াছিল।' মরে গেলে তার সংসারে যে একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে সেটা নিয়ে প্রভাকরের চিন্তাভাবনা। এখানে সংসারের প্রতি স্নেহময় ও সন্তানবৎসল প্রভাকরের দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার। এরপরে অফিস সেরে বাড়ি ফিরছিল প্রভাকর ছেলের পছন্দ সন্দেশ ও পাকা কলা কিনে। একটা কাচের গ্লাসও সে কিনেছে। আবারও রাস্তা পার হতে গিয়ে প্রভাকর বাস দুর্ঘটনায় পড়ে এবং মারা যায়। যথারীতি কাচের গ্লাসটি ভেঙে যায়। গল্পটিতে যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে সন্দেহ নেই। লক্ষ করা যায় নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে হেমিংওয়ের মতো গল্পে রূপান্তরিত করতে তিনি কতটা সফল এবং দক্ষ, ঠিক যতটা বাস্তব ঘটনা নিয়ে গল্প বানাতে গিয়ে নাটকীয়তা তাঁকে কখনও কখনও অসফল করে তোলে।

মৃত্যুর সাত বছর আগে ১৯৬৯ সালে লেখা ছোটোগল্পটির নাম 'পাঁচু মিস্ত্রি'। যত না ছোটোগল্প,তার চেয়ে বেশি ছোটোগল্পের স্কেচ। পাঁচুমিস্ত্রি ট্যাক্সি চালায়, মদ খায়, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে। সে চুমকিকে ভালোবাসে, চুমকি বিধবা। থাকে কলকাতার চক্রবেড়ের ফুলবাসিয়া বস্তিতে। এই পাঁচুর মানব-মনটাকে আবিষ্কার করেছেন এই গল্পের প্রধান চরিত্র এক লেখক, যদিও এই গল্পটা শৈলজানন্দের একদা বস্তিজীবনের এক হীরক অভিজ্ঞতা। প্রধান চরিত্র লেখকটি এই বস্তিতেই থাকেন। মানব-মনের সূত্র ধরেই গল্পের শুরু হয়েছে একটি সার্বজনীন প্রবাদ বাক্য দিয়ে, 'মানুষকে চট করে চেনা বড় শক্ত।' এই মানুষটিই হচ্ছে পাঁচুমিস্ত্রি। লেখক আবিষ্কার করলেন, পাঁচুমিস্ত্রির মনের মধ্যে ভালোবাসা এবং সততাকে। ট্যাক্সিচালক পাঁচুমিস্ত্রিও দার্শনিকের মতো কথা বলে, 'ভালোবাসার যে একটা আলাদা ভাষা আছে, দাদাঠাকুর।' প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের মধ্যে একটা দার্শনিক

ভাবনা আছে, বাইরে থেকে সেটা বুঝতে পারা যায় না, আবিষ্কার করতে হয়। পাঁচুর মধ্যেও আছে। পাঁচুকে যখন বলা হল সে বাঙালি এবং চুমকি হিন্দুস্থানী, ওর বাবার নাম হরমন পাশী। সেখানে ভাষা ভালোবাসার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পাঁচু স্বীকার করে না। সে বলে, 'ভালোবাসার ভাষা চুমকি বোঝে আর আমি বুঝি।' পাঁচুর দার্শনিক মনোভাব আরও জানা যায়, যখন সে বলে, 'চুমকিকে যখন থেকে ভালোবেসেছি তখন থেকে মনে হয় সবাই ভালোবাসুক।'

এই পাঁচু মিস্ত্রি। ট্যাক্সিতে যারা টাকা পয়সা ও জিনিসপত্র ফেলে যেত, পাঁচু নিয়ে নিত। এখন, চুমকিকে ভালোবাসার পর যখন কেউ একজন জড়োয়া আর সোনার গহনা ভরতি বাক্স ট্যাক্সিতে ফেলে যায়, তখন সেটা ফেরত দেবার জন্যে বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় লেখককে ধরে। এখানেও সে দার্শনিকের মতো উত্তর দেয় ' কোনো খারাপ কাজ আমি করতে পারব না দাদাঠাকুর। মনে শান্তি পাব না। সে মন নিয়ে আমি চুমকির কাছে দাঁড়াতে পারব না।' সহজ-সরল-সাদাসিধা গল্প হলেও মানবিক গভীরতায় উজ্জ্বল। তবে ডিটেলসের ব্যবহারে বুঝতে পারা যায় গল্প বলার স্বাতন্ত্র্য থেকে তিনি চ্যুত হননি। সেই ধারাবাহিকতা বুঝতে পারা যায়, গল্পের শেষে একটি চিত্রকল্পের ব্যবহারে : 'মাতাল, দুশ্চরিত্র পাষণ্ড পাঁচুর সেই ধ্যানমগ্ন মুখখানা নিমেষেই যেন অন্যরকম হয়ে গেল। সে মুখের ছবি আমি আজও ভুলতে পারি না।'

পাঁচুর পরিবর্তিত স্বভাবই বলে দেয় একদিন সে চুমকিকে নিয়ে পালাবে, বিয়ে করবে, সংসার করবে। কিন্তু গল্পে লেখক সে-সব প্রসঙ্গ টেনে আনেননি। পাঁচুর 'ধ্যানমগ্ন' মুখখানার কথা বলেই গল্প শেষ করেছেন।

পঞ্চাশ দশকের শেষে বা ষাট দশকের প্রথমেই 'পরাজয়' গল্পটি লেখা হয়েছিল। তখন শৈলজানন্দ চলচ্চিত্র পরিচালনা করছেন না। তাঁর শেষ চলচ্চিত্র পরিচালনা 'আমি বড় হবো' (১৯৫৭)। তিনি আবার গল্প লেখা শুরু করেন। চলিত ভাষায় লেখা 'পরাজয়' গল্পটি ঠিক সেই সময়কার লেখা। সংলাপধর্মী একটি গল্প। চিত্রনাট্যের প্রভাব তখনো পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সম্পূর্ণ সিনেমার ছকে লেখা। ত্রিকোণ প্রেম নিয়ে গল্প, শিশির, সমর (দুই বন্ধু) এবং নীলা। নীলাকে সমর ভালোবাসত কিন্তু সমরের মা এ বিয়েতে রাজি নয়। সমর বিলেতে চলে যায়। তিন বছর পর সমর ফিরে আসে। বন্ধু শিশিরের সঙ্গে দেখা করতে একদিন বালিগঞ্জে যায়। সেখানে দেখে শিশির নীলিমাকেই (নীলা) বিয়ে করেছে যাকে সে ভালোবাসত এবং বিয়েও করতে চেয়েছিল। ভালো সে এখনও বাসে কারণ সে এখনও বিয়ে করেনি। এই ক্লিশে বিষয়বস্তুকে নাটকীয় সংলাপের ভিতর দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছেন শৈলজানন্দ। গল্পের সংলাপে ঢুকে যায় ব্ল্যাকমেলিং নিয়ে কথাবার্তা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে কথাবার্তা, বিলেতেব মেয়ে ও বাংলাদেশের মেয়ে প্রসঙ্গ, মেয়েদের যৌনতা-আদর্শ-লজ্জা এইসব ত্রিশ-চাল্লিশ দশকের কল্লোলীয় রোমান্টিক ভাবনা যা শৈলজানন্দকে সরিয়ে এনেছিল। আর এ সময় নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমেদও শৈলজানন্দের বন্ধুত্বের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তবু 'পরাজয়' গল্পটি প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা বলা যায়, একটি কলমেব খোঁচায় গল্পকার শিশিরের পারিবারিক বন্ধনকে, মূল্যবোধকে এবং ভালোবাসাকে

ধূলিসাৎ করে দিতে পারতেন নীলিমার সঙ্গে সমরের শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে এবং মনে হিংসা-প্রতিহিংসাকে উসকে দিয়ে। সেখানে তিনি কলমকে সংযত রেখেছেন সামাজিক মূল্যবোধের কারণে এবং মানবিক কারণে। ফলে সমর একটি যথার্থ মানবিক চরিত্র হতে পেরেছে। বিলেতের ধরনধারণ বা অবক্ষয়তা তাকে পরিবর্তন করতে পারেনি। নারীর সঙ্গে পুরুষের শারীরিক ভোগের সম্পর্ক গড়ে তোলাটা আধুনিকতা নয়, প্রগতিশীলতা তো নয়ই। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বোঝা পড়ার ব্যাপার, পরিবেশ ও স্বার্থের ব্যাপার, রুচির এবং অসুস্থতার ব্যাপার। এখানেই শৈলজানন্দ অনন্য।

বয়সের প্রান্তসীমায় এসে তিনি শহরকেন্দ্রিক কলকাতার বাবুসমাজ এবং এলিট সোসাইটি নিয়ে অনেক সাধারণ মানের গল্প লিখেছেন। নামের খ্যাতিতে সে-সব গল্প 'দেশ' পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। ১৯৫৫ সালে চলিত ভাষায় তিনি একটি গল্প লিখেছিলেন 'দেশ' পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায়, গল্পের নাম 'এ-কূল-ও-কূল'। খুবই সাধারণ মানের গল্প। বীরভূম থেকে সতীশ পড়াশোনা করতে এসেছে কলকাতায়। থাকে শ্যামবাজারে। 'মস্ত বড়লোক বাপ, তার একমাত্র ছেলে সতীশ।... বাবার এক মস্ত বড়লোক বন্ধু থাকে শ্যামবাজারে। সতীশ তারই বাড়িতে থাকবে, খাবে আর কলেজে পড়বে।' এখানেই আবার ত্রিকোণ প্রেম, সতীশ-মিনতি-সতী। বি.এ. পড়তে পড়তে সতীশ ভালোবাসে মিনতিকে। কিন্তু বিয়ে করার কথা বলেও মিনতিকে বিয়ে করার সাহস হারিয়ে ফেলে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাবার কথামতো বিয়ে করে সতীকে। পরে আবার মিনতির সঙ্গে যোগাযোগ করে। সতী আত্মহত্যা করে সতীশের প্রেমের কথা জানতে পেরে। মিনতিও সতীশকে ছেড়ে অজানা স্থানে চলে যায় সতীশকে ঠিকানা না দিয়ে। সতীশের এ-কূল-ও-কূল দুকূলই গেল। এটাই গল্পের বিষয়বস্তু। প্রেমের এই গল্পটা সতীশ বলেছে নির্মল নামে এক জ্যোতিষের কাছে। নির্মলকে দিয়ে গল্পের শুরু। বরং জ্যোতিষী নির্মলের চরিত্রটাই ভীষণ বাস্তব হয়ে উঠেছে এই গল্পে। নির্মল জ্যোতিষ শাস্ত্রেই বিশ্বাস করে না। জীবিকার প্রয়োজনে করে। গল্পকার লিখছেন : 'হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি আর জ্যোতিষ—এই দুটো এখানেই চলে ভাল। মানুষের পয়সা না থাকলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করায়, আর সময় খারাপ হলে জ্যোতিষীর কাছে ছোটে।' প্রগতিশীল শৈলজানন্দ জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না বলেই এই গল্প শুরু করেন; 'নির্মল সেইরকম জ্যোতিষী, যার গণনার বেশিরভাগ কথাই মেলে না। দৈবাৎ যদি বা দু-একটা মিলে যায়, তা সে তার গণনার গুণে নয়, এমনিই।' কিন্তু গল্পটি এই গৃহীত অংশটিকে বিষয়বস্তু করেনি। নির্মল-জ্যোতিষীর কাছে এসে তার জীবনের গল্পটা বলেছে সতীশ। এই গল্পের মধ্যে পূর্বের গদ্যশিল্পী এবং গল্পশিল্পী শৈলজানন্দকে পাওয়া যায় না।

শৈলজানন্দের তীক্ষ্ণ, তীব্র ও মমতাময় শিল্পদৃষ্টিকে খুঁজে পাওয়া যায় না কলকাতার কৃত্রিম বাবুসমাজকে নিয়ে পাঁচের দশকে ও ষাটের দশকে যে-সব গল্প লিখেছেন সে-সব গল্পে। একসময় শ্রেণিবিভক্ত ভদ্রেতর মানুষ সম্পর্কে অসীম মমতা এবং মানবতা শৈলজানন্দের সাহিত্যকর্মকে একটা গভীর তাৎপর্য দিয়েছিল। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় তাঁর যৌবন বয়সের গল্পগুলির। বাংলা কথাসাহিত্যে সে-সব গল্পের তুলনা খুঁজে পাওয়া সত্যিই একটু শক্ত।

শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের ইংরেজ সাহেবদের নির্মম অত্যাচারের বেশকিছু গল্প লিখেছেন। শুধু ইংরেজ সাহেব নয়, জমিদারের নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারের কাহিনিও লিখে গেছেন। 'সাঁওতাল' গল্পে টেরির উপর নায়েবের অত্যাচার এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। এই গল্পে নায়েব সাঁওতাল পল্লীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত আছে 'অভাগা', 'মরণ', 'বিচার' এবং 'বনবিহগী' গল্পে। এ সব অত্যাচার সহ্য করেছে রুকী (মরণ), মতিয়া (অভাগা), মুকরী (বনবিহগী)। এরা সবাই খনিশ্রমিক এবং মূলত সাঁওতাল, কয়লাকুঠির শ্রমিক। সাঁওতালদের ম্লান বিবর্ণ দারিদ্র নির্যাতিত জীবনকথার সঙ্গে যুক্ত করেছেন জৈবিক যন্ত্রণা ও পারিবারিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-স্নেহ-ভালোবাসা। এই সব গল্প প্রসঙ্গে শৈলজানন্দের দরদি মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এই বিশেষ মন্তব্যটিতে : 'প্রকৃতির দুলাল এই নগ্ন অসভ্য বর্বর সাঁওতাল গায়ের রক্ত দিয়া, প্রাণ দিয়া—মনের ক্ষোভ আর পেটের দায়ে মাতা বসুন্ধরার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়াছে। কত শত পল্লী পাতাল-গহ্বরে বসাইয়া দিয়া, তাহাদের শ্যামলশ্রী জনশূন্য শ্মশানে পরিণত করিয়া, মানব সভ্যতার রক্ত-নিশান উড়াইয়া একে একে তাহারা প্রাণ দিতেছে।' এই মন্তব্য আমাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে ফেলে দেয়। ভাবায়, কয়লার প্রয়োজন, সাঁওতালদের ওপর অত্যাচার ও শোষণ, প্রকৃতির সৌন্দর্যের ধ্বংস এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

৩

গল্প এবং ছোটোগল্পের উৎকর্ষ প্রকাশ পায় ভাষাপ্রতিমায়। উপমা, চিত্রকল্প, শব্দের ব্যবহার এবং ব্যঞ্জনা ভাষাপ্রতিমার অলংকার। যে সকল গল্পকার এ সবের যথার্থ প্রয়োগের দক্ষতা দেখাতে পারেন, তিনিই হয়ে ওঠেন গল্প-শিল্পী। এভাবেই গড়ে উঠেছে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প এবং রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্প। যে গল্পদুটির শুরুতেই প্রাকৃতিক বর্ণনায় প্রকাশ পায় চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনা, গল্পটির সাথে অটুট সম্পর্কে সম্পর্কিত। শৈলজানন্দও তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন অনেক গল্পে। তাঁর গল্প এবং ছোটোগল্প আলোচনার সময় ভাষাপ্রতিমার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। এবার আরও কয়েকটি গল্প থেকে ভাষাপ্রতিমার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

১। 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা' গল্পে লিখেছেন গল্পকার : 'রমেশের শয্যার একপাশে দেয়ালের গায়ে কোন এক মাসিক পত্রিকা হইতে কাটা একটি পরমহংসদেবের এবং একটি সিক্তবসনা নারীর, দুইখানি রঙিন ছবি পাশাপাশি টাঙানো। জুতা ব্রুশ শেষ করিয়া রমেশ তাহার জুতা-জোড়াটি সেই ছবির নীচে দুইটি পেরেকের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিল।' এখানে তিনটি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়—(১) পরমহংসদেব, (ধর্ম) (২) সিক্তবসনা নারী, (যৌনতা) (৩) জুতা-জোড়াটি (বিলাস) যা ছবির নীচে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পরিষ্কার শ্লেষ-কটাক্ষপাত বুঝতে পারা যায় রমেশের চরিত্রকে ঘিরে এবং সঙ্গে সঙ্গে গল্পকারের নাস্তিকতার মনোভাবটাও বুঝতে পারি।

২। ওই গল্পটিতেই গল্পকার মেসের ম্যানেজারবাবুর স্বভাব-চরিত্রের কথা বলতে

গিয়ে বলেছেন : 'ম্যানেজারবাবু ছারপোকার মতোই চতুর, সহজে ধরাছোঁয়া দিতে নারাজ'। ম্যানেজার বাবু এবং ছারপোকা।

৩। প্রফেসারের স্বভাব ও আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধাভাব থেকে এসেছে : 'শত্রুর বিরুদ্ধে কুকুরকে যেমন করিয়া হাততালি দিয়া লেলাইয়া দেওয়া হয়, সর্বপ্রথমে আমাদের প্রফেসারকে তিনি ঠিক তেমনি করিয়াই খেপাইয়া দিলেন।' এখানে 'তিনি'টি হচ্ছেন ম্যানেজারবাবু। কুকুর এবং প্রোফেসার।

৪। 'গরীব' গল্পে গল্পকার লিখেছেন : 'সম্মুখে বড় বড় উনানের ধারে কয়েকটা খেঁকি কুকুর আহারের অন্বেষণে বৃথাই ঘুরিয়া মরিতেছিল। প্রসন্ন একদৃষ্টে তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল।' এখানে অনাহারক্লিষ্ট প্রসন্নের কথা ভাবা হয়েছে।

৫। এই গল্পেই ক্ষুধার্ত ডাবির চোখে ধরা দিয়েছে : 'মাঠের মাঝে একটা ঘূর্ণী বায়ু ধুলা উড়াইয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধূম্রকুণ্ডলির মতো উর্ধ্বে উঠিতেছিল।' ক্ষুধা, ঘূর্ণীবায়ু ধূম্রকুন্ডলি একই রেখায় রেখাঙ্কিত।

৬। 'জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটিমাত্র সেকেন্ডের তফাত। এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হইলেই আজ সে মরিয়াছিল (ভঙ্গুর)।' গল্পকারের জীবন-মৃত্যু ভাবনায় গভীরতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। জীবন থেকে মৃত্যুর পথ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ও লাগতে পারে, আবার ১ সেকেন্ডও লাগতে পারে।

৭। 'একে একে প্রত্যেকটি প্রাণী তাহার কাছে হইতে দূরে সরিয়া গেল—আসন্ন মৃত্যু—পিপাসার্ত কণ্ঠে দারুণ যন্ত্রণায় ছবি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।' 'নারীমেধ' গল্পে নিঃসঙ্গতা বা দূরত্ব বোঝাতে গল্পকার বাক্য ভেঙে ওভাবেই সাজিয়েছেন।

৮। 'কয়লা ফেলার ঝুপঝাপ শব্দ এবং ট্রাম লাইনের ঘড়-ঘড়ানির তালে তালে তাহাদের অপূর্ব মেঠো সুরের আনন্দ সংগীত বর্ষার জলো হাওয়ায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া সুদূরের শূন্য প্রান্তরে মিলাইয়া যাইতেছিল'। চিত্রকল্পের ব্যবহারে কয়লাকুঠি শ্রমজীবীদের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে জীবনের আনন্দ একাত্ম করে দিয়েছেন গল্পকার।

৯। বিলাসীর রূপের বর্ণনা। 'তাহার পরনের শাড়িখানা কালো কয়লার বিশ্রি ময়লায় সামান্য মলিন হইলেও, গায়ের রঙের জৌলুস এতটুকু মলিন হয় নাই—জলে ধোয়া কচি পাতার মতোই জ্যোৎস্নালোকে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। (কয়লাকুঠি)' নারী-শরীরের সৌন্দর্যের শব্দচিত্র।

১০। 'কিন্তু বিলাসীর কাছে সাধ করিয়া এই আনন্দের ফাঁসি বড় খাপছাড়া মনে হইতে লাগিল। কীসের যেন একটা পাষাণ ভার তাহার বুকের ওপর এমনভাবে চাপিয়া বসিয়াছে যে—' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

১১। 'হয়ত তাহার মত খাইবার এবং পরিবার-ভাবনা না থাকিলে শ্রমক্লান্ত বৃদ্ধ শ্রমজীবীও খেয়া-পারের ডাক উপেক্ষা করিয়া মরণের পরিবর্তে জীবনের ভিক্ষাই মাগে।' (মরণ-বরণ) এখানে জীবনের ভিক্ষাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। বৃদ্ধ ভাটুলের ছয়টি সন্তান কয়লাখনিতে সমাধিস্থ হলে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের সম্পত্তি ভোগের জন্য আবার বিয়ে করতে চাইছে এই অনুচ্ছেদেই আছে, 'ভাটুলের সমস্ত মুখখানা সন্ধ্যা-ছায়াঘন আকাশের মতো

বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিল'। উপমাটি লক্ষণীয় ভাটুলের মুখ এবং সন্ধ্যাছায়-ঘন আকাশ।

১২। 'এদেশের নারীর মূল্য না মাটির গুণ জানি না,—অন্নের সংস্থান থাকিলে শ্মশান-যাত্রীর হাতেও কন্যা সম্প্রদান করিতে কেহ কুণ্ঠিত হয় না' (মরণ-বরণ)। চিত্রকল্পটি গভীর জীবন-বোধের পরিচায়ক।

১৩। 'কিন্তু সারা দেহে তার স্বাস্থ্য-সুন্দর ও সুন্দর যৌবনের সুষমা। হাজারে হাজারে মাংসলোভী নেকড়ের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের পথে পথে। মোহিনীকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে তারা।' (মর্যাদা) মাংসলোভী নেকড়ে ও নারীলোভী পুরুষ।

১৪। 'কেরোসিন বাতির একটুখানি আলো গৌরীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাক্সের ওপর সবুজ রঙের শালখানি গায়ে দিয়া তখনও সে ঠিক তেমনিভাবে পাষাণ মূর্তির মতো বসিয়া। স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় অন্ধকারের দিকে ব্যাকুল একাগ্র দৃষ্টি তাহার তখনও নিবদ্ধ, এই বয়ঃসন্ধিলতা কিশোরীর—এবং শুধু এই কিশোরীর কেন, সমগ্র নারীজাতির নিষ্ঠা ও ভালোবাসার ওপর আস্থা তাহার অনেক দিন হইতেই নাই।' (বধূর বরণ)। এভাবেই তিনি ভাষা এবং চিত্রকল্পকে শব্দের যাদুতে নিজস্ব ভঙ্গিতে আধুনিক রূপ দিতে পেরেছেন। অনেক গল্প, অনেক কথা সাধু ভাষায় লিখলেও তৎসম শব্দকে পরিহার করেছেন।

৪

প্রত্যেক কথা-সাহিত্যিকের একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। নিছক আনন্দ প্রদানের জন্য কেউ কেউ কলম ধরেন, সবাই না। চেতনা বাড়াবার জন্যেই গল্প লেখা, কলম ধরা। আনন্দবাদীরা মনে করেন, দুঃখ থেকেও আনন্দ পাওয়া যায়, ট্র্যাজেডি থেকেও আনন্দ পাওয়া যায়। এসব ভাববাদীদের চিন্তা-ভাবনা। আমরা মনে করি দুঃখ থেকে দুঃখই পাওয়া যায় এবং তখন উত্তরণের কথা ভাবি। লেখক কখনও উত্তরণের কথা বলেন না। ট্র্যাজেডির যন্ত্রণাও সেরকম। বাস্তববাদীরা মনে করেন, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকেই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। গভীর জীবনবোধ এবং সমাজবোধ শৈলজানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিকে শাণিত করেছিল।

আলোচ্য গল্প ও ছোটোগল্পগুলো থেকে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গির এবং বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার উল্লেখযোগ্যতা আছে বলে মনে করি।

১। সাধারণ জীবনের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা, দারিদ্র, সামাজিক বৈষম্য তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে।

২। মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের ছবি তাঁর অনেক গল্পে লক্ষ করা যায়। তবে সেটা জীবনের গভীর অনুভবের জন্য প্রাধান্য পায়নি। গুরুত্ব পায়নি।

৩। শৈলজানন্দ অতি দ্রুত উপেক্ষিত ও পীড়িত মানুষের শিল্পী বলে পরিচিতি পেয়েছিলেন।

৪। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক মন্দা এবং ভাঙন, শৈলজানন্দের গল্পকে প্রভাবিত করেছিল।

৫। দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতি শৈলজানন্দের মমতা এবং মানসিক যন্ত্রণা তাঁর সাহিত্যকর্মকে একটি গভীর তাৎপর্য এনে দিয়েছে।

৬। সমাজ বাস্তবতা, সমাজ সচেতনতা, মানবতাবোধ, সংবেদনশীলতা, প্রগতিশীলতা তাঁর যৌবনে লেখা অনেক গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

৭। বেশির ভাগ গল্প এবং ছোটোগল্প তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। এক ভাষণে গল্প সম্পর্কে শৈলজানন্দ বলেছেন : 'গল্প হচ্ছে এক জীবন থেকে আর এক জীবন। দেখো, চেনো, অন্তরঙ্গ হও।'

৮। ব্রেট-হার্ট, ন্যুট হ্যামশুন, এমিল জোলা, ফ্রয়েড—এঁদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি বলেই কল্লোলীয় চেতনা থেকে শৈলজানন্দ আমূল পৃথক।

৯। আদিম জীবন, লৌকিক জীবন এবং শহরতলির জীবন তাঁর প্রথম দিকের অসাধারণ গল্পগুলোতে লক্ষ করা যায়, পরবর্তী কালের গল্পগুলোতে প্রাধান্য পায় মহানগরীর জৌলুস, অবক্ষয়, লালসা, কৃত্রিমতা ইত্যাদি। অনেক গল্পে ত্রিকোণ প্রেম তাঁর প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রেমে বিকৃতি নেই, অসুস্থতা নেই, প্লেটোনিক প্রেমও নয়। প্রেমে আছে সুস্থ চেতনা, আছে স্বাভাবিকতা, আছে রুচিবোধ।

১০। শৈলজানন্দ সম্পর্কে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত সঠিক মন্তব্য করেছেন : নিঃস্ব রিক্ত বঞ্চিত জনতার তিনি প্রথম প্রতিনিধি, বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু, নতুন ভাষা এনেছেন, হাতির দাঁতের মিনার চূড়া ছেড়ে তিনি প্রথম নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে।'

১১। শৈলজানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিপূর্ণ রোমান্টিকতা ছিল না। বাস্তবতার প্রবাহে দুটি ধারা আছে : (১) ভাববাদী, (২) বস্তুবাদী। শৈলজানন্দ ভাববাদী বাস্তবতাকে অনুসরণ করেছেন, তবে তিনি ভাববিলাসী বা কল্পনাবিলাসী ছিলেন না।

১২। তাঁর ছোটোগল্পে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে, বাঁচার লড়াই আছে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আছে কিন্তু যৌনক্ষুধার চরিতার্থতার প্রাবল্য নেই। যৌনক্ষুধা এবং যৌন-যন্ত্রণা সমার্থক শব্দ নয়। কল্লোলিয়রা ছিল যৌনচেতনায়, যৌনক্ষুধায় তাড়িত ও প্রাণিত। শৈলজানন্দ যৌনযন্ত্রণায় বিশ্বাসী। জীবন যন্ত্রণার হাত ধরে তাঁর গল্পে যৌনতা এসেছে। এখানেই শৈলজানন্দ প্রগতিশীল।

১৩। পুরুষতান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নেতিবাচক দিকটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

৫

ফলত সবিনয়ে অনন্যসাধারণ গল্পশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে, জৈবিক তাড়না নয়, জৈব-প্রবৃত্তির দাসত্ব নয়, শুধুমাত্র আঞ্চলিকতার গল্পকার নয়, সাঁওতাল জীবনের রোমান্টিক ভাববিলাস নয়—এসব তাঁর গল্পের পরিচয় নয়। তিনি সারা জীবন প্রায় ২৫০টি যে-সব গল্প এবং ছোটোগল্প লিখেছিলেন তার মধ্যে অধিকাংশ গল্প এবং ছোটোগল্পের পরিচয়ই হচ্ছে বস্তিজীবন, মেসজীবন, আঞ্চলিক ও পল্লীজীবন, নাগরিক জীবন এবং শহরতলির জীবন। এদের জীবন-প্রবাহ কখনও ছবি হয়ে উঠেছে, আবার কখনও দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে মানবতাবোধ, জীবনের সপক্ষে বাঁচার অনুপ্রেরণা, ইতিবাচক মনোভাব এবং মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। কলকাতায় 'নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে' (১৯৬১) তাঁর ভাষণের একটি বিশেষ অংশ : 'ভালবেসেছিলাম গোটা মানবসমাজকে, মানুষকে ভালবেসেই সাহিত্য জগতে এসেছিলাম।' গল্পশিল্পী শৈলজানন্দ তাঁর কথা রেখেছিলেন ১৯৭৬ সালের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটোগল্প (১৯৪৭/১৯৪৮)

সতীনাথের ছোটোগল্পের হিসেব-নিকেশ এবং রাজনৈতিক জীবন

সর্বশেষ হিসেবমতো সতীনাথ ভাদুড়ী সারাজীবন (জন্ম : ১৯০৬, মৃত্যু : ১৯৬৫) ৬২টি ছোটোগল্প লিখেছেন। শুরু করেছেন ২৫ বছর বয়সে 'জামাইবাবু' নামে একটি সাধারণ গল্প দিয়ে, প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৮/১৯৩১, অঘ্রাণ মাসে। ২ পৃষ্ঠার গল্পের সংখ্যানুসারে ৬টি ভাগ, অনুচ্ছেদ নয়। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় তাঁর শেষ গল্পটি প্রকাশিত হয় (১৩৭১/১৯৬৪)। ছোটোগল্পটির নাম 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ'।

৬২টি ছোটোগল্পের মধ্যে সাপ্তাহিক 'দেশ' এবং 'দৈনিক আনন্দবাজার' পত্রিকায় ৩৪টি ছোটোগল্প লিখেছেন, শারদ সংখ্যায় এবং বার্ষিক সংখ্যায়। 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় এবং সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় তিনি মোট ৯টি ছোটোগল্প লিখেছেন। এছাড়া তিনি ছোটোগল্প লিখেছেন দৈনিক কৃষকে, উত্তরায়, বিশ্বভারতীতে, পূর্বাশায়, চতুরঙ্গে, বিচিত্রায় এবং পরিচয়ে। মূলত তিনি ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাণিজ্যিক কাগজের লেখক। মধ্য ৬০-এর দশক পর্যন্ত বাণিজ্যিক কাগজে সাহিত্যমূল্য ছিল, ছোটোগল্পকারদের লেখার স্বাধীনতা ছিল এবং যশের প্রতি মোহ ছিল না। তারপর থেকে বাণিজ্যমূল্যই সাহিত্যের মানদন্ড হল। সেটা এখনও চলছে। লেখকেরা অর্থদাস এবং যশদাস হয়ে উঠলেন। এখানে বাণিজ্যিক প্রসঙ্গটি আনা হয়েছে। কারণ তখন (৬০-এর দশক থেকে) লিটল ম্যাগাজিন এবং তাদের লেখক সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব অধিকারে বিকল্প সাহিত্যের একটি জায়গা করে নিয়েছে। বাণিজ্য পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য-চর্চার বিপরীতে লিটল ম্যাগাজিনে তৈরি হচ্ছে বিকল্প স্বাধীন সাহিত্য-চর্চা, এটাকে অস্বীকার করার এখন আর কোন উপায় নেই। বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় সামাজিক দায়বদ্ধতার উন্নতমানের গল্প/কবিতাও ছাপা হতো। তার প্রমাণ সতীনাথ ভাদুড়ীর বেশ কিছু ছোটোগল্প, যেমন : আন্টাবাংলা, ধস, চরণদাস এম.এল.এ., একটি কিংবদন্তীর গল্প, জলভ্রমি ইত্যাদি। আবার এর বিপরীতে বলা যায় প্রতিটি লিটল-ম্যাগাজিনেই যে উন্নত মানের গল্প/কবিতা ছাপা হয় তা নয়। লেখার স্বাধীনতার নামে কাঁচা লেখাও ছাপা হয়।

সতীনাথ যে সকল ছোটোগল্প বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন, সে-সব লেখা সমালোচনার উর্ধে নয়। জীবনের ইতিবাচকতা এবং নেতিবাচকতা, জীবনের গতিশীলতা এবং স্থিতিশীলতার দ্বন্দ্বে সতীনাথ কখনো দ্বিতীয় অবস্থানেই রয়ে গেছেন আবার কখনো অস্থির, বিভ্রান্ত। যদিও তিনি ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে সমাজ সচেতন ও রাজনীতি সচেতন বাস্তব-অভিজ্ঞ এক উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পকার।

তাঁর মানসভূমিতে কখনও রোমান্টিকতা, আবেগসর্বস্বতা ও ভাবপ্রবণতা বিচরণ করত না। সমাজ-সচেতনতা ও রাজনীতি সচেতনতা তাঁকে অস্থিরতা এনে দিয়েছে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞান-মনস্কতা এনে দিতে পারেনি। তবু সতীনাথের প্রয়োজন আছে তৎকালীন ও সমকালীন ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতির পাঠের জন্য। এবং তার মাধ্যমটা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ কয়েকটি গল্প। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৩৫৩/৫৪ বঙ্গাব্দের (১৯৪৭/৪৮), এসময়ের লেখা ব্যতিক্রান্ত ও স্বতন্ত্র্য ধারার ৫টি ছোটোগল্প : গণনায়ক, বন্যা, আন্টাবাংলা, ওয়ার কোয়ালিটি ও আন্তর্জাতিক। এখানে আলোচ্য বিষয় এই ৫টি ছোটোগল্প। স্বাধীনতা-উত্তর বাঙলা ছোটোগল্পের যাত্রা শুরু এখান থেকেই।

সতীনাথের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর ছোটোগল্পকে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রভাবিত করেছে। এমন কিছু জোরালো ছোটোগল্প আছে (বিশেষ করে ঐ ৫টি ছোটোগল্প) যা পারিবারিক দায়বদ্ধতা থেকে, সংসারের 'ছোট-প্রাণ, ছোট ব্যথা/ ছোট ছোট দুঃখ কথা' থেকে সরে এসে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে বেছে নিয়েছেন। এখানেই সতীনাথের প্রগতিশীলতা। তবে এই প্রগতিশীলতা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারেনি। শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত এই লেখক যৌবনে পড়েছেন মার্কসীয় দর্শন, গান্ধী-দর্শন, লুকাচ, ফরাসি সাহিত্য, রুশ-সাহিত্য, র‍্যাডিক্যাল হিউমানিস্ট এম.এন.রায়, এমনকি চৈতন্য চরিতামৃতও। পড়েছেন জোলা, আলবেয়ার কামু, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র এবং আরও অনেকের সাহিত্য। পুলিশের ভয়ে 'আনন্দমঠ' পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ছাত্রজীবনে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) এবং আইন-অমান্য আন্দোলন তাকে প্রভাবিত করেছিল। আইন পাশ করার পর (১৯৩১) গান্ধীকে নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। পরে আদর্শ হিসেবে গান্ধীকে গ্রহণ করেন। আইনজীবী সতীনাথের বাবা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী ঠাট্টা করে বলতেন সতীনাথকে উদ্দেশ্য করে, 'দেখলে তো গান্ধী বাবার চেলা হয়েছে।' এরপর সতীনাথ ভাদুড়ী কংগ্রেসে যোগ দেন। পরে হয়েছিলেন পূর্ণিয়া জেলার কংগ্রেসের সেক্রেটারি। সতীনাথের কারাবরণ হাজারিবাগ জেলে (১৯৪০), পূর্ণিয়া জেলে এবং ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে (১৯৪২)। একসময় তিনি কংগ্রেসের activist ছিলেন। এরপরেও তিনি কংগ্রেস ছাড়লেন (১৯৪৮), বললেন, 'এখন রাজকাজ ছাড়া কংগ্রেসের আর কোন কাজ নেই।' এভাবেই সতীনাথের সাথে কংগ্রেস-নেতৃত্বের কর্মপদ্ধতি এবং মতদ্বৈধতা বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাবান হতে পেরেছিলেন। রাশিয়ার ভাষা শিখেও তিনি রাশিয়া যাবার অনুমতি পেলেন না।

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে সতীনাথের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক গভীর শ্লেষ-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ প্রবণতা। বেশির ভাগ ছোটোগল্পে, লক্ষ করা যায়, তার প্রতিফলন ঘটেছে। ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরেই কংগ্রেসি রাজনীতির নানারকম কীর্তি-কলাপের ভিতর দিয়ে সতীনাথ বুঝতে পারলেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের শেকড়হীনতা, প্রযত্নে নিষ্ফলতা এবং অসাড়তা। গান্ধীজির নাম নিয়ে, খদ্দর ও গান্ধী টুপি পরে, কংগ্রেসি তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে কিভাবে জমে ওঠে মুনাফাখোরি ব্যবসা, কালোবাজারি এবং চোরাই কারবারি তা তিনি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় দেখতে পেলেন, শুনলেন, পত্র-পত্রিকায় পড়ে জানতে পারলেন।

ফলত তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতার স্থায়ী ফসল ফললো সাহিত্যে। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩৫৩/১৩৫৪ বঙ্গাব্দের (১৯৪৭/৪৮) ৫টি ছোটোগল্পে। তার মধ্যে ৩টি ছোটোগল্পকে আঙুল তুলে বিশেষিত করা যায়, এই হচ্ছে ৩টি ছোটোগল্প : 'গণনায়ক' (১৩৫৪), 'বন্যা' (১৩৫৩) এবং 'আন্তর্জাতিক' (১৩৫৪)। এই ৫টি ছোটোগল্প সতীনাথ যখন লিখেছিলেন তখন তার বয়স ৪০/৪১ এবং মাত্র কংগ্রেস ছেড়েছেন বিতৃষ্ণায়, ঘৃণায়। এসময় আদর্শ-শূন্যতা (detachment) তাঁর মধ্যে দেখা দেয়, অনাসক্ত ক্ষোভ জ্বালা। অসম্পূর্ণ উপন্যাসের (জারজ) কাজ করতে গিয়ে তিনি একজায়গায় নোট করেছেন : To reveal the inner isolation out of which even love cannot lift him. সামাজিক অনাসক্তি ও উদাসীনতা (detachment), ক্ষোভ-জ্বালা ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল। চল্লিশের দশক থেকেই বুঝলেন লেখাই একমাত্র আদর্শ ও মত-প্রকাশের স্বাধীন মাধ্যম। ফলে তিনি সৃষ্টিশীল লেখনির মাধ্যমে গতিশীল থাকতে চাইলেন এবং কংগ্রেসের রাজকাজের স্বরূপটি ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে চাইলেন। আগামীদিনে কারা গণনায়ক তিনি চিহ্নিত করলেন। এর মধ্যে ৪টি ছোটোগল্প বাণিজ্যিক কাগজে ছাপা হয়নি।

গণনায়ক

'গণনায়ক' ছোটোগল্পটি প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৩৫৪ (১৯৪৭) বঙ্গাব্দের শারদ সংখ্যায় 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকায়। দেশবিভাগ, কালোবাজারি এবং হিন্দু-মুসলমানদের চরিত্র নিয়ে এই গল্পের পটভূমি। গল্পের ভৌগোলিক অবস্থানটি হচ্ছে পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানা এবং দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানার মধ্যবর্তী অঞ্চল। গোপালপুর থেকে শ্রীপুর যেতে হলে একটি নদী পেরোতে হয় কাঠের নড়বড়ে পুল দিয়ে। নদীর নামটি বেশ রোমান্টিক নাগর নদী। এই নদীটিও এখানে একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। এই পুলের পশ্চিমেই পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত গোপালপুর থানার অধীনে আরুয়াখোয়া নামে বিখ্যাত একটি হাট আছে। কালোবাজারি এবং চোরাই কারবারের জন্যে এই হাট বিখ্যাত। গোপালপুর থানার অধীনে এবং আরুয়াখোয়ার হাটের চারপাশে হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশে বসবাস করে। এই হাটে চাল-ডাল-চিনির ব্যবসা করতে আসে মুনিমজি, সে রাজস্থান থেকে পূর্ণিয়ায় ব্যবসা করতে এসেছে। এই মুনিমজি এবং হাটের মুসলমান ইজারাদার দুজনেই কালোবাজারি এবং চোরাই কারবারে আগাপাছতলা জড়িয়ে আছে।

ছোটোগল্পটি লেখা হয়েছিল ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের কয়েক মাস আগে। তখনও ঘোষণা হয়নি পূর্ণিয়া জেলার কোন্ কোন্ অঞ্চল এবং দিনাজপুর জেলার কোন্ কোন্ অঞ্চল হিন্দুস্থানে এবং পাকিস্তানে পড়বে। এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, রটনা-গুজব চলছে। ব্যবসার সুবিধার জন্যে এইসব গুজবের ইন্ধন যোগাচ্ছে মুনিমজি। গুজব রটিয়ে তিনি হিন্দুস্থানি পতাকা ও পাকিস্তানি পতাকা বিক্রি করেন। হরিপুর পাকিস্তান হবার কথা নয়, সেই হরিপুর অধিবাসীদের তিনি বিক্রি করেন হিন্দুস্থানী পতাকা। শ্রীপুর হিন্দুস্থান হবার নয়, সেই শ্রীপুর অধিবাসীদেরকে পাকিস্তানি পতাকা বিক্রি করেন। পরে কমিশনারের দেশভাগের রায়ে দেখা গেল ঘটনাটি বিপরীত হয়েছে। হরিপুর এসেছে

পাকিস্তানে শ্রীপুর এসেছে হিন্দুস্থানে। এরপর মুনিমজি আরও একটি গুজব ছড়িয়ে দেন, পাকিস্তান ফ্ল্যাগ আর রেখো না। আমার কাছে দিয়ে দাও। আমি গভর্নমেন্টের কাছে জমা দিয়ে দেব। এ ভাবেই হিন্দুস্থানি ও পাকিস্তানি ফ্ল্যাগগুলো আবার মুনিমজির কাছে ফিরে আসে। বিনামূল্যে প্রাপ্তি ঘটে মুনিমজির। এই নিশানগুলো দু'দুবার করে বেঁচেন মুনিমজি। আর তখনি মুনিমজির নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হয়।

জয়ধ্বনি শুনে ভাবেন, 'খদ্দরের টুপি (গান্ধীটুপি) আগে কিনে রাখলে বোধহয় দেশভাগের এবং স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ব্যবসাটা আরও একটু লাভের খাতায় স্থান পেত। ছোটোগল্পটি সতীনাথ ভ্যাদুড়ী satirical ভাষায় শেষ করেছেন একটি বাক্যে : 'মুনিমজী কুঠিয়ালী ভাষায় পকেটবুকে হিসাব লিখতে বসেন।'

এই ছোটোগল্পটি সম্পর্কে সতীনাথ যে মন্তব্য করেছেন সেটি ছোটোগল্পের বিচারে একটি মূল্যবান সংযোজন হতে পারে, তিনি বলেছেন : 'লেখাগুলি বিবরণমূলক। বিবরণের যথাযথ সামান্য পরিমাণে ক্ষুন্ন করিতে বাধ্য হয়েছি, পাছে প্রাণহীন প্রতিলিপি হইয়া দাঁড়ায় সেই ভয়ে এবং আরও কয়েকটি কারণে।' মন্তব্যটি ছোটোগল্প-প্রসঙ্গে যথার্থ। সর্বাংশে ঘটনার বিবরণ ছড়ানো থাকলে সেটাকে ছোটোগল্প বলা যাবে না। গল্পে প্রাণ থাকা চাই এবং গতিশীলতা থাকা চাই। আর সেই প্রাণ এবং গতিশীলতা আসে চরিত্রের টানাপোড়েনের ভিতর দিয়ে যেটা আমরা লক্ষ করি সতীনাথের গল্পে। মুনিমজি, ইজারাদার, হানিফ, শুকদেব, দর্পন সিং, অছিমদ্দী, এরফান—এসব চরিত্র সুখ-দুঃখের টানাপোড়েনে সচল হয়ে উটতে পেরেছে। যতদিন আমরা অল্প কিছু কংগ্রেসি নেতাদের চক্রান্তে দেশভাগের কথা মনে রাখব, যতদিন আমরা স্বাধীন ভারতের তথা বাংলার দেশভাগের সাথে জড়িয়ে থাকা কালোবাজারি, চোরাই-কারবারি ও মুনাফাখোরদের মনে রাখব, ততদিন আমরা এই গল্পটির গণনায়ক মুনিমজির কথাও মনে রাখব। কারণ যুগযুগ ধরে বিহারের এই উত্তর অঞ্চলে, নেপালের সীমানা ঘেঁষে রাজপুতদের অলিখিত শাসন, ব্যবসায়ী ও মহাজনী দাপট ব্রিটিশ আমল থেকে এখনও স্বাধীনতা প্রাপ্তির ষাট বছর পরেও চলে আসছে। নিজ দেশে, যাদবেরা এখানে এখনও পরবাসী। সতীনাথের ভবিষ্যৎ-বাণী, আগামীদিনেও মুনিমজি এবং ইজারাদারদের মতো গণনায়কেরাই দেশ শাসনের আড়ালে থাকবে। তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে এই 'গণনায়ক' ছোটোগল্পটি। কখনও কখনও নেতিবাচক চরিত্রও বিপরীত আঘাতে আধুনিক ও প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারে, যেমন 'গণনায়ক'।

বন্যা

'বন্যা' ছোটোগল্পটি প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৩৫৩ (১৯৪৭) বঙ্গাব্দের মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায়। কুশী নদীর বানের জলে ভেসে যাওয়া পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত রহিকপুরা গ্রামের বানভাসি বিহারী অধিবাসীদের নিয়ে এই বাস্তব কাহিনি। বাস্তবতা এবং প্রতীকতার সমন্বয় এই ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য। গল্পের এবং রিপোর্টাজের সমন্বয় এই ছোটোগল্পটির বৈশিষ্ট্য। স্টোরি ও এন্টিং-স্টোরির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই অসাধারণ ছোটোগল্পটির সুঠাম টান্‌টান্‌ শরীর। এখানে সতীনাথের আশ্চর্য কলম যেন

সোনি হ্যান্ডিক্যাম মুভি ক্যামেরা দিয়ে বন্যার এবং বানভাসিদের ছবি তুলছে, তাদের যন্ত্রণার এবং বিভৎসতার। 'বন্যা' গল্পে সতীনাথ ভাদুড়ীর মোটিভ পরিষ্কার তথা জীবনদর্শন : বিপদে-আপদে সবশ্রেণির মানুষ, জাত-বেজাত, গরিব-বড়লোক, নিম্নবর্ণ-উচ্চবর্ণ, হিন্দু-মুসলমান, মিলেমিশে একপ্রাণ, সেই জাতির নাম মানুষ জাতি। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ-বিচ্ছিন্নতা-মারামারি-হাতাহাতি ভুলে যায়। বিপদ কেটে গেলে আবার মানুষ, সব শ্রেণির মানুষ স্বধর্মে ফিরে আসে, ফিরে আসে হিংসা-বিদ্বেষের জগতে, ফিরে আসে জাতপাত-সাম্প্রদায়িকতার দাঙ্গা-হাঙ্গামায়। তখন আবার স্ব স্ব শ্রেণিতে অবস্থান করে। এভাবেই সতীনাথ এই অসাধারণ ছোটোগল্পটিতে জীবনের দুটি স্বরূপ তুলে ধরেছেন, বন্যার সময় এবং বন্যার জল সরে যাওয়ার পরের সময়।

বন্যায় ছিন্নভিন্ন দিক্‌ভ্রান্ত গ্রামবাসীদের কংগ্রেসি-সেবকেরা এক বিশাল নৌকায় তুলে নিয়েছে। হাজারমনী নৌকা বন্যার জলে ভাসে যেন নোয়ার নৌকা ভেসে চলেছে। গঞ্জের বাজারে উঁচু জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। সেখানে রিলিফ ক্যাম্পে উঁচুবর্ণ-নিচুবর্ণ-ব্রাহ্মণ-কায়েত-নমশূদ্র-মুসলমান এক হয়ে বাঁচার তাগিদে একসাথে রান্নাবান্না, প্রসব যন্ত্রণায় ও অসুস্থতায় সাহায্য করা, হাসি-ঠাট্টা-মস্করা নিয়ে একজাতি-একপ্রাণ, সদ্য স্বাধীন ভারতের তপ্তরপ্ত আদর্শ বহুর মধ্যে এক সম্প্রদায়, ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্বেল প্রকাশ ঘটেছে।

নৌখে ঝা ও সুমৃৎ তিয়রের পরিবারের মধ্যে যে রেষারেষি ছিল, সেটা এখন বানের জলে ভেসে গেছে। তিয়রের মেয়েরা ছাতু মাখে, ব্রাহ্মণীরা রুটি সেঁকে। সুমৃতের স্ত্রী নৌখের স্ত্রীকে বলে, 'দিদি ঐ কচি পোয়াতি বৌটাকে এখনি বাচ্চাদের সঙ্গে খাইয়ে দাও।' অন্যজাতের মেয়েরা ঘোমটা টেনে হাত গুটিয়ে বসে কাজের আদেশের অপেক্ষায়। সাঁওতালনীরা সাঁওতালদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে দু'হাত দিয়ে মাকাইয়ের রুটি খায়। মনিরুদ্দি শীর্ষাবাদিয়া সঙ্গের মেয়েদের একদিকে জায়গা দেখিয়ে দেয়। তারপর ব্রাহ্মণ ও তিয়রদের বলে, 'চলুন আমরা বেটাছেলেরা সব একটু বাইরে ঘুরে আসি। দেখছেন না নইলে মা ঠাকরেনদের খাওয়া হবে না।' এই প্রসঙ্গে সতীনাথ লিখছেন, 'এ কয়দিন বন্যার স্রোতে গ্রামের কলহ, মনের পঙ্কিলতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্লাবনের বিশালতার মধ্যে গ্রামীণ মনের সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। পরের দিন গোবরাহা দিয়াবার কালো মাটি জলের মধ্য হইতে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই কয়দিনের অবচেতন স্বার্থলোলুপ কিষাণ মন আবার চেতন হইয়া উঠে। অস্বাভাবিক পরিবেশের সমাপ্তির সহিত স্বাভাবিক গ্রামীণ মনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।' 'স্বাভাবিক গ্রামীণ মন' (কিষাণমন) সতীনাথের কলমে এই শব্দ কয়টি স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে, অর্থাৎ এটাই বাস্তবতা। 'বহুর মধ্যে এক সম্প্রদায় বরং তাঁর কাছে মনে হয়েছে বাস্তবতার পরিপন্থী এক রোমান্টিক আদর্শ ভাবনা।'

এরপর সতীনাথের কলমে ধরা পড়েছে রিলিফ ক্যাম্পের দুর্নীতি, সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থপরতা-নীচতা-সংকীর্ণতা-চুরিচামারি-অকর্মসংস্কৃতি এবং উপর মহলে চিঠি চালাচালির দীর্ঘসূত্রতা। গতবারের বন্যায় রিলিফের জন্য কেনা সরকারি নৌকার একটাও এবারে পাওয়া যাচ্ছে না। সব কটা সরকারি নৌকাই কর্মচারীরা বিক্রি করে দিয়েছে। কংগ্রেসি-অকংগ্রেসি দলের মধ্যে রিলিফের টাকার বন্টন নিয়ে বিশাল

মতদ্বৈধতা। সরকারি নৌকায় এখন বেঙ্গল নুন 'স্মাগল' করা হয়। ফলে রিলিফের কাজে নৌকা পাওয়া যায় না। সতীনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'লেখাপড়ার কাজ বাড়ে, কিন্তু কাজ এগোয় না। কাগজের চাপে আসল কাজের দম বন্ধ হইয়া আসে।... চারিদিকে প্লাবনের জলের ফেনা, এখানে কেবল কথা আর কথা—কথার ফেনা! লালফিতার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বর্তমান সমস্যাটিকে চাপিয়া ধরিয়াছে অজগরের নিষ্পেষণে হরিণ-শিশুর মতো।'

চমৎকার Satire এবং Irony, একসাথে সময়ের গালে চপেটাঘাত। এক সাক্ষাৎকারে নিজের লেখা Satire সম্পর্কে সতীনাথ লিখেছেন, Satire নিয়ে অনেক লেখা লিখেছি। 'নবশক্তি' পড়ো না বোধহয়! ওতে আমার লেখা গোটা কয়েক Satire বেরিয়েছে।' সমাজের দুর্বলতা ও দোষত্রুটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষের সহায়তায় পাঠকের কাছে তুলে ধরেন সতীনাথ।

সতীনাথ লিখছেন : 'যেরূপ গতিতে বান আসিয়াছিল তাহা অপেক্ষা তীব্রতর গতিতে জল শুকাইতেছে।' সাথে সাথে তীব্র গতিতে ফিরে আসে গ্রামবাসীদের, বানভাসিদের স্বার্থপরতা, অমানবিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের মানসিকতা। এসব দেখে কি সতীনাথ ক্রোধে-ক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছেন, তাই কি আয়রনিকলি লিখছেন, 'যাহা পাও, নিজস্ব করিয়া লও। সব জিনিস ব্যক্তিগত করিয়া লইতে চেষ্টা কর; নিঙড়াইয়া লও, শুষিয়া লও। চুরি করিয়া লও, লাঠির জোরে লও।'

এভাবেই সতীনাথ বন্যার বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বানভাসিদের মন-হৃদয় পোস্ট-মর্টেম করে আবিষ্কার করেছেন তাদের মানসিকতার স্বরূপ—কখন ভালোবাসতে হয়, কখন ভালোবাসা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। কখন বর্ণবিদ্বেষ ভুলে থাকতে হয়, আবার কখন বর্ণবিদ্বেষকে মনে রাখতে হয়। বাংলা সাহিত্যে বন্যাকে বিষয় করে যথেষ্ট ছোটোগল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু এরকমটি একটাও নয়, অনন্য সাধারণ, অদ্বিতীয়।

আন্টাবাংলা

'আন্টাবাংলা' ছোটোগল্পটি প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে (১৯৪৭/৪৮) শারদ সংখ্যা দেশ পত্রিকায়। সাদামাটা নেতিবাচক ছোটোগল্প হলেও ভাষার গতিশীলতা এবং কাহিনির নির্মমতা পাঠককে টান্‌টান্‌ করে রাখে, সজাগ রাখে। তবে গণনায়ক এবং বন্যার মতো এই ছোটোগল্পটিকে বিন্যাসে এবং বিষয়ে স্বাতন্ত্রধর্মী বলা যায় না। তরাই অঞ্চলের নিরীহ মানুষদের নিয়ে লেখা এই ছোটোগল্পে ছোটোখাটো একটি কাহিনি আছে এবং নির্মমতা ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের আকর্ষণ আছে। সতীনাথ সেটা শুরুতে বলেছেন : 'মানুষদের কথাই বলি; কুঠির বড়ো বড়ো চৌবাচ্চায় তাহারা দেখিয়াছে গোলা নীলের সমুদ্র, বহু পরিচিত আত্মীয়স্বজনের দেহে দেখিয়াছে নীল কালো শিরার দাগ।' সেই ইতিহাসের শেষ অধ্যায়। এই নির্মমতা, নির্মমতাই রয়ে গেছে যেন একজন গরিব ভাল মানুষকে এক সাহেব কোনো এক তুচ্ছ কারণে মারছে বা নির্যাতন করছে, নির্মম নির্যাতনে ভাল মানুষটাকে মেরেই ফেলছে, আমরা ধনাঢ্য-অভিজাত শ্রেণির লোকেরা দর্শক হয়ে দেখছি। ঠিক সেরকমই আন্টাবাংলার (প্ল্যান্টার্স ক্লাব) সেক্রেটারি বেঞ্জামিন সাহেব

রোববারে কাজে আসেনি বলে বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রি বিরসা ওঁরাওকে দুহাতে মাথায় ইট চাপিয়ে গ্রীষ্মের রোদে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বিকেলে মাটিতে পড়ে যায়, পরে অজ্ঞান হয়ে মারা যায় নীরবে, নিঃশব্দে। আশেপাশে পুত্রবধূ ছিল, নাতি-নাতনিরা ছিল, অন্যান্য রাজমিস্ত্রিরা ছিল। তারা কেউ অত্যাচারের ভয়ে বিরসার পাশে এসে দাঁড়াতে সাহস করেনি। প্রতিবাদ তো দূরের কথা। অথচ পাদ্রি সাহেবই রোববারে কাজ করতে নিষেধ করেছিল। আর এই তিনজনই বেঞ্জামিন সাহেব, পাদ্রি টুডু সাহেব এবং বিরসা ওঁরাও ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী। অত্যাচারে-শোষণে-প্রতিহিংসায় ধর্ম কোনো কাজে আসে না। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে।

বিরসা ওঁরাও-এর নির্মম পরিণতি দেখিয়ে কাহিনিটির সমাপ্তি ঘোষণা করা যেত। যেহেতু সতীনাথ ভাদুড়ী সেহেতু তাঁর চিন্তাভাবনার অন্য একটা দিক আছে। দিকটি হচ্ছে আন্টাবাংলার আগের এবং পরের ইতিহাসের নীলরক্তের প্রবাহমানতাকে তুলে ধরা। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও অভিজাত শাসন-শোষক ভারতীয় সাহেবদের ইতিহাসের সূচনা ঘটে আন্টাবাংলাতেও। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে এবং পরে শোষণের এবং নিষ্ঠুরতার ইতিহাসটা একই থাকে, শুধু চেহারাটা বদলায়। রঙ বদলায়। সতীনাথ লিখেছেন : 'মানুষ বদলায় / বোটরার মা ছিল পাথর। সেও বদলাইয়াছে। এর পরের ইতিহাস বোটরার (বিরসা ওঁরাও-এর নাতনি) মৃত্যুর ইতিহাস। বিরসা ওঁরাওর মৃত্যুর পর বোটরা আন্টাবাংলায় কাজ করে। সে বিধবা মায়ের কাছে থাকে না, কারণ মায়ের মাথার তেল এবং পরনে রঙীন শাড়ি দেখেই বুঝতে পরে বোটরা, মা বেশ সুখেই আছে, থাক। একদিন কালো পাদ্রি টুডু সাহেব বলেন বোটরাকে, 'তোমার ঠাকুরদার মরার তারিখ ১৮ই মে। সেদিন সকালে কিছু খেও না। পবিত্র মনে বিরসার কবরের উপর ফুল দিতে হবে। আর প্রার্থনা করতে হবে।' আর সেদিনই কিছু না খাওয়া অবস্থায় একগুচ্ছ অতীতের নিষ্ঠুর স্বপ্ন মাথায় নিয়ে ট্রাক চালাতে গিয়ে বোটরা সজোরে পথের ধারে পাকুড় গাছটিতে ধাক্কা দেয়। বোটরার স্পন্দনহীন দেহ ছিটকাইয়া পথের ওপর পড়ে। সতীনাথ ছোটোগল্পটি শেষ করেছেন চমক-লাগানো একটি চিত্রকল্পকে যথাস্থানে প্রয়োগ করে : 'গত যুগের সাক্ষী পাকুড় গাছটির কাণ্ডের ক্ষত হইতে রস ঝরিয়া পড়ে নূতন মাঙ্গলিক বসুধারার মতো।'

মৃত্যুর পরিবেশে গড়ে ওঠা আন্টাবাংলার কাহিনির নেতিবাচকতার উদাহরণগুলি এইরকম : (১) বিরসা ওঁরাও আন্টাবাংলার রাজমিস্ত্রি। সামান্য কারণে তার নির্মম মৃত্যু দেখানো হয়েছে। (২) বিরসা ওঁরাও-এর ছেলে বেলি সাহেবের আসামের চা-বাগানে কাজ করতে চলে যায়। আর ফেরেনি। ওর নিরুদ্দেশ বার্তা শোনা যায়। শোষণের শিকার মৃত্যুও হতে পারে। (৩) বিরসা ওঁরাও-এর একমাত্র পুত্রবধূ, বোটরার মা, বেঞ্জামিন সাহেবের নারী লোভের শিকার হয়। পরে হয়ে যায় নষ্ট মেয়েছেলে। (৪) বিরসা ওঁরাও-এর নাতি বোটরা, সে ঠাকুরদার নিষ্ঠুর মৃত্যু দেখেছে। সেজেগুজে মা আলাদা থাকে, তাও দেখেছে, তারপর ট্রাক চালাতে গিয়ে মারা গেছে। এই মৃত্যু দুর্ঘটনা, নাকি ইচ্ছামৃত্যু তার কোনো স্পষ্টতা নেই। এ-রকম একটি আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা নেতিবাচক কাহিনি (অনেকসময় মরবিড (morbid) করে তোলে) কি বার্তা বহন করে। একটাই বার্তা বহন করে আনে,

আন্টাবাংলাকে সামনে রেখে দেখানো, স্বাধীনতার আগে এবং পরে এভাবেই চলবে, এ ভাবেই বজায় থাকবে সমাজের স্থিতাবস্থা। যদি সেটাই ভাবা যায় তাহলে বলতে হয় ছোটোগল্পটি নেতিবাচক হলেও ভাবায়, নাড়ায়। নিষ্ঠুরতাও পাঠককে জাগিয়ে রাখে। এর জন্যই কি সতীনাথ দেশ স্বাধীন হবার পর রাজপথ দিয়ে হাঁটলেন না, কংগ্রেস ছাড়লেন। সমাজের এই স্থিতাবস্থা ভাঙবেন বলেই কি পরবর্তীকালে তিনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাবান হয়ে উঠেছিলেন? হয়তো। আর এরজন্যই তিনি আমাদের প্রিয় লেখক।

আন্তর্জাতিক

'আন্তর্জাতিক' ছোটোগল্পটি প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে (১৯৪৭/৪৮) 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায়। সতীনাথের এই ছোটোগল্পটি গড্ডালিকা প্রবাহে হারিয়ে যাবে না। ভিন্নধর্মী এই গল্পটি আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বিশেষ কারণে। কংগ্রেসি রাজনীতির নেতিবাচকতা এবং তৎকালীন ইতিহাস-সচেতনতা জড়িয়ে আছে এই অসাধারণ ছোটোগল্পটিতে। কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এবং রাজনীতির অহিংসা পন্থার ট্র্যাজিক পরিণতি এই ছোটোগল্পের এক চরম চাবুকাঘাত। কাহিনির বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে ভীমভার মিলের ধর্মঘটের কথা। ছোটোগল্পটির ভৌগোলিক অবস্থান হচ্ছে পূর্ণিয়া জেলার কাছে তরাই অঞ্চলের সীমান্তে নেপালে বা নো ল্যান্ডস এরিয়ায়, সেখানকার অধিবাসীরা বলে 'দশগজ্জা'।

নেপাল থেকে সরকারি অনুমতি নিয়ে সূর্যসামশের রানা আইন পড়তে এসেছে কাশীতে। যখন সে কাগজ পড়ে জানতে পারে নেপাল সীমান্তে ভীমভার মিলে ২৯ দিন দরে ধর্মঘট চলছে, মেয়েদের ওপর গুলি চালানো হয়েছে, ব্রাহ্মণ মেয়েদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে এবং নেপাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী-পুরুষ সকলকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যখন সূর্যসামশের রানা জানতে পারল নেপাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের ছেলে ভীমভার মিলের মালিকের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ চেয়েছিল এবং মালিক পক্ষ দিতে রাজি না হওয়ায়, প্রেসিডেন্ট মিলে ধর্মঘটের এবং সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহী আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, তখন সূর্যসামশের রানার এইসব আইন পড়ার প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যায়। বুঝতে পারে কোনো দরকার ছিল না যুক্ত প্রদেশের টেনান্সি আইন পড়ার। নেপালে যদি থাকতে হয় তাহলে কোন্ কাজে লাগবে ভারতশাসন বিধান সংক্রান্ত আইন পড়ে! কোন্ কাজে লাগবে 'International law is the vanishing point of jurisprudene' রাত জেগে মুখস্থ করা পরীক্ষার জন্যে।

শেষপর্যন্ত সূর্যসামশের রানা আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে নেপাল কংগ্রেসে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নাম লেখালেন। এবং নেপাল কংগ্রেসের নেতা উপাধ্যায়জি তাকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সত্যাগ্রহী ও অর্থ সংগ্রহ করার কাজ দিলেন। একদিন সূর্যসামশের গ্রাম থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য গ্রামবাসী মহিলাদের দান হিসেবে বুড়ির সিঁদুর মাখানো আসরফি, দিদি-বহিনদের সোনার তাবিজ এবং টিকলি, তরুণী বিধবার স্বামীর মিলিটারি পদক, শালগাছের তলায় মানত করা আংটি এসব সংগ্রহ করে রাতের বেলায় দশগজ্জা (নো ম্যানস্ ল্যান্ড) কংগ্রেসি ক্যাম্পে ফিরল। ক্যাম্প খালি ছিল। সে সময় সূর্যসামশেরের

পেছন পেছন দৌড়ে আসা প্রৌঢ় মোটা লোকটা ক্যাম্প পর্যন্ত এসেছিল সূর্যসামশেরের সাথে নানারকম কথা বলতে বলেতে। তারপর একসময় মোটা প্রৌঢ় লোকটা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এবং ভীমভার মিলের শ্রমিকদের জন্যে তোলা সোনার অলংকার তাকে দিয়ে দিতে বলে। এতগুলো মথিত হৃদয়ের সহানুভূতির দান ওই অপরিচিত লোকটির হাতে না দিয়ে বিপদ বুঝে সূর্যসামশের দৌড়তে থাকে ভীমভার মিলগেট এবং রেলওয়ে ইয়ার্ডের আলো লক্ষ্য করে। এরপর সতীনাথ লিখেছেন : 'দুই দিকের রাইফেল একসঙ্গে কর্কশ ধ্বনিতে আন্তর্জাতিক খেলাঘরের কলকাকলিতে উপহাস করে ওঠে। / দুদিককার বুলেট সূর্যসামশেরের দেহের কোনো vanishing point-এ গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। পরীক্ষায় না বসেও সে আইনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায়।'

আন্তর্জাতিক আইনকে এখানে কটাক্ষ করা হয়েছে। সতীনাথ লিখেছেন : 'দশগজ্জার চোখে সব সমান—দেশপ্রেমিক এবং ডাকাত এক হয়ে গিয়েছে এখানে। এই কি ভবিষ্যতের বিশ্বব্যাপী আইনের রূপরেখা।' এখানেই এই গল্পের নামকরণের উপযুক্ততা। কিন্তু তিনি যদি মহার্ঘ এই ছোটোগল্পটি এখানেই সমাপ্তি রেখা টেনে দিতেন তাহলে গল্পের গতিশীলতায় টান পড়ত না। কারণ এরপরেও পাঠককে আরও ৩/৪টি ছোটো অনুচ্ছেদ পড়তে হয়। ভাবন ঝিমিয়ে পড়ে।

ওয়ার কোয়ালিটি

'ওয়ার কোয়ালিটি' ছোটোগল্পটি লেখা হয়েছিল ১৩৫৪/৫৫ বঙ্গাব্দে (১৯৪৮-৪৯) বৈশাখ সংখ্যায় 'পরিচয়' পত্রিকায়। এটি একটি সার্থক ছোটোগল্প হলেও, অসাধারণ ছোটোগল্প নয়, তবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধকালীন সন্ত্রাস তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে চল্লিশ দশকের অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে এই ছোটোগল্পে। সতীনাথের গল্প-লেখার দক্ষতা আছড়ে পড়ে তাঁর শাণিত-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষে। যার যত বেশি ইতিহাস-রাজনীতি এবং সমাজ সচেতনতাবোধ প্রখর থাকে, তাঁর হাতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ প্রচণ্ডভাবে মান্যতা পায়। সতীনাথ এরকমই একজন কুশলী ছোটোগল্পকার। এসব আমরা লক্ষ করেছি 'গণনায়ক' এবং 'বন্যা' ছোটোগল্পে, বিশেষভাবে। 'ওয়ার কোয়ালিটি' ছোটোগল্পটিও সেরকমই একটি ছোটোমাপের কাহিনি। এর মোটিভ, কি করে চোরা-কারবারের, ভেজালের ও প্রতারণার রাজত্বে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়, তারই পটভূমিকায় এই ছোটোগল্পটির অবস্থান। সম-সাময়িক কালের এই ভয়েসটাকেই সতীনাথ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষে সাজিয়েছেন তাঁর লেখা ছোটোগল্প 'ওয়ার কোয়ালিটি'তে। সূক্ষ্ম শ্লেষ কি হাসির ইন্ধন জোগায়? জোগায়। এই ছোটোগল্পটিও সেরকম। তবে খোলামেলা থলথলে হাসির গল্প নয়। এই ছোটোগল্পটিতে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছেন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের বিনিময়ে ডক্টরেট প্রদানকে এবং আমেরিকান ব্যবসাদারদের ব্যবসা-বুদ্ধিকে।

কাহিনির শুরুতেই ছোটোগল্পের একটি ছোটোখাটো পরীক্ষা-নিরীক্ষা : '১৯৪৯ সালের মহেঞ্জদারো ইয়ারবুকের পাতা উলটাইতেছিলাম। 'হু ইস হু' পরিচ্ছেদের একটি

পাতায় হঠাৎ নজর পড়িল : ডক্টর নরেশ ভদ্র। শিক্ষা : ম্যাকগেভিন বিশ্ববিদ্যালয়ে, উইস্‌কনসিন। ব্যবসায়িক বিজ্ঞান ও প্রটোকল বিষয়ক অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন।'— আরও কিছু বিশেষ্য-বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে নরেশ ভদ্র সম্পর্কে, সেই ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ইয়ারবুকে। এই নরেশ ভদ্রের সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এই ছোটোগল্পের উত্তম পুরুষের সাথে। বন্ধুত্ব ছিল বাল্যকাল থেকেই। নরেশ ভদ্র একসময়ে কথকের রুমমেট ছিল কলকাতার কোনো এক মেসে। কথক ভাবে, নরেশ ভদ্র তো ফেল করা ছাত্র। কি করে ইয়ারবুক লেখে, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ডিগ্রি লইয়া...।' কথক আমাদের জানিয়ে দেন 'বার কয়েক বি.এস.সি. ফেল করিবার পর নরেশ পড়া ছাড়িয়া দেয়। প্রতিবার পরীক্ষার পর বলিত, প্র্যাক্‌টিক্যাল খারাপ হইয়া গিয়াছে। বোধহয় পাশ করিতে পারিব না।' এই নরেশ ভদ্রক (ভদ্রের ব্যঙ্গাত্মক শব্দ সতীনাথ ব্যবহার করেছেন) কত রকমের ব্যবসা করে যুদ্ধের বাজারে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ভাগ্যে লাগছে না। তার পাশে থেকে কথকবন্ধুটি ভদ্রকে যথাসাধ্য উপদেশ দিয়ে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে।

একদিন কথক দেখে ভদ্রক কয়েক পিপা আমেরিকান কডলিভার তেল কিনে এনেছে ব্যবসা করবে বলে। পরে দেখল আমেরিকান কডলিভার তেল কিনে ভদ্রক প্রতারিত হয়েছে। তেলের পরিমাণ অনেক কম, অথচ দাম নিয়েছে বেশি। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ভদ্রক বলে, 'বড্ড ঠকে গিয়েছি, শালা আমেরিকানরা জোচ্চর।' ইতিহাস সচেতন এই মন্তব্য থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি আমেরিকান ব্যবসাদারদের চরিত্র যা আজও অব্যাহত, আজও তার চরিত্র পালটায়নি। তারপর প্র্যাক্‌টিক্যাল ফেল করা ভদ্রক আলটা-ভায়োলেট তেল আবিষ্কার করল। বিজ্ঞাপনের জন্য হ্যান্ডবিল ছাপাল। হ্যান্ডবিলের একপিঠ সাদা, অন্যপিঠ বিজ্ঞাপনে ঠাসা। কিন্তু তেল তবুও বিক্রি হচ্ছে না। একদিন নরেশ ভদ্রক লক্ষ করে হ্যান্ডবিলের পাতা দিয়ে ছাত্ররা রাফ খাতা তৈরি করেছে। কারণ একপিঠ সাদা পাতা পাওয়া গেছে বিনামূল্যে। যুদ্ধের সময়, কাগজের দাম প্রচুর, অভিভাবকদের কেনার অসাধ্য। সেজন্য অভিভাবকেরা সন্তানদের পড়াশোনার কাজে লাগিয়েছে। একেই বলে ওয়ার কোয়ালিটি। আর তখনই নরেশ ভদ্রকের ভাগ্য খুলে গেল। সে ম্যাকগেভিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস পাঠালো। বিষয় : 'যুদ্ধকালীন একপিঠে লেখা ইস্তেহার' এবং নরেশ ভদ্র (ভদ্রক) ডক্টরেট পেল। এরপর সতীনাথ ভাদুড়ী ছোটোগল্পটি শেষ করলেন, 'ইয়ারবুকে সংক্ষিপ্ত জীবনী দিবার বিরুদ্ধে একটি বিরাট আন্দোলন মনে করিতেছি।' ব্যঙ্গ-শ্লেষের চাবুকটা পাঠকের মস্তিষ্কে এসে লাগল। পাঠক চমকে উঠে বুঝতে পারল, আন্দোলনটা মহেঞ্জদারোর ইয়ারবুকের বিরুদ্ধে নয়, সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপার বিরুদ্ধে।

ছোটোগল্পের সতীনাথ : দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশিষ্টতা

এই ৫টি ছোটোগল্পের পরিপ্রেক্ষিতে সতীনাথের দৃষ্টি-স্তম্ভ এবং লেখার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা যায় :

(১) তাঁর ইতিহাস, রাজনীতি ও বাস্তব সচেতনতা।

(২) ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ প্রবণতা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা।

(৩) ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতার দ্বন্দ্ব এবং টানাপোড়েন।

(৪) মূলত তার গল্পের পটভূমি পূর্ণিয়া জেলা, তরাই অঞ্চল, নেপাল এবং বাংলাদেশ সীমান্ত।

(৫) বিবরণ, রিপোর্টাজ এবং বহুমাত্রিকতার সাথে ছোটোগল্পের সমন্বয় সাধন এবং সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

(৬) সমাজটাকে পালটাবার স্বপ্ন তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজের কার্যকারণ সম্পর্ক সমাজ-বিজ্ঞানী মনস্কতায় বুঝে উঠতে পারেননি।

(৭) তাঁর শাণিত বুদ্ধি এবং মেধা, পড়াশোনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর লেখা ছোটোগল্পকে স্বমহিমায় সংগঠিত করেছে।

(৮) সতীনাথের ছোটোগল্পে একটি মোটিভ থাকে। যথার্থ ছোটোগল্পে একটি ভয়েস বা কণ্ঠস্বর থাকা চাই, এটাই হচ্ছে মোটিভ, এটাই হচ্ছে একজন লেখকের দৃষ্টি-স্তম্ভ বা দৃষ্টিভঙ্গি। নিছক বিনোদন এবং রসোত্তীর্ণতা ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। সতীনাথের কোনো ছোটোগল্পেই বিনোদনের ঘোলা জল মেশানো নেই।

(৯) তাঁর ৫টি ছোটোগল্পের পটভূমি স্বাধীনতার আগে-পরে দেশের বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্র, নানা সামাজিক অব্যবস্থা, ঘুষ, চোরাকারবার, দুর্নীতি, প্রতারণা, দরিদ্রের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন, শ্রমিক ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, রাজনৈতিক মতভেদ, আদিবাসী ও গ্রামীণ মানুষদের জাতপাত ইত্যাদি। এই সবই তাঁর লেখার বিষয়, তাঁর লেখ্যভূমি।

(১০) সতীনাথের ছোটোগল্পে হিন্দি, উর্দু ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে অন্যমাত্রা যুক্ত করেছে। কয়েকটি উদাহরণ : শোকরিয়া জানাতে হবে/ আজ ক'বোরা চিনি এনেছ/ নিজের মঝরের লোকের জন্য/ ক'দিন মোফল চলবে/ পোলিয়া মেয়েরা কান্নাকাটি আরম্ভ করে/ তিন দিনের ভিস্তির বাদশাগিরি/ এ অঞ্চলের রইস এরা/ ডিউর‍্যান্ডার বেড়ার ওপর দিয়ে নীলচাষের বটাইদার/ ধুরী গয়লা/ চিরনবীন আন্টাবাংলা ক্লাব/ দশগজ্জা আইনের জাল থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ সমাধিস্থ থাকার জায়গা/ তুরিয়া বাঁতার এই সময়েও/ ইণ্ডয়া নোডনের যুগের মতো এক যুগের স্মৃতি/ মেয়েটির কপালে অনেক খোয়ার আছে/ আর ধরুন রাত-বিরাতের জন্য এক ঘণ্টা ফাজিল রাখলাম/ অলহিলালের ছায়ার তলার নিরাপত্তা/ আরও আছে, যেমন, শীর্ষবাদিয়া, মুসহর, মহাৎমা ইত্যাদি।

সতীনাথের ছোটোগল্পে চিত্রকল্প-উপমা-অর্থালংকার

ছোটোগল্পের নিজস্ব একটি ভাষা আছে। শব্দবিন্যাসে-বাচনভঙ্গিতে-বাক্যবিন্যাসে, চিত্রকল্প-উপমা-অর্থালংকারে ছোটোগল্পের ভাষার সুনির্বন্ধে প্রকাশ ঘটে। সতীনাথ যথার্থ নিপুণতার সাথে সেই ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাঁর গল্পে, ছোটোগল্পে। এখানেই সতীনাথের ছোটোগল্পের সার্থকতা। এখানে, এই প্রবন্ধে ছোটোগল্পে সতীনাথের প্রয়োগ-নিপুণ কয়েকটি চিত্রকল্প-উপমা-অর্থালংকার এবং বাচনভঙ্গি তার ভাষাপ্রতিমা বোঝার সুবিধার্থে পাঠকের কাছে তুলে ধরলাম।

(১) হুড়াহুড়ি করিয়া একসারি ঢেউ, আর একসারিকে তাড়া করিয়া তীব্র গতিতে তোড়ে একটি বিরাট গাছের গুড়ি উষ্ট্রারোহীর মতো সামনে পিছনে দুলিতে দুলিতে, চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। (বন্যা)

(২) এখানে জলে একটি প্রকাণ্ড ঘূর্ণী; বিরাট পরিধি লইয়া সাদা ফেনিল আবর্ত। নাম কালভৈরোকা কুণ্ডী। কালভৈরব দুধ দিয়া সিদ্ধির সরবৎ তৈয়ারি করিতেছেন। আঙ্গুল দিয়া নীচের থিতানো চিনি সিদ্ধিবাঁট দুধের সহিত মিশাইতেছেন। (বন্যা)

(৩) চারিদিকে প্লাবনের জলের ফেনা, এখানে কেবল কথা আর কথা, কথার ফেনা!! লালফিতার নাগপাশ আষ্টেপৃষ্ঠে বর্তমান সমস্যাটিকে চাপিয়া ধরিয়াছে নিষ্পেষণে হরিণ-শিশুর মতো। (বন্যা)

(৪) পাকুড় গাছের পাতা অজস্র সাপের জিভের ন্যায় লিক্‌লিক্ করিয়া কাঁপিতেছে। অজস্র স্মৃতির প্রেতাত্মা তাহার স্টিয়ারিং হুইলের ভিতর দিয়া ঘূর্ণিবাত্যার মতো চলিয়া যাইতেছে। গত যুগের সাক্ষী পাকুড় গাছটির কাণ্ডের ক্ষত হইতে রস ঝরিয়া পড়ে, নূতন মাঙ্গলিক বসুধারার মতো। (আন্টাবাংলা)

(৫) দেশের লোকের তীব্র আকাঙক্ষার আগুন নিবিয়ে দেবে কি পশুপতিনাথের সাপের ফোঁস-ফোঁসানিতে আর লেজের দাপটে। সপ্তর্ষির হলকর্ষণে প্রাণবন্ত করতে হবে এই পাথরের অহল্যাকে, তাই দেখিয়ে দিচ্ছে। শ্মশান বৈরাগ্যের শৈবালের মধ্য থেকে— তাকে বাঁচতে হবে, যেমন করেই হোক। (আন্তর্জাতিক)

(৬) আজ হাটে বিশ্রাম করে কতক যাবে এগিয়ে, শিকারের খেদানো হরিণের মতো, অনির্দিষ্ট লক্ষ নিয়ে। (গণনায়ক)

(৭) কলকাতা ফেরত ছোকরা—অজ পাড়া গাঁয়ের নিরীহ ছেলেদের ওপর খুব মোড়লি করছে। ছেলেদের সে নূতন নূতন ভূত-ভূত খেলা শিখিয়েছে—অবিশ্যি খেলাটা শিখিয়েছে রিলিফের বাবুরা।—একদল হয়েছে বেম্মদত্যি, একদল হয়েছে মামদো ভূত। একদিককার নাম বেলগাছের দিক, আর একটা কবরের দিক। নোয়াখালিতে মরলে হবে বেম্মদৈত্যি, বিহারে মরলে হবে মামদো ভূত। কবরের দিকে নূতন কোনো খেলোয়াড় এলেই মামদোরা উল্লাসে নাকিসুরে চিৎকার করে 'বিহার থেকে এসেছে রে;' আর বেলগাছের দিকে কেউ এলেই সকলে জিজ্ঞাসা করে 'নোয়াখালি নাকি?' (গণনায়ক)

(৮) কিছুদিন পরে ভয়ে ভয়ে নেহাত সংকোচের সহিত ভদ্রককে মনকুসুমের মশা মাছি বিতাড়নী ক্ষমতার কথা বলিয়াছিলাম। নোবেল হঠাৎ ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাবিলাম এবার হয়তো ভদ্রকের কপাল খুলিল। (ওয়ার কোয়ালিটি)

(৯) সারাদিন পান আর গুন্ডি চিবাইত। প্রায় টেবিল টেনিসের ব্যাটের মতন চওড়া চিবুকটিতে দু'কষ বাহিয়া পানের রস গড়াইয়া পড়িত। একখানি মোটা নীল মলাটের ইংরেজি বই হইতে ফর্মুলা দেখিয়া নরেশ ভদ্র নূতন উদ্যমে নূতন জিনিস তৈরি করিতে আসে। বিজ্ঞানের কিছু বুঝিতাম না। ভাবিতাম হয়তো বা এডিসন বা কুরীর মতো একটা কিছু করিয়াও ফেলিতে পারে। (ওয়ার কোয়ালিটি)

(১০) নাম হইবে 'আলটা ভায়োলেট তেল'। ছেলে বুড়ো সকলকে মাখিয়া এক ঘণ্টা

রৌদ্রে বসিতে হইবে মাত্র। তাহার পরেই নূতন ভারতের নূতন মানব জয়যাত্রার পথে দৌড়াইবে। (ওয়ার কোয়ালিটি)

এই প্রসঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর গদ্যের এবং কবিতার দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে এখানেই সমাপ্তি রেখা টেনে দেওয়া যায়।

(১) দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ জিনিসগুলোও সাহিত্যের দরবারে আর অপাঙ্‌ক্তেয় থাকে না। তখন সাহিত্যিকদের কাজ হয়ে ওঠে আরও কঠিন। কোনটুকুকে বাদ দিয়ে কোনটুকুকে রাখবে সাহিত্যের মাল মশলা হিসেবে, লেখকের এই সনাতন সমস্যায়, আগের চেয়ে অনেক বেশি অন্তরদর্শনের দরকার হয়। কারণ তথাকথিত তুচ্ছ ঘটনাগুলি রসের উৎস বলে ধরে নিতে পাঠকের মনে একটা স্বাভাবিক বিরোধ থাকে।

(২) কালির লেখন সবাই পড়ে
কালের লেখক গুমরে মরে।

এই ৫টি ছোটোগল্প বিষয়ক প্রবন্ধে ধরা আছে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ জিনিস, অন্তরদর্শন, তথাকথিত তুচ্ছ ঘটনা, পাঠকের মনে স্বাভাবিক বিরোধ এবং গুমরে মরা কালের লেখন। এছাড়া পাঠক সতীনাথের এই ৫টি মূল্যবান ছোটোগল্প-পাঠে বুঝে নিতে পারবেন দুটি উদ্ধৃতির মর্মার্থ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি ছোটোগল্প : অপ্রকৃতিস্থতা ও জীবন-সমীক্ষা

Morbidity কথাটির বাংলা হতে পারে অপ্রকৃতিস্থতা বা অসুস্থ-চিন্তাভাবনা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটোগল্পে Morbidity-র অবস্থানকে চিহ্নিত করেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে যে কল্পনার একেবারে অভাব তাহা ঠিক নহে; কিন্তু এই কল্পনার মধ্যে একপ্রকার অপ্রকৃতিস্থতা (Morbidity) বা মনোবিকারের ইঙ্গিত আছে।' পরে সমমাত্রার অন্য একজন বিশ্লেষণ ধর্মী সমালোচক প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের Morbidity-র উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের Morbidity আসলে এক ভারসাম্যহীন অসুস্থ যুগ জীবনযন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে ধারণ এবং বহন করার শৈল্পিক ফল-পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নয়, এখানেই তিনি যথার্থ কবি'।

এখানে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে চারটি মূল্যবান, যথার্থ এবং সঠিক শব্দ 'Morbidity-জীবনযন্ত্রণা-কল্পনা-শৈল্পিক ফল-পরিণাম' বসিয়েছেন প্রবীণ দুই সমালোচক। প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি অতিপাঠ্য ও সুখপাঠ্য ছোটোগল্প, 'হয়তো' ও 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' আলোচনার্থে এই চারটি শীর্ষ শব্দের প্রয়োজন আছে। এখানে Morbidity শব্দটির তথ্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এই শব্দটির গভীর তাৎপর্য বুঝতে হবে। Morbid শব্দটির সাথে জড়িয়ে আছে abnormality, characterized by gloomy or unwhole some feelings. মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার সাথে এই শব্দটির সম্পর্ক আছে। অসুস্থ পরিবেশ, সমাজ-বিচ্ছিন্নতা, বিষাদগ্রস্থতা, বিষণ্ণতা, দুঃখজনক অবস্থা এইসব শব্দাবলি সাহিত্যে Morbidity-র অবস্থানকে স্পষ্ট করে। এইসব শব্দগুচ্ছ তৎকালীন (ত্রিশ-চল্লিশ দশক) সমাজব্যবস্থায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিল। বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ দশক থেকেই ২য় মহাযুদ্ধের আগে-পরে পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল আমাদের সমাজে। প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল ইউরোপে। এই পরোক্ষ প্রভাব বাঙালির সামাজিক জীবনকে ওলোট-পালোট করে দিয়েছিল। সামাজিক মূল্যবোধকে এবং আর্থিক বুনিয়াদকে নাড়িয়ে দিয়েছিল ভয়ংকরভাবে। ইউরোপে তখন Morbid সাহিত্যের রমরমা বাজার। আর আমাদের এখানে এলিট সাহিত্যিকরা সেসব সাহিত্য পড়ে অবাক হচ্ছে, ভাবছে আধুনিক রবীন্দ্র-পাঠ এবং রবীন্দ্র-ভাবনার বিস্তৃতি থেকে মুক্তির কথা। এই মুক্তির ফসলই হচ্ছে কল্লোল-যুগ। পাশ্চাত্য দেশ থেকে Morbid literature-এর আমদানি। ফরাসি কবি ও ঔপন্যাসিক (১৮১১-১৮৭২) তেওফিল গোতিয়ের পারসেনিয়ান আন্দোলন ফরাসি দেশে আবার নতুন করে দেখা দিল, যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য নৈতিক ও সামাজিক বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা। ফিরে এল অবক্ষয়বাদ,

অভিব্যক্তিবাদ, ন্যাচারালিজম, অস্তিত্ববাদ যার মূল কথা হল, মানুষ মুক্ত এবং এই মুক্ত ইচ্ছা প্রয়োগ করে, যন্ত্রণা, হতাশা এবং একাকিত্ব ভোগ করেই সে যা চায় তা হতে পারে। এসব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য সামাজিক আন্দোলনকে, ইতিবাচক সমাজ-বাস্তবতার সাহিত্য-আন্দোলনকে প্রতিহত করা, সাথে সাথে সফল মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনাকে বিকৃত করা। দৃষ্টিভঙ্গির লড়াই শুরু হয় ন্যুট-হামসুনের বাস্তবতার সাথে গোর্কির সমাজ-বাস্তবতার। আর তখনই তৈরি হয় কল্লোল গোষ্ঠী। "কল্লোল" নামে পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। এর বিপরীত স্রোতে কয়েক বছর পর প্রকাশিত হয় (পরিচয়), ও (অগ্রণী)। একদিকে পাশ্চাত্য Morbidity-র প্রভাব, অপরদিকে মার্কসীয় চিন্তাভাবনার প্রভাব। এ যেন সাহিত্যের চিন্তাজগতের লড়াই আধুনিকতার সাথে প্রগতিশীলতার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প (বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে) বের হয় "কল্লোলে" এবং সুবোধ ঘোষের গল্প (ফসিল) বের হয় "অগ্রণীতে"। প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে Negative দৃষ্টিভঙ্গির সাথে Positive দৃষ্টিভঙ্গির। Sex এবং Morbidity এই দুটি অস্ত্রকে হাতে তুলে নিলেন কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা এবং প্রগতিশীল লেখকেরা তুলে নিলেন Social Realism-কে। "কল্লোল-গোষ্ঠীর" কাল থেকেই Morbid সাহিত্য গড়ে উঠল। এ সময়ের Morbid literature এর সাথে যুক্ত হল ফ্রয়েডের যুগান্তকারী মনোবিকলন-তত্ত্ব এবং প্রেমের দেহবাদী ব্যাখ্যা। প্রেমেন্দ্র মিত্র কয়েক বছরের জন্যে হলেও "কল্লোল গোষ্ঠীর" লেখক ছিলেন। সে সময় সংগ্রাম ও মূল্যবোধের সপক্ষে অবক্ষয় ও নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন "কল্লোল গোষ্ঠীকে" এবং প্রথম দিকের সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এর পরিণামে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ত্রিশ-দশকের বেশির ভাগ ছোটোগল্পে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে বিষাদগ্রস্থতা, অপ্রকৃতিস্থতা এবং বিষণ্ণতা। আন্দোলন বিমুখ সমাজ-বিচ্ছিন্ন এসব যুগযন্ত্রণা ছোটোগল্প পাঠকের চিন্তা-ভাবনায় যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে স্থিতিশীল নেতিবাচক মনোভাব যা এখনও প্রবহমান।

ত্রিশ-দশকেই লেখা হয়েছে Morbid লক্ষণাক্রান্ত ছোটোগল্প (হয়তো) এবং (তেলেনাপোতা আবিষ্কার) অতিসাধারণ গল্প দুটি। গল্পের থিম সেই কথাই বলে। তবে গল্পের আঙ্গিকে ভাষার শিল্প-সৌকর্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম থেকেই যে কত বড় মাপের ছোটোগল্পকার ছিলেন, তা প্রমাণ করে। প্রধানত মনস্তত্ত্ব ও যৌন-বিকলনকে ঘিরেই Morbidity-র প্রসার এবং বিস্তার। "হয়তো" প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি মনস্তাত্ত্বিক ছোটোগল্প। যৌন মনোবিকলনের সাথে এর সহযোগ। "হয়তো" শব্দটির মধ্যে Perfection নেই, এর ফলে গল্পটির, মধ্যে Perfection তৈরি হয়নি। 'কি হতে পারে, কি হতে পারে' এরকম একটা বিসদৃশ ভাবনার মধ্যে আটকে রেখেছেন গল্পকার। এই ধরনের গল্পকে ইংরেজিতে বলে 'ইনট্রিগ' (Intrigue), কথাটির তাৎপর্য to arouse the interest, desire or curiosity. গল্পের ভাবনা-চিন্তাও ইউরোপ থেকে এসে এখানে বাজার দখল করেছে, সমাজের গতিশীলতায় কোন কাজে লাগে না, তবে অপ্রকৃতিস্থ ভালোবাসার গল্প পড়তে ভালো লাগে। লেখকের যদি এইরকম মনোভাব থাকে 'পাঠক আপনি যাহা কিছু ভাবিতে পারেন', কারণ লেখক গল্পের শেষে একটি

ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'আমার কল্পনার অন্ধকারে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে', তাহলে বলতে হয় লেখক মনস্তাত্ত্বিকতায় পাঠককে জটিল জালে আটকে রেখেছেন। সততই কল্পনাবিলাসী-ভাববিলাসী ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু এরকমই হয় ঃ গল্পের কথক অন্ধকার ঝড়ের রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথে অর্ধ সমাপ্ত একটি কাঠের সেতু তাকে পেরোতে হচ্ছে। সেতুর ধারে তখনও রেলিং দেওয়া হয়নি। ঝড়ের রাতে নদী উথাল পাথাল। সেসময় কথক দেখলেন দুটি অস্পষ্ট মূর্তি, একটি নারী একটি পুরুষ। মূর্তি দুটি বিপরীত থেকে সেতু পার হবার চেষ্টা করছে। মেয়েটির আঁচলে ঢাকা কেরোসিনের আলোয় কথক লক্ষ করলেন, মেয়েটির শীর্ণ রুগ্ন মুখে অসহায় আতঙ্কের ছবি। কথক যখন সেতু পেরিয়ে মূর্তি দুটির পেছনে চলে গেছে, তখন কথক শুনতে পায় মহিলাটির ভয়ার্ত চিৎকার। মহিলাটি সেতুর ধার থেকে টাল সামলাতে না পেরে নিচে পড়ে যেত যদিনা শাড়ির আঁচলটি একটি লোহার বলটুতে আটকে যেত। তখন কথক ও পুরুষটি মিলে মহিলাটিকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনল। কথক শুনল মহিলাটি বলছে, 'আমার যেন মনে হল তুমি আমায় ঠেলে দিলে'। গল্পটি এখানে শেষ হলেও গল্প হতো, কারণ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ওই ঘটনাটি প্রাণিত (impressed) করতে পেরেছিল। কিন্তু গল্পকার আরো একটু এগিয়ে গেলেন। অস্পষ্ট করে শেষটা রাখলেন পাঠকের মনে, ফলে ছোটোগল্পের শেষ বাক্যটি হচ্ছে : 'হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।' এখানে 'জীবনের সেতু'ও 'নদীর সেতু' শব্দগুচ্ছ দুটি মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আবহ তৈরি করে দিতে পেরেছে, লাবণ্য ও মাধুরীর মধ্যে ব্যঞ্জনায় এবং ইঙ্গিতময়তায়।

এই ঘটনার পরেই গল্প শুরু। একটা ঘোরের ভিতর দিয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে গল্পটি নির্মাণ করলেন, যাকে বলা হয় flash back পদ্ধতি। নারীটির নাম দিলেন লাবণ্য, পুরুষটির নাম দিলেন মহিম। মহিম জমিদারী বংশের শেষ বাতি, প্রকান্ড সাত মহলা পুরোনো দালান বাড়ির মালিক। বাড়িটা নোনাধরা ইট-কাঠের স্তূপ। মহিম বিয়ে করে লাবণ্যকে ভুতুড়ে পোড়ো বাড়িতে এনে তুলল। 'চারটি মাত্র প্রাণী এই বিশাল ভগ্নপ্রাসাদের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তিনটি ঘরে বাস করে'। মহিম-লাবণ্য, শীর্ণ পিসিমা, আরেকজন মাধুরী। মহিমের পিসিমা বৃদ্ধ এবং অন্তঃপুরের সম্পদ রক্ষিণী, মাধুরী মহিমের দূর-সম্পর্কের বোন, রূপসী এবং যৌবনপ্রাপ্ত। বিবাহিত জীবনযাপনের কয়েক দিন পরে লাবণ্য বুঝতে পারে তার স্বামী মহিম সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, যার জন্য রাতে ঘুমোবার সময় লাবণ্যের শাড়ির আঁচলের সাথে মহিমের ধুতির খুট শক্ত করে বেঁধে রাখে। আরেক দিন একটি অন্ধকার ঘরে লাবণ্যকে আটকে রেখে মহিম বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে শিকলি লাগিয়ে দেয়। পরে লাবণ্যকে মুক্ত করে মাধুরী।

এই মাধুরী, যাকে বলা হয়েছে মহিমের দূর সম্পর্কের বোন, পরম সৌন্দর্যের উদাহরণ, 'সর্বাঙ্গে পুষ্পাভরণে অলংকৃত করিয়া মাধুরী সাক্ষাৎ বনদেবীর মতোই সাজিয়া আসিয়াছে। তার রূপ দেখিয়া চোখ ফেরানো দুষ্কর।' এই মাধুরীর সাথে এই গল্পের সম্পর্ক কি? মহিমের সাথে মাধুরীর সম্পর্ক কি? শুধুই কি দূর সম্পর্কের বোন? গল্পকার

মাধুরী সম্পর্কে লিখছেন, 'সে যে এ বাড়ির কে, এই পরিবারটির সহিত তাহার সম্বন্ধ যে কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। মহিমকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করে—সুতরাং ভগিনী স্থানিয়া কেহ হইবে। কিন্তু আপনার ভগিনী যে নয়, এ বিষয়ে শুধু চেহারা দেখিয়া নয়, তাহার আচরণ দেখিয়াও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।' এখানেও মাধুরীর সাথে মহিমের সম্পর্ক বের করার জন্য 'হয়তো' শব্দটাকেই ব্যবহার করতে হবে। তাহলে কি মাধুরী লেসবিয়ান, হয়তো লেসবিয়ান, যে মাধুরী অবলীলাক্রমে লাবণ্যকে বলতে পারে, 'তুই সাজবি বর, আমি হব তোর কনে'। লাবণ্য উত্তরে বলে, 'কেন তুমিই বর হও না।' একথা শোনার পর মাধুরী বলে, 'দূর তাহলে মানাবে কেন? আমার এ রূপ কি কোঁচা-চাদরে ঢাকা যাবে রে হতভাগী।' এসব সংলাপের আগেই ওরা দুজন শারীরিক স্পর্শে শিহরিত হয়েছে, 'হঠাৎ কখন কোথা হইতে আসিয়া লাবণ্যের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া হয়তো (আবার 'হয়তো') বলে, 'তোকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছি ভাই, চ, তোকে নিয়ে কোথাও পালাই।' তাহলে এই অবিবাহিত কুমারী মেয়েটি কে, 'যে চওড়াপাড় শাড়ি পরে, সর্বাঙ্গে তাহার বহুমূল্য অলংকার সারাক্ষণ ঝলমল করে, পায়ে আলতা পরিয়া বিম্বফলের মতো অধর দুটি তাম্বুলে রঞ্জিত করিয়া সারাদিন সে পটের ছবিটি সাজিয়া থাকে। অথচ এই মাধুরীর সাথে মহিমের কোনোপ্রকার শারীরিক-মানসিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না গল্পে। রক্ষিতাও নয়, প্রেমিকাও নয়, শুধুই কি দূরসম্পর্কের বোন? তাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না, কারণ মাধুরীর আচার আচরণে সেটাও প্রকাশ পায় না। তাহলে হয়তো (আবার "হয়তো") নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা বিমাতা-শাসিত লাবণ্য বিবাহিত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের আশা আকাঙক্ষার প্রতিচ্ছবি এই মাধুরী। সে হয়তো আশা করেছিল মাধুরীর মতো অবস্থান করবে মহিমের এই সংসারে, কারণ সে একদা সৎ-মায়ের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল, বাপের বাড়ি হইতে কালেভদ্রে খোঁজ লইতে আসে—সেখানে যাইবার কিন্তু তাহার আর উপায় নেই সে বোঝে। মাধুরী সম্পর্কে এইসব চিন্তা-ভাবনা স্বভাবতই এসে যায়, কারণ এই গল্পে মাধুরী অস্পষ্ট।

একদিন মাধুরী লাবণ্যকে একটি আঁধো অন্ধকার ঘরে নিয়ে যায়। বলে মাধুরী 'মজা দেখবি তো আয়'। এই বলে সে লাবণ্যকে পিসিমার ঘরে নিয়ে যায় সে, দেখাল 'গহনা, টাকা, মোহর, মণিরত্ন-এই প্রাচীন লুপ্ত প্রায় পরিবারের সমস্ত সম্পদ বৃদ্ধা বুঝি তাহার ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াচে। সেই সম্পদ আগলাইয়া ডাইনির মতো পিসিমা দিনরাত্রি বসিয়া থাকে।... মাধুরী চোখ তুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা দরজায় দাঁড়াইয়া হিংস্র শ্বাপদের মতো তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। পরক্ষণেই শোনা গেল বৃদ্ধা সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়াছে।'

এই গল্পে এই পিসিমার পরিচয়। ডাইনির মতো যার স্বভাব। কুবেরের সম্পদ রক্ষিণীর মতো যার আচরণ। স্নেহময়ীর মতো পিসিমার আচরণ এখানে লক্ষ করা যায় না। তবে মহিমের অনুগামী বুঝতে পারা যায়। পিসিমার আচরণ-স্বভাব-চেহারার বর্ণনা ও মহিমের প্রতি অনুগামিতা—এসব ঘিরে পিসিমা-কেন্দ্রিক রহস্যের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

এবারে মহিমের স্বভাব-চরিত্র বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র মহিমকে আনলেন কেন, সে কি শুধু নীল রক্তের বহমানতা দেখাবার জন্যে? তার সদর্থক উত্তর খুঁজতে যাওয়া বৃথা। মহিম যখন দূরে যায় সবলে লাবণ্যকে ঘরের ভিতর পুরে চাবি বন্ধ করে দিয়ে যায়। আর সে চলে যাওয়ার পর মাধুরী এসে তাকে মুক্ত করে। আবার মহিম ফিরে আসার আগে তাকে ঘরের ভিতর পুরে দরজা বন্ধ করে রাখে। মহিমের মধ্যে এই মনোবিকলনের আস্তানা তৈরি করেছে তার জমিদারী অস্তিত্ব। সাতপুরুষের জমিদারী অত্যাচার, নারী পীড়ন ও শোষণের রক্ত মহিমের শরীরে প্রবহমান। যদিও জমিদারী জৌলস রাষ্ট্রে এখন আর সেরকম নেই, তবে জমিদারীর শেষ প্রতিনিধি মহিমের রক্তে অন্তঃসলিলা নদীর মতো নীল রক্তের ক্ষীণধারা ক্ষীণধারায় বহে গেছে। এ কথা বুঝতে পারি মাধুরীর কথায় 'মেয়েমানুষের শাপে, হাজার হাজার মেয়েমানুষের শাপে এ বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরের ভিত পর্যন্ত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। অপমান লাঞ্ছনা নেই যা করেনি। তাদের সে-অভিশাপ যাবে কোথায়! যা নিয়ে একদিন ছিনিমিনি খেলেছে। তারই জন্য দুর্ভাবনা আজ তোর বরের বুক কুরে-কুরে খাচ্ছে। ও যে সেই বংশের শেষ বাতি।'

মনোবিকলনের চরিত্রের মধ্যে দুটি সত্তা থাকে, মুখ ও মুখোশের আড়ালে, একটি মানবিক অন্যটি অমানবিক। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে, সংঘাত থাকে। একদিকে মহিম সন্দেহবাতিকগ্রস্ত বিষাক্ত রক্তের অভিশপ্ত পুরুষ, অন্যটি ভদ্রবেশধারী স্বাভাবিক মানুষ। বংশের এসব কুকীর্তির বিরুদ্ধে মুখ খুলে মহিম বলে লাবণ্যকে, 'তুমি জানো লাবণ্য, কত বাধা, রক্তের ভেতর কত বিষ জমে আছে। কিন্তু এ-বিষ থেকে আমি মুক্ত হবই, শুধু যদি তোমার ভালোবাসা পাই।' কি সুন্দর ভাব-মহিমায় মহিম লাবণ্যকে পুনরায় প্রশ্ন করে, 'সাত পুরুষের পাপ দেহ থেকে ধুয়ে ফেলে আবার নতুন জন্ম পাওয়া যায় না?' মনের অসুস্থতাই মনস্তত্ত্বের অন্যতম শর্ত। মহিম সেই অসুস্থতার শিকার। সেটা মহিম নিজেই জানে, যখন মহিম লাবণ্যকে বলে, 'ভালোবাসো, বাসো জানি, কিন্তু অসুস্থ মনে অকারণ সন্দেহ জাগে। সে সন্দেহে মিছে পুড়ে মরি, তোমাকেও পোড়াই।' মহিমের অন্তঃসলিলা নেতিবাচক সত্তাটি নিয়েই এই ছোটোগল্পটি এগিয়ে গেছে পরিণতির দিকে।

সমাজ-বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে প্রথম থেকেই একটা দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব ছিল। সেই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছিল অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লেখা একটি চিঠিতে যার মূলকথা : "নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সুখ নেই; সমষ্টির কাছে, বিস্তৃতির কাছে ধরা দিতে হবে, কেবল সমাজটাকে আর একটু উদার প্রসারিত করে তুলতে হবে।"

(খ)

(১) চারিধারে শুধু ভাঙা নোনাধরা ইটকাঠের স্তূপ... এই জরাজীর্ণ বাড়িটির কোনো এক গোপন কক্ষ... কাঠবেড়ালির দল নির্ভয়ে ভূতপূর্ব রায়বাড়ির ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়া পরস্পরকে তাড়া করিয়া ফেরে... দেউড়ির সিং-দরজা ভেদ করিয়া অশ্বত্থ গাছটি শাখায়-প্রশাখায় বিপুল হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি ছাদে ওঠবার... প্রতিমুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খসে পড়ে...। এই অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে... ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চমবাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এই অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে উপরের দুটি বাক্যাংশের উদ্ধৃতিতে (এক এবং দুই) সদৃশতা আছে। এই সদৃশতা খুঁজে পাওয়া যাবে 'হয়তো' এবং 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে। এরূপ ভগ্নস্তূপ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষে যেতে হলে সাঁকো পেরোতে হবে। দুটো গল্পে তাই আছে। তবে বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও সমাজ-বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ থেকে গেছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে এই দুটি গল্পে উঠে এসেছে নঞর্থক চিন্তাভাবনা। একজন (হয়তো) শহরতলির গ্রামের মানুষ, জমিদার বংশের শেষ বাতি, বিয়ে করে এনে বৌকে তুলেছে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন সাত মহলা দালানে। অপরজনেরা (তেলেনাপোতা আবিষ্কার) শহর থেকে বেড়াতে এসেছে শহরতলির গ্রামে ধ্বংস প্রাপ্ত বিশাল অট্টালিকা দেখতে এবং বেড়াতে, সেখানে যামিনী নামে প্রতারিত এক পাত্রীকে একবন্ধু বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও শহর থেকে পুনরায় গ্রামে আর ফিরে আসেনি বিয়ের প্রতিশ্রুতি রাখতে। দুটি গল্পেই বিয়ের যোগ্য দুটি মেয়ের যন্ত্রণাকাতর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তেলেনাপোতা একটি কাল্পনিক গ্রামের নাম। গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পনায়-ভাবনায় এই শব্দটা এল কিভাবে। আমাদের মনে হয় 'তেলেনাপোতা' শব্দটাকে তিনি এইভাবে আবিষ্কার করে থাকতে পারেন। 'তেলেনা' এই আভিধানিক শব্দটার অর্থ, অর্থহীন শব্দে গানের সুর। সেই সুর এই গ্রামে স্তব্ধ। আর 'পোতা' কথাটির অর্থ ভিটে। এই ভিটেমাটিতে অর্থহীন গানের সুর হয় ছড়িয়ে আছে বা থেমে গেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিন্তা-ভাবনা কি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছড়াটা মাথায় ছিল, " পোড়ো ভিটের পোতার পরে, শালিখ নাচে, ছাগল চড়ে?" ফলে গ্রামের আবহ সৃষ্টিতে 'তেলেনাপোতা' অর্থটা অর্থহীন হয়ে পড়ে না। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই দালানবাড়িটিকে গল্পকার বলেছেন শ্মশানপুরী এবং অজগরপুরী। সেখানে থাকে মণিদার আত্মীয়া বিবাহযোগ্যা যামিনী এবং যামিনীর অসুস্থ মা। মণিদা শহরের এক অফিসে কাজ করে। মাঝে মধ্যে বন্ধুদের নিয়ে এই বাড়িতে আসে। গল্পের শুরু সেখান থেকেই।

যামিনীকে প্রেমেন্দ্র মিত্র রূপকথার গল্পের ঢঙে চিত্রায়িত করেছেন। "এই মৃত্যু সুষুপ্তি মগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপোর কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন।" এই সময়ের রাজপুত্ররা বন্দিনী রাজকন্যা যামিনীকে উদ্ধার করে না, ভালোবাসায় জাগায় না, ঠকায়, প্রতারণা করে। যামিনীর শীর্ণ-জীর্ণ বৃদ্ধা মা বেঁচে আছেন এক করুণ আশা নিয়ে, কবে নিরঞ্জন এসে যামিনীকে উদ্ধার করবে, কারণ যামিনীর মাকে নিরঞ্জন কথা দিয়েছিল, শহর থেকে ফিরে এসে সে যামিনীকে বিয়ে করবে। কিন্তু সে কথা রাখেনি। এবার যারা মণিদার সাথে বেড়াতে এসেছে তাদের মধ্যে একজন পুকুর পাড়ে যামিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নিরঞ্জনের মতো কথা দেয় যামিনীর মাকে, যে সে পুনরায় শহর থেকে ফিরে এসে

যামিনীকে বিয়ে করবে। সেও কথা রাখেনি। সমাজে অসহায় অবহেলিত এই নারী, গল্পকারের কর্কশ ভাষায় ''ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট যামিনীর শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে''। জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ পার হয়ে এখন সে পাথরের মূর্তির মতো শান্ত-করুণ-গম্ভীর, যাকে মণিদা পুরুষতান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে বলেছেন, ''অমন ঘুঁটে কুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে নিরঞ্জনের দায় পড়েছে''। ঠিক এরই প্রতিবাদের ক্ষীণ সূক্ষ্ম কণ্ঠস্বর শোনা যায় কঙ্কালসার যামিনীর মায়ের, 'এই শ্মশানের দেশে-দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না।' সার্থক ছোটোগল্প জীবন-যন্ত্রণার ফসল তুলে আনে। যামিনীর বিবাহ সমস্যা এবং যামিনীর বৃদ্ধা মার আর্তি নিয়ে যে পোকায় কাটা ফুলের মতো নিস্তরঙ্গ জীবনযন্ত্রণাকে যান্ত্রিকভাবে দেখানো হয়েছে মেধা পাঠককে সেই দেখানোটাকে তীরবিদ্ধ করে না। সূক্ষ্ম যন্ত্রণাবোধেরও তীব্রতা আছে। সেটা এই গল্পে নেই। নেই জীবন-যন্ত্রণার তীব্র দহন জ্বালা। সাধারণ এই কাহিনিতে ঘটনাপ্রায় সম্পূর্ণ বর্জিত। এখানে চারিত্রিক দ্বন্দ্ব নেই, ঘটনার টানাপোড়েন নেই। হয়তো আছে মনের ভিতরে, তবে তার ইঙ্গিত প্রকাশ নেই। বন্ধুরা এল, দেখল, চলে গেল। যামিনীর মা এবং যামিনী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার অন্দরে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন এবং স্বপ্নবিলাস যন্ত্রণার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মিশে যায়। নাটকিয়তার ব্যঞ্জনা আছে, থাকলেও দুবার এই ব্যর্থ বাণিজ্যিক গল্পটি নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল। তবে কোনো পরিচালকই পূর্ণেন্দু পত্রী বা মৃণাল সেন সফলতা অর্জন করতে পারেন নি, ব্যর্থ হয়েছিলেন। গিমিক সর্বস্বতার এবং গল্পের ভাষার চাতুর্যের শিকার হয়েছিলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই গল্পের অসফলতার কারণ তিনি জীবন সংগ্রামের মূল্যবোধ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিলেন। সে সময় কল্লোল-গোষ্ঠী প্রভাবিত একশ্রেণির অবক্ষয়বাদ-সমর্থক লেখকদলের সংগ্রামের প্রতি, প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি আস্থাশীলতার অভাব ছিল। ফলে নেতিবাচক জীবনটাকে শৈল্পিক ভাষায় পুরে পাঠকের সামনে তুলে ধরতেন। ওটাই ছিল ওদের কাছে উপর থেকে দেখা (Bird's eye view) বা বই পড়ে ঘরে বসে দেখার বাস্তবতা। 'বইয়ের চেয়ে মানুষকে পড়া অনেক বেশি জরুরি।' এই প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমসাময়িক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে। বিভূতিভূষণের অন্যতম সৃষ্টি অপু চরিত্র। গ্রামের ছেলে হলেও শহরে বসবাসকারী অপুকে দেখেছি গ্রামে গিয়ে অসহায় পরিস্থিতিতে অসহায় একটি মেয়েকে বিয়ে করে শহরে নিয়ে এসেছে। অপুও ছিল ভাববিলাসী-প্রকৃতিবিলাসী-রোমাণ্টিক। কিন্তু সংগ্রামী অপুর মানসিক বাস্তবতা ওর মনে সুস্থ চেতনার পরিবেশ গড়ে দিয়েছিল। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের মণিদার শহুরে বন্ধুদের মতো মানসিক প্রতিবন্ধী ছিল না অপু। হয়তো প্রেমেন্দ্র মিত্র শহুরে বন্ধুদের এই মানসিক প্রতিবন্ধকতাকেই দেখাতে চেয়েছেন।

সেই কারণে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটোগল্পটি এখানে শেষ করেননি, যখন মণিদার বন্ধু নিরঞ্জন সেজে যামিনীর মার কাছে গিয়ে বলে, 'না মাসিমা, আর পালাব না।' গল্পটি

এখানে শেষ করলে আমরা ত্রিশের দশকের এক সাহসী যুবককে পেতাম যে নিরঞ্জনের মতো প্রতারক নয়, যে তৎকালীন প্রগতিশীল আন্দোলনের এক সংগ্রামী সদস্য, অবক্ষয় তাকে ধরাশায়ী করতে পারেনি, মশার কামড় তার চিন্তাকে নষ্ট করতে পারেনি। বলছি কারণ, মশা এবং ম্যালেরিয়া মানুষের চিন্তাভাবনাকে যে পালটে দিতে পারে তার একটা নঞর্থক ভূমিকা আছে গল্পের মাঝখানে এবং গল্পের শেষে, 'তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্য আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে, লেপ তোশক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা জানাবে একশত পাঁচ ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে, 'ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন'।

পূর্বেই বলা হয়েছে "তেলেনাপোতা" শব্দটির সদর্থক প্রয়োগ-সিদ্ধতা নিয়ে। গল্পটির নামকরণ তেলেনাপোতা নয়, "তেলেনাপোতা আবিষ্কার"। তেলেনাপোতা নামে একটি গ্রামকে লেখক আবিষ্কার করেছেন যে গ্রামে আছে এক বিশাল অট্টালিকা। এখন এই প্রাচীন দালানটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। সেই ধ্বংসস্তূপের চারপাশে প্রকৃতি তার গাছপালা-ঝোপজঙ্গল ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশাল অট্টালিকাটি দেখে বোঝা যায় এক সময় এই অট্টালিকার বাসিন্দাদের যথেষ্ট বৈভব ছিল। এখন সেই বৈভবও ধ্বংসপ্রাপ্ত। এখন দারিদ্র এদের সহায়, উদাহরণ কুরূপা যামিনী এবং তার অস্থি কঙ্কালসার অন্ধ মা। আর আছে এই অট্টালিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত মণিদা, শহরে চাকরি করে, দিনরাত মদ্যপান করে সব কিছু ভুলে থাকতে চায়। ছন্দ হারানো এই পরিবারটিকে আবিষ্কার করেছে মণিদার শহুরে বন্ধুরা। মণিদার এক বন্ধু আবিষ্কার করেছে যামিনীকে, আবিষ্কার করেছে প্রতারিত অন্ধ মায়ের আর্তিকে, আবিষ্কার করেছে প্রতারক নিরঞ্জনকে যে যামিনীকে বিয়ে করার কথা দিয়েও বিয়ে করেনি, আর আবিষ্কার করেছে নিজেকে, ম্যালেরিয়া আক্রান্ত নিজের দুর্বল অসহায় মনটাকে। ছবির মতো যামিনী, যামিনীর মা, মণিদা, এই ভাঙা দালান সবই সাজানো ছিল, শুধু খুঁজে পাওয়া। ফলত এই আবিষ্কাব discovery, invention নয়। বন্ধুটির দুর্বল মনের (invention বলা যায়) আবিষ্কারে হেলদোল নেই, টানাপোড়েন নেই, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই, যন্ত্রণা দহন নেই, জীবন-সমীক্ষা নেই। পাঠক এই আবিষ্কারে চমকায় না, পাঠকের ভাবনাকে জাগায় না, বরং নেতিবাচকতার অন্ধকারে দিশা হারায়। সার্থক নামকরণের যে একটি কেন্দ্রিকতা থাকে, শাণিত বিদ্যুৎ-শাসন থাকে, এই গল্পের এই নামকরণে সেই কেন্দ্রিকতা নেই, বিদ্যুৎ-শাসন নেই, ব্যঞ্জনার বিস্তৃতি নেই। এই প্রসঙ্গে দুটি তির্যক এবং অব্যর্থ মন্তব্য, তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্পে ভাবা যায়। তির্যক মন্তব্যটি করেছেন কলা-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য ঃ "স্বপ্ন ও মায়া দিয়ে গড়া এই অবাস্তব রূপকথা প্রেমেন্দ্র মিত্র উপস্থাপনার উৎকর্ষে ছোটোগল্পের শিল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল।" স্বপ্ন ও মায়া, অবাস্তব রূপকথা, উপস্থাপনার উৎকর্ষে, —এইসব শব্দ জগদীশ ভট্টাচার্যের মন্তব্যকে যথার্থ এবং মান্য মন্তব্যে পরিণত করেছে। নিজের সম্পর্কে অব্যর্থ মন্তব্যটি করেছেন স্বয়ং গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র, "বড় দুঃখ আমার এই যে কোনো কাজই ভাল করে করতে

পারলুম না। জীবনের মানেও বুঝতে পারি না।" এই ভাষ্যটি কি বিষাদঘন আত্মসমালোচনার আর্তি? 'জীবনের মানেও বুঝতে পারি না' —এই কথার সূত্র ধরেই কি সমালোচকদের কলমে উঠে এসেছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন ভাববিলাসী কল্পনাবিলাসী? অন্ততপক্ষে ত্রিশের দশকের গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বুঝতে গেলে মনে হয় না প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই মন্তব্যটি মিথ্যাভ্রম বা নম্র বিনয়।

এই গল্প দুটির আশ্চর্যজনক সফলতা অন্যত্র। এর সফলতা কাব্য ব্যঞ্জনায়-শিল্পসুষমায়-গঠনসৌকর্যে-চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগে। এসব হচ্ছে ছোটোগল্পের ভাষা। এসব বাদ দিয়ে একটানা কাহিনিটি লিখে গেলে, 'শোন, একটা গল্প বলি' এরকম চলতি প্রবাদটা কানে বাজবে, তখন সেটা গল্পবলা হল বটে, সেটা আর ছোটোগল্প হয়ে উঠল না। এখানে দুটি গল্প থেকে তার কিছু উদাহরণ তুলে আনা যায়।

(১) তক্তাপোশে ছিন্ন কন্থাজড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে।... আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে। (তেলেনাপোতা আবিষ্কার)

(২) রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এক কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেননি। (ওই)

(৩) মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনর জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে। (ওই)

(৪) দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাতলা কাচের মতো পাখা নাড়ে। (ওই)

(৫) মনে হবে নীচের জলা থেকে এটা ক্রুর কুন্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে। (ওই)

(৬) পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনও তাদের জল-জীবনের প্রথম বড়শি হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। (ওই)

(৭) অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন। (ওই)

(৮) ক্ষীণ-দীর্ঘ-অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে। (ওই)

(৯) ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত, স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে। (ওই)

(১০) পথের ধারের গাছগুলি ঝড়ের তাড়নায় অসহায় বন্দীর মতো মাটির শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। (ওই)

(১১) পথের ধারে গ্যাসের আলোগুলি কেমন নিষ্প্রভ হইয়া গেছে—সমস্ত মানবজাতির আশার সঙ্গে, কেন জানি না তাহার একটা উপমা বারবার মনে আসিতে চায়। (হয়তো)

(১২) হাঁটুভর জঙ্গল, মড়িপোড়া পুরুত, আকখুটে কোথাকার, শ্যাল-কুকুর, নেমকানুন, কাঠকাঠরা জঙ্গোল, বিম্বফলের মতো অধর—এইসব শব্দ এবং শব্দের সুষম ব্যবহার লক্ষণীয়। (ওই)

(১৩) তুমি জানো না লাবণ্য, কত বাধা, রক্তের ভেতর কত বিষ জমে আছে। (ওই)

(১৪) অমানুষিক রাগে ও ঘৃণায় তাহার সেই পরম সুন্দর মুখ বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। (হয়তো)

(১৫) আমার কল্পনার অন্ধকারে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে। (ওই)

ছোটোগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র ওয়াল্ট্ হুইটম্যানের তত্ত্ব 'Reject nothing' কে বা যে কোনো তুচ্ছ বিষয়কে কিভাবে ছোটোগল্পকে আলংকারিক পরিভাষায় যথার্থ প্রয়োগে এবং কাব্যগুণে যথেষ্ট পরিণত করতে পারেন, তার স্পষ্ট উদাহরণ "হয়তো" এবং "তেলেনাপোতা আবিষ্কার"— এই দুটি অপরিণত ও অপ্রকৃতিস্থ ছোটোগল্প।

শরদিন্দুর ছোটোগল্পে, অণুগল্পে
আত্ম-অনুসন্ধান ও অন্তর্ভেদী মানব-সত্তা

প্রাক কথন :

কথা-সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) সম্পর্কে প্রচলিত 'মিথ' গড়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের অ্যাকাডেমিস্টদের লেখায়, ভাবনায়। এঁরা বলে থাকেন, শরদিন্দু ব্যোমকেশের লেখক এবং ঐতিহাসিক কাহিনির অদ্বিতীয় লেখক। এঁরা শরদিন্দু সম্পর্কে যেসব 'মিথ' গড়ে তুলেছেন, তার কিছু উদাহরণ জেনে রাখা ভাল—

(১) শরদিন্দুবাবুর প্রধান কৃতিত্ব অতীত যুগের জীবনযাত্রার পুনর্গঠনে ঐতিহাসিক কল্পনার সার্থক প্রয়োগ। (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

(২) (ক) প্রকৃতির রহস্যজগতের চেয়ে ইতিহাসের তথ্য-লোকের প্রতিই রোমান্টিক শিল্পী শরদিন্দুর অধিকতর আগ্রহ। (খ) তাছাড়া রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পধারায় 'ব্যোমকেশের গল্প, ব্যোমকেশের কাহিনি এবং ব্যোমকেশের ডায়েরি প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুচ্ছের ব্যোমকেশও আসলে শারলক হোমসেরই প্রভাবজাত। (ভূদেব চৌধুরী)।

(৩) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্য রসিকতার জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর রহস্যরসিক মনই তাঁকে ব্যোমকেশের গল্প, কাহিনি ও ডায়েরি রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

শরদিন্দু কিন্তু ইতিহাসকে সাক্ষী রেখেই গল্পের সত্যাসত্য যাচাই করে নিয়েছেন। শরদিন্দুবাবুর রহস্যরসিক মনই তাকে ব্যোমকেশের গল্প, কাহিনি ও ডায়েরি রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে। (সরোজ মোহন মিত্র)

(৪) গোয়েন্দা গল্পের মতো শরদিন্দুবাবু ভূতের গল্প রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। (জগদীশ ভট্টাচার্য)

এবং শরদিন্দু সম্পর্কে আরও যা যা বলা হয়ে থাকে—

(১) শরদিন্দুর রচনা চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য। তাঁর সাহিত্য রচনায় গভীর ও অন্তর্ভেদী জীবন পরিচয়ের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

(২) তাঁর চেতনার গহনে সমসাময়িক কাল-স্রোতের কুটিল স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা গল্পের জগতে প্রবেশ করেছিলেন বিশুদ্ধ রোমাঞ্চ চেতনাময় লিরিক কবিদৃষ্টির সহযোগে। অনেক দূরের মুক্ত আকাশে পালিয়ে যেতে পারার স্বপ্নাবিষ্ট আনন্দ উপভোগ করেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের গল্পগুচ্ছে। (ভূদেব চৌধুরী)

(৩) শরদিন্দুর সরস গল্প সময় কাটাবার অমোঘ উপায়। সাধারণত ছোটোগল্পের মধ্যে যে তির্যকতা, প্রশ্নমূলকতা ও ব্যঞ্জনা প্রধান হয়ে ওঠে শরদিন্দু সেরকম গল্প লিখেছেন

কম। জীবন জিজ্ঞাসা থেকে জীবনের রহস্য উন্মোচনের দিকেই তিনি বেশি লক্ষ্য রেখেছেন। (ড. সরোজমোহন মিত্র)

(৪) সংস্কৃত সাহিত্যের মত, তাঁর সাহিত্যেও আদিরসই উজ্জ্বলতম রস। সর্বোপরী তার দূরাভিসারী জীবনস্বপ্ন এ যুগের সাহিত্যে রোমান্সের রুদ্ধদ্বারের অর্গলমুক্ত করে রসিকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছে। (জগদীশ ভট্টাচার্য)

এইসব পণ্ডিত অ্যাকাডেমিসিয়ানরা উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে কতিপয় ছোটোগল্পের চর্বিতচর্বন করে থাকেন। যথাক্রমে সেসব ছোটোগল্পগুলি হচ্ছে জাতিস্মর, রক্তসন্ধ্যা, চুয়াচন্দন, মৃৎপ্রদীপ, ব্যোমকেশের গল্প-কাহিনি ও ডায়েরি, কানু কহে রাই, ছায়া পথিক ইত্যাদি। ফলতঃ সাধারণ পাঠকদের মধ্যে ধারণা জন্মে গেছে যে শরদিন্দু মানেই ব্যোমকেশের গল্প, জাতিস্মর, চুয়াচন্দন, চিড়িয়াখানা, সজারুর কাঁটা ইত্যাদি। শরদিন্দু মানেই 'ঝিন্দের বন্দী' (চলচ্চিত্রের আকারেও প্রকাশিত)। এভাবেই কথা-সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য-প্রতিভা মূল্যায়নের পরিবর্তে অন্ধকারেই থেকে গেছেন। যারা শরদিন্দুর জন্ম-শতবর্ষে (১৯৯৯) তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করছেন বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও জীবিকা সর্বস্ব পত্র-পত্রিকায় এবং লিটল ম্যাগাজিনে তারা উল্লিখিত অ্যাকাডেমিস্টদের চিন্তা সূত্র ধরেই আলোচনা করছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে বাস্তবতা, প্রগতিশীলতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক মনস্কতা, মানবিকতা, এসব নিয়ে প্রবন্ধ নজরে পড়ে না। অথচ শরদিন্দুর সামাজিক গল্পগুলি পড়লে এইসব তথ্য নজর কাড়ে। শুধু ছোটোগল্প নয়, শরদিন্দু অনেক অণুগল্পও লিখেছেন। কিছু অণুগল্প আছে যা স্মৃতিচারণমূলক হওয়া সত্ত্বেও অণুগল্প হতে পেরেছে, ডায়েরি বা অণুগল্পের খসড়া হয়ে ওঠেনি। এখানে 'গল্প পরিচয়' (৭ম খণ্ড) সংকলক শোভন বসুর তথ্য যোগ করা যায়, "কয়েকটি গল্পে, বিশেষ করে, শেষ জীবনে পুনায় লেখা কাহিনিগুলিতে শরদিন্দুবাবু স্মৃতিচারণ করেছেন। অন্যের কাছে শোনা বা নিজের চোখে দেখা ঘটনার বর্ণনা, কাহিনির মধ্যেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।" শরদিন্দু কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যক্তি-সত্তাকে জড়িয়ে স্বগত-ভাষণে কোনো গল্প লেখেননি। শরদিন্দু কোনো নারীর মোহময় লাস্যরূপের দিকে তাকিয়ে বা নারী-শরীরের অনুপুঙ্খ বর্ণনার প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পাঠকের রাতের ঘুম কেড়ে নেবার চেষ্টা করেননি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্পের পটভূমি মুঙ্গের, পুনা এবং বোম্বাই। সারা সাহিত্য-জীবন (১৯২৫-১৯৬৫) তিনি এই তিনটি স্থানে বেশির ভাগ সময় জীবনযাপন করেছেন। কলকাতায় তার ক্ষণস্থায়ী বসবাস ছিল। শরদিন্দুর অধিকাংশ গল্পে বক্তা 'আমি'। এই 'আমি'কে তিনি কখনও চরিত্রে রূপ দেন, আবার কখনও 'আমি'র ভূমিকায় নিজেই চলে আসেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অণুগল্প ও সামাজিক প্রসঙ্গ :

বাংলা সাহিত্যের অণুগল্পের একটা ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য ছিল যা বনফুলের হাতে পরিপূর্ণতা পায়। শরদিন্দুও অনেক উল্লেখযোগ্য, আলোচনাযোগ্য অণুগল্প লিখেছেন। সেই অণুগল্পগুলি স্বাতন্ত্র্য-প্রভাবে উজ্জ্বল কথনে, আঙ্গিকে এবং বিষয়ভাবনায় পাঠক

মনকে টেনে রাখে। তাঁর প্রথম একপাতার অণুগল্প দুটি ছাপা হয় 'সচিত্র শিশির' পত্রিকায় ১৯২৫ সালে। অণুগল্প দুটির নাম, প্লেগ ও রূপসী।

'ইচ্ছাশক্তি' অণুগল্পটি দেড়পাতার গল্প, ১৯৪৫ সালে লেখা। এই গল্পটি গুজরাতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। গল্পের শুরুতেই আছে, 'মনস্তত্ত্বের এক প্রচণ্ড পণ্ডিত বলিলেন, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা হয় না, এমন কাজ নেই'। গল্পের শেষে আছে, 'পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয় নাই, হইলে জিজ্ঞাসা করিব, ইচ্ছাশক্তি এমন জুয়াচুরি করে কেন?' এই দুটির উদ্ধৃত বক্তব্যেই পাঠক বুঝে নিতে পারবেন শরদিন্দুর সমাজ-মনস্কতার মোটিভ। এছাড়া অণুগল্পটি চল্লিশ দশককে ধরে রেখেছে—'যুদ্ধের বাজার ফাউন্টেন পেনের দাম যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে আমার মতো লেখকতো দূরের কথা, হায়দ্রাবাদের নিজাম ছাড়া আর কেহ কলম কিনিতে পারে বলিয়া তো মনে হয় না।' চল্লিশ দশকের প্রথমার্ধে খাদ্যদ্রব্যের দাম যে আকাশ ছোঁয়া হয়েছিল জানি। কিন্তু কলমের দাম? শরদিন্দু পড়ে জানতে পারলাম। 'ধীরে রজনি' একটি প্রথাবিরোধী অণুগল্প, ১৯৩৮-এ লেখা। দেড় পাতার গল্প। বিষয়ঃ পাশের বাড়ির মাত্র-যৌবনপ্রাপ্ত এক তরুণীর বিয়ে। ওই বয়সে বিয়ের বাসরঘরের ও ফুলশয্যার আনন্দে নিজের মানসিক অস্তিত্ব ও সাংসারিক বাস্তবতা হারিয়ে ফেলেছে। আগামী দিনের নিরানন্দময় জীবনযাপনের পরিবেশ তার মনে আসে না। তারই দুটি চিত্র শরদিন্দু তুলে ধরেছেন, 'তোমার হাতে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর জ্বলিতেছে তোমার অকলঙ্ক দেহবর্তিকায় কুমারী মনের নিষ্কম্প শিখা।' অন্য চিত্রটি হচ্ছে, 'বৌদিদি ঝাঁঝিয়ে উঠিলেন, খবরদার বলছি, বাপ তুললে ভাল হবে না। তুমি কোন নবাববংশের ছেলে শুনি? বলিয়া দুই বছরের ছেলেটাকে দুম্‌দুম্‌ করিয়া পিটিতে লাগিলেন।' তুচ্ছ বিষয়, চিরকালের বিষয়, কিন্তু সাংসারিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। এই বাস্তবতা বর্তমান সময়ে (একবিংশ) মানসিক নির্যাতনে এসে ঠেকেছে। এবং তার পরিণতি ডিভোর্সে। এই গল্পে ব্যবহৃত ইংরেজি কবিতাটি দর্শনবৃত্তে অবস্থান করে, 'When beauty and beauty meet/All naked fair to fair–The earth is crying–sweet–'

'প্রণয়-কলহ' অণুগল্পটির শুরু, 'অরুণা ও হিরণ পিঠোপিঠি হইয়া বিপরীত মুখে বসিয়াছিল।' এই বসার ভঙ্গিটি এখন ক্লিশে হয়ে গেছে। তারপর তারা কবিতায় সংলাপ বলে যাচ্ছে। সেসব সংলাপের ভেতর দিয়ে তাদের প্রণয়-কলহ প্রকাশ পাচ্ছে। ভালোবাসা নিয়ে একঘেয়ে টানাপোড়েন। উল্লেখযোগ্য গল্প নয়। বৈষ্ণব পদের প্রভাব আছে। অপরিণত কবিতার সংলাপ—

নেই আর সেই চুপি চুপি চাওয়া
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—

বিষয় রোম্যান্টিকতার টইটুম্বুর হলেও আঙ্গিকে প্রথাবিরোধিতার লক্ষণ আছে।

'ভাল মানুষের কাজ নয়, অহিংসাতে চিঁড়ে ভিজবে না—মেরে তাড়াতে হবে—ওদের লাথি মেরে তাড়াতে হবে—। মহাযুদ্ধের ঘোলাটে বন্যা অনেক সমাজের ভিত ঢিলা করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।' 'স্বাধীনতার রস' নামে অণুগল্পের মধ্যে উপরের অংশদুটি

পাওয়া যাবে। এই অণুগল্পটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অসাধারণ গল্প। যদি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পনেরোটি অসাধারণ সমাজ-মনস্ক গল্পের তালিকা তৈরি করা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে 'স্বাধীনতার রস' স্থান পাবে। অসাধারণ শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ এবং প্রতিবাদের চাবুক সেটা গল্পের শেষবাক্যটি না-পড়া পর্যন্ত বুঝতে পারা যাবে না। গল্পের উপস্থাপনাটিও গতানুগতিক নয়, 'পনেরোই আগস্ট ভোরবেলা একটা চায়ের দোকানে বসিয়া চা পান করিতেছিলাম। সারা রাত্রি ছাপাখানার কাজ গিয়াছে; এই খানিকক্ষণ আগে খবরের কাগজ বাহির করিয়া দিয়া বাড়ি যাইতেছি। রাত্রি বারোটায় যে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল...।'

এখানে যে মহোৎসবের কথা বলা হয়েছে সেটা আমাদের পনেরোই আগস্টের প্রথম দিনের মহোৎসব। ১৯৪৭ সালে গল্পটি লেখা হয়েছিল।

বক্তা ছাপাখানার কর্মী আত্মকথন থেকে বেরিয়ে এলেন। 'বল হরি, হরি বোল শব্দে চট্‌কা ভাঙিয়া দেখি রাস্তা দিয়া মড়া লইয়া যাইতেছে—।' কেষ্টর বাবা নবগোপালবাবু মারা গিয়াছেন।' বক্তা ছাপাখানার কর্মী, বলছেন, 'কেষ্ট ছাপাখানায় আমার অধীনে কাজ করে, কাল রাত দেড়টার সময় বাপের অসুখ বাড়ার খবর পাইয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল।'

বক্তা কেষ্টর কথা বলতে বলতে শবযাত্রা থেকেও সরে এলেন। তিনি বলছেন পুনরায়, 'নবগোপালবাবুর জীবন ও মৃত্যুর যে ইতিহাস শুনিলাম তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।'

নবগোপালবাবু বিলাতী সওদাগরী অফিসের বড়বাবু ছিলেন। একদিন ইংরেজ সাহেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। ফলে নবগোপালবাবুকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়। এরপর থেকেই নবগোপালবাবু পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর ১৫ই আগস্টের প্রথম দিনটি এল। 'রাত্রি বারোটার সময় চারিদিকে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। মেয়েরা হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। রাস্তায় রাস্তায় লোক গমগম করিতেছে।' পক্ষাঘাতগ্রস্থ নবগোপালবাবুও রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। সেসময় দেখলেন এক ইংরেজ-নাবিক রাস্তা দিয়ে আসছে। নবগোপালবাবুর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। নাবিকটা যখন নবগোপালবাবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নবগোপালবাবু তাকে একটি লাথি মারলেন।

এরপর নবগোপালবাবু সেদিনই মারা যান।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২ পৃষ্ঠায় এই অণুগল্পটি শেষ করছেন, 'চায়ের দোকানের ছোকরার আক্ষেপ মনে পড়িল—ভদ্দরলোকের সইল নাহে। নতুন স্বাধীনতার রস বড় উগ্র। নবগোপালবাবু সহ্য করিতে পারেন নাই। এখন আমাদের সহ্য হইলে হয়।' ১৩৫৪ সালে লেখা। স্বাধীনতা দিবস ষাট বৎসর পেরিয়ে গেছে। এখন আমরা স্বাধীন দেশে কি দেখছি এবং কি ভাবছি ভাবতে গেলেই ক্রান্তদর্শী শরদিন্দুর এই শক্তিশালী অণুগল্পটির কথা বারবার মনে পড়ে যায়। নাম পুনরায় উচ্চারণ করছি শ্রদ্ধার সঙ্গে 'স্বাধীনতার রস'।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ অণুগল্প উত্তম পুরুষে লেখা। 'মুষ্টিযোগ' নামে ২ পৃষ্ঠার অণুগল্পটিও উত্তম পুরুষে লেখা। মুষ্টিযোগ কথাটির অর্থ টোটকা ওষুধ। এটাই প্রচলিত অর্থ। অন্য একটি বিশেষ অর্থ আছে, 'কাহারো অহিত করিবার জন্য বিশেষ মন্ত্র।' এরকমই একটি উদ্দেশ্য-প্রধান বিষয়ভিত্তিক অণুগল্প।

গল্পটির শুরু, 'পুনায় আমার পাশের বাড়ির একতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছেন। নাম শম্ভুশঙ্কর লেলে'। এই শম্ভুশঙ্কর লেলেকে নিয়েই গল্প। তিনি নাগপুরে কোনো এক কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই পণ্ডিত ব্যক্তিটি কারওর সঙ্গে কথা বলেন না। ভুরু কুঁচকে চলে যান।' উত্তমপুরুষটি তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অপমানিত হয়েছেন। কুকুরের তাড়া খেয়ে একদিন শম্ভুশঙ্কর উত্তমপুরুষটির ঘরে চলে যেতে বাধ্য হন। একজনের অহঙ্কার এবং বিচ্ছিন্নস্বভাব নিয়ে সমাজে বসবাস করা যায় না। শম্ভুশঙ্কর লেলের মতো সবাই উপহাসের পাত্র হয়ে যান। এই গল্পে সমাজ-মনস্কতার সঙ্গে সঙ্গতভাবেই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসে গেছে, 'মানুষ যদি পেটভরে নিজের পছন্দসই খাবার খেতে পেত, তাহলে সেও স্বাধীনতা চাইত না।' যদিও এই কথাটার মধ্যে গল্পের শ্লেষ আছে। কারণ শরদিন্দু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, পশুরা জঙ্গলে খাবার না পেলে খাঁচায় ফিরে আসে।

অণুগল্পটির নাম 'অবিকল'। গল্পটি পড়ে মনে হল অন্য নাম হলে গল্পের মূলভাবনাটি আকর্ষণীয় হত। শুরুটা চমৎকার, কারণ 'নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার ফলে মনটা মাঝে মাঝে ফাঁকা হয়ে যায়, তখন সেই শূন্যস্থানটা ভরাট করার জন্যে মনের অন্ধকার কোণ থেকে দু-একটা বহু পুরোনো স্মৃতি বেরিয়ে আসে। আজ তেমনি একটি স্মৃতিকথা লিখছি।'

তারপর গল্পের শুরু। আঙ্গিকের ব্যতিক্রমতা অন্যমাত্রা এনে দেয় আড়াইপাতার গল্পটিকে। পাটনা ও মুঙ্গেরের মধ্যে যাতায়াত করতে হলে কিউল জংশনে গাড়ি বদল করতে হয়। এই নির্জন কিউল স্টেশনে দুজন রেলযাত্রীর মুখোমুখি দেখা হয়। একজন উত্তমপুরুষ, গল্পের বক্তা এবং অপরজন মুসলমান। এবার গল্প থেকে বিশেষ অংশ তুলে আনা যাক, 'স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। এ যে অবিকল আমারই মুখ।' এখানেই মুসলমানের মুখ, হিন্দুর মুখ হয়ে যায় বা হিন্দুর মুখ, মুসলমানের মুখ হয়ে যায়। আর তখনি ধর্মমুক্ত মানুষবোধ জেগে ওঠে। বিষয়ের নতুনত্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃঢ়তা অন্যমাত্রা পেয়ে যায়। চল্লিশ বছর আগের ছোটোগল্পকার শরদিন্দুকে মনে হচ্ছে বর্তমান সময়ের শরদিন্দু যিনি আমাদের অনুরোধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর একটি ছোটোগল্প 'অবিকল' লিখে দিলেন।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মানসিক যন্ত্রণাকে ধরে রেখেছে 'বুড়োবুড়ি দুজনাতে' এই অণুগল্পটি। গল্পের শুরু, 'পুনায় আমার বাড়ির খুব কাছেই পেশোয়া পার্ক'। সেই পার্কের একটি বেঞ্চিতে একজোড়া বুড়োবুড়ি বসে আছে। ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়। বুড়ো বিপত্নীক, আর বুড়ি বিধবা। পঞ্চাশ বছর আগে এদের প্রেম ছিল। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধের চাপে তাদের বিয়ে হয়নি। ফলে দুজনেই অন্যজনকে বিয়ে করে। ওদের নাতি-নাতনি হয়। বুড়োর স্ত্রী এবং বুড়ির স্বামী মারা যায়। গভীর বেদনা থেকেই বোধহয় ব্যঙ্গ-কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসে, ফলে লেখক এরকম বাক্য লিখতে পারেন, 'ব্যস, লাইন ক্লিয়ার'। একদিকে বুড়ো-বুড়ির পুনর্মিলনে সমাজ-শাসন নেই, অন্যদিকে ওই পার্কে বসে বুড়োর নাতনির সঙ্গে বুড়ির নাতির' প্রেমপর্ব চলছে। সেখানেও এখন আর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-শাসন নেই। তবে এই গল্পে শরদিন্দু আরও গভীরভাবে পরিবর্তিত সমাজ বিশ্লেষণে নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারতেন।

'শুক্লা একাদশী' সাধারণ মানের অণুগল্প। ছোটোগল্পের ট্রাডিশনাল সংস্কার মতো শেষে একটি অতিসাধারণ তাৎপর্যহীন চমক আছে। শুক্লা একাদশীতে বিনয় বাঁশি বাজায় ছাদে। অন্য ছাদে একটি মেয়ে সেই বাঁশি শোনে। পরে মেয়েটি, বিনতা যার নাম, বিনয়ের সঙ্গে আলাপ করে, বন্ধুত্ব করে কিন্তু বিনয় বিনতাকে ভালোবাসার কথাটা জানাতে পারে না। ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে অন্যকথা বেরিয়ে আসে, 'বিনতা, আজ শুক্লা একাদশী। ...তোমার মুখ এত শুকনো কেন? যেন সমস্ত দিন কিছু খাওনি?' এই প্রশ্নে বিনতার উত্তরটাই হচ্ছে অণুগল্পটির শেষ বাক্য, 'সত্যিই আজ সমস্ত দিন খাইনি। আজ যে একাদশী'। একটা ধর্মীয় অনুশাসনই ভালোবাসার বুকে ছুরি বসিয়ে দিল। আহত শুক্লা একাদশী জোছনা ছড়ানো ধুলায় কাতরাচ্ছে। একসময় মেয়েদের গোপনে ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করার, ভালোবাসার সম্পর্ক ও শারীরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করত ছাদ। এখন ছাদের সেই গুরুত্ব আর নেই। এখন ফ্ল্যাট কালচার হলেও সন্তোষী মার শুক্রবারের উপবাস নতুন ধর্মীয় উপসর্গ দেখা যায়। তা হলেও ষাট বছর আগের ধর্মীয় অনুশাসন মানবিকতার রাস্তা ধরে এগোচ্ছে, কুসংস্কারের আগাছা তুলতে তুলতে।

'আর একটু হলেই' অণুগল্পটি স্মৃতিচারণমূলক গল্পেই রয়ে গেছে। সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ। লেখক বম্বে শহরের উপকণ্ঠে থাকেন। লেখক ভৈয়ার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। ভৈয়া চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়। লেখক টেনে তোলেন। না তুললে প্রাণে মারা যেত। উত্তর প্রদেশ থেকে আগত গোয়ালাদের ভৈয়া বলে। এরা দিনের বেলায় দুধের ব্যবসা করে, রাতে গুণ্ডামি, খুনখারাপি করে। একদিন রাতের বেলা এই ভৈয়া লেখককে ধরেন। পরে চিনতে পেরে ছেঁড়ে দিয়ে পালায়। উপকারী ব্যক্তিকে কেউ ভুলে না। এটা একটা নীতিবাক্যমূলক অণুগল্প। স্বভাবতই গল্পটি অসামান্য হয়ে উঠতে পারেনি। 'অপরিচিতা' অণুগল্পের একটা সামান্য ঘটনার ভেতর দিয়ে শরদিন্দু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দশ/বারো বছর সুখী দাম্পত্য জীবন কাটালেও স্ত্রী কখনও কখনও অপরিচিত থেকে যায়। তবে লেখার কৌশলটি আকর্ষণীয়। যে স্ত্রী সারাক্ষণ সংসার নিয়ে ব্যস্ত, উদাহরণ, 'পাওনাদার মিনসে এসেছিল—বলে গেছে'—সেই স্ত্রীর মধ্যে লুকিয়ে আছে কবিতা এবং কবিতার প্রতি ভালোবাসা। এখানেই সে স্বামীর কাছে অপরিচিতা। সামান্য বিষয়, অসামান্য দ্যোতনা।

শরদিন্দুর প্রথাবিরোধী ছোটোগল্প ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ :

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য সমাজ-চৈতনিক ছোটোগল্প আছে। ত্রিশের ও চল্লিশের দশকের সামাজিক অবস্থানকে সেখানে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতি কিভাবে সমাজকে আগোছালো করে তুলে ছিল তারও নিদর্শন পাওয়া যায়। সে সময়কার কোনো ছোটোগল্পকারই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। শরদিন্দুও পারেননি।

'শাদা পৃথিবী' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অসাধারণ প্রথাবিরোধী ছোটোগল্প।

গল্প নেই, গল্পের সূত্র আছে, গল্পের ব্যঞ্জনা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে। শরদিন্দু এই গল্প প্রসঙ্গে বলেন, 'শাদা পৃথিবী' রচনাটি ঠিক গল্প নয়; উহা আমার মনের উপর আণবিক বোমার প্রতিক্রিয়া।' এখনও মনের প্রতিক্রিয়া নিয়েও প্রথাবিরোধী ছোটোগল্প লেখা হচ্ছে। অশীতিবৎসর বয়স্ক স্যার জন হোয়াইটের প্রবন্ধ নিয়ে গল্পের শুরু। থাকেন লন্ডনে। তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, কর্মী ও ভাবুক। পাশ্চাত্য জগতে তিনি একজন ঋষি বলে পরিচিত। ছোটোগল্পটির পটভূমি আণবিক বোমা এবং শ্বেতসন্ত্রাস। গল্পটি পড়ে কবি কালিদাস রায় তার প্রতিক্রিয়া শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, 'শাদা পৃথিবী গল্পটি আমাকে বিচলিত করিয়াছে।' ছোটোগল্পটি তিনি তেরোটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ে তারিখ এবং সাল (১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত) দিয়ে আণবিক বোমার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন স্যার জন হোয়াইটের। কখনও কখনও লেখক সেই প্রতিক্রিয়ায় একাত্ম হয়ে গেছেন। শেষ অধ্যায়ে ছোটোগল্পের রীতি অনুসারে স্যার জন হোয়াইটকে এনেছেন। 'শাদা পৃথিবী' থেকে লেখকের কিছু মূল্যবান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : (১) সকলেই জানে এই বিস্তীর্ণা পৃথিবীতে সকলের জন্যই পর্যাপ্ত স্থান আছে—যৌথভাবে কাজ করিলে সকলের জন্যই প্রভূত খাদ্য উৎপন্ন করা যায়—তবু কেন এই মারামারি হানাহানি? (২) বুদ্ধ-যিশু-গান্ধীর পথে চলিবার আর সময় নাই। ভাবালুতার বাষ্পোচ্ছ্বাসে এই সমস্যাকে ঘোলা করিয়া তোলাও নিরাপদ নয়; (৩) মানুষের বিজ্ঞান-বুদ্ধি তাহার বিবেক-বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। (৪) খ্রিস্টের অনুশাসন মানুষের জীবনে ব্যর্থ হইয়াছে। এরপরেও কি বলা যায় শরদিন্দু রহস্যের লেখক, ঐতিহাসিক উপন্যাসকার, স্বপ্নলোকের লেখক, রোমান্সের লেখক! মানবিকতা এবং প্রগতিশীলতা তার কলমকে শাণিত করেছে 'শাদা পৃথিবী'। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় শরদিন্দুর স্মরণযোগ্য অসাধারণ মন্তব্য 'আণবিক বোমা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যজাতির জীবনের ধারা পরিবর্তিত হইয়াছে। অতীতের সহিত তাহার ধারা বাহ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে।... কৃষি মানুষের জীবন সম্ভাবনাকে বাড়াইয়া দিয়াছিল আণবিক বোমা করিয়াছে ঠিক তাহার বিপরীত।'—এই সত্য থেকেই 'শাদা পৃথিবী' গল্পটিকে ধরা হয়েছে। মানবিক সমাজের প্রতি শরদিন্দুর গভীর অনুরাগ। তাঁকে শ্রেষ্ঠ সামাজিক গল্পকার হিসেবে গণ্য করি। এরকম আরও গল্প আছে।

১৩৪০ সালে মুঙ্গের শহরে একটা ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল। তারই চেহারা দেখা যায় শরদিন্দুর 'মরণ দোল' ছোটোগল্পটিতে, নিজের চোখে দেখা ঘটনা, 'আড়াই মিনিটের মধ্যে সাত শতাব্দীর কীর্তি একটা শহর তাসের বাড়ির মতো ধুলিসাৎ হয়ে গেল। উঃ! কী ভীষণ শক্তি। আমার বিশ্বাস, জার্মান হাউইট্‌জার দিয়ে বারো ঘণ্টা বোম্বার্ড করলেও এমনটা করতে পারত না।' এরকম একটা ভূমিকম্পের হাত থেকে একটি পরিবার কিভাবে রক্ষা পেল, তা নিয়ে এই গল্পটি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'ভূমিকম্প' নিয়ে একটি সার্থক গল্প লিখেছিলেন। তবে সেই গল্পে একটি সমাজ-দার্শনিকতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু শরদিন্দুর গল্পে সেটা লক্ষ্য করা না গেলেও একটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য আছে, (১) পয়লা মাঘ ১৩৪০, ভূমিকম্পের দিন, (২) বেলা দুটো বেজে বারো

মিনিটের সময় ভূমিকম্প হয়ে গেছে, (৩) নীচে, উইঢিবির উপর উইয়ের মতো অসংখ্য লোক ইটের স্তূপের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, (৪) পঞ্চাশ টন ইটসুরকি সরাবার চেষ্টা করছিল ইত্যাদি। বড়দা চরিত্র দিয়ে গল্পের শুরু, 'মুঙ্গের শহর বলিয়া যাহা এতকাল পরিচিত ছিল তাহারই একপ্রান্তে আমাদের ক্লাবের বিধ্বস্ত বিমথিত ঘরখানার বাহিরে আমরা কয়েকজন ক্লাবের সভ্য বসিয়া ছিলাম। ...বড়দার গায়ে কেবল একটা গেঞ্জি—বাহুর একটা স্থান কাটিয়া ধুলায় রক্তে মাখামাখি হইয়া শুকাইয়া ছিল।' এই বড়দা চরিত্র দিয়ে গল্পের শেষ। ভয়ংকর বিপদের সময় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি অলৌকিক কণ্ঠস্বর থাকে যে বুদ্ধি যোগায়। বড়দা সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল এবং খুনি ভূমিকম্পের হাত থেকে সস্ত্রীক বেঁচেছিল। শরদিন্দু এখানেই ছোটোগল্পটিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

'ডিকটেটর' ছোটোগল্পটিও শরদিন্দুর একটি অসাধারণ ছোটোগল্প। মাত্র আড়াই পাতার গল্প, অথচ কি শক্তিশালী গল্প। এই গল্পে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে মুস্তাফা কামাল, মুসোলিনি, হিটলার ও স্ট্যালিনের নাম। ডিকটেটর হিসেবে শরদিন্দু এই তিনজনকে একসারিতে বসিয়েছেন। শোষকের একনায়কতন্ত্র এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র একসারিতে বসতে পারে না। শরদিন্দু রাজনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানটা ভাল বুঝতেন না। স্ট্যালিন ছিলেন সর্বহারার নেতা, শ্রমিকশ্রেণির নেতা। গল্পের বিষয় খুবই সাধারণ। এই গল্পে আদিবাসীর প্রতি শরদিন্দুর মমতা-বোধ লক্ষ্য করার মতো। একটা প্রায় ন্যাংটো ছেলের গল্প। বয়স বড়জোর সাত বছর। এই আদিবাসী দরিদ্র ছেলেটি দশ/বারোটা হাতির মতো প্রকাণ্ড মোষ চরাতে নিয়ে যায় মাঠে। মোষের মতো কালো ছেলেটি। কোমরে ঘুনসি ছাড়া লজ্জা নিবারণের আর কোনো উপকরণ নেই। হাতে থাকে পেন্সিলের মতো সরু একটা লাঠি। এই দরিদ্র ছেলেটির সঙ্গে একটা উপমা টেনেছেন গল্পের কথক, 'মধ্যম নাতির বয়শ পাঁচ বছর, অতিশয় ক্ষীণকায় ব্যক্তি। হাত-পা কাঠির মতো।' এই নাতিকে নিয়ে গল্পের কথক যাচ্ছেন পুণার পেশোয়া পার্কে হনুমান, বাঘ, সিংহ, খট্টাশ, নানা জাতের বানর, নানা জাতের পাখি দেখাতে। একটা বিশাল মাঠ পেরিয়ে পেশোয়া পার্কে যেতে হয়। সেই মাঠে ন্যাংটো আদিবাসী ছেলেটার মোষগুলি চরছে। নাতির গায়ে লাল রঙের সোয়েটার দেখে মোষগুলো শিঙ বাগিয়ে কথক ও নাতির দিকে এগিয়ে আসছে। পালাবার পথ নেই। মোষগুলো ওদেরকে সপ্তরথীর মতো ঘিরে ধরেছে। দশ-বারো গজের মধ্যে মোষগুলো এসে পড়েছে। আর রক্ষে নেই। সেই মুহূর্তে প্রায় ন্যাংটো ছেলেটা মুখে আওয়াজ করল, টক্-টক্-টকাস টকাস। চোখ খুলে দেখি মোষগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর এগুচ্ছে না।' কথক-চরিত্রটি বিস্মিত ন্যাংটো আদিবাসী ছেলেটার অলৌকিক ক্ষমতা দেখে। একটা বাচ্চা ছেলে সামান্য আওয়াজে প্রকান্ড মোষগুলোকে থামিয়ে দিল। প্রগতিশীল গল্পকার শরদিন্দু ছোটোগল্পটি শেষ করছেন, 'ডিকটেটরদের আমরা ভালোবাসি না। ওরা মানুষ ভাল নয়, জনগণের শক্তি অপহরণ করে ওরা জনগণকেই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।... কিন্তু এই অতিমানুষিক শক্তি মাঝে-মাঝে আমার মতো সাধারণ মানুষের খুব কাজে লাগে।'

শেষপর্যন্ত সামান্য এই ঘটনার ভেতর দিয়ে শরদিন্দু অনুভব করতে পেরেছেন যে ডিকটেটরদের দুটো ভাগে ভাগ করা যায়— (১) যারা জনগণের শক্তি অপহরণ করে জনগণকেই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, (২) ডিকটেটরদের অতিমানুষিক শক্তি যা সাধারণ জনগণের খুব কাজে লাগে। এখানেই ছোটোগল্পটির নামকরণের সার্থকতা এবং এখানেই ছোটোগল্পটির সার্থকতা যেখানে শরদিন্দু গল্পের বিষয় থেকে বেরিয়ে এসে পাঠকের চিন্তা-ভাবনাকে পৌঁছে দিয়েছেন প্রগতিশীল (?) ও মানবিক চিন্তা-ভাবনার জগতে। একেই বলে সার্থক ছোটোগল্পের ব্যঞ্জনা বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

এই 'ডিকটেটর' ছোটোগল্প সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করা যেতে পারে যা শরদিন্দুর প্রগতিশীল ও রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাকে চিনতে বুঝতে পারা যায়—(১) মানুষ ও পশুর মধ্যে নিবিড় সখ্যতা। আবার একদিকে কঠিন শাসন, অন্যদিকে নির্বিবাদ আনুগত্য, (২) কেন দেশসুদ্ধ লোক গড্ডালিকা প্রবাহের মতো এদের অনুসরণ করে, কেন কান ধরে এদের গালে থাবড়া মারে না?

একবিংশ শতাব্দীতে এসব কথা এখনও সচল এবং গতিশীল। এই ছোটোগল্পটি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রতিক্রিয়াটি বিশেষভাবে স্মরণীয়, 'রচনার গুণে সাধারণ কাহিনির মধ্য দিয়ে কিরূপ অপূর্ব সাহিত্যরস সৃষ্টি এবং মনুষ্যচিত্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা যায় এ বইখানি তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ...ডিকটেটর এই শ্রেণিভুক্ত।'

'পতিতার পত্র' ছোটোগল্পে যৌনতা নেই, যথার্থ প্রেমই আছে। আর আছে রাজনৈতিক স্বার্থজনিত চরিতার্থতা। তবে কিছু যৌন প্রসঙ্গ এসেছে গভীর মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে। রাম-লক্ষ্মণ দুজন রাজনৈতিক কর্মী। দেশজোড়া নাম, দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। রাম হচ্ছেন নরমশরম, আর লক্ষ্মণ যেন গনগনে হোমের আগুন। রামের চেহারা ভারি মিষ্টি। লক্ষ্মণের শরীর লম্বা, চওড়া-কঠিন। মুখে হিমালয়ের গাম্ভীর্য। দুজনে একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে যায় রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে। একবার বাংলাদেশের পশ্চিমসীমানায় এক উকিলের বাড়ি এলেন রাম-লক্ষ্মণ। সেই বাড়িতে থাকত উকিলের বিধবা মেয়ে সুলোচনা। সুলোচনার কণ্ঠস্বর শোনা যাক, 'আমার তখন ভরা যৌবন; যৌবনের স্বাদ পেয়েছি, কিন্তু সাধ মেটেনি।' সেই সুলোচনার উপর দায়িত্ব পড়েছে রাম-লক্ষ্মণের সেবাযত্নের কারণ এই দুই রাজনৈতিক নেতার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে উকিলের বাড়িতে। সুলোচনা বলছে, 'আমি দুজনকেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম।' রাম সুলোচনার প্রেমে পড়ল। এই প্রেম রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী লক্ষ্মণ সহ্য করতে পারল না। লক্ষ্মণ সুলোচনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সুলোচনাকে কাশী নিয়ে যায়। সুলোচনা বলছে, 'লক্ষ্মণ আমাকে কাশীর একটা অন্ধকার সরু গলিতে একটা বাড়িতে তুললেন। বাড়িটা ছিল আধবয়সী এক পতিতার বাড়ি।' এভাবেই রাজনৈতিক কর্মীর দ্বারা উকিলের কন্যা সুলোচনা পতিতা হয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতা লক্ষ্মণ বলছেন, 'রাম যদি তোমাকে বিয়ে করত, তাহলে দেশের কাজ আর করত না, তোমাকে নিয়েই মেতে থাকত।' এভাবেই রাজনৈতিক কুটিল স্বার্থে শিক্ষিত পরিবারের বিধবা কন্যাকে হয়ে যেতে হয় বেশ্যা রাজনৈতিক নেতার প্ররোচনায়।

এখানে দুটি মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন চলে আসতে পারে, রাজনৈতিক স্বার্থে নাকি, লক্ষ্মণের নিজের শারীরিক-মানসিক স্বার্থে সুলোচনাকে পতিতা হতে হল? সুলোচনা দুজনকেই ভালোবাসে। এখানে পলিগ্যামি লক্ষ্মণ-সুলোচনার মধ্যে দেখা যায়। সময়টা চল্লিশের দশক, তখন গান্ধীর নেতৃত্বে 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলন চলছে। সুলোচনার পত্র দিয়ে ছোটোগল্পটি শেষ হয়েছে। তারপর ডাক্তারের একটি ফুটনোট আছে। ফুটনোটটা শ্লেষ-বিদ্রূপের চাবুকের মতো কাজ করবে পাঠকের মনে, 'লক্ষ্মণ কেন্দ্রীয় শাসক মণ্ডলের উচ্চস্থ ব্যক্তি।' ১৩৬৬ সালে পতিতার পত্র' ছোটোগল্পটি লেখা। তখন দেশ স্বাধীন। বারো বছর পেরিয়েছে।

গীতা নামক ধর্মীয় পুস্তকটি কি নেশাকে নাশ করতে পারে? গীতা নানারকম নেশার যন্ত্রণা থেকে কি মানুষকে মুক্তি দিতে পারে? 'গীতা' নামে ছোটোগল্পে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও ধর্মকে এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন শরদিন্দু। বড়ো ভাইয়ের বড়লোক হবার নেশা, ছোটোভাইয়ের পঞ্চ-মকারে নেশা। এই গল্পে শরদিন্দুর একটি প্রগতিশীল মনকে ধরা যায়। পঞ্চ-মকারে আসক্ত মনটাকে সরিয়ে আনার জন্যে মুকুন্দবাবু ভাইপো নগেনকে 'গীতা' পাঠিয়েছিলেন। বাবা এবং কাকার সকল পাওয়া-সম্পত্তি নগেন শেষ করে দরিদ্র অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। সেসময় তার দাদা খগেন শেয়ার মার্কেটে সব পাওয়া-সম্পত্তি খুইয়ে দশ হাজার টাকা চাইতে এসেছে নগেনের কাছে। তারপর শরদিন্দু ছোটোগল্পটি শেষ করলেন নগেনের সংলাপ দিয়ে। 'এবার নগেন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'দশ হাজার টাকা!—একটা জিনিস আছে গীতা। আয় দাদা, গীতা বিক্রি করব। একটা টাকা পাওয়া যাবে না? তুই আট-আনা নিস, আমি আট-আনা নেব।' তারপর নগেনের হাসি, 'হা-হা-হা'। কি গভীর ব্যঞ্জনা। জীবনের মূল্যবোধ কোথায় এসে ঠেকেছে! গল্পটি লেখা হয়েছে ১৯৫৪ সালে।

'মন্দলোক' ছোটোগল্পটি এক পতিতা ও তার কন্যার কাহিনি। এই মন্দলোকটির হৃদয়-মন থেকে শরদিন্দু ছেঁকে তুলেছেন বাৎসল্যকে, কৃতজ্ঞতা ও মানবিক বোধকে। পতিতার বয়স বছর চল্লিশ। পাপ-ব্যবসায়ের একমাত্র মুনাফার উৎস তার একমাত্র মেয়ে ঋতুরানী, সে অসুস্থ। এবং এটাই পতিতার বেঁচে থাকার ধারাবাহিকতা। ফলে কন্যাকে সুস্থ করে তুলতেই হবে এবং পরে পতিতা-বৃত্তিতে নামাতে হবে। সারা জীবনের সঞ্চয় খরচ করেও কোনো ডাক্তার ঋতুরানীকে সুস্থ করে তুলতে পারেনি। আসলে ডাক্তাররা সুস্থ করে তুলতে চাননি। সারাবার নাম করে ঋতুর পতিতা মায়ের কাছ থেকে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। পরে এক সহৃদয় হোমিওপ্যাথীর যুবক-ডাক্তার কোনো পয়সা না নিয়ে সততার সঙ্গে পতিতা-কন্যার অসুখ সারিয়ে দেয়। এরপর ঋতুকে প্রথম দেহ-ব্যবসায় নামানো হবে। পতিতাদেরও ধর্মীয় অনুশাসন আছে। প্রথম মিলন হবে একজন সৎ পুরুষের সঙ্গে। হোমিওপ্যাথীর যুবক ডাক্তারকে সৎ ও সজ্জন ভেবে তার কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেল ঋতুর মা, ঋতুর শুভমিলন রাতটা যেন তিনি গ্রহণ করেন। প্রস্তাব শুনে 'অজস্র গালাগালি দিয়া অকৃতজ্ঞ পতিতা স্ত্রীলোকটাকে তাড়াইয়া দিলাম।' কুড়ি বৎসর পর চল্লিশ বছর বয়সে সেই ডাক্তার অনুভব করলেন, 'ঋতুর মাতা 'মন্দলোক' ছিল বটে, কিন্তু বোধহয় অকৃতজ্ঞ ছিল না। ...ঋতুর মাতা আমাকে পাপপথে প্রলুব্ধ করিতে আসে

নাই, বরং তাহার পরিপূর্ণ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছিল—তাহার দীন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান পূজারিনীর মতো আমার পদপ্রান্তে রাখিয়াছিল।' এখানেই ছোটোগল্পটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এক মা-পতিতার মহিমান্বিত চরিত্রটি ভাস্কর-উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পতিতাদের নিয়ে প্রচুর সাধারণ মানের গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু এরকম অসাধারণ গল্প চোখে পড়ে না। শরদিন্দু একদিকে ডাক্তারদের লোভ-লালসার ও অসততার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। অপরদিকে পতিতজীবনের প্রতি মমতা-বোধ তাঁর লেখনীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। শরদিন্দু বেঁচে থাকবেন। 'মন্দলোক' ছোটোগল্পটি মারাঠি ও গুজরাতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

'চিড়িকদাস' ছোটোগল্পে মানবজীবনে স্বাধীনতার স্বাদকে গুরুত্ব দিয়েছেন সামাজিক বন্ধনকে অস্বীকার না করে, এক কাঠবেরালির আচরণের ভেতর দিয়ে। কাঠবেরালটি (চিড়িকদাস) আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেটা ধাড়ি কাঠবেরালি নয়, বাচ্চা। একদিন চিড়িকদাস তার নিরাপদ আশ্রয় খাঁচা থেকে পালিয়ে যায়। স্বাধীন সাম্রাজ্যে, তার নিজের জায়গায়। বনের জন্তু বনে চলে যায়। হঠাৎ তিনদিন পরে চিড়িকদাস ফিরে আসে বিকেল বেলা চা-বিস্কুট খাওয়ার সময়। ওকে বিস্কুট দেওয়া হয়। সে নিজে খায়, অর্ধেকটা নিয়ে চলে যায়। কিন্তু খাঁচায় সে আবার ঢুকতে চায় না। শরদিন্দু পশুপ্রীতি ছাড়াও এই গল্পের একটা বক্তব্য আছে, স্বাধীনতা বড় কথা নয়, খাদ্যের এবং ভালোবাসার টান আরও বড়।

'গোপন কথা' ছোটোগল্পটি একটি সাধারণ কাহিনি মনে হলেও এর গাল্পিক চেতনা অন্যমাত্রা পেয়েছে। একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েকে পঁচিশ বছরের এক যুবক আবিষ্কার করল পাহাড়-বনভূমি-নির্ঝরিনী ও ভগ্নস্তূপের নির্জন পরিবেশে। 'সেখানে ওরা আলাপচারিতায় বুঝতে পেরেছিল, ওদের আর দেখা হবে না, ফলে চিরকালের জন্য একটি গোপন কথা বলে যেতে চায়। প্রথমে তটিনী (মেয়েটির নাম) একটি গোপন কথা বলে, যুবকটি শোনে। পরে যুবকটি একটি গোপন কথা বলে, তটিনী শোনে। একমাত্র পাঠকের কাছে গোপন কথাটি গোপনই থেকে যায়। লেখক গোপন কথাটি প্রকাশ্যে নিয়ে আসেননি। গল্পটি এখানেই শেষ হলে একটি সাধারণমাত্রার গল্প হয়ে যেত। যথার্থ ছোটোগল্প হতো না। অন্তর্নিহিত তাৎপর্য না থাকলে ছোটোগল্প হতে পারে না। ওই যুবকটি হচ্ছে গল্পের বক্তা, উত্তম পুরুষ।

'গোপন কথা' ছোটোগল্পটির উপস্থাপনা অন্যরকম। গল্পটি শুরু হয়েছে, 'প্রথম নাতনী হইয়াছে, তাহাকেই দেখিবার জন্য ট্রেনে চড়িয়া বহু দূরের পথে যাত্রা করিয়াছিলাম'। গল্পের বক্তা ভাবছেন, পনেরো বছর পর তার নাতনীর বয়স হবে পনেরো বছর। ভাবতে ভাবতে বক্তা লক্ষ্য করলেন ট্রেনটি একটি বড়ো স্টেশনে থেমেছে। সেই ট্রেনে বক্তা দেখতে পান সেই তটিনীকে যাকে যৌবনে নির্জন পরিবেশে একটি গোপন কথা বলেছিল, তখন তটিনীর বয়স ছিল পনেরো বছর। এখন সেই তটিনীর বয়স হয়েছে চল্লিশ। চল্লিশ বছরের তটিনীকে বক্তা এখন দেখছেন ট্রেনে। এই দৃশ্য দেখার পর গল্প চলে যায় ফ্ল্যাশ ব্যাকে। বক্তার মন্তব্য ঃ আমার নাতনী যখন পনেরো বছরের হইবে, তখন তাহার কানে কানে আমার গোপন কথাটি বলিব কি? না, বলিব না। অতীতের এই সামান্য কথাটি

ভবিষ্যতের কাছে চিরদিনের জন্য অকথিত থাকিয়া যাইবে এইখানেই আমাদের গোপন কথার পরম পরিপূর্ণতা।' 'আমার গোপন কথাটি রবে না গোপনে' হয়তো রবীন্দ্রনাথের এই গান শরদিন্দুকে মুগ্ধ করেছিল, ফলে এরকম একটি ছোটোগল্প লিখতে পেরেছিলেন।

ছোটোগল্পটির তাৎপর্য ঃ প্রত্যেকের মধ্যে একটা গোপন কথা আমরণ থেকে যায়। গোপনতার মধ্যেই তার পরিপূর্ণতা, বলার মধ্যে নয়। এবার এও বলা যায়, গোপন কথা একজনকেই বলা যায়, সবাইকে নয়। এইসব ছোটোগল্পের পরিচয়ের ভিতর দিয়ে আমরা বুঝে নিতে পারি, ভেবে নিতে পারি শরদিন্দুর আত্ম-অনুসন্ধান এবং তাঁর মেধা-ভাবনার সামাজিক অস্তিত্ব।

শরদিন্দুর গল্পে চিত্রকল্প :

চিত্রকল্প-প্রতীক-উপমা-ব্যঞ্জনা ছোটোগল্পের আবহ ও ভাষাপ্রতিমা তৈরি করে। ঘটনা, চরিত্র, অভিব্যক্তি ইত্যাদির সূক্ষ্ম রেখাগুলির স্পষ্টতা পাঠক মনে ধরিয়ে দেয়। বিশেষ করে চিত্রকল্প হচ্ছে অনুভবের ক্যামেরা। ছোটোগল্পের একমুখীন থিমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর সঠিক প্রয়োগ এক কঠিন কাজ। তানাহলে অপপ্রয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। একটি ছোটোগল্প সফল হতে পারে চিত্রকল্পের সার্থক ব্যবহারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষাকে ছোটোগল্পের ভাষা বলে না।

চিত্রকল্প মানুষের চেতনার নানারকম সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিয়ে আসে। মনে রাখতে হবে, চিত্রকল্প শুধু চিত্র নয়, বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কাল্পনিক চিত্র। চিত্রকল্প প্রয়োগের সার্থকতার বড়ো শর্ত হল, ছোটোগল্পের বিষয়ের সঙ্গে চিত্রকল্পগুলি তাৎপর্যময় সম্পর্কে যুক্ত হয়ে এক যৌথ সামগ্রিক পূর্ণতা নিয়ে আসে। ছোট্ট একটা চিত্রকল্প ও উপমা এক নয়। চিত্রকল্প কল্পনার ও ভাবনার বিশাল পরিবেশ তৈরি করতে পারে, উপমা কল্পনার ও ভাবনার বিশাল পরিবেশ তৈরি করতে পারে না। আর প্রতীক হচ্ছে শব্দের বিকল্প। প্রতীকের সাহায্যে জটিল শব্দকে বোঝানো যায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ-বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। এখানে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু সার্থক ও সফল চিত্রকল্প-উপমা-প্রতীক উল্লেখ করা হল।

(১) চোখে অসহায় উৎকণ্ঠার চাপা ব্যগ্র দৃষ্টি। ও দৃষ্টি আমি চিনি। ঘরে যখন তিল তিল করিয়া প্রিয়জনের মৃত্যু হইতেছে অথচ হাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিনিবারও পয়সা নাই, তখন মানুষের চোখে ওই দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। (মরণ দোল)

(২) আর লক্ষ্মণ যেন গনগনে হোমের আগুন; টকটকে রঙ, লম্বা চওড়া কঠিন দেহ; মুখে হিমালয়ের গাম্ভীর্য। (পতিতার পত্র)

(৩) আমার জীবনে যেন একটা প্রবল বন্যা আসছে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কিছু জানি না। (পতিতার পত্র)

(৪) কলসীর জল ঢালিতে ঢালিতে শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণার শেষ নাই। নগেন বুকফাটা তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিয়া ফিরিতেছিল। (গীতা)

(৫) অশান্ত চামচিকার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ তাহার নজর পড়িল ঘরের একটা উঁচু তাকের উপর কি যেন রহিয়াছে। (গীতা)

(৬) তাহার মাথার মধ্যে মাদকতার ফেনা গজিয়া উঠিতেছিল। তাহার বুকের মধ্যে মত্ততা গুমরিয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলা হইয়াছে। (পূর্ণিমা)

(৭) মহাযুদ্ধের ঘোলাটে বন্যা অনেক সাম্রাজ্যের ভিত ঢিলা করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। (স্বাধীনতার রস)

(৮) এক হাজার জাঁতা একসঙ্গে ঘোরালে যে রকম শব্দ হয়, তেমনি একটি শব্দ মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। (স্বাধীনতার রস)

(৯) (ক) সোনালী সন্ধ্যা ক্রমে রূপালী রাত্রে পরিণত হইল। (খ) মাথার ওপরে আধখানা চাঁদ নীচের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। অরণ্যানীর জ্যোৎস্না-নিষিক্ত নীরবতার ওপর এ যেন পাশবিক দৌরাত্ম্য। (ভাগাবন্ড)

(১০) তোমার হাতে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর জ্বলিতেছে তোমার অকলঙ্ক দেহ-বর্তিকার কুমারী মনের নিষ্কম্প শিখা। (ধীরে রজনী!)

(১১) (ক) তাহার বৈরাগ্যের ভস্মাবরণের ভিতর দিয়া ঈষৎ তৃপ্তির ঝিলিক খেলিয়া গেল। (খ) অরুণার চোখের দৃষ্টিতে যুগান্তরের কুহক ঘনাইয়া আসিল। (প্রণয়-কলহ)

(১২) কিন্তু তাহার তুলাদণ্ডের মতো নিরপেক্ষতা তিলমাত্র বিচলিত হয় না।

(১৩) (ক) বন্যার জলে যখন দশদিক ভাসিয়া গিয়াছে তখন কূপে কতখানি জল আছে কে তাহা মাপিয়া দেখিতে যায়। (খ) জানালার কাচের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ মুচকি হাসিল, মেঘ চাপা স্বরে গুরু গুরু করিল। (এমন দিনে)

(১৪) তাহার দেহলাবণ্য তো গিয়াছিলই, নারীত্বও যেন হঠাৎ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। যাহা রহিয়া গিয়াছিল তাহা গৃহকর্ম নিপুণ সচল সবাক একটি যন্ত্রমাত্র।

(১৫) তাহার দাম্পত্য জীবনের এই অপ্রত্যাশিত অনাবৃষ্টি তাহার অন্তরের কাঁচা ফসলকে শুকাইয়া তুলিতেছিল।

(১৬) (ক) সমস্ত দিনের অগ্নিক্ষরণ মাটির কটাহে সঞ্চিত হইয়া টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। (খ) পাখির কুহরণের মতো ছোটো একটি হাসি তপতীর কণ্ঠ হইতে বাহির হইল। (মেঘদূত)

(১৭) স্থানটি বড়ো ভাল লাগিল। সুদূর অতীত যেন কর্মক্লান্ত বৃদ্ধার মতো সংসারের কাজ শেষ করিয়া একান্তে বসিয়া ঝিমাইতেছে। (গোপন কথা)

শরদিন্দুর ছোটোগল্প সম্পর্কে শরদিন্দু :

(১) শরদিন্দু যেমন কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের কাছে ঋণ স্বীকার করে বলেছেন, 'কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গ যে স্বয়ং কালিদাসের রচনা, তাহা এই কাহিনির প্রতিপাদ্য না হইলেও মুখ্য বক্তব্য বটে', ঠিক তেমনভাবে জ্যাক্ লন্ডন ও কোনান্ ডয়েলের কাছে ঋণ স্বীকার করে বলেছেন, 'জাতিস্মর শ্রেণির গল্প বাংলা ভাষায় নূতন হইলেও, বিদেশি সাহিত্যে নূতন নয়। আমি যতদূর জানি, বিখ্যাত মার্কিন গাল্পিক জ্যাক্ লন্ডন ও সর্ববিদিত ইংরাজ সাহিত্যিক স্যার আর্থার কোনান্ ডয়েল এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক।'

আমেরিকার গল্পকার জ্যাক লন্ডন ছিলেন জীবনমুখী ও জীবনসংগ্রামী ছোটোগল্পকার।

তাঁর গল্প হতাশা এবং বিষণ্ণতার বিরুদ্ধে। তাঁর মতাদর্শ, জীবনকে জয় করতে হয় সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের প্রিয় গল্পকার ছিলেন জ্যাক লন্ডন। এই জ্যাক লন্ডনের জীবনমুখিতার প্রভাব আছে শরদিন্দুর অনেক সামাজিক গল্পে। ইংরেজ সাহিত্যিক স্যার আর্থার কোনান্ ডয়েল ছিলেন জীবন অনুসন্ধিৎসু। সত্যকে আবিষ্কার করাই ছিল মূলমন্ত্র। অনেক সামাজিক গল্পে শরদিন্দু জীবনসত্যের অনুসন্ধান করে গেছেন।

(২) 'আমার সাহিত্য জীবনে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বোধহয় সকল সাহিত্যিকের জীবনে ঘটে না। আমার লেখার একটা immediate appeal আছে।... তাছাড়া একটি আবেদন আছে যাহা অনুভূত হইতে সময় লাগে। ...আমি যত্ন করিয়া লিখি, লেখাকে চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্ট করি। তাই প্রথম পাঠে বোধহয় লেখার বাহ্য চাকচিক্যটাই চোখে পড়ে। চাকচিক্য ছাড়া তাহাতে যে আরও কিছু আছে। তাহা কেহ লক্ষ্য করে না। অনেক পরে আবার লেখাটি পড়িলে তাহার অন্তর্নিহিত বস্তুটি চোখে পড়ে।' এই মন্তব্যে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি শব্দকে বার করে এনে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার গল্পের সততা ও সমাজ-মনস্কতা। শব্দ দুটি হচ্ছে 'চিত্তাকর্ষক' ও 'অন্তর্নিহিত বস্তু'। শরদিন্দুর অধিকাংশ ছোটোগল্প যেমন চিত্তাকর্ষক আঙ্গিক ও ভাষাটা আছে, ঠিক তেমনি ছোটোগল্পগুলো বলিষ্ঠতা অর্জন করতে পেরেছে অন্তর্নিহিত বস্তুকে খুঁজে পাওয়া যায় বলে। অ্যাকাডেমিস্ট পণ্ডিতেরা তাঁর immediate appeal ও চাকচিক্যটাকেই বড়ো করে দেখেছেন। তাঁর গল্পের অন্তর্নিহিত সমাজ-সত্তাকে সন্ধান করেননি বলেই নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন, 'শরদিন্দুর সরসগল্প সময় কাটাবার অমোঘ উপায় বা ইহাদের মধ্যে কোনো গভীর ও অন্তর্ভেদী জীবন পরিচয়ের বিশেষ নিদর্শন মিলে না'।

(৩) " 'রুমাহরণ' গল্পে মানবসভ্যতার গোড়ার কথাটা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইতিহাসের ঘটনাকে যথাযথ বিবৃত করাই ঐতিহাসিক গল্পের উদ্দেশ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। ...কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎসায়নের কামসূত্র হইতে এই বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।"

এই মন্তব্যই আমাদের জানিয়ে দেয় শরদিন্দুর অনেক ছোটোগল্পে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামসূত্রের প্রভাব আছে। প্রগতিশীল গল্পকারেরাই অর্থশাস্ত্রের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সমাজ-বিজ্ঞান তো অর্থশাস্ত্র দ্বারা চালিত হয়। ফলে সমাজের উপর অর্থশাস্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। এখানে শরদিন্দুর প্রগতিশীল মনকে ধরা যায়। সমাজ বিকাশের প্রয়োজনে 'কামশাস্ত্র' পরিপন্থী নয়, যৌন বিকৃতিই হচ্ছে পরিপন্থী।

(৪) "আমি মুঙ্গেরে থাকি। সন ১৩৩৭ সাল। তখন সবেমাত্র গল্প লিখতে আরম্ভ করেছি। ...বেশির ভাগই বর্তমান কালের গল্প। ...নতুন ধরনের কিছু লেখার ইচ্ছা, কিন্তু উপযুক্ত বিষয়বস্তু পাচ্ছি না, কিন্তু অভিনব উপকরণ না পেলে তো ও জাতীয় কাহিনি লেখা যায় না।"

শরদিন্দুর এই বক্তব্য থেকে তিনটি কথা শরদিন্দুর ছোটোগল্প লেখার স্বভাবকে স্পষ্ট করে দেয়, (১) বর্তমানকালের গল্প, (২) নতুন ধরনের কিছু লেখা, (৩) অভিনব উপকরণ না পেলে...। একজন প্রগতিশীল লেখকের মানস-পটভূমি এভাবেই তৈরি হয়। ফলত

শরদিন্দুর লেখায় এই ছাপ দেওয়া যায় না যে তিনি কল্পলোকের ও স্বপ্নলোকের বাস্তব-পলাতক ছোটোগল্পকার।

(৫) "ছোটোগল্পটাই আমার হাতে বেশি আসে। গল্পলেখার সময় সর্বদা মনে রাখি, Brevity is the soul of wit. যাই লিখিনা কেন যত্ন করে লিখতে হয়।"

এই Brevity সামাজিক অস্তিত্বকে এবং ইতি-বাচকতাকে টিকিয়ে রাখে।

অনেকে মনে করেন শরদিন্দুর অনেক ছোটোগল্প স্মৃতিচারণমূলক। অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে ছোটোগল্পে নিয়ে আসাই বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী ছোটোগল্পকারের সিদ্ধি। বায়োগ্রাফিকাল ঘটনাকে যখন সিনথেটিক সিচুয়েশনের মধ্যে নিয়ে আসা হয় তখনই লেখা হয় একটি যথার্থ ছোটোগল্প। ছোটোগল্প বিষয়ে শরদিন্দুর এই নতুন তত্ত্ব আমরা স্বীকার করি।

সার্থক ছোটোগল্পে time এবং place এর সহ-অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরদিন্দু নিজের ছোটোগল্প লেখা সম্পর্কে বলেছেন, "All my life I have had an awarness of time and place. এই কথাটা আমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।" Time and Place শুধু ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে নয় ঐতিহাসিক রচনার ক্ষেত্রেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরদিন্দু যেমন ছোটোগল্প লিখেছেন, ঠিক সেভাবেই ছোটোগল্প চর্চা করেছেন। ফলত তিনি একজন পরিশীলিত, সংযত, মার্জিত ছোটোগল্পকার। তিনি বলেছেন, 'ছোটোগল্পটাই আমার হাতে বেশি আসে।' শরদিন্দু সম্পর্কে শরদিন্দুর আত্ম-অনুসন্ধান উন্মোচন আমাদের চকিত করে, আমাদের মধ্যে বিস্ময় জাগিয়ে তোলে, তাঁর লেখা ছোটোগল্প অনুসন্ধানের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।

ছোটোগল্পে শরদিন্দু-মানস :

জীবনের গভীরতায় বেদনা অন্বেষণে শরদিন্দু বিচলিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর জীবনের জটিলতা এবং তার ব্যভিচার ও অবক্ষয় শরদিন্দুর গল্পে উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় 'জাতিস্মর' গল্পের বক্তার মন্তব্যটি 'একালের মানুষ যেন সবদিক দিয়াই ছোটো হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নেই।' মানবিক দায়বদ্ধতা তাঁর ছোটোগল্পে/অণুগল্পে যেমন উপস্থিত থাকে, ঠিক সেরকম সামাজিক দায়বদ্ধতাকেও তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। কোনো শ্রেণি-সচেতন গল্পকারই তা পারেন না। শরদিন্দু ছিলেন শ্রেণি-সচেতন গল্পকার। তিনি অনেক প্রেমের গল্প লিখেছেন। প্রেমের গল্পে যেমন আছে রোমান্টিক স্বপ্নময় পরিবেশ, তেমনি আছে তিক্ততা, বিষাদ ও বিষণ্ণতা। এটা স্ববিরোধিতা নয়, সম্পূর্ণ অন্তর্দ্বন্দ্বের বাস্তবতা।

চল্লিশ দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধাক্কায় টলটলায়মান সমাজ-জীবনের অভাব-দারিদ্র-দুর্ভিক্ষ-কালোটাকা-কালোবাজারি-শোষণ-অত্যাচার তাঁর ছোটোগল্পে ও অণুগল্পে লক্ষ্য করা যায়। কখনও প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, কখনও বিষয় হিসেবে এসেছে। তিনি ছিলেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে। 'নীলকর' ছোটোগল্পে নীলকর সাহেবের পাশবিক অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে গেছে।

সমকালীন রাজনীতি চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের, তার বেশকিছু ছোটোগল্পে প্রভাব ফেলেছে, যদিও সম্পূর্ণ রাজনীতির বিষয় নিয়ে তিনি কোনো ছোটোগল্প লেখেননি, একমাত্র ব্যতিক্রম গল্প 'শাদা পৃথিবী'। সেই রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান সৎ ও সংগ্রামী মানুষের পাশে। তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে কলম ধরেছেন। তার একটা প্রমাণ তো আগেই দেওয়া হয়েছে 'অবিকল' ছোটোগল্পে। লোভি, নিষ্ঠুর ফিরিঙ্গির সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংঘাত তার ছোটোগল্পে লক্ষ্য করা যায়। দেশপ্রীতিও তার ছোটোগল্পে উপস্থিত। দেশপ্রীতির উপর লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পটি হচ্ছে, 'স্বাধীনতার রস'।

তাঁর অধিকাংশ ছোটোগল্পে গভীর ও অন্তর্ভেদী জীবন-পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় তাঁর চেতনার গভীরে সমসাময়িক কালস্রোতের কুটিল স্পর্শ। এখানে শরদিন্দু তার লেখ্য স্বভাবের কথাটা নিজেই বলেছেন, 'আমি জীবনকে যতটুকু বুঝেছি, জীবন থেকে যতটুকু রস আহরণ করেছি, সেইটুকুই আমার পাঠকদের পরিবেশন করেছি।' কথাটি যথার্থ, আত্মম্ভরিতা নয়। তাঁর ছোটোগল্পে উচ্ছ্বাস, আবেগ, রোমান্টিকতা আছে, তবে সংযত, সংহত। যখন ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের গল্পকারেরা চলিত ভাষায় গল্প লিখছেন, তখন শরদিন্দু অধিকাংশ গল্প সাধু ভাষায় লিখেছেন। পড়লে মনে হবে যেন চলিত ভাষায় গল্প পড়ছি, এমন প্রাঞ্জল। অধিকাংশ ছোটোগল্প তিনি 'আমি' দিয়ে শুরু করেছেন, উত্তম পুরুষে। সকল চরিত্রের মধ্যেই নানারূপে শরদিন্দু আছেন। এটা কি তাঁর আত্ম-অনুসন্ধান? সমাজ-জীবন এবং আত্ম-জীবন পরস্পরের পরিপূরক, উদাহরণ শরদিন্দুর ছোটোগল্প / অণুগল্প।

উপসংহার :

(১) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক ঐতিহাসিক, রহস্যমূলক ও সামাজিক ছোটোগল্প অন্য ভাষায় অনূদিত হয়ে বিস্তার লাভ করেছিল। কোন্ গল্প কোন্ ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পাঠকদের কাছে রাখা যায়। হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয়েছে—'চুয়াচন্দন', 'আঙটি', 'নীলকর', 'জটিল ব্যাপার'। মারাঠি ভাষায় অনূদিত গল্পগুলো হচ্ছে—'প্রাগ্‌জ্যোতিষ', 'মন্দলোক', 'মানবী'। মালয়ালাম ভাষায় অনূদিত একটি গল্পের নাম 'বিষকন্যা' এবং কান্নাড়ি ভাষায় 'রক্তসন্ধ্যা' গল্পটি অনূদিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে গুজরাতি ভাষায়। প্রায় চব্বিশটি ছোটোগল্প। গুজরাতি ভাষায় শরদিন্দুর ছোটোগল্পের একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অনূদিত অণুগল্প / ছোটোগল্পগুলো হচ্ছে 'অমিতাভ', 'মায়ামৃগ', 'বাঘিনী', 'ঘড়িদাসের গুপ্ত কথা', 'সবুজ চশমা', 'ইচ্ছাশক্তি' ইত্যাদি। গুজরাতি ভাষায় যিনি অনুবাদ করেছেন তার নাম রামনিক মেখানি। ইংরেজি ভাষায় অনূদিত ছোটোগল্পগুলোর নাম 'চন্দনমূর্তি' (The Divine Image), 'বহুরূপী' (Chameleon), 'সেতু' (Across)। ফরাসি ভাষায় অনূদিত ছোটোগল্পটির নাম 'সেতু' (Traverse)।

(২) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন প্রবাসে, বিহারের

মুঙ্গেরে, মহারাষ্ট্রের বোম্বাইতে এবং পুনাতে। শরদিন্দু দিনলিপিতে জানিয়েছেন, 'মুরে আমার মাতৃভূমি না হলেও ধাত্রীভূমি'। পরে তিনি পুনাতে বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বাড়ির নাম রাখেন 'মিথিলা'। সেজন্য তাঁর ছোটোগল্পে প্রবাসী বাঙালিদের জীবন-জটিলতা ভারতীয় পারিবারিক জীবনপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার যাবতীয় রচনার মূলকথাটি নিজেই বলে গেছেন, 'আমার কাছে সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই। ...মানুষকে কোনোদিন ছোটো করেও দেখতে পারিনি। মানুষের অনেক দোষ, অনেক দুর্বলতা আছে, তবু সে বৃহৎ, তবু সে মহৎ। এই বিরাট সত্তার বিশ্বরূপ প্রকাশ করাই আমার সাহিত্য সাধনা'। শরদিন্দুর এই অমোঘ মন্তব্যটি আমরা তাঁর ছোটোগল্পে লক্ষ্য করেছি বলেই জন্মশতবর্ষের পরেও তাঁর ছোটোগল্প পড়তে হবে।

বনফুলের ছোটোগল্পে, অণুগল্পে সচলতা ও নিশ্চলতা

বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) জীবনমন্থনকারী ছোটোগল্পকার নন। তিনি গল্প-শোনা ও চোখে-দেখা ঘটনার অনুলেখনকারী ছোটোগল্পকার। তাঁর ছোটোগল্প/অণুগল্প লেখার অত্যাধিক প্রাচুর্য এর একটা কারণ হতে পারে। এতো ছোটোগল্প বাংলা কথাসাহিত্যে কোনো গল্পকারই লেখেননি। তাঁর মোট ছোটোগল্পের/অণুগল্পের সংখ্যা ৫৭৮টি এবং গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ৩৪ খানি। বনফুলের জন্মশতবর্ষে হয়তো বনফুলের আরও অমুদ্রিত ছোটোগল্পের আবিষ্কার চলবে। তারপর হয়তো দেখা যাবে তিনি ছয়শোর ওপর ছোটোগল্প/অণুগল্প লিখে ফেলেছেন। তিনি ছিলেন ছোটোগল্প/অণুগল্পের দক্ষ কারিগর। বনফুলের কলম যেন ছোটোগল্পের কারখানার দামি মেশিন, অবশ্যই স্বদেশি মেশিন, যেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে গাদা গাদা ছোটোগল্প/অণুগল্প।

কথা-শিল্পী এবং কথা-সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটোগল্প' নামে গবেষণামূলক গ্রন্থে বনফুলের নামটি পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আরও একটি ছোটোগল্পের বই আছে 'বাংলা গল্প-বিচিত্রা', সেখানেও বনফুল অনুপস্থিত। সেখানে বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রেমেন্দ্র মিত্র আছেন, এমনকি মনোজ বসু-বুদ্ধদেব বসুও আছেন। আরও সমসাময়িক গল্পকারেরা আছেন, একমাত্র বনফুলকেই দেখা গেল না। হয়তো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বনফুলে আনন্দ পাননি বা তখনও পর্যন্ত বনফুল তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

অবশ্যই কোন্ সমালোচকের কলমের ডগায় এলো, কার কলমের ডগায় এলো না, কারণ সেখানে আত্ম-স্বার্থ ও অর্থ-স্বার্থ থাকে এটা। কোনো গল্পকারের বিচারের মানদণ্ড নয়। প্রথমত পরিবর্তনশীল সমাজের জনজীবনের মানসিক অগ্রগতির সঙ্গে গল্পকারের গল্পের সম্পর্ক কতটা গতিশীল সেটা নির্ণয় করার ওপর নির্ভর করে বিচারের গুরুত্ব। দ্বিতীয়ত ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতার নিরিখে কোন্ কোন্ ছোটোগল্প নিষ্প্রাণ-মুক্ত হয়ে উঠতে পেরেছে তার ওপরেও নির্ভর করে ছোটোগল্পের গুরুত্ব বিচার। গল্পকার বনফুলও সেভাবেই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে।

গল্পের বিচারে 'ছোটোগল্পের সীমারেখা' গ্রন্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি আমি সঠিক এবং যথার্থ মনে করি, 'ঘটনা, চরিত্র, বিষয়—অবলম্বন যাই হোক তাকে একটি নিজস্ব জীবন-বোধিতে, একটি দর্শনে, একটি স্বগত ভাবলোকে পৌঁছে দেওয়াই ছোটোগল্পের কাজ'।

বনফুলের অধিকাংশ ছোটোগল্পে/অণুগল্পে ঘটনা-চরিত্র বিষয় সবই আছে, নেই একটি দর্শন এবং স্বগত ভাবলোক, জীবন-বোধ আছে, তবে সেই জীবন-বোধ সজীব জীবন-বোধ নয়। বিষণ্ণ জীবন-বোধ বা নেতিবাচক জীবন-বোধ। সমাজের জনজীবনকে একজন লেখক কিভাবে দেখছেন তার ওপর নির্ভর করছে লেখকের জীবন-দর্শন। লেখকের শ্রেণীগত অবস্থান সেই জীবন-দর্শনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। সেজন্য শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন এক নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানব-জীবনকে দেখেছেন লড়াইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতার নিরিখে। তারাশঙ্কর মানব-জীবনকে দেখেছেন নিয়তির দৃষ্টিকোণ থেকে। বিভূতিভূষণ মানব-জীবনকে দেখেছেন প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে। তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণ ট্রাডিশনাল বাস্তবতার চালচিত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করেছেন। এ ভাবেই তাঁদের দার্শনিক মনোভাব গড়ে উঠেছে। কিন্তু বনফুলের গল্প-পাঠে সেরকম কোনো জীবন-দর্শনে পৌঁছানো যায় না। হয়তো এই ভেবেহ মোহিতলাল বলেছেন, 'তিনিও এক ধরনের প্রকৃতিবাদী—Naturalist। তাহার আর্ট মানুষেরই স্নায়ু-শিরা-শোণিত-বিজ্ঞানের আর্ট।' মোহিতলাল নন, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যও ওই একই কথা বলেছেন, 'তাঁর সাহিত্যে জীবন রহস্য তথা মানব প্রকৃতির এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেখে তাকে Naturalist বা প্রকৃতিবাদী বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। জীবনকে আপন স্বরূপে প্রকাশ করাই Naturalist লেখকদের উপাস্য। বনফুলকেও সেভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।' 'আপন স্বরূপ' কথাটির মধ্যে দর্শন-ভাবনার বিস্তৃতি নেই।

সমালোচকমাত্রই বনফুলের ছোটোগল্পে/অণুগল্পে মানবিক মূল্যবোধর কথা বলেন। আমিও বলি। বলতেই হয় কারণ লেখকমাত্রই মানবিকতার কাছে দায়বদ্ধ। 'মানবতাবাদী লেখক' কথাটা বড্ড ক্লিশে এবং অ্যাকাডেমিক। একটা দায়সারা কথার কথা। কিন্তু মানবিক দায়বদ্ধতা কিসের ওপর নির্ভর করছে। তার বিপরীত শক্তিটা কি? সেটাই বা কিসের ওপর নির্ভর করছে? দায়বদ্ধতা সামাজিক কার্যকারণের ওপর নির্ভর করে। মানবিক দায়বদ্ধতা বলে, পাপীকে ভালোবাসো, চোর-বেশ্যা এদেরকে ভালোবাসো। নির্যাতিতকে, নিপীড়িতকে এবং শোষিত মানুষকে ভালোবাসো। কারণ এরা সবাই মানুষ। একই সমাজে আমরা এদেরকে নিয়েই বসবাস করি। এসব 'থিম' নিয়ে সারা বিশ্বে নানাকায়দায়, নানাকৌশলে, নানারকম দার্শনিক ভাবনায় উপন্যাস-কবিতা-গল্প-ছোটোগল্প-অণুগল্প-প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এবং এখনও লেখা হচ্ছে। কিন্তু পাপী কেন পাপ করে, বেশ্যা কেন বেশ্যা হয়, চোর কেন চুরি করে, মানুষ কেন নির্যাতিত হয়, নিপীড়িত হয়, শোষিত হয়, তার যে একটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক কার্য-কারণ দ্বান্দ্বিক সূত্র আছে, সেসব নিয়েও তো লেখককে ভাবতে হবে। আর এখানেই একজন লেখক জীবন-মন্থনকারী লেখক হয়ে ওঠেন, আর এখানেই একজন লেখক দার্শনিক হয়ে ওঠেন।

বনফুলের ছোটোগল্পে/অণুগল্পে illustration of life আছে, interpretation of life নেই, যদিও তিনি জানিয়েছেন কোনো এক পত্রে যে তার ছোটোগল্পে তিনি মানুষের জীবনকে interpret করেছেন। বনফুল নানারকম গল্পকে আনন্দদায়ক ও সুখবোধ্য করে তুলেছেন উপমা-রূপক-চিত্রকল্প ইত্যাদির সঠিক এবং যথার্থ প্রয়োগে। সমাজের

নানারকম মানুষ-মানুষীর বিচিত্র স্বভাবের দৃষ্টান্ত ছোটোগল্পকে মাধ্যম করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সেসব ছোটোগল্প চমৎকার ছবি হতে পেরেছে কিন্তু যথার্থ ছোটোগল্পের মনোভূমি গড়ে তুলতে পারেননি। আসলে বনফুল কলমের ক্যামেরায় তুলে ধরেছেন নানারকম ঘটনা ও তুচ্ছ ঘটনা এবং নানারকম মানব-মানবীর স্বভাব-চরিত্র। বনফুলকে বলা যায় ফটোগ্রাফিক রাইটার। তিনি বিচ্ছিন্নভাবে নিষ্প্রাণ বহিরাগত বিষয়-ভাবনাগুলিকে তুলে এনেছেন এবং ছোটোগল্পের অন্যতম শর্ত 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ' মেনে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে ছোটোগল্প যান্ত্রিকভাবে নির্মাণ করেছেন এবং চরিত্র বের করে এনেছেন। বনফুল সামাজিক মেলামেশা থেকে, ভালোবাসা থেকে, অন্তর্গত অভিজ্ঞতা থেকে গল্পের বিষয়-ভাবনাকে বুঝবার ধরবার চেষ্টা করেননি। তিনি দৈনিক পত্রিকা থেকে, নানারকম ইংরেজি-বাংলা পত্র-পত্রিকা-বই থেকে রোগী দেখবার অভিজ্ঞতা থেকে গল্পের বিষয়-ভাবনা সংগ্রহ করতেন। এসবের জন্যে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যেতে পারে তাঁর চিঠিপত্র, ডায়রি, আত্মকথা থেকে।

২

বনফুলের জন্ম শতবর্ষে বনফুলের ছোটোগল্প/অণুগল্প নিয়ে অনেক প্রবন্ধ আলোচনা সমালোচনা বের হয়েছে। সেসব কিছু পাঠ করে জানা গেল, একমাত্র বনফুলই অণুগল্প লিখেছেন। যদিও তখনো বাঙলা কথা-সাহিত্যে 'অণুগল্প' কথাটি এন্ট্রি পায়নি। বনফুলের ঐ ধরনের গল্পগুলিকে বলা হত Conte (Short-tale) বা পোস্টকার্ড গল্প। কথাটার মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগ থাকতে পারে কিন্তু কথাটার মধ্যে সততা নেই, যথার্থতা নেই। বিশ্বসাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকই অণুগল্প লিখেছেন। লিখেছেন টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, গোর্কি, কাফকা, ল্যু-সুন, পিটার বিকসেল, আর্জেন্টিনার ফ্রাই মোচো, স্পেনের মিগেল দেলিবেস (মহিলা), জাপানের ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা এবং আরও অনেকে। শিশিরকুমার দাশের, 'বাংলা ছোটোগল্প (১৮৭৩-১৯২৩)' পড়লে জানা যাবে চূর্ণক ও কথিকা নামে প্রচুর অণুগল্প এক সময়ে লেখা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের একটি চূর্ণিকা (আজকের অণুগল্প) তুলে ধরছি।

> কোনো সময়ে একজন প্রধান পাদরী নিজ ধর্মাগারের কার্যাদি সমাপনান্তে বায়ু সেবনার্থে নির্গত হইয়া এক খনির সম্মুখে গমনপূর্বক দেখিলেন যে, একদল খনি-খোদক তথায় বসিয়া আছে ও তাহাদিগের সম্মুখে এক ধাতুময় পাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে পাদরীবর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা বসিয়া আছে কেন? পাদরী তাহাদিগকে সকল কথা ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিল। তখন খনি-খোদক পাদরীকে বলিল, আমরা এই পাত্র পাইয়া স্থির করিয়াছি, যে ব্যক্তি সকলের অপেক্ষা মিথ্যা বলিতে পারিবে সেই এই পাত্রটি পাইবে। পাদরীবর তাহাতে দুঃখিত হইয়া মিথ্যা বলার অধর্ম জ্ঞাপনার্থ একটি বক্তৃতা করিয়া কহিলেন, "আমি যাবজ্জীবনে একটিও মিথ্যা বলি নাই।" তৎশ্রবণে খনি-খোদকের একজন কহিয়া উঠিল। "উহাকে পাত্রটি দেহ। উহাকে পাত্রটি দেহ।"

হয়তো এইসব চূর্ণক ছোটোগল্পের সংজ্ঞানুসারে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত বনফুলীয় অণুগল্প নয়, তথাপি আমরা মনে করি অণুগল্প হিসেবে এই চূর্ণকটিও এই সময়ের একটি স্বার্থক অণুগল্প। খনি-খোদকের শেষ সংলাপটি এই চূর্ণকটিকে একটি সার্থক অণুগল্পে পরিণত করেছে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাষা-শব্দ-বিষয়ের রূপ-রীতিও পরিবর্তিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর কথিকা ও চূর্ণকই পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান সময়ের ভাষায় অণুগল্প Conceptটি তৈরি হয়েছে— আজও যা লিখিত হচ্ছে। বনফুল সেটাকে ব্যাপ্ত করেছেন, বিস্তৃত করেছেন এবং প্রথাটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে বনফুলের পূর্বেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অণুগল্প লেখা হয়েছে। ওইসব গল্পে জীবনবোধ, দার্শনিক মনোভাব এবং স্বগত ভাবলোক প্রতিভাসিত। 'লিপিকা'-য় অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু কথিকা (রবীন্দ্রনাথের কথামতো) আজকের প্রথাবিরোধী ছোটোগল্প হয়ে উঠেছে। 'তোতাকাহিনী' অণুগল্পের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ছাড়াও আছে 'প্রথম শোক', 'নামের খেলা', 'পুরোনো বাড়ি', 'সতেরো বছর', 'সওগাত', 'ধ্বংস'। অনুত্বের বিচারে 'তোতাকাহিনী' অণুগল্প না হলেও অন্য সব 'লিপিকা'র (এখানে উল্লেখ করা হয়েছে) গল্পগুলিকে যে বিষয়-ভাবনার গভীরতা ও ব্যঞ্জনা ঘিরে রেখেছে সেরকম গভীরতা ও ব্যঞ্জনা বনফুলের অণুগল্পে প্রতিফলিত হয়নি।

সামাজিক জড়তা, প্রাণহীন স্থবিরতা এবং স্বার্থ-চর্চা যেভাবে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে শিকড়-বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে তারই সংকেত বহন করছে 'তোতাকাহিনী'। স্যাডলার কমিশনের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই 'তোতাকাহিনী' গল্পে। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ অণুগল্প 'সওগাত', যথা, 'মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।... কোলের ছেলেটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারা দিন ধরে দেখছে, ভারে ভারে সওগাত চলছে...। ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে 'মা, সবাইকে তুই সওগাত দিলি, কেবল আমাকে না।'

মা হেসে বললেন, 'সবাইকে সব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোর জন্য কি বাকী রইল এই দেখ।'

এই বলে তার কপালে চুম্বন করলেন।' (সংক্ষিপ্ত)

পনেরোটি বাক্যে সমাপ্ত এই অণুগল্পটিতে যে গভীর ব্যঞ্জনা নিয়ে আসা হয়েছে অনুভবে এবং শব্দের ব্যবহারে সেখানে বনফুল দার্শনিক শূন্যতায় নিষ্প্রাণ এবং ম্লান। বনফুল সেখানে বিচিত্র মানুষের চরিত্রের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন মাত্র।

ম্যাক্সিম গোর্কির একটি অণুগল্পের নাম 'শহর'। আমরা এখানে 'অণুগল্প' নামটা ব্যবহার করছি। অণুগল্পটি আছে 'ইতালির রূপকথা' গ্রন্থে। গল্পটি, 'অল্পবয়সি এক সুরকার শহরের বুকে সংগীত রচনা করতে চায়, যে শহরটা সুরকারের সামনে পড়ে আছে সেটা যেন মাটি চেপে ধরা গুরুভার দালান বাড়ির এক স্তূপ। তারই চাপে শহরটা গোঙাচ্ছে, গজগজ করছে চাপা গলায়। এই শহর নিয়ে সংগীত রচনা করবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে রাতের অন্ধকার মায়ের মতো স্নেহ কোমল শান্ত গলায়। রাতের অন্ধকার বলছে 'সময় হয়ে এলো রে, যা যা। ওরা অপেক্ষা করে আছে তোর জন্য।'

এভাবেই গভীর ব্যঞ্জনায় নিষ্প্রাণ শহরও প্রাণ পেয়ে যায়। এই যে শহরকে দার্শনিক মন দিয়ে লেখকের দেখা যেখানে 'রাতের অন্ধকার'ও (আমরা সাধারণত অন্ধকারকে নেতিবাচক রূপ দিয়ে থাকি) মায়ের মতো মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে, সেটা অনুপস্থিত বনফুলের অণুগল্পে। বনফুল গৃহবধূর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন 'নিমগাছ' অণুগল্পে। তিনি রূপকের বন্দিশালায় গল্পকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কিংবা বলা যায় নিমগাছের নিচে আত্মমগ্ন বিষাদগ্রস্ত আটপৌরে গৃহবধূকে বসিয়ে রেখে কলমের ক্যামেরায় তুলেছেন মাত্র। তবু অস্বীকার করা যায় না এই গল্পের ব্যঞ্জনাকে। 'এত উপকারী নিমগাছটাও বাড়ির পেছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল।' ঠিক তারপরের বাক্যটিই হচ্ছে, 'ওদের বাড়ির গৃহকর্মা নিপুণা লক্ষ্মী বউটির ঠিক এই দশা।' লেখককে আর বলতে হয় না, 'এতো উপকারী বউটিকেও আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই ফেলে রাখা হয়েছে।' চিত্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে না-বলা কথাটিকেই পাঠকের মনের ভেতর বলিয়ে দেওয়া। আরও বিস্ময় সৃষ্টি করে এই গল্পটিকে যখন ভাবতে বসি, নিমগাছ যেমন বাক্‌শক্তিহীন, অপমানিত লাঞ্ছিত, অসম্মানিত গৃহবধূটিও বাক্‌শক্তিহীন হয়ে গেছে। এই গল্পে ব্যঞ্জনার গভীরতা আছে। কিন্তু দার্শনিক মনোভাবের রহস্যময়তা বা মনোভূমির সূক্ষ্মস্পর্শের যোগ নেই। অতি পরিচিত এক সাধারণ গৃহবধূর ছবিমাত্র।

বনফুলের অনেক আগের লেখক ফ্রানৎস কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪)-র এমন কিছু অণুগল্প আছে যেগুলিকে অনেক বিশ্ব-পণ্ডিতেরা ছোটোগল্প মনে করেন না, মনে করেন গল্পের খসড়া। ছোটোগল্পের প্রথাবিরোধিতার বা এন্টি-স্টোরির কথা মনে রাখলে সব কথিকা বা খসড়াকেই অণুগল্প মনে করা যায়। যখন কোনো খসড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে দার্শনিকতার ও স্বগত ভাবলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল একটি অণুগল্প, তখন সেটা আর খসড়া থাকে না। এরকমই একটি অণুগল্প কাফকার 'পসিডন'। 'পসিডন' অণুগল্পে এক দার্শনিক পটভূমি গড়ে উঠেছে অনুভবে এবং কাহিনিবৃত্তে। পসিডন বিশাল প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন। এই প্রশাসনিক দায়িত্ব সমুদ্রতুল্য, বা 'সামুদ্রিক প্রশাসনের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে'। সামুদ্রিক প্রশাসনের এই দায়িত্ববোধ থেকেই সে সমুদ্রের বা সাগরের বিশালতাকে বুঝতে পারে। সাগরের অভিযান নিয়ে কানাঘুষো গালগপ্পো পসিডনকে শুনতে হয়, অথচ সে চাক্ষুষ কোনোদিন সাগর দেখেছে কিনা মনে করতে পারছে না। দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীত মেরুদণ্ডের হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রের স্বাদ' ছোটোগল্পটির কথা মনে পড়ে যায়।

অণুগল্পের ভিতর দিয়েও যে দার্শনিক পটভূমি ও স্বগত ভাবলোক বা অন্তর্লোক গড়ে তোলা যায় তা রবীন্দ্রনাথ-গোর্কি-কাফকার অণুগল্পগুলোই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বনফুল নিজেই বলেছেন, 'ডস্টয়েভস্কি, চার্লস ডিকেন্স, অথবা ম্যাক্সিম গোর্কির আবির্ভাবের জন্য আমাদের এখনও নিদারুণ তপস্যার প্রয়োজন আছে'। অর্থাৎ তাদের গতিশীল ভাবনার কাছে পৌঁছতে।

বনফুল ছোটোগল্পের যথাযথ শর্ত এবং গ্রামার মেনে গল্প লিখেছেন। তাঁকে ব্যতিক্রমী গল্পকার বলা যায় না। যে কোনো তুচ্ছ ঘটনার শেষে তিনি চমৎকার চমক সৃষ্টি করতে পারেন। চমকের শেষেই তুচ্ছ বিষয় ভাবনাটা আর তুচ্ছ থাকে না। এক অজানা বিষয়কে

ছোটোগল্পের ফ্রেমে আটকে রাখেন। যত ছোটোই হোক না কেন গল্পের শেষে যান্ত্রিক উপায়ে একটা চমক আনতেই হবে। ফলে রূপান্তর ঘটেনি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ গল্পকারেরা ছোটোগল্পের যথাযথ গ্রামার মেনে চলেননি। তাঁরা সৃজনশীল প্রতিভাধর ব্যক্তি। সৃজনশীলতার ধর্মই হচ্ছে, ভাঙো এবং গড়ো। বাইরে থেকে ভাঙা নয়, আত্‌লামি করার জন্য ভাঙা নয়, ভেতর থেকে ভাঙা, গভীর বেদনাবোধ বা যন্ত্রণাবোধ থেকে ভাঙা। এই বেদনাবোধ ও যন্ত্রণাবোধ সামাজিকও হতে পারে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকও হতে পারে। বাইরে থেকে গড়া নয়, আত্‌লামি করার জন্যে গড়া নয়, স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠা, শ্রেণিঅবস্থান থেকে অকৃত্রিম ভাবেই গড়ে ওঠা। তারপর সেই সৃজনশীল ছোটোগল্পটি বা অণুগল্পটি ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, যথাযথ না হলেও ছোটোগল্পের মূল শর্ত একমুখীনতাটি ঠিকই আছে। গল্পের শেষে এসে চরমতম আঘাতের ফলে বিস্ময়কর ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়বে পাঠকের চিন্তায়। পাঠকের বিশ্বাসে যার জন্য পাঠক প্রস্তুত ছিল না। আরও একটু বিস্তৃত করে বলা যায়, 'out of rapidly moving currents of life's experiences the author's imagination siezes on impassive situation or a striking contrast, that effects him keenly'—Upham. বনফুল আরও একটু পিছিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মেনেছেন, 'ছোটোপ্রাণ, ছোটোব্যথা। ছোটো ছোটো দুঃখকথা... অন্তরে অতৃপ্তি রবে/সাঙ্গ করি মনে হবে/শেষ হয়ে হইল না শেষ।' গতিশীল ও দ্বান্দ্বিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শুধুমাত্র ঐ শর্তটুকু যান্ত্রিকভাবে মান্য করলে ছোটোগল্প পূর্ণতা পায় না। বনফুলের ছোটোগল্পে / অণুগল্পেও সেই পূর্ণতার অভাব লক্ষ করা যায়।

৩

বনফুলের ছোটোগল্প নিষ্প্রাণ হোক, যান্ত্রিক হোক, দার্শনিক মনোভাব মুক্ত হোক, স্বগত বা অন্তর্লোক থেকে তার অবস্থান যত দূরেই হোক, তথাকথিত মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে অর্জিত তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। কোনোপ্রকার কৃত্রিমতার ভান না করে বনফুলই বলতে পারেন, 'জীবনের নানা বিচিত্র আবেষ্টনীতে পড়ে নানারকম মানুষ দেখেছি আমি। মানব জীবনের বৈচিত্র্যই আমাকে সবচেয়ে বেশি ইনস্পায়ার করে। (শনিবারের চিঠি, ১৩৫৬, ভাদ্র)।' সমাজ ও রাজনীতি-প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'সামাজিক কোনো সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে যাওয়া আরও বিপজ্জনক। কারণ সামাজিক সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত...।' (আধুনিক গল্প-সাহিত্য : ভূয়োদর্শন) এ রকম বক্তব্য যাঁরা রাখতে পারেন তাঁদের লেখায় মানবিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতি জড়িয়ে থাকবেই। বনফুলেরও ছিল। ভূয়োদর্শন কথাটির অর্থই হচ্ছে, অনেক কিছু দেখার অভিজ্ঞতা (মেলামেশার নয়)। সমাজ, রাজনীতি, মানবজীবনের বৈচিত্র্য ও তাদের তুচ্ছ ঘটনা বনফুলের গল্পের মূল আশ্রয়। এই বৈচিত্র্য এবং তুচ্ছ ঘটনার সামাজিক কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের অনুসন্ধিৎসু মন তাঁর ছিল না বলেই বেশির ভাগ ছোটোগল্প/অণুগল্পই নিষ্প্রাণ, প্রাণস্ফূর্ততা নেই। কিন্তু তিনি

তাঁর সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক নানারকম ঘটনা ও সংবাদ এড়িয়ে যেতে পারেননি। ছবির মতো সেসব অণুগল্পগুলো এখনও জ্বল জ্বল করছে।

ত্রিশ-দশক থেকে সত্তর-দশক এই চল্লিশ বছর ধরে বনফুল এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প/অণুগল্প লিখেছেন, যেসব ছোটোগল্পে/অণুগল্পে পোস্টারিং হয়ে আছে সামাজিক ব্যাধিতে এবং অবক্ষয়ে যেমন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কুফল, অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকার, ধুলায়ধূসরিত মধ্যবিত্তের মান-সম্মান-ইজ্জত, মন্বন্তরকালীন বাংলা, মজুতদারের চাল হোর্ডিং, রেশনের দোকানে লাইন, ফুটপাথে গরিবের মৃত্যু, ক্ষুধার্ত যুবকের আত্মহত্যা, তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষিত পেশাদারি মানুষজন এবং তাদের কলুষিত আচার-আচরণ, মানুষের অতি উচ্চ লোভ-লালসা-কামনা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, নিয়ম বহির্ভূত স্বজনপোষণ ইত্যাদি ইত্যাদি। ত্রিশ-দশক থেকে সত্তর দশকের এইসব ডকুমেন্টরি সমাজ-চিত্র ফুটে উঠেছে নমুনা, উৎসবের ইতিহাস, বিবেক, শরশয্যা, আদর্শ ও বাস্তব, গহিন রাতে, অনুবীক্ষণ, অসম্ভবের গল্প, জ্যোতিষ, পিশাচ, ভোটার সাবিত্রীবালা, তর্ক ও স্বপ্ন, আইন, অর্জুন মণ্ডল ইত্যাদি ছোটোগল্পে/অণুগল্পে, মূলত অণুগল্পে। এইসব সামাজিক এবং অবিনোদিত বিষয় পাঠককে নিশ্চল করে রাখে, সচল করে না।

'উৎসবের ইতিহাস' অণুগল্পে ত্রিশ দশকের সামাজিক অবক্ষয়টি গল্পকারের টেনশনে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম.এ. পাশ। তৈলাক্ত মর্দনেও সে সামান্য কেরানির চাকরিও পায় না। অবশেষে বাধ্য হয়ে বাবার কথামতো ঘুঘু মিত্তিরের বয়স্কা কুৎসিত কন্যাটিকে বিয়ে করে সামান্য একটা কেরানির চাকরি পায় এম.এ. পাশ নরেন মল্লিক। 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি' এই প্রবাদ বাক্যটি মনে পড়ে যায়। মধ্যবিত্তের বিবেক বলতে কিছু নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে সুযোগ-সুবিধা বুঝে দু নৌকায় পা দিয়ে চলে। কিন্তু এর বাইরেও অনেক মধ্যবিত্ত আছেন যারা বিবেকচ্যুত হন না, আদর্শচ্যুত হন না। নিদেনপক্ষে না-হওয়ার কষ্টকর লড়াইটা চালিয়ে যান। এরকম ইতিবাচক ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয়-ভাবনা বা দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতার গতিপ্রকৃতি বনফুলের প্রায় ছ'শ গল্পের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার জন্যে প্রয়োজন আরো বেশি বনফুলের গল্প-পাঠের। 'আদর্শ ও বাস্তব' গল্পে দেখা যায় আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে আদর্শের ও বাস্তবের পরাজয়। গল্পটা শুরু করলেন, ডাক্তার প্রিয়গোবিন্দ বসাক ছাত্র-জীবনে আদর্শবাদী ছিলেন। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন নিরক্ষর পশুর দলকে সেবা করে মানুষ করে তুলতে হবে। প্রিয়গোবিন্দ বসাকের এটাই ছিল আদর্শ। পরে পারিবারিক সুখভোগের কথা ভেবে প্রিয়গোবিন্দ আদর্শচ্যুত হয়ে পশুর দল ছেড়ে 'দুরাচার, চরিত্রহীন, পাষণ্ড, কালোবাজারি ও সিফিলিস আক্রান্ত যজ্ঞেশ্বরের মতো ধনীলোকের চিকিৎসা শুরু করলেন যাদের হাতে প্রচুর টাকা। সেই টাকার মোটা অংশ প্রিয়গোবিন্দের বড়ই প্রয়োজন। এই অণুগল্পের মূল স্রোতের সঙ্গে সমাজ-সচেতন একটি বলিষ্ঠ বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন বনফুল, 'একটা কথা কি তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছ প্রিয়গোবিন্দ? যজ্ঞেশ্বরের সিফিলিস এবং ওই (গরিব) মেয়ের যক্ষ্মা কি একই অবস্থার দুই দিক নয়! যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থার ফলে যজ্ঞেস্বর অত্যধিক টাকা রোজগার করিয়া মাথা ঠিক রাখিতে পারে নাই, সেই সামাজিক ও

রাজনৈতিক অব্যবস্থাই ওই অভাগিনী মেয়েটিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, যক্ষাগ্রস্থ করিয়াছে।' গল্পটি এখানেই শেষ নয়। বনফুল আরও একটু বাড়িয়ে নিয়েছেন পঁচিশ বৎসর পর প্রিয়গোবিন্দ আবার আদর্শে ফিরে আসে। গরিবের চিকিৎসা শুরু করে অল্প পয়সায়। কিন্তু দেখে গরিব জমিজিরাৎ বিক্রি করে বিলাত ফেরৎ ভণ্ড ডাক্তারের কাছে চলে যায় চিকিৎসা করাতে। এতটা বনফুল না টানলেই পারতেন। আপাতদৃষ্টিতে এই গল্পটি যথেষ্ট মূল্যবান গল্প। ভাবাবেগ পাঠককে আপ্লুত করে রাখে এই গল্প। কিন্তু বনফুল নিজস্ব শ্রেণি অবস্থান থেকে এই গল্পের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, শ্রেণিবিভক্ত সমাজ থেকে যদি তিনি দেখতেন তাহলে বুঝতেন প্রিয়গোবিন্দের আদর্শ ভাবাবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক বোধ ও রাজনৈতিক বোধ নেই। শ্রেণিসচেতনতা এবং বোধ এক কথা নয়।

সভ্যতাকে শিক্ষিত ও পেশাদারি মানুষজন কিভাবে কলুষিত করে তুলেছে—এই Content-এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে 'অসম্ভবের গল্প'। শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ধরে টান মেরেছেন। কুকুরকে চরিত্র বানিয়ে লেখা হয়েছে 'খেঁকি'। সমাজ ও রাজনীতি মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। আইন অমান্য আন্দোলন, সশস্ত্র আন্দোলন, মুসলিম লিগ, আম্বেদকরের কণ্ঠস্বর, দলিত জীবনযাপন ইত্যাদি প্রসঙ্গ গল্পে জলের রেখার মতো ছুঁয়ে যায়। পাঠক-মনকে নাড়ায় না, গল্পটিতে প্রাণরস নেই। Satire যেন যন্ত্রবৎ। বাঙালির অন্তঃসারশূন্যতাকে বোঝানো হয়েছে রূপকের আড়ালে। রূপক ব্যবহারটি প্রশংসনীয়। ভদ্রশ্রেণির কাছ থেকে গরিব লোকেরা যে কুকুরের মতো ব্যবহার পায় সেটা এতো বেশি ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা গল্পে, যা এখন তার রং ফিকে হয়ে গেছে।

নারীরাও যে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নিপীড়ন ও অবহেলার স্বীকার তার কয়েকটা নক্‌সা পাই 'রামায়ণের এক অধ্যায়', 'নিমগাছ', 'তিলোত্তমা' ইত্যাদি অণুগল্পে। এরকম আরও গল্পে বনফুল নির্যাতিত নারীদের পাশে এসে দাঁড়ান। 'রামায়ণের এক অধ্যায়' অণুগল্পে যে নক্‌সাটি এঁকেছেন বনফুল, সেটি হচ্ছে নকুড় মাইতি যাত্রায় রামের পাট করেন এবং সীতার জন্য বিলাপ করেন, সেই নকুড় মাইতি ঘরে স্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরে মারধোর করেন। এই গল্পে কেন, অনেক অণুগল্পেই মন-কারা সংলাপ এবং ভন্ডামির মুখ ও মুখোশ পাঠক দেখতে পাবেন। হাজারি-হাজার বছরের পরেও রামায়ণ পুরুষের চরিত্র পালটাতে পারেনি। বনফুল মনে করেন, ভন্ডামিটাই বাস্তবতা। তাহলে কি আমরা এই সামাজিক ভন্ডামিটাকে স্বীকার করে নিশ্চল জীবন যাপন করে চলেছি? বা চলবো?

যে-কোনো ঘটনা, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বনফুল অণুগল্প লিখে ফেলতে পারেন চট্-জলদি। এই মন্তব্যটি প্রমাণ করা যায় অণুগল্পগুলি পড়লে, অণুগল্পের প্রাচুর্যের কথা ভাবলে, এবং প্রতিটি গল্পের প্রায় একই রকমের শেষ চমকের কথা মনে করলে। একবার ছোটোগল্প লেখার প্রযুক্তিটা বা ছকটা চূড়ান্ত রকমভাবে আয়ত্ত করতে পারলেই এই দক্ষতাটা আর দক্ষতা থাকে না মানসিক-মেসিনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বনফুল আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসেবে তিনি এখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা না পেলেও তিনি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অণুগল্প লিখেছেন। ওপরে কিছু আলোচনা হয়েছে। 'ফরেন

মানি' অণুগল্পটি সেরকম একটি। অর্থনীতি প্রসঙ্গে হালকা উপস্থাপনার ভিতর দিয়ে এক গভীর satiristic ব্যঞ্জনা এনেছেন। ফরেন মানি আর্ন করবার জন্যে চিংড়ি মাছ ফরেনে রপ্তানি করা হয়। এই সংবাদ একসময় সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় উঠে আসত। স্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষ নিজের দেশের উৎপাদিত বস্তু ভোগ করতে পারছে না। বনফুল এই গল্পে লিখছেন, 'এ দেশের সব ভাল জিনিসই বিদেশে গিয়ে ফরেন মানি আর্ন করছে। ভাল কাপড়, ভাল চাল, ভাল ভাল ফল, সব আজ বিদেশের বাজারে। আমাদের খনিগুলিতো খালি হয়ে গেল। এমন কি বড়ো বড়ো ব্যাং পর্যন্ত চালান হচ্ছে। এ দেশের ভাল ভাল ছেলে মেয়েরাও বিদেশে গিয়ে 'ফরেন মানি' রোজগার করছে।' এই গল্পের প্রাসঙ্গিকতা আজও আছে। বনফুলের দূরদর্শিতাই বনফুলের প্রতিভার অন্য পরিচয়। গল্পের চরিত্র গোবর্ধন ফরেন মানি আর্নের ফলে তাঁর সুন্দরী বৌকে চিংড়ি মাছ খাওয়ার ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারছে না। বাড়ি ফিরে একদিন গোবর্ধন দেখে বৌ বাড়িতে নেই। তবে বৌ-এর একটি চিঠি আছে। লিখেছে, 'আমিও ফরেন মানি আর্ন করতে চললাম।' আমাদের দেশে চিংড়ি মাছের মতো সুন্দরী মহিলারাও ফরেন মানি আর্নের জন্য মূল্যবান পণ্যদ্রব্য। গল্পের নেতিবাচকতার তীব্র আঘাতও অনেক সময় পাঠক-মনে ইতিবাচকতার আলোড়ন তোলে। বনফুলের অনেক অণুগল্পে/ছোটোগল্পে এরকম ব্যতিক্রম আছে। 'ফরেন মানি' অণুগল্পটি তার মধ্যে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই গল্পে অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুণ কিভাবে ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয় গ্রাস করে নেয়, তারই নিদর্শন রেখেছেন বনফুল। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসেও দেখি একই ইতিহাস। শুধু তুচ্ছ ঘটনা নয়, জীবনদায়ী ওষুধের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও বনফুলের হাতে পড়ে অণুগল্প হয়ে যেতে পারে। অণুগল্পে উনি আমাদের সাহিত্য-গুরু। তবু বলি, এইগল্পে ও অনেক গল্পে কার্য পেয়েছি, কারণ পাইনি।

'রিকশাওয়ালার আত্মকাহিনি' অণুগল্পটি একটি প্রথাবিরোধী ছোটোগল্প। সেই গল্পই প্রথাবিরোধী যে গল্প ছোটোগল্পের নিয়ম-শর্ত-সংজ্ঞা মেনে অর্থাৎ ছোটোগল্পের গ্রামার মেনে লেখা হয় না। বনফুলের বেশির ভাগ ছোটোগল্প/অণুগল্প ছোটোগল্পের ছাঁচ থেকে উঠে আসা। 'রিক্‌শাওয়ালার আত্মকাহিনি' অণুগল্পটি তার আংশিক ব্যতিক্রম। গল্পের উপাদান, রিপোর্টারের ও আত্মকাহিনির উপাদান মিলেমিশে এক প্রথাবিরোধী গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে গল্পের শেষে চমকের চাবুক নেই, রূপক বা চিত্রকল্প নেই, বরং আছে চরৈবেতি। শেষে আছে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়া আশা। ফলত কোনো সামাজিক দ্বন্দ্ব নেই, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত নেই। বনফুলের অধিকাংশ গল্পে এমন দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের বড়োই অভাব, ফলত সচলতার অভাব।

অস্বীকার করার উপায় নেই, বনফুল ছিলেন প্রোফেশনাল, কমার্সিয়াল এবং ফরমায়েশি গল্পকার বা গল্পের কারিগর। বনফুল নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ঋণ শোধ করবার তাড়ায় আমাকে অনেক লিখিতে হইয়াছিল। এ তাড়া না থাকিলে আমি হয়তো এতো বই লিখিতাম না।' স্বভাব-সুন্দর স্বীকারোক্তি। নিজের সমালোচক নিজেই ছিলেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি কি তাহলে সফল ডাক্তার ছিলেন না? ঋণের কি

সীমারেখা নেই? অন্যত্র সফল পুস্তক ব্যবসায়ী সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতি কথাতেই বনফুলের প্রোফেশনাল স্বভাবটি বুঝতে পারা যায়, 'লেখা চেয়ে ছাপার পর যদি কেউ টাকা পয়সা না দিতেন, বনফুল তাদের ওপর অত্যন্ত চটে যেতেন।' অর্থভাবনা এবং সৃজনশীল ভাবনা পাশাপাশি চলতে পারে না। একটা আরেকটার ওপর প্রভাব ফেলবেই। বনফুলের অতিরিক্ত অর্থভাবনা সৃজনশীল ভাবনার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এখানে আমরা বনফুলের লেখা 'মরজিমহল' ডায়েরি থেকে একটি কথা স্মরণ করতে পারি, 'সারা জীবনই লেখবার মতো বিষয় খুঁজছি। কিন্তু মনোমতো বিষয় পাইনি। ...সব লেখার বিষয় ঠিক আমার 'মনোমতো' ছিল না, লেখার খাতিরে লিখেছি।' এটা প্রকৃত আত্মসমালোচনা হতে পারে। ফলে সৃজনশীলতার স্ফুট-অস্ফুট যন্ত্রণা থেকে তাঁর সচল গল্প অল্পই বেরিয়ে এসেছে। সেই অল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটির নাম 'মানুষের মন', 'অর্জুন মণ্ডল', 'শ্রীপতি সামন্ত', 'আইন', 'ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিহাস', 'বুড়িটা', 'ভুলির গল্প', 'তর্ক ও স্বপ্ন', 'যুগান্তর', 'চৌধুরী' ইত্যাদি। 'তর্ক ও স্বপ্ন' গল্পে জাত্যাভিমানী অন্ধ অনুকারকদের ষাঁড়েদের সঙ্গে তুলনা করেছেন মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে। এই গল্পে মাংস-রন্ধন প্রণালী ও তৃণভোজী ষাঁড়েদের শৃঙ্গ-যুদ্ধের রূপকের আড়ালে বনফুলের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মনোভাবটি বুঝতে পারা যায়। স্বৈর-শক্তির বিরুদ্ধে বনফুলের মনোভাবটি বুঝতে পারা যায় 'যুগান্তর' ও 'চৌধুরী' অণুগল্পে। 'যুগান্তর' গল্পে ধরা পড়েছে গ্রামের মহাজনদের কথাই শেষ কথা নয়। কারণ সমাজ দ্রুত বদলাচ্ছে। 'চৌধুরী' গল্পের চরিত্রটি সমাজের সার্বিক অনুশাসনকে মেনে নিতে না পারার জন্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। আত্মহত্যা নেতিবাচক জীবনপ্রবাহকে বিপন্ন করে।

বনফুলের শিক্ষিত ও দেহ-রূপে অম্লান স্ত্রী লীলাবতীর মৃত্যুর (১৯৭৬) পর বনফুল লীলাবতীকে সম্বোধন করে ডায়েরি লিখতেন। বনফুলের শেষ বয়সের লেখা এই ডায়েরির কোথাও কোথাও আত্মবিশ্লেষণের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। শেষ বয়সের আত্মবিশ্লেষণে বা ডায়েরি লেখায় কোনো গ্ল্যামার বা গিমিক থাকে না, সত্য থাকে। যেমন, তিনি ডায়েরিতে লিখছেন, 'আমাদের দেশের দুর্দশার কারণ যে কি তা আমরা সবাই জানি। আমরা অপদার্থ অমানুষ। তাই যুগে যুগে বিদেশীরা এসে আমাদের ওপর রাজত্ব করেছে। ...এই ত্রিশ বছরে আমরা বুঝেছি বিদেশি রাজ্য আর স্বদেশি গণতন্ত্রে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। আমাদের দুঃখ কমেনি, বেড়েছে। কারণ আমাদের মনুষ্যত্ব ক্রমশ লোপ পাচ্ছে, আমরা আর মানুষ নই, গোরু-ছাগলের পর্যায়ে নেমে গেছি।' (জানুয়ারি ১৯৭৯) বনফুলের এরকম মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ-কয়েকটি অণুগল্প আছে। বাঙালির নকল ইংরেজি ভদ্রতার মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলার একটি সতেজ অণুগল্প 'শ্রীপতি সামন্ত'। ইংরেজ চলে গেছে, কিন্তু ইংরেজদের দাসত্ব চর্চা রয়ে গেছে। সেরকমই একটি চরিত্র ট্রেনের কামরায় ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের যাত্রী সাহেব-বাঙালি, প্যান্ট-টাই, মুখে পাইপ শোভিত। মুখে ইংরেজি বুলি। তিনি হচ্ছেন বিনা পয়সার যাত্রী। টিকিট চেকারকে সেই ইংরেজির দাসত্বে গর্বিত বাঙালি সাহেবের পুরো টিকিটের মূল্য দিয়ে বাঙালির সম্মান বাঁচান শ্রীপতি সামন্ত, যাঁর 'পরনে একটি আধ-ময়লা থান, খালি গা, পায়ে

ধুলিধূসরিত এক জোড়া দেশি মুচির তৈয়ারি চটি'। একটা সফল সচল সামাজিক ভূমির ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন বনফুল। গল্পটি যথার্থ গতিশীল, অবক্ষয়-তাড়িত নয়। রাজনৈতিক চর্চার অনুপ্রবেশ ঘটেছে 'ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিহাস' ও 'বুড়িটা' ছোটোগল্পে। 'ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিহাস' অণুগল্পে গান্ধী-শিষ্যকে নিয়ে লেখা যে খদ্দর পরে, যে ব্যবসা করতে গিয়ে মুনাফার লোভে বিলাতি রেশম বস্ত্রের ওপর ত্রি-রঙা ভারতীয় পতাকা ছাপিয়ে বেশি দামে বিক্রি করে। 'ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিহাস' অণুগল্পে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে কিছু সংলাপ আছে যেমন, (১) উনিই (মহাত্মা গান্ধী) তো ভারতবর্ষের প্রতীক, মশাই। বাইরে অনাড়ম্বর, অন্তরে ঐশ্বর্য। এইটেই তো ভারতের বৈশিষ্ট্য। (২) কী ভীষণ আধ্যাত্মিক শক্তি বলুন তো, ইংরেজের মতো অত বড় একটা দুঁদে জাতকে কেঁচো বানিয়ে দিলে একেবারে—। (৩) আসল কথা কি জানেন, মহাত্মা একটা ঘুঘু। আমি খুব রিলায়েবেল সোর্স থেকে শুনেছি যে রোজ রাত্রে উনি ওড়েন। (৪) ঘুঘু মানে যোগী, পদ্মাসনে বসে উনি রোজ শূন্য মার্গে ওড়েন, একজন স্বচক্ষে দেখেছেন। আমার বিশ্বাস উনি হিমালয়ে গিয়ে মহাদেবের সঙ্গে কন্‌সালট্ করে আসেন রোজ। তা না হলে 'কুইট-ইণ্ডিয়া' বলামাত্র ইংরেজরা সুট সুট করে চলে যাবে একি আর এমনিতে হয়।

এসব সংলাপের বক্তা যে ভদ্রলোকটি তিনি খাঁটি স্বদেশি লোক, বস্ত্র-ব্যবসায়ী। যিনি শুনছেন, তিনি বেকার। বেকারটি বলছেন— 'শুনেছি একবার এক বখাটে ছোঁড়া ওঁর বন্ধুর একটা খাসি কেটে ফেলেছিল। বন্ধু খাসির শোকে কেঁদে-আকুল, তখন উনি (মহাত্মা গান্ধী) অহিংস মন্ত্রবলে সেটাকে নাকি বাঁচিয়ে দেন।'

এরপর স্বদেশি ভদ্রলোক তাঁর বস্ত্রের দোকানে কমিশনের ভিত্তিতে বেকারটিকে একটা কাজ দেন।

টীকা নিষ্প্রয়োজন, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তাঁর মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করত বলেই তিনি গণতান্ত্রিকতার পক্ষে কংগ্রেসের আচার আচরণকে সমালোচনা করে গেছেন তাঁর অনেক ছোটোগল্পে/অণুগল্পে। 'বুড়িটা' তার মধ্যে একটি। এই গল্পের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বনফুল এই গল্পে লিখেছেন, 'যেদিন পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতা দেবার কথা সেদিন আমাকে একটা দূরের গ্রামে কলে যাইতে হইয়াছিল। খুব ভোরে গিয়াছিলাম যাহাতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটি শুনিতে পারি। একটি গ্রামের কাছে ড্রাইভার সজোরে ব্রেক কষিয়া গাড়িটা থামাইয়া দিল। পথের ওপরই একটা মড়া, তাহাকে ঘিরিয়া শকুন আর কাক। ...তখনই মনে হইল—এ তো সেই বুড়িটা।' এই সেই দরিদ্র বুড়ি যাকে গল্পের বক্তা ডাক্তার প্রতিদিন সকালে কিছু না কিছু সাহায্য করতেন।

'ফিরিয়া শুনিলাম বক্তৃতায় নেহেরুজী বলিয়াছেন, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য তাহার গভর্নমেন্ট প্রাণপণ করিতেছেন। বক্তৃতা দিয়া বিমানযোগে পাটনা চলিয়া গিয়াছেন, সেখানে আর একটি বক্তৃতা দিবেন।' ছোটোগল্পের আঙ্গিক বিচারেও এটি একটি নিঃসন্দেহে ভাল গল্প। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাঙ্গাত্মক কৌশলটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

'আইন' ছোটোগল্পটিতে গল্পকার আইনের অনুশাসনকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। পাপ, সচল দুর্নীতি, অনাচারের বিরুদ্ধে বনফুলের অনাস্থা মনোভাবটিকে এই গল্পে বুঝে নেওয়া যায়। প্রেমে ব্যর্থ হতে পারে এই ভেবে জীবন একজনকে খুন করেছে। খুন করার সময়টাতে সে যে ডাক্তারের অধীনে চিকিৎসায় ছিল সেই ডাক্তার টি. সি. পালের কাছ থেকে মিথ্যা সার্টিফিকেট দু'হাজার টাকা দিয়ে কিনে নেয়। পরে ডাক্তার জানতে পারেন, জীবন যাকে খুন করেছে, সেই ব্যক্তিটিই হচ্ছে ড. টি.সি. পালের বড় ছেলে। কিন্তু আগেই আইনের হাত থেকে জীবনের বাঁচার পথ ডাক্তার পালই করে দিয়ে বলেছেন, 'এমন পাকা কাজ করে দিলুম যে, আইনের বাবারও সাধ্য নেই আপনাকে ধরে।' গল্পের climax নির্মাণ দক্ষতায় বনফুল হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কারিগর।

'ভুলির স্বপ্ন' চমৎকার গতিশীল এবং দ্বান্দ্বিকতায় পরিপূর্ণ একটি ছোটোগল্প। ম্যাজিক রিয়ালিজম যার বাংলা করা হয়েছে যাদু-বাস্তবতা, কুহেলী ঘেঁষা বাস্তবতা বা কুহকি বাস্তবতা বা অলৌকিক বাস্তবতা, কথাটা এখন খুবই প্রচলিত। ম্যাজিক রিয়ালিজমের মূলে আছে অলৌকিক কল্পনা, অদ্ভুত কল্পনা, রহস্য, ইন্দ্রজাল, লোককথা, কিংবদন্তি, পুরান, রূপক, প্রতীকী ব্যঞ্জনা। অন্যরূপে অন্যরীতিতে সমাজ-বাস্তবতার প্রকাশ মাধ্যম হচ্ছে এই ম্যাজিক রিয়ালিজম। উপন্যাস-ছোটোগল্পের এক ধরনের রচনা-রীতির নামই হচ্ছে ম্যাজিক রিয়ালিজম। ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রবক্তা মূলত লাতিন আমেরিকার দুই সাহিত্যিক এবং গবেষক, আলেহো কার্পেন্তিয়ের ও আন্‌হেল আস্তুরিয়াস। ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রয়োগ ও চর্চার ভিতর দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়ে উঠছে যে বাস্তবে কুহক অন্তত তথাকথিত বিষয়মুখী তন্ময় রচনার ওপর নির্ভর করে না। বনফুলের একটি অণুগল্প প্রসঙ্গেই ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রস্তাবনা। অণুগল্পটির নাম 'ভুলির স্বপ্ন'। এই গল্পে বাংলার লোককথা-পুরাণ-কিংবদন্তির সংমিশ্রণে সমাজ-বাস্তবতার বিকাশ ঘটেছে। পিতৃমাতৃহীন ভুলি হচ্ছে জমিদার পলাশলোচনের মালি যোগেশের দ্বিতীয় বউ। প্রথম বৌ দুর্গা কলেরায় মারা গেছে। জমিদার পলাশলোচনই দরিদ্র ভুলির বিয়ে দেয় যোগেশের সঙ্গে। উদ্দেশ্য সে ভুলিকে ভোগ করবে। যোগেশের অনুপস্থিতিতে পলাশলোচন রাতে ভুলির ঘরে ঢোকে। ভুলি জমিদারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে খিড়কির দুয়ার দিয়ে পালিয়ে ক্রমাগত ছুটতে ছুটতে গভীর জঙ্গলে ঢুকে একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসামাত্রই গাছটি একটা যুবক হয়ে যায়। যুবকটি হচ্ছে নাগরাজ ফণীন্দ্র। দেবতার অভিশাপে গাছ হয়েছিল। দেবতা বলেছিলেন, কোনো সতী রমণী যদি তোমাকে স্পর্শ করে তাহলে তুমি মুক্তি পাবে। তখন ভুলি জমিদারের অত্যাচারের কথা, সতীত্ব হরণের কথা বলে। শুনে যুবক শঙ্খচূড় সাপ হয়ে যায়। 'পরদিনই সর্পাঘাতে পলাশলোচনের মৃত্যু হইল।' এইখানেই গল্প শেষ। আর তখনি পাঠকের মনে গণেশ পাইনের একটা স্কেচ তৈরি হয়ে যায়, এক অসহায় পতিপ্রিয় রমণীর মুখ, অলৌকিক ইচ্ছার স্বপ্ন যাকে গ্রাস করে নেয়। বনফুল যার নাম রেখেছেন ভুলি। সার্থক নামকরণ।

৪

বনফুলের ছোটোগল্প/অণুগল্পের আলোচনা এখানেই সম্পূর্ণ নয়। তিনি প্রায় ছ'শো ছোটোগল্প/অণুগল্প লিখেছেন। ছ'শো গল্পের পরিশীলিত ও নিবিড় পাঠ-পাঠান্তে বিচার বাছাই, তারপর তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণ শেষে গল্পকার বনফুলের গুরুত্ব বিচার, এটাই হবে বনফুলের প্রতি শুদ্ধতম শ্রদ্ধার্ঘ্য। ফলে তাঁর ছোটোগল্প/অণুগল্পের আলোচনা এখানেই সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই অসম্পূর্ণতা থেকেই বনফুলের ছোটোগল্প/অণুগল্প পড়ে এবং আলোচনা লিখে আমার যা ধারণা হয়েছে সেসব এখানে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

১. বনফুলের ছোটোগল্পে অনুভবের জায়গাটা প্রশস্ত নয়।
২. তাঁর গল্পে ন্যারেশনের (Narration) বিস্তৃতি যতখানি ততখানি মনস্তাত্ত্বিকতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।
৩. কিছু কিছু সফল, সচল ও বিস্ময়পূর্ণ গল্প লেখার জন্য বনফুল যতখানি গুরুত্বপূর্ণ (Serious) হয়ে উঠেছেন, অত্যধিক লেখার চাপ তাঁকে ততখানি গুরুত্বপূর্ণ লেখক তৈরি করতে পারেনি। অবশ্য এ প্রকার মন্তব্যের সত্য-অসত্য প্রমাণ হবে প্রায় ছ'শো গল্পের বিচার বিশ্লেষণের পর।
৪. অণুগল্প লিখতে হলে প্রাথমিক পাঠ অবশ্যই বনফুলের কাছ থেকে নিতে হবে।
৫. বনফুল সংস্কারমুক্ত সাহসী ছোটোগল্পকার।
৬. বনফুলের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রতি কোনো মোহ নেই। বনফুলের জগত প্রত্যক্ষ বাস্তবের জগত। তিনি যা চোখে দেখেন তাই তিনি শব্দ/অক্ষর দিয়ে গল্পের ছবি তৈরি করেন। তাঁর গল্পে চমক আছে, গিমিক আছে।
৭. বনফুল অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মানব জীবনের নানারকম চরিত্র ও স্বভাবের, আচার-আচরণের কলমের ক্যামেরায় সাজানো ছবি তুলে গেছেন। সেখানে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাত প্রধান হয়ে ওঠেনি। নিশ্চলতা ও সচলতার নিস্পৃহ অবস্থান।
৮. বনফুলের ছোটোগল্পে/অণুগল্পে সামাজিক চিত্র ও রাজনৈতিক চিত্র এসেছে, কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত, আন্দোলন, লড়াই, প্রতিরোধ প্রতিবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।
৯. সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, 'কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতিও তাঁর অকারণ অনুরক্তি নেই। তার মনের গড়ন দার্শনিকের নয়, বৈজ্ঞানিকের। বলা যায়, নিস্পৃহ বিজ্ঞান-ভাবনা।
১০. নিছক চোখে দেখা ফটোগ্রাফিক বাস্তবতা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ফলে বনফুল আধুনিক হতে পারেন, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারেননি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প : সমাজ-চেতনা, বিজ্ঞান-চেতনা ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প এবং প্রাক্‌-কথন :

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের ছোটোগল্পগুলোকে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে বক্তব্য রাখেন, "তাঁহার উদ্ভট অবাস্তবতা ও যৌন বিষয়ের প্রতি অতিপক্ষপাত সত্ত্বেও তাঁহাকে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করেছে।" এই বক্তব্যের মধ্যে তিনি উদ্ভট অবাস্তবতা ও যৌনবিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং উত্তর-পর্বের ছোটোগল্পগুলোর কোনো আলোচনা তিনি করেননি। কিন্তু যৌন-বিষয়ক চিন্তাভাবনা ছাড়াও প্রথম পর্বের ছোটোগল্পগুলোতে মানিক যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি লিখতে বাধ্য হোন, "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প সংগ্রহের মধ্যে কতকগুলি প্রথম শ্রেণির গল্প আছে"।

বেশির ভাগ মানিক গবেষকদের মতে মানিকের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প থেকেই শুরু হয় যৌন-প্রধানতা এবং ফ্রয়েডিয় প্রভাব। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি আলোচনা করতে গিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও মানিকের গল্প যে যৌনপ্রধান তার ইঙ্গিত দিয়ে বক্তব্য রাখেন, "সেদিনের আদিম জিঘাংসা এবং নীতি-ধর্ম-সমাজ বিবর্জিত পাশবকামনা আজও মানুষের অন্তরতম লোকে নিহিত আছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক বাস্তব লীলার দিকটিই প্রতীকিত হয়েছে ভিখু এবং পাঁচীর গল্পটিতে।"

ড. সরোজমোহন মিত্র এই 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটোগল্পটিতে মানিকের বিদ্রোহী স্বভাবের উপকরণটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে বক্তব্য রাখেন, "এই গল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ভিখু চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং স্বজীবতা। বাংলা সাহিত্যে যখন কেবল নির্জীব চরিত্রের বিষাদময়তায় ভারাক্রান্ত হচ্ছিল তখন ভিখুর চরিত্র যেন বিদ্রোহীর মতো আত্মপ্রকাশ লাভ করল। এ গল্পে কোনো রোমান্টিক আবেগপ্রবণতা নেই, আছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মেকি আবরণের স্বরূপ প্রকাশের উদ্ধত বিদ্রোহী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। এখান যেন বিদ্রোহের একটা বলিষ্ঠতা আছে।" এই অ-ক্লিশে (cliche) মন্তব্যটিকে মেনে নিয়েও সরোজমোহন মিত্র যখন মানিকের প্রথম পর্বের ছোটোগল্পগুলোতে অ্যাকাডেমিক গবেষক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো যৌনতাকে প্রাধান্য দেন এবং ফ্রয়েডিয় প্রভাবকে রুট ভাবেন তখন এই স্ববিরোধী গবেষকের বিরোধিতা করতেই হয়। ড. মিত্র মন্তব্য স্থাপিত করেন, "মানিকের প্রথম পর্বের গল্পে আছে ফ্রয়েডিয় চিন্তাধারার প্রভাব। মানিকের প্রথম পর্বে চরিত্রগুলোর মধ্যে আছে পরস্পর বিরোধিতা, অস্বাভাবিকতা এবং যৌনতার প্রধান্য।"

প্রবন্ধকার ও সমালোচক নারায়ণ চৌধুরীও কতিপয় অ্যাকাডেমিক গবেষকদের মতোই সুর মিলেয়ে বলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প সম্পর্কে, "প্রথম জীবনে ফ্রয়েডিয় নির্জ্ঞান তত্ত্বের প্রভাবে তা আত্মকেন্দ্রিক বিকৃতির পথে চলেছিল, পরে মার্কসীয় বিজ্ঞানের আরোগ্য ক্ষমতার কল্যাণে তা সুস্থ পথে সুস্থিত হয়।"

নারায়ণ চৌধুরীর আরও একটি সিদ্ধান্ত, "তাঁর সাহিত্য জীবনে ফ্রয়েড আর মার্কস দুইয়েরই প্রভাব স্বীকৃত, তবে এককালীন নয়। প্রথম বয়সে ফ্রয়েডিয় আত্মরতির মাত্রাহীন প্রভাব—" আমরা মনে করি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনে বিজ্ঞান ও মার্কস স্বীকৃত, মানিকের প্রথম পর্বের গল্পেও ফ্রয়েডের মাত্রাহীন প্রভাব নেই। পুরোপুরি ফ্রয়েড-তত্ত্ব মানিকের ওপর চাপানো হয়েছে। মানিকের সাহিত্য-জীবনের গোড়া থেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বামাচারী লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। ফ্রয়েডিয় প্রভাব শুধুমাত্র মনোবিকলন তত্ত্বেই সীমাবদ্ধ, আংশিকতাদুষ্ট। এ বিষয়ে পূর্বসুরীদের মধ্যে আলোকপাত করেন ভূদেব চৌধুরী এবং পরবর্তীকালে ড. রবীন্দ্র গুপ্ত।

ভূদেব চৌধুরী বক্তব্য রাখেন, "দারিদ্র, সামাজিক অসাম্য ও পারিপার্শ্বিক নির্যাতনের পঙ্কিল স্রোতে বলিষ্ঠবেগে উজান ঠেলে সুন্দর প্রেমের তীরে শিল্পী তাঁর গল্পের তরী বেয়ে চলেছিলেন।" প্রথম থেকেই মানিকের ছোটোগল্প যে বামাচারী ও বিজ্ঞান লক্ষণাক্রান্ত ভূদেব চৌধুরী মানিকের ছোটোগল্প আলোচনা করতে গিয়ে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ড. রবীন্দ্র গুপ্তও একজন মানিক-গবেষক। তিনিও ফ্রয়েড নয়, বিজ্ঞান ভাবনাকেই আবিষ্কার করেছেন, "আশৈশব 'কেন' রোগ মানিকের শিল্প তথা জীবনবোধকে মনোবিকলনী আতিশয্য, নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক সম্পর্কতা থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণ সত্যের দিকে নিয়ে গেছে।" তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, "ফ্রয়েডিয় মনঃসমীক্ষণে তাঁর সাহিত্য আংশিকতাদুষ্ট হলেও বাংলা সাহিত্যে আর কেউ জীবনসত্য অন্বেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সতত সজাগ নন।" আমরা এখান থেকেই শুরু করব। অনুসন্ধান করব, সাহিত্য-জীবনের গোড়া থেকেই মানিকের বিজ্ঞান-স্পৃহা এবং বাস্তব-ভাবনা কিভাবে ভাববাদ থেকে বাস্তব সংঘাতের দিকে এগিয়ে গেছে, শ্রেণিসংগ্রামী সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বোধে সফলতা অর্জন করেছে।

সূত্রপাত, প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা ইত্যাদি :

আমরা দেখলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাঁর পূর্বজীবনের ছোটোগল্পগুলো ফ্রয়েড প্রভাবিত এবং উত্তর-জীবনের ছোটোগল্পগুলো মার্কসবাদ প্রভাবিত। কিন্তু এভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-জীবনকে যান্ত্রিকভাবে দুটি পর্বে চিহ্নিত করা অর্থই গোড়া থেকেই মানিকের বিজ্ঞান-স্পৃহা এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। সকল গল্প না পড়া পাঠকদের বিভ্রান্ত করা যে মানিকের পূর্বজীবনের সকল ছোটোগল্পই ফ্রয়েডের মতবাদ দ্বারা চালিত। শুধু তাই নয়, এর বিষক্রিয়া সুদূর প্রসারিত হতে বাধ্য, যেমন, ফ্রয়েড প্রভাবিত ভালগার গল্পকারদের সামনে মানিককে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহারের জন্য তুলে ধরা। কিন্তু পূর্বজীবনের প্রচুর বলিষ্ঠ সামাজিক দায়বদ্ধতার গল্প আছে যা সামান্য কয়েকটি ফ্রয়েড-মনোবিকলনবাদ প্রভাবিত গল্পগুলোকে ম্লান করে

দেয়। আমাদের যন্ত্রণাটা এখানেই যে মানিকের পূর্বজীবনের বলিষ্ঠ বাস্তববাদী গল্পগুলোকে লাইমলাইটে না এনে ফ্রয়েড মনোবিকলনবাদ প্রভাবিত কয়েকটি গল্পকে আলোচনার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে মানিককে দুভাবে চিহ্নিত করা হয়।

অনেক সমালোচক মানিকের পূর্বজীবনের ছোটোগল্পগুলোকে নাকচ করে দেন মানিকের উদ্ধৃতি দিয়ে। পূর্বজীবনের গল্প সম্বন্ধে মানিকের মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে নাকচ করে দেওয়াটা সঠিক নয়। মানিক বলছেন, "লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে। মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি।" এই বক্তব্যই প্রমাণ করে, মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার আগেও মানিকের দৃষ্টিভঙ্গি এক জায়গায় আবদ্ধ থাকেনি। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনটা কোথা থেকে কিভাবে হচ্ছে তা একশ্রেণির পূর্বসুরী গবেষকরা করেননি। শুধুমাত্র ফ্রয়েডের মধ্যেই তাকে আবদ্ধ রেখেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও একটি জনপ্রিয় উক্তি এঁনারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, "আমার লেখায় যে অনেক ভুলভ্রান্তি, মিথ্যা ও অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি।" এই যে ভুলভ্রান্তি, মিথ্যা ও অসম্পূর্ণতা এসব মানিক তাঁর যৌনপ্রধান গল্প সম্পর্কে অনুশোচনা করেছেন, নাকি পূর্বজীবনের গল্পে যে রোমান্টিকতা, রোমান্স, ভাবপ্রবণতা, বিষণ্ণতা, ভাবাবেগ প্রাধান্য ছিল সে সবের জন্য অনুশোচনা করেছেন? এর উত্তর মানিকই দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য-জীবন সম্পর্কে যে আত্মকথার প্রসঙ্গে এনেছেন তার মধ্যেই আছে।

সাহিত্য-জীবনের গোড়া থেকেই সমাজ-জীবনে বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা মানিককে সর্বদা পরিবর্তন ও উত্তরণের পথে নিয়ে যাচ্ছিল এবং মার্কসবাদে এসে পরিণতি লাভ করেছে। বিজ্ঞান যেমন ভাববাদের ওপর বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, আবার বিজ্ঞান ভাববাদকে নস্যাৎ করে দিয়ে সঠিক বাস্তবতার দিকে সামাজিক চিন্তাভাবনার অগ্রসরণ ঘটায়। প্রথম দিকে মানিকের মধ্যে ভাববাদ ও বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের সংঘাত দেখতে পাই। সংঘাতের সপক্ষেই মানিক কল্লোল-গোষ্ঠীর বিদ্রোহ সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করেন, "জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল ও কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।"

বাস্তব এবং বাস্তবতার দ্বন্দ্ব সংঘাত এক কথা নয়। নিছক চোখে দেখা ফটোগ্রাফিক বাস্তবতা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। বাস্তবতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতই মানুষের চিন্তাকে, সমাজকে পরিবর্তনশীলতার পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যায় নতুন সমাজ গঠনের দিকে। মানিক সেমত কারণেই বলেন, "শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসেনি। বস্তি জীবন এসেছে, কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি—"

মানিক যখন নিজের গল্প 'অতসীমামী' সম্পর্কে বলেন, "রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী", তখন তিনি গল্পে বাস্তবতারই প্রশ্ন তোলেন। এই 'অতসীসামী' যখন মানিক

লেখেন, তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর। এতো কম বয়সে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে মানিকের পক্ষে ভাবাবেগ ও ভাবপ্রবণতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। এরপর থেকে যখন পারিবারিক সংঘাত শুরু হয়, তখন থেকে মানিককে জীবন-অভিজ্ঞতার অন্য স্তরে নিয়ে যায়। মানিক সংঘাতময় বাস্তবতার মুখোমুখি হোন। তখন কলেজে আজকের মতো রাজনৈতিক পরিবেশ-জটিলতা ছিল না। মোটামুটি ইংরেজের বিরুদ্ধেই রাজনীতি দানা বাঁধতো। ত্রিশ দশকে মানিক ত্রিশের কোঠায় পড়েছেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা কয়েক বছর পূর্বে হলেও জনমানসে প্রসার লাভ করেনি। মানিক তখন অ্যাকাডেমিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বাস্তবতা বিশ্লেষণ করছেন। এই প্রবন্ধের সাত নম্বর উদ্ধৃতি (ভদ্র জীবনের সীমা...) লক্ষ করলে প্রমাণ মিলবে প্রথম প্রথম কল্লোল-গোষ্ঠীর চাকচিক্যে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এই বিভ্রান্তিরই ফসল 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭) ও 'মিহি ও মোটাকাহিনী' (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থ। অবশ্যই সকল গল্প নয়, অল্প কয়েকটি গল্পই এই বিভ্রান্তি, মিথ্যা ও ফাঁকির ফসল।

অনেকের মতে 'অতসীমামী' মানিকের প্রথম ছোটোগল্প। এই গল্পটির বিষয়বস্তুকে তিনি বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, যৌনতা বা দেহ আকর্ষণের মুখোমুখি দাঁড় করাননি। বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করালেও কতখানি জীবনের সংঘাতময় ছবি হতে পেরেছে সে বিষয়ে মানিক নিশ্চিন্ত হতে পারেননি বলেই তিনি বলেছেন 'ঠাসা অবাস্তব কাহিনী'। বাস্তব-সংঘাতহীন কাহিনিকে তিনি মনে করেন অবাস্তব কাহিনি। আমরাও মনে করি। কারণ মানিক স্বীকার করেন, 'ভাববাদ যদি একেবারে বর্জন করতেই পারতাম তবে আর সংঘাত থাকত কিসের'। আবার এই 'অতসীমামী' সম্পর্কেই পরবর্তী কোনো এক সময়ে তিনি বলেন, "কাহিনী রূপকথা হলেও নায়ক-নায়িকা জীবন্ত মানুষ, উদ্ভট হলেও কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে মাটির পৃথিবীর দুটি মানুষের বাস্তব প্রেম।" তিনি আরও বলেন 'অতসীমামী' সম্পর্কে, "কিন্তু সমস্তটাই আজগুবি কল্পনা হলে তো গল্প জমবে না, বাস্তবের ভিত্তিও থাকা চাই গল্পের। গল্পের চরিত্রগুলিকে করতে হবে বাস্তব রক্ত-মাংসের মানুষ।" "বাস্তব রক্ত মাংসের মানুষ" ও "মাটির পৃথিবীর দুটি মানুষের বাস্তব প্রেম"— এখান থেকে ধরতে হবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তারই ক্রম-পরিণতি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার রূপান্তরিকরণ। মাটির পৃথিবীর রক্ত-মাংসের বাস্তব মানুষকে অস্বীকার করে গল্পগুলোকে বলা হয় কিনা ফ্রয়েড-প্রভাবিত। একজন বলিষ্ঠ এবং পথিকৃৎ কমিউনিস্ট লেখক সম্পর্কে, যিনি আজ প্রগতিশীল মার্কসবাদী তরুণ লেখকদের আদর্শ, তাঁর সম্পর্কে ফ্রয়েডিয় মূল্যায়ন প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দেয়।

বিজ্ঞান-চেতনা থেকে সংঘাতময় বাস্তববাদ এবং পরে মার্কসবাদ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকৃতির অংশ বিশেষ :

(১) "ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোটোবড়ো সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ। খুটিয়ে খুটিয়ে সব জানা চাই।"

(২) "কিন্তু একথাও সত্য যে, এ যুগে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব—তাতে শুধু পুরোনো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।... বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্বন্ধ এ যুগের অতি প্রয়োজনীয় যুগধর্ম।"

(৩) "চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশি। প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে।... জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি।"

(৪) "সমাজ জীবনে কি আছে, কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে এটা উপলব্ধি করে দীনতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত করে জীবনকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রামের প্রেরণা জাগবে—সাহিত্যের মাধ্যমে এ সংগ্রাম চালাতে হলে ওই সমাজ জীবনটির সাহিত্যে কি আছে আর কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে সেটাও উপলব্ধি করতে হবে সাহিত্যিককে।"

(৫) "লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি।..."

(৬) "মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানী করেছি—জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।"

(৭) "ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নিচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরালো করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটুয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটি আমার কাছে ধরা পড়ে যেত।"

(৮) "গরীবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত—জিজ্ঞাসা জাগতো, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?"

"ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবনদর্শন খোঁজার মতো সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।"

(৯) "মার্কসবাদ আজ আমার এ সংঘাতের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছে। এ সংঘাত হল ভাববাদ ও বস্তুবাদেরই সংঘাত, সমাজ জীবনে আজ যা প্রকট হয়েছে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।"

(১০) "মোটামুটি প্রথম থেকেই একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাব বাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।..."

"সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কহীন নয়, সমাজের মাধ্যমে যে সম্পর্কের সূত্রগুলি পাওয়া যায়।"

(১১) "আমার বিজ্ঞান প্রীতি, জাত বৈজ্ঞানিকের কেন ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্র বয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ—"

(১২) "সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ অবলম্বন করে নয়। বাস্তবতাই মধ্যবিত্তের জীবনে ও চেতনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যে সংঘাত আমার জীবনে ও চেতনায় প্রকট হয়েছিল, সাহিত্যে তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছিল এই বিদ্রোহ।"

(১৩) "সাহিত্যের আদর্শ জানা ছিল না, সমাজ জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝতাম না—তবু, জীবন সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমার নিশ্চয়ই ছিল।"

(১৪) "প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে—একদিকে চেনা চাষি-মাঝি-কুলি-মজুরদের কাহিনি রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মুর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চোদ্দটি স্বীকৃতি অংশে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ফ্রয়েডের কথা, যৌনতার কথা। একমাত্র ১৪-তে পাওয়া গেল 'নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে', এই কথাটার মধ্যে হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারে ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব। তাও সেটা যৌনতার মোহে নয়, মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দেবার প্রয়োজনে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের পুনর্মূল্যায়ন :

মানিক গবেষকেরা মানিকের ছোটোগল্পের বিচার ও বিভাজন করেছেন ফ্রয়েড এবং মার্কসের চিন্তাসূত্র ধরে। কিন্তু আমরা এই মূল্যায়নকে সঠিক মনে করি না। মানিকের ছোটোগল্পের বিচার করতে হলে যেসকল সূত্র ধরে এগোতে হবে সেগুলো হচ্ছে বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা, ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাত এবং মার্কসবাদ। সেটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত করতে হবে এবং যদি মানিকের সাহিত্য জীবনকে দুভাগে ভাগ করতে হয়, তাহলে সঠিকভাবে সেটা হওয়া উচিত (১) পূর্বকালের গল্প বা অমার্কসীয় ছোটোগল্প (২) উত্তরকালের গল্প বা মার্কসীয় ছোটোগল্প। তবুও আমরা বিভাজনের পক্ষপাতিত্ব করি না।

ছোটোগল্প লেখার শুরু থেকেই মানুষের জীবন সম্পর্কে মানিকের একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এই প্রবন্ধের তেরো সংখ্যক উদ্ধৃতিটিতে (সাহিত্যের আদর্শ...) এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গি এক জায়গায় থেমে থাকেনি। পরিবর্তিত হতে হতে মার্কসবাদে এসে পৌঁছেছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল গল্পের আলোচনা সম্ভব নয়। মানিকের ছোটোগল্পের গবেষকেরা যেসকল ছোটোগল্পগুলোকে আলোচনা করেননি সে সকল ছোটোগল্পের আলোচনাসহ উত্তরকালের কিছু পরিচিত গল্পের আলোচনা করে ক্রম-পরিণতি এবং উত্তরণ দেখানো হয়েছে।

'সরীসৃপ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'নদীর বিদ্রোহ' ছোটোগল্পটি এই কারণে স্মরণীয় যে বন্দী নদীর বিদ্রোহকে কি ভাবে বাঁধ দিয়ে মানুষ দমিয়ে দিতে পারে, ক্ষীণ স্রোতা নদীতে

পরিণত করে দিতে পারে, এমনকি শুকনো করে দিতে পারে সেটাই মানিক অনুভব করেছেন মানুষের যান্ত্রিক জীবনে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র নদের চাঁদ। নদের চাঁদ গ্রামের রেল স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার। চার বছর ধরে চাকরি করছে। ছক বাঁধা পারিবারিক জীবনের মধ্যে সে বন্দী। তার ভেতরেও বন্দী নদীর মতো বিদ্রোহ। সে নদীকে খুব ভালোবাসে। সেই নদীকে যান্ত্রিক সভ্যতা যেমনভাবে বাঁধ দিয়ে বিদ্রোহকে দমন করে, বর্তমান সভ্যতা নদের চাঁদকে তেমনিভাবে বন্দী করে রেখেছে। বৌ-এর কাছে লেখা পাঁচ পৃষ্ঠার চিঠি সে ভীষণভাবে বেদনাসিক্ত হয়ে ছিঁড়ে ফেলে ভাসিয়ে দেয়। নদের চাঁদ কি নতুন সহকারী স্টেশন-মাস্টারকে সব বুঝিয়ে দিয়ে 'আমি চললাম হে' বলে নদীর ব্রিজের ধারে গিয়ে অসহ্য একাকিত্বের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য রেলের তলায় পিষে যায়? এ কি আত্মহত্যা? এই গল্পের এটি একমাত্র দুর্বল দিক এই নাটকীয় পরিস্থিতির জন্য। নাকি মানিক বলতে চেয়েছেন মানুষ সমাজে একা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না? এটি মনস্তত্ত্বের গল্প, মনোবিকলনের গল্প নয়। তবু মনের মধ্যে প্রশ্ন খোঁচা মারে, নয়কি?

'বিষাক্ত প্রেমের' সত্য ও সরলা। একজন চোর (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বেশ্যাসক্ত যুবক) ও অন্যজন গণিকা। কিন্তু এখানে যৌন কামনা বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি। এদের জীবিকাই এখানে বিষয়বস্তু। এদের মধ্যে জীবিকার মিল থেকেই মনের মিল হয়েছে। 'মনের মিলই তো প্রেম' একথা প্রেম সম্পর্কে বলা হলেও মূলত: প্রেম নির্ভর করে বিশ্বাসর ওপর। এই গল্পে সত্য এবং সরলা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্য ভাবছে একদিন সে সরলার সোনার গহনা নিয়ে পালাবে। এরজন্য সে সরলার ঘরে যায়। অনেক টাকা সরলার জন্য খরচ করে। সরলা ভাবে যে সে সোনার গহনাগুলো গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখবে। সে জানে সত্য চোর। সে শুধু সত্যর ঘাড় ভাঙার মতলব আঁটে।

'দিক পরিবর্তন' ছোটোগল্পে মনোহর ডাক্তারের বাড়ির বিধবা ঝি সখি কিভাবে ঝি থেকে নষ্ট মেয়েছেলেতে রূপান্তরিত হল তা দেখানো হয়েছে। যেহেতু অল্প বয়সে সে বিধবা হয়েছে, সেহেতু সখি কি যৌন যন্ত্রণায় কাতরার্ত হয়ে একের পর একেকজনকে দেহ-সম্ভোগের সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে? যদি তাই হতো তাহলে এই গল্পে ফ্রয়েডের প্রভাবকে অস্বীকার করা যেত না। কিন্তু সমাজ-সমীক্ষক মানিক দেখাচ্ছেন যে একজন চাকর যখন সখির পেটের ছেলেটাকে মেরে ফেলার জন্য সখিকে ওষুধের মোড়ক দিল, সখি সেই মোড়ক নিয়ে নর্দমায় ফেলে দিল। মাতৃত্ব এবং আগামীদিনে বেঁচে থাকার জন্য দেহ-সম্ভোগের চেয়ে ছেলের আশ্রয় এখানে প্রধান হয়ে উঠল। সখির জীবনের দিক্-পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন গল্পকার। উপরন্তু পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় কিছু পুরুষের পাপের ফল বিকারগ্রস্ততাকে প্রকাশ করলেন।

'মহাজন' নামে ছোটোগল্পটি বাঙ্গা ও বিধুশেখরকে নিয়ে। সামান্য ঘটনা অসামান্য হয়ে উঠেছে। বিধুশেখরের বৌ বাঙ্গা গ্রামে থাকে। বিধুশেখর গ্রামের বাইরে শহরে চাকরি করে। বছরে একবার পুজোর সময় আসে, তিন-চারদিন থেকে যায়। এই তিন-চারদিন আনন্দে ফুর্তিতে বাঙ্গা দিন কাটায় বিধুশেখরকে নিয়ে। এভাবেই বিয়ের ত্রিশটা বছর কেটেছে। কিন্তু জীবনের প্রান্তসীমায় বাঙ্গার চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এবং বিধুর ষাট বছর

বয়সে যেদিন বিধু এলো সেদিন থেকে বাঙ্গা আর আগের মতো হাসে না, আনন্দ করে না। অবশেষে বিধুশেখর ত্রিশ বছর পর বুঝতে পারে এর কারণটা যে তাঁর স্ত্রী সারা বছর কাঁদে, ওই চারটি দিন হাসে, আনন্দ করে। বিধুশেখরের ত্রিশ বছরের ধারণা ছিল ওই চারদিনের আনন্দ দেখে যে বাঙ্গা বোধহয় সারা বছর ওই হাসিখুশি মুখ নিয়েই দিন কাটায়। ত্রিশ বছর পর বিধুশেখর বৌকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল। মানিক লিখেছেন, "কে আজ ত্রিশ বছরের ক্ষতিপূরণ করিবে? কোন মহাজনের এত ক্ষতি সহ্য হয়?"

'ভূমিকম্প' একটি মনস্তাত্ত্বিক ছোটোগল্প। মনস্তাত্ত্বিক হলেও এরমধ্যে দেহজ জটিলতা নেই; সহজ, সরল এবং বিশ্লেষণাত্মক। মানিক এখানে গল্পের প্রধান চরিত্র কেরানি প্রসন্নের ভীতি মানসিকতা বিশ্লেষণ করেছেন। ভূমিকম্পে একবার আটকা পড়ে প্রসন্ন একা বের হতে পারছিল না। মায়ের সাহায্যে বের হতে পেরেছিল। তারপর থেকেই তার মধ্যে মৃত্যুভয় প্রবেশ করে।

'চাকরী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ গল্প হলেও বাস্তব গল্প এই জন্য যে চাকরী না পাওয়ার বেদনা আজকের মতো সেদিনও যে ছিল, তাঁর ছবি তুলে ধরেছেন। বড়োলোক বন্ধু মহেন কিভাবে গরীব বন্ধু জয়গোপালের চাকরীটা ছিনিয়ে নিল তা নিয়ে গল্প।

'অতসীমামী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাসঙ্গম' নামে ছোটোগল্পটিতে আছে, 'কাঁপানো জড়ানো গলায় পশুপতি সকলের কাছে রোদের উত্তাপের, জীবনের আবির্ভাবের সুসংবাদটি শুনিতে চায়।' এই বক্তব্য আগামী দিনের উত্তরণের পথকে সূচিত করে। এই ছোটোগল্পটির বিষয়বস্তু ত্রিশ বছর ধরে নিঃসঙ্গ সাতাশী বছরের বৃদ্ধ পশুপতির অসহায়তা। ভার্নাকুলার মাস্টার পশুপতির বয়স যখন পঞ্চাশ, তখন তাঁর ছেলে বর্মা পালায়। সাতান্ন বছর বয়সে স্ত্রী মারা যায়। কি অপূর্ব গল্পের শেষ : পশুপতির ঘুমের আড়ালে শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহোৎসব চলিতে থাকে। এই মহাঘুমের ভিতর দিয়েই বৃদ্ধ পশুপতি মহাসঙ্গমে পৌঁছে যায়। ত্রিশ বছরের যুবক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড় দক্ষ শিল্পী হতে পারলে এক বৃদ্ধের মানসিক অবস্থা নিখুঁতভাবে বলতে পারেন। অথচ কত সহজে কিছু মানিক-গবেষক বলে থাকেন 'অতসীমামী' গ্রন্থের গল্পগুলোতে আছে বিকারগ্রস্ত এবং অসুস্থ নর-নারীর কাহিনি। পশুপতির এই স্বপ্ন-ভাবনা কি বিকারগ্রস্থতা, নাকি একাকিত্বের যন্ত্রণা-নাশ?

'মিহি ও মোটা কাহিনী' নামক গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে ড. সরোজমোহন মিত্রের বক্তব্য, "এই গল্প সংকলনে মানিকের ওপর ফ্রয়েডের বহুল প্রভাব বিদ্যমান। এই গ্রন্থের সবগল্পই মনোবিকলনের গল্প।" সরোজমোহন মিত্রের বক্তব্যে স্ববিরোধিতা আছে। এই গল্পগ্রন্থের ছোটোগল্প 'রকমারি' সম্পর্কে তিনি বলেন, "'রকমারি' এই সংকলনের একটি চমৎকার গল্প। বাৎসল্যের মধ্যে মমত্বের মধ্যেই বাঙালি গৃহিণীর যথার্থ পরিচয়। উকিলগিন্নী ঝি চাকরকে সবসময় বকুনি দিলেও তিনি যে তাদের স্নেহ করেন তারই সুন্দর পরিচয় রয়েছে এই গল্পে।" অতএব এই গ্রন্থের সব গল্পই মনোবিকলনের বা ফ্রয়েডিয় নয়। 'অবগুণ্ঠিত' ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত কেরানী নবীনের সুখ-দুঃখ সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

নবীন সুখ-দুঃখের সংসারটাকে ভালোবাসে, বৌকে ভালোবাসে। নবীনের বৌও নবীনের দুঃখকষ্ট মেনে নিয়েছে। বৌ কোনোদিন শাড়ির জন্য চাপ দেয় না। মানিক গল্প শেষ করছেন, "এই জন্যই তো বৌকে সে এত ভালোবাসে।" এই গল্পে কোনো মরবিডিটির লক্ষণ পর্যন্ত নেই। বিকৃত যৌনতার শিকার হচ্ছে মরবিডিটি।

পূর্বকালের অনেক ছোটোগল্পে প্রতিবাদী মানিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিশের দশক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিণতির দশক। এ সময় গান্ধীর কার্য পদ্ধতির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। নারীমুক্তি, চরকা, স্বদেশি আন্দোলন ইত্যাদির প্রভাব বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে পড়ছিল। তারই ফসল মানিকের চমৎকার একটি ছোটোগল্প 'বৃহত্তর-মহত্তর'। এটি নারীমুক্তি ও নারীবিদ্রোহের গল্প। এই বিদ্রোহী নারীটির নাম মমতাদি। এগারো বৎসর অত্যাচারী স্বামীর সঙ্গে ঘর-সংসার করে অত্যাচারী স্বামী ও অভিশপ্ত দুই ছেলেকে ছেড়ে এই মমতাদি নারী-সমিতিতে যোগ দেয়। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে জেল খাটে। যোগ দেওয়ার আগে ঝি-এর কাজ করেও সে সংসারে মঙ্গল আনতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। বিদ্রোহী মন অবশেষে সংসার ছাড়তে বাধ্য করে। মমতাদি বলেন, 'স্বামী আমার কাছে ছোটো নয়, তুচ্ছ নয়—কিন্তু পর। সব স্বামীই পর—নিজের চেয়ে মানুষের আপনার কেউ নয়। প্রেমে নয়, স্নেহে নয়।' মমতাদির আরও একটি বক্তব্য এখানে স্মরণীয়, "ছিলাম যন্ত্র—আজ আমি মানবী যার আত্মা আছে, যার জীবনের মূল্য অনেক"—এই বিদ্রোহী নারী নিজের সন্তান দুটিকেও বলেছে অভিশপ্ত। মানিক এখানে মাতৃত্বের মুখোমুখি। মাতৃত্ব তাহলে কিসের ওপর নির্ভর করছে? মায়ের ওপর, নাকি, পরিবেশের ওপর? এর উত্তর মমতাদির বক্তব্যে স্পষ্ট : "জন্ম থেকেই ওরা অভিশপ্ত। বাপের অসংযমে জন্মাল রুগ্ন হয়ে। খাদ্যের অপ্রাচুর্যে দেহ মন কুঁকড়ে গেল, বিকাশ হল না। জীবনীশক্তির অভাবে ক্রমাগত রোগে ভুগল। দোষে, বিনাদোষে বাপের ছ্যাচা খেয়ে কুটিলতা শিখল। শিশু মনের তুচ্ছতম আকাঙ্ক্ষাটি অতৃপ্ত থাকায় চুরি শিখল। বাড়ির ভয় ও নিরানন্দ আবহাওয়ায় মন না টেকায় বেশি সময় বাইরে কাটাতে ভালোবাসল। যার তার সঙ্গে মিশে অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ সঞ্চয় করল, পয়সা আর খাবারের লোভে বজ্জাত লোকের কাছে কামুকতার দীক্ষা পেল।" ত্রিশের দশকের পরিবেশ আজও কত সত্য, কত স্পষ্ট। ত্রিশের দশকের সমাজ সম্পর্কে মানিক এই গল্পেই বলেছেন, "একটি গলিত আত্মায় হাজার হাজার গলিত আত্মার বীজ কিলবিল করে।" মানিকের এই বক্তব্যেরই বিরুদ্ধে মমতাদির বিদ্রোহ সার্বজনীনতারূপ লাভ করেছে।

'সরীসৃপ' নামে গল্পের বই-এ 'গুপ্তধন' ছোটোগল্পটির প্রাসঙ্গিকতা হচ্ছে প্রতিরোধ। সাংগঠনিক প্রতিরোধ নয়। প্রতিহিংসা চরিতার্থতার দুর্বলতা এই গল্পে আছে। আসলে প্রতিহিংসা এখানে বিদ্রোহ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক বিদ্রোহী সত্তা লুকিয়ে আছে। সাংগঠনিক রূপ পায় না বলেই এই বিদ্রোহী সত্তা মার খায়, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে বা শ্রেণিনির্বিশেষে প্রীতির বন্ধনে এই বিদ্রোহী সত্তাকে দুর্বল করে ফেলে। 'গুপ্তধন' গল্পের মুখ্য চরিত্র ভীম সম্পর্কে মানিক বলেন, "অন্তরটা গভীরভাবে নাড়া খাইলে ভীমের মুখের চামড়াই সকলের আগে বিদ্রোহ করে।" এখানে প্রীতির বন্ধনে ভীমের বিদ্রোহী সত্তা দুর্বল

নয়। কারণ ভীম মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী নয়। সে লাঠিয়াল, চাষাড়ে। কুলপী নদীর ধারে হরিয়ালি গ্রামের বাসিন্দা ভীম। গ্রামের মেজকর্তা ভীমের বড়োমেয়ের মান হানি করায় ভীম মেজকর্তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সেই রাগে মেজকর্তা মিথ্যা ডাকাতির কেসে ভীমকে আট বছর জেল খাটিয়েছিল। আট বছর পর গ্রামে ফিরে দেখে ভীম যে তার বাড়িঘরদোর পরিবার কেউ নেই। আবার তার মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগে। তবে অভিজ্ঞতা কৌশল পালটে দিয়েছে। সে নির্বিরোধী গ্রামবাসীদের গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে বাঁধের নীচে গর্ত করায়। এই কৌশলটা বিজ্ঞান-নির্ভর, তবে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। মাটির বাঁধ আর নদীর জলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ভীম ভাবছে, 'মাঠে ঘাটে পথে, বাড়ির উঠানে, ঘরের রোয়াকে, ঘরের মেঝেতে, চৌকির বিছানায়—কে জানে আরও কত উঁচুতে উঠিবে নদীর জল। বাবুদের বাড়ির দোতলায় পৌঁছিতে পারিবে না এই যা আপসোস।' ভীমের এই প্রতিবাদ রোমান্টিক। কারণ বাঁধের জলে শুধুমাত্র মেজকর্তার বাড়ি ভাসবে না, দরিদ্র গ্রামবাসীদেরকেও ভাসিয়ে নেবে। যদিও ভীমের মতে বেশিরভাগ গ্রামবাসীরা মেজকর্তার দালালে পরিণত হয়ে গেছে।

'বৌ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' ছোটোগল্পটি মানবিক উৎকর্ষতার জন্য শ্রেণিঘৃণার ছোটোগল্প হতে পারল না। অথচ শ্রেণিঘৃণার মনোভাব নিয়ে মানিক শুরু করেছিলেন, "একথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া। ...কম এবং বেশি অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানি। কারও ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচতে চাও, কপালের পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন কর : সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষ ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে।"

মানিক এসব শ্রেণিঘৃণার উক্তি করেছেন যতীনের বাবা সম্পর্কে। যতীন বাবার পাপের ফল ভোগ করছে। তার শরীরে কুষ্ঠ বাসা বেঁধেছে। স্বামীর কুষ্ঠরোগ সারিয়ে তুলতে গিয়ে স্ত্রী মহাশ্বেতা কুষ্ঠরোগীদের আশ্রম খুলেছে। কিন্তু স্বামীর সন্দেহ, সংকীর্ণতা, মহাশ্বেতার মানবিক কাজটা মেনে না নেওয়া মহাশ্বেতাকে ভাবিয়ে তোলে। মানিক লিখেছেন, "সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালোবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালোবাসে।" স্বামীর প্রতি এই ঘৃণাই কি শ্রেণিঘৃণা? তাহলে কুষ্ঠাশ্রম খোলা কেন? সব কুষ্ঠরোগীইতো যতীনের মতো কোনো না কোনো পাপের ফল ভোগ করছে। এখানেই আবেগপ্রবণতার প্রশ্ন দেখা যায়। রোগের সঙ্গে, চিকিৎসার সঙ্গে শোষণের কোনো সম্পর্ক নেই চিকিৎসকের সম্পর্ক আছে। এই ছোটোগল্পের মানিক একজন বড় হিউমানিস্ট।

এই গল্পটি ১৯৪৩ সালে লেখা। ১৯৪৪ সালে মানিক ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পূর্বকালের ছোটোগল্পগুলোতে মানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল ভাববাদ, বিজ্ঞান, কিন্তু বাস্তবতার সংঘাত বা দ্বান্দ্বিকতা ছিল না। পরবর্তীকালে

এই বিজ্ঞান-চেতনা, বাস্তববাদ এবং ভাববাদের সংঘাতই মানিককে মার্কসবাদে দীক্ষিত করেছে। আত্মসমালোচনামূলক উদ্ধৃতিগুলো পড়লেই বুঝতে পারা যাবে। উত্তরকালের গল্পের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূল সূত্রগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে যে মার্কসবাদীরা সমাজে দুই শ্রেণির মানুষের অবস্থানকে স্বীকার করে। (১) মুনাফাখোর মালিকশ্রেণি যাদের দখলে আছে উৎপাদনের হাতিয়ার সকল, (২) মুনাফা বঞ্চিত শোষিত শ্রেণি যাদের নিজস্ব শ্রম ছাড়া কোনো কিছুই দখলে নেই। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করে যে এই দুই শ্রেণি বোঝাপড়ার ভিতর দিয়ে বা সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না এবং সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এই দুই শ্রেণি শ্রেণি-সংগ্রামের ভিতর দিয়েই সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। শ্রেণিসমন্বয় ও বোঝাপড়া সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, তবে সংসার সাধন করতে পারে। মার্কসবাদীরা স্বীকার করে পরিবর্তনশীল উৎপাদিত বস্তুই মানুষের চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তিত করে। মানুষের মনোজ চিন্তা-ভাবনা কখনও বস্তুরূপ ধারণ করতে পারে না, কিন্তু ভাববাদীরা বিশ্বাস করে, পারে। বস্তু থেকেই চিন্তার জন্ম, মার্কসবাদীদের মতে। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করে যে সমাজকে ব্যাখ্যা করলে চলবে না, সমাজটাকে পালটাতে হবে। সেটা উৎপাদনের হাতিয়ার দখল করেই হোক, গল্প-কবিতা-নাটক চলচ্চিত্র এসবের মাধ্যমেই হোক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের ছোটোগল্পগুলোতে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণ স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। 'বাগদীপাড়া দিয়ে' মানিকের একটি স্মরণীয় গল্প। বাগদীপাড়ায় ঠাকুরের থান জমিদার বাঁধিয়ে দেওয়াতে পুরো নিচু অঞ্চলটা জলে পরিপূর্ণ থাকে। এর জন্য বাগদীপাড়ার জীবন অসহ্য হয়ে উঠছে। তারা জমিদারের কাছ থেকে পাওনা এই কষ্ট ও যন্ত্রণা স্বীকার করতে চায় না। বাগদীরা এখন কারখানায় কাজ করছে। বিদ্রোহ চাড়া দিয়ে উঠছে। দুলে বাগদী বলে, "সংসার পালটে গেছে, বামুনের চেয়ে সেরা জাত এয়েচে পিথিবিতে। মজুরের জাত, খাটিয়ের জাত।" ঠাকুরের থান বাগদীরা ভেঙে ফেলে জল নিকাশের পথ তৈরি করে। বাঁধা দিতে আসে জমিদারের লাঠিয়াল দুলে বাগদী। আর তখুনি বাগদী পাড়ার মেয়ে-শ্রমিক দুলালীর খন্তার আঘাতে মাথা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুলে। গল্পের শেষটা বাঙলা ছোটোগল্পের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মানিক শেষ করেছেন, "ঠাকুরের থানে নালা কাটা শেষ হলে বাড়তি বদ্‌জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে দুলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।"

তে-ভাগা আন্দোলনের প্রভাবপুষ্ট এই ছোটোগল্পটির মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—

(১) দুই শ্রেণির অবস্থান : (ক) অত্যাচারী জমিদার এবং দালালশ্রেণি, (খ) অত্যাচারিত বাগ্‌দী শ্রেণি।

(২) সামাজিক পরিবর্তন। কি করে গ্রামের অত্যাচারিত ভূমিহীন বাগ্‌দী সম্প্রদায় শ্রমিক শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ছে। এবং নিজেদেরকে লড়াকু শ্রেণিতে পরিণত করছে।

(৩) ধর্মের নেশা থেকে বাগদী সম্প্রদায় মুক্ত হয়ে ঠাকুরের বেদীর ওপর আঘাত হানছে। ধর্ম হচ্ছে ভাববাদের ফসল।

'হারানের নাতজামাই' ছোটোগল্পেও সমাজে দুই শ্রেণির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। (ক) অত্যাচারী শোষক শ্রেণির জোতদার চণ্ডী ঘোষ, দালাল কানাই শ্রীপতি ও পুলিস-নায়ক মন্মথ। (খ) শোষিত শ্রেণির নেতা ভুবন মণ্ডল এবং ভূমিহীন ভাগচাষী সম্প্রদায়। সংগ্রামের স্থান পশ্চিম বাঙলার মালিগদু গাঁ-এর অন্তর্গত হাসতলা পাড়া। সংগ্রামের জন্য চাষীদের অস্ত্রশস্ত্র, লাঠি, সড়কি, দা, কুড়ুল। অপর শ্রেণির অস্ত্র পুলিশ, দেশী বন্দুক। মানিক লিখছেন, "শ'দেড়েক চাষী চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ভয় পায় রেইডিং নায়ক মন্মথ। কারণ তার মাত্র দশটি বন্দুক এবং একটি নিজস্ব রিভলবার।" এই গল্পটি আলোচনা করতে গিয়ে ব্রেশটের 'খড়ির খণ্ডী' নাটকটির কথা মনে পড়ে। যে জন্ম দেয় সন্তান কি তার হয় নাকি, যে অন্ন দেয় লালন পালন করে তার হয়? ঠিক একই প্রশ্ন তোলেন মানিক 'হারানের নাতজামাই' গল্পে। কৃষক-নেতা ভুবন মণ্ডলকে ময়নার মা বাপ বলায়, জামাই জগমোহন বিদ্রূপ করলে তার জবাব দেয় ময়নার মা, 'খালি জন্ম দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে।' শোষিত মানুষের প্রতিরোধের সামনে শোষক সম্প্রদায়ের রক্ষক পুলিস আর এগোতে পারল না হারানের পরিবারকে গ্রেপ্তার করতে। মানিক গল্প শেষ করছেন, "মানুষের সমুদ্রের ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।"

শুধু জমির সংঘাত নয়। উত্তরকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ছোটোগল্পে মানবিক সংঘাতের প্রশ্নও তুলেছেন। 'মাসীপিসী' ছোটোগল্পে সামন্ততান্ত্রিক পুরুষশাসিত গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থার যাঁতাকল থেকে উদ্ধার করে কিভাবে মাসীপিসী সধবা যুবতী আহ্লাদীকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে তার গল্প বলা হয়েছে। আহ্লাদী স্বামীর কাছ থেকে কোনোদিন মানুষের মতো ভালোবাসা পায়নি। পেয়েছে পশুর নিষ্ঠুরতা— পেটে লাথি মারা, কলকে পোঁড়া ছ্যাঁকা দেওয়া, খুটির সঙ্গে দিনভোর দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা ইত্যাদি। এখানেও গাঁয়ের জোতদার গোকুল এবং পুলিশের অবস্থান দেখানো হয়েছে। গোকুলের নির্দেশে আহ্লাদীকে তুলে নিতে আসে তিন পেয়াদা। মাসীপিসী রুখে দাঁড়ায়। বলে মাসী হাতে বঁটি নিয়ে, "এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এককোপে গলা ফাঁক করে দেবো, পিসীও পাশে থেকে হাতে কাটারি নিয়ে বলে, আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু'একটার।" এরপরেও গোকুলের লোকেরা এগিয়ে গেলে শুধু অস্ত্র তৈরি রাখা নয় মাসীপিসী চিৎকার করে যেন রণযুদ্ধের হুঙ্কার। গণ-শক্তিকে বাদ দিয়ে অস্ত্রের শক্তি যে শক্তিহীন হয়ে পড়ে এই শিক্ষাও মানিকের উত্তরকালের প্রতিবাদের এবং প্রতিরোধের গল্পগুলো থেকে পাওয়া যায়।

'পেটব্যথা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিখুঁত নিপুণ ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং বিষয়বস্তুতে স্মরণীয়। 'পেটব্যথা' গল্পের সমস্যা ভূমিহীন চাষীদের সমস্যা নয়, নর-নারীর মনের সমস্যা নয়। একটা ছাগল বিক্রী নিয়ে এখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভৈরব গ্রামের দরিদ্র চাষী। অভাবের তাড়নায় তার ছাগলটা সে বিক্রী করবে। বেশি দাম পাবে বলে সে

গ্রামের বাইরে হাটে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু গ্রামের ধনী ব্যক্তি কৈলাস ওই ছাগলটা ভৈরবের কাছ থেকে কম মূল্যে কিনতে চায়। সে ভৈরবকে মিথ্যা কথা শোনায়, "বলিনি তোকে, আমি ছাড়া এ এলাকায় গোরু-ছাগল কেনাবেচার লাইসেন্স কারওর নেই। ছাগল বেঁচতে হলে আমাকে বেচতে হবে।"

কৈলাসের মিথ্যা কথায় ভৈরব ভোলেনি। সে হাটে গিয়ে বেশি দামে ছাগল বিক্রী করে যখন গ্রামে ফিরছিল তখন কৈলাস ভৈরবের কাছ থেকে সাড়ে বারো টাকা কেড়ে নেয়। ভৈরব প্রতিবাদ করতে গেলে থাপ্পড় খায়। ভৈরব থানায় নালিশ করার কথা বললে জোতদার ও মহাজন একই ব্যক্তি ঐ কৈলাস পা তুলে ভৈরবের কোমর লক্ষ্য করে লাথি কষিয়ে দেয়। লাথিটা লাগে ভৈরবের পেটে। অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত ভৈরবকে দরিদ্র গ্রামবাসীরা নিয়ে যায় সদর হাসপাতালে। কুঞ্জ ডাক্তার ভৈরবকে দেখে মিথ্যা কথা বলে। বলে, 'কলিক। কলিক হয়েছে। তেলেভাজা খেয়ে তোর কলিক ব্যথা উঠেছে।' গ্রামের রাম-শ্যাম-যদু-মধু কুঞ্জ ডাক্তারের চালাকি ধরতে পারে। এরা বুঝতে পারে গ্রামের জোতদার এবং ডাক্তার একশ্রেণির লোক। কারণ গ্রামের ভূমিহীন চাষীর দল কৈলাসকে মারতে মারতে কুঞ্জ ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসে এবং ডাক্তারের বাড়ির বাইরে থেকে হাঁক দেয়, ডাক্তারবাবু শূলবেদনার রুগী এসেছে, তখন ডাক্তার দরজা খুলে কৈলাসকে দেখে চমকে যায়। সদরের চৌকাঠে মুখ থুবড়ে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গোঙাচ্ছে কৈলাস। মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা বলে, 'পোলাও মাংস খেয়ে শূলবেদনা ধরেছে, ডাক্তারবাবু।' এখানেই গল্প শেষ।

গল্পকেও শ্রেণি সংগ্রামের হাতিয়ার করে তোলা যায় তারই নিদর্শন এই ছোটোগল্পটি। এখানে শ্লোগান নেই, পার্টির কর্মসূচির নির্দেশমানা নেই, মার্কসিয় দৃষ্টিভঙ্গির যান্ত্রিকতা নেই। অথচ দুটি শ্রেণির অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে। সামন্তপ্রভুর নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস জাগিয়েছেন মানিক। তে-ভাগার লড়াকু গ্রামবাসীরা মানিককে প্রভাবিত করেছে। বাঙলা ছোটো গল্পে গ্রামবাসীদের গণ-প্রতিরোধ মানিকের হাত ধরেই এসেছে। যত দিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি থাকবে, ততদিন জনগণের প্রতিরোধ শক্তিও থাকবে। এটাই মানিক-ছেটোগল্পের প্রাসঙ্গিকতা।

এই গল্প যখন দরিদ্র গ্রামবাসীদের সন্তানদের ফ্রি-স্কুলে পড়ানো হবে তখন তাদের মেরুদণ্ডের অবশ্যই পরিবর্তন ঘটবে। যদিও প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি ওদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য তৎপর, তবুও আগামী দিন কলমের লড়াই আরও জোরদার হবে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি রুখবার জন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন, সে শিক্ষা আমরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে পাইনি। সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী স্পষ্টই তা উল্লেখ করে লেখেন, "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের কল্পিত স্বপ্নময় রূপের উপরকার কুহকের পর্দাটিকে একটানে ছিঁড়ে দিয়েছেন তাঁর একাধিক গল্পে ও উপন্যাসে। তাঁর লেখায় না প্রশ্রয় পেয়েছে গ্রামের কবিত্বময় ভাবমণ্ডিত স্থিতিশীল রূপ (যেমন রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে); না, গ্রামের অভাবগ্রস্ত সাধারণ দরিদ্র মানুষের কুটিল কুঁদুলে রূপ (যেমন শরৎচন্দ্রের গল্পোপন্যাসে); না, ক্ষয়িষ্ণু ও অপসৃয়মান জমিদারতন্ত্রের প্রতি

মমত্ব আবেগ (যেমন তারাশঙ্করের লেখায়); না প্রকৃতির সৌন্দর্য-বিভ্রমে আত্মহারা হয়ে দারিদ্র্যের দুঃখ ভুলে থাকবার চেষ্টা (যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়); ...মানিক গ্রামের সংগ্রাম-চেতনাকে আর প্রতিরোধহীন স্থানুরূপটিকে বারেবারেই করেছেন আঘাত তাঁর ক্রিয়াশীল কল্পনা দিয়ে।"

মানিকই আমাদের প্রথম পথ দেখালেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে লেখায় ব্যবহার করতে হয় ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট এবং নন্দনতত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ না করে।

ইত্যাদির ইতি :

অতএব ফ্রয়েড থেকে যাত্রা শুরু করে মার্কসবাদে উত্তরণ—মানিক সম্পর্কে এ কথা সঠিক নয়। বিজ্ঞান-অন্বেষক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানচেতনা থেকে যাত্রা শুরু করে মার্কসবাদে এসেছেন। মানিক সাহিত্য-জীবনের গোড়া থেকেই বৈজ্ঞানিক-ভাববাদী-সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন সমাজের দারিদ্র্য, শ্রেণি-বৈষম্য, তেরোশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কুফল ও তেলেঙ্গানা-তেভাগা-কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৈপ্লবিক জাগরণ। এভাবেই মানিক প্রথম থেকেই ছোটোগল্পে গ্রামের এবং শহরের শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত পরিবারকে জাগ্রত রেখেছেন বাস্তবের শোষিত শ্রেণিকে জাগাবার জন্য (তেরো নম্বর উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)। এই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি মানিক পেয়েছেন লেনিনের কথা থেকেই : A slave who is not aware of his slavery and exists in a condition of mute obedience is just a slave. A slave who has reconciled himself to his position and finds his slavish existence enjoyable is a today and a hanger-on.

গায়েন ও মুচিবায়েন : তর্ক-বিতর্ক ও পুনর্মূল্যায়ন

১

গায়েন ও মুচিবায়েন : তর্ক-বিতর্ক প্রসঙ্গে

'গায়েন' ছোটোগল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন ১৩৫৪ (১৯৪৭) সালে শারদীয় যুগান্তরে, তখন মানিকের বয়স চল্লিশ। রীতিমতো বুদ্ধিদীপ্ত, সমাজ-জিজ্ঞাসায়, বিজ্ঞান-চেতনায় এবং মার্কসীয়-ঈক্ষায় পরিণত এবং সাধারণ লেখকদের চেয়ে ভিন্ন জাতের লেখক হয়ে উঠেছেন। সেসময় ১৩৫৪ সালে অঘ্রান মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় নীহার দাশগুপ্ত একটি প্রবন্ধ লেখেন 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোটোগল্প' এই নামে। ওই প্রবন্ধে মানিকের 'গায়েন' এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'মুচিবায়েন' এই দুটি ছোটোগল্পের তুলনামূলক আলোচনা করেন পঞ্চম অনুচ্ছেদে। 'মুচিবায়েন' ছোটোগল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয় 'বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫৪ সালে। নীহার দাশগুপ্তের ওই প্রবন্ধ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ছোটোগল্প দুটিকে নিয়ে তর্ক বেঁধে ছিল চারজন লেখকের কলমে : বিষ্ণু দে, নীহার দাশগুপ্ত, অনিল সিংহ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যথাক্রমে ১৩৫৪ সালের পরিচয় পত্রিকায় অঘ্রান-পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায়। এই তর্কের সূত্রপাত ঘটে বিষ্ণু দে-র দুটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে। প্রবন্ধ দুটির নাম : 'গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা' এবং 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোটোগল্প'। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৪। সেই প্রবন্ধে প্রথমেই তিনি শুরু করেছেন 'বাংলা সাহিত্যে কল্লোলের যুগ সেটা'। কল্লোলের প্রশংসা করার অর্থই যৌন-আবেদনের পক্ষে সওয়াল করা। বিষ্ণু দে তাই করেছেন। যৌন আবেদনের প্রসঙ্গ টেনেই তিনি মানিক ও অচিন্ত্যকুমার প্রসঙ্গে যে বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলো হচ্ছে : 'অথচ এদের শারীরিক ব্যাপারের স্পষ্টভাষিতায় যে মনোলৌল্য ও ইঙ্গিততৃপ্তি তা রবীন্দ্রনাথের 'লেবরেটরি' 'বাশঁরী'-তে কি একইরূপে টস্‌টস্ করছে না।' যৌনতার যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনলেও মানিককে সরিয়ে রাখা যায় না, একই গদে সুর না তুলে তিনি মানিকের মহত্ত্বকে স্বীকার করে বলেন, 'তাই মানিকবাবুর অস্থির কৌতূহল, জীবনের নানাস্তরের তথ্যজ্ঞান, থেকে থেকে তাঁর গভীর ও সংবেদ্য অন্তর্দৃষ্টির ঝলকানি, সেটাই আমাকে শ্রদ্ধানত করে।' মানিকের ছোটোগল্প নিয়ে 'গল্পে-উপন্যাসে সাবালক বাংলা' প্রথম প্রবন্ধে (শারদীয় পরিচয় ১৩৫৪) তিনি আরও বলেছেন : 'নানাগল্পে মানিকবাবুর যে চমকপ্রদ দক্ষতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি সে কৃতিত্ব আজ সংহত দৃষ্টিতে সেই নবসম্ভাবনায় ঐশ্বর্যবান। যেখানে জীবনের ব্যাপ্তিতে লেখা হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক, মহৎ।' হেমিংওয়ের সঙ্গে তুলনা করে ওই প্রবন্ধে অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কে উজ্জ্বল বক্তব্য রাখেন : 'অচিন্ত্যকুমারের ক্লান্তিহীন

বিষয় অনুসন্ধিৎসা ও রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এসবেরই কাছে বাংলাসাহিত্য ঋণী। লুই আরাগ ঠিকই বলেছেন, সাহিত্যের ইতিহাস, টেকনিকের ইতিহাস, অতীতের রাজনৈতিক প্যারালালে তার সংজ্ঞা মেলে না। ...হেমিংওয়ের রচনাবলির ভয়াবহ মিতভাষিত্ব, ...অনতিকথনের প্রায় সেই সার্থকতা এসেছে অচিন্ত্যবাবুর সাম্প্রতিক শব্দের শব্দ-সম্পদে'। কিন্তু ওই প্রবন্ধে বিষ্ণু দে একবারও 'গায়েন' ও 'মুচিবায়েন' গল্প দুটি উল্লেখ করেননি। শুধুমাত্র দুই কথাকারের সাহিত্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আবহ তৈরি করেছেন। বিষ্ণু দে-র পরবর্তী প্রবন্ধে 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোটোগল্প' (প্রবন্ধটি চিঠির আকারে, রচনাকাল, পৌষ ১৩৫৪। তর্কের বিষয়বস্তু ছিল দুজন কথাকারের শ্রেণিগত অবস্থান, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয়বস্তুর মিল-অমিল, এবং শ্লীল-অশ্লীলতা। তার্কিক আলোচনার মধ্যে এসেছে হেমিংওয়ে, শলোকভ, গোর্কি, লুই আরাগঁ, ন্যুট-হামশুন, ট্রটস্কি, মার্কসবাদ-ভাববাদ-বস্তুবাদ, বামপন্থী-ডানপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীলতা। মূলতঃ নীহারবাবু 'গায়েন'কে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, 'মুচিবায়েন'কে সেরকম গুরুত্ব দেননি। বিষ্ণু দে 'গায়েন'কে গুরুত্ব দিয়েও অচিন্ত্য সেনগুপ্তের হয়ে 'মুচিবায়েনে'র পক্ষে কলম ধরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং শ্রেণিগত অবস্থান থেকে 'মুচিবায়েন'কে সমালোচনা করেছেন 'গায়েনে'র প্রসঙ্গ তুলে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে।

নীহার দাশগুপ্ত 'গায়েন' এর প্রসঙ্গ ধরে টেনে এনেছেন 'মুচিবায়েন'কে, লিখেছেন, 'মানিকবাবুর 'গায়েন' গল্পের সঙ্গে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'মুচিবায়েন' গল্পের তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদে গল্পের গুণগত প্রভেদ কত বিরাট হতে পারে। দুই বাজনাদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা 'মুচিবায়েন' গল্পের বিষয়বস্তু। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে এক অভিনব উপায়ে। একরাত্রে প্রথম বাজনাদারের স্ত্রী দ্বিতীয় বাজনাদারের কাছে আত্মদান করে (দেহদান), পরিবর্তে দ্বিতীয় বাজনাদার প্রথম বাজনাদারের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়—সেই তল্লাট ছেড়ে চলে যায়। সাধারণ মানুষ গল্পের ভিতর ভিড় করে এলেই গল্প বাস্তব ও প্রগতিশীল হয়ে ওঠে না, দৃষ্টিভঙ্গির অপরিচ্ছন্নতায় ও দরদের অভাবে সে গল্প প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়েও পৌঁছতে পারে। অচিন্ত্যবাবুর 'মুচিবায়েন' গল্প পড়ে এ কথা খুব বেশি করে মনে হয়।'

'গায়েন' গল্পটি সম্পর্কে নীহার দাশগুপ্তের মূল্যায়ন, 'এক বৃদ্ধ কবিয়াল ও তার তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘর্ষ 'গায়েন' গল্পের বিষয়বস্তু। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের গান করে বৃদ্ধ কবিয়াল যশ কিনেছেন, হাজার হাজার শ্রোতার হৃদয়ে দুঃখের হতাশার ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই দুঃখের ও হতাশার গানের পরিবর্তে তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল সংগ্রামের গান নিয়ে— দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে যারা, মানুষের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে, সেইসব সামাজিক শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। গল্পের শেষে বৃদ্ধ কবিয়াল উচ্ছ্বসিত আনন্দে তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়। আমার মনে হয়, মানিকবাবুর গল্পগুলির মধ্যে 'গায়েন' শ্রেষ্ঠ।'

ফলত এখানে স্পষ্ট 'গায়েন' এবং 'মুচিবায়েন' গল্পদুটির পরিণতি। সামাজিক-অসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈগুন্যের ফলে আলাদা রূপ পেয়েছে। মূলত গল্পের পরিণতি

নিয়েই তর্ক-যুদ্ধ। নীহার দাশগুপ্তের প্রথম প্রবন্ধটির উত্তরে বিষ্ণু দে লিখলেন 'পরিচয়ে'র পৌষ সংখ্যা ১৩৫৪ সালে : 'অচিন্ত্যকুমারের 'মুচিবায়েন'-এ তিনি যে দুর্নীতিব্যঞ্জক পটচ্যুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে ব্যাখ্যা আমাদের অনেকের কাছেই স্বকপোল বলে মনে হয়েছে। ...শোলোকভের প্রথম উপন্যাস কম্যুনিস্ট ও কসাকদের দুর্বলতা বা যৌন-আত্মদানেই শেষ—এই অভিযোগে অপ্রকাশ্য হয়ে পড়েছিল, তখন সেই বই ছাপতে গিয়ে গোর্কি কি প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়ে গিয়েছিলেন? 'মনে হয়' নীহারবাবু 'যেন' তাই বলেছেন। ...হেমিংওয়ের বিশেষ পরিণতির সঙ্গে আমি তুলনা করেছিলুম অচিন্ত্যকুমারের বিশেষ পরিণতির। নীহারবাবু আমাকে 'কবি-সমালোচক' ব্যঙ্গাভিধায় অধোবদন করে দিয়ে বলেছেন যে, তিনি আমার মতো হেমিংওয়ের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের তুলনা করতে অক্ষম।'

অচিন্ত্যবাবুকে তিনি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কলম চালিয়ে গেলেও মানিকের 'গায়েন' গল্পটির উৎকর্ষতাকে অস্বীকার করতে পারেননি, ফলত তিনি লেখেন 'গল্পের উপজীব্য যে সাধারণ মানুষ আমাদের মনোনীত মহত্ত্ব অর্জন করে, যেমন মানিকবাবুর 'গায়েন' করছে— তারই মতো মানুষ অন্য গল্প-চরিত্রে দুরাবস্থার চাপে যে মনুষ্যত্বের ট্র্যাজিক বা করুণরূপ, প্রকাশ সম্ভব এ সত্য যেন আমরা না ভুলি।'

বিষ্ণু দে-র মতে 'গায়েন' গল্পটি তেভাগা আন্দোলনের ছকে লেখা হয়নি বলেই শ্রেষ্ঠত্বের মান বজায় রাখতে পেরেছে। তাবলে তিনি 'মুচিবায়েন' ছোটোগল্পটি ছোটোমানের গল্প ভাবতে রাজি নন, 'মুচিবায়েন' গল্পটির শেষ পরিণতি যৌন-আবেদনে শেষ হয়নি, শেষ হয়েছে মনুষ্যত্বের ট্র্যাজিকে বা করুণরূপে। তবে সেটা নীহারবাবুর মতে প্রতিক্রিয়াশীল কেন হবে? কি বলেন নীহার দাশগুপ্ত? শোনা যাক নীহারবাবুর বক্তব্য : 'স্বামীর পসার-প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য এক পতিপ্রাণা নারীর মহান যৌন আত্মদানের ট্র্যাজিডি? প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে সেই আত্মদান পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভোগ দখল করে গ্রহীতা সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিসর্জন দিয়ে, সে তল্লাট ত্যাগ করে চলে গেল কিসের প্রেরণায়? কিংবা এ শুধু নেহাতই কৃতজ্ঞতা? যৌন আত্মদান নিয়েও মহৎ গল্পের সৃষ্টি হতে পারে, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে তার উদাহরণ যথেষ্ট। কিন্তু 'মুচিবায়েন'-এর প্রতিটি চরিত্রের এই কদর্য ও বিকৃত রূপায়নে বিষ্ণুবাবু যদি মনুষত্বের করুণ ও ট্র্যাজিক রূপের প্রকাশ আবিষ্কার করেন, তা নিশ্চিতভাবে তাঁর বন্ধুপ্রীতির গভীরতাকেই প্রমাণ করে।'

গল্প দুটির বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য প্রায় একইরকম, শুধু পরিণতিটা অন্যরকম। 'গায়েন'-এর গায়েন এবং 'মুচিবায়েন'-এর বায়েন। গায়েন রাজেন গান গেয়ে উপার্জন করে। বায়েন ভোলানাথ ঢোল বাজিয়ে উপার্জন করে। দুজনেই বিবাহিত। দুজনেরই বয়েস হয়েছে। তার ওপর গায়েনের প্রতিদ্বন্দ্বী এসে গেছে, তরুন গায়েন নরহরি সে সংগ্রামের-প্রতিবাদের গান করে। সেই গান শোনার জন্যে হাজার হাজার লোকের ভীড় হয়। ফলত বৃদ্ধ গায়েনের পসার-প্রতিপত্তি কমে যায়। তখনও মেয়েটির বিয়ে হয়নি। তবু বৃদ্ধ রাজেন মেনে নেয় তরুণের গান, শুধু একটি আবেদন রাখে, তরুণ গায়েন নরহরি যেন বৃদ্ধ গায়েনের মেয়েটিকে বিয়ে করে। ঠিক সেরকম মুচিবায়েন ভোলানাথেরও বয়েস হয়েছে।

তারও প্রতিদ্বন্দ্বী এসে গেছে। সেও তরুণ তারাপদ। তরুণ বায়েনের বাজনা শোনার জন্য লোকের ভীড় উপচে পড়ে। বৃদ্ধ বায়েন ভোলানাথেরও পসার-প্রতিপত্তি কমে যায়। তখন বৃদ্ধ বায়েনের পসার-প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য বৃদ্ধের যুবতী ভার্যা গোরাশশী তরুণ বায়েন তারাপদর কাছে যায় নিশুতি রাতে। দেহদানে রাজি হয়, তবে একটি শর্ত আছে, ওই তল্লাট থেকে তাকে চলে যেতে হবে। তরুণ বায়েন তারাপদ সেই শর্ত মেনে নেয়, বলে 'আজকের ই আত (রাত) ছাড়া আর সব ছাড়তে পারব।' এই হচ্ছে গল্পদুটির সারাংশ, বাস্তবতা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক-বিতর্ক জমে উঠেছিল প্রথমে বিষ্ণু দে ও নীহার দাশগুপ্তের সঙ্গে। তারপর তর্কে নামলেন অনিলকুমার সিংহ। তিনি ১৩৫৪ সালের মাঘ মাসেই 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখলেন, 'দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদে গুণগত প্রভেদের বিরাটত্বের কথা মেনে নিয়েও এ কথা বলতেই হয় যে, অচিন্ত্যকুমারের 'মুচিবায়েন' গল্পে প্রথম বাজনদারের স্ত্রী যদি তার স্বামীর মর্যাদা, পসার ও ভালোবাসা রক্ষার তাগিদে দ্বিতীয় বাজনদারের কাছে যৌন-আত্মদান করেই থাকে, তাতে নীহারবাবুর অকস্মাৎ প্রতিক্রিয়া আবিষ্কারের যুক্তিটা কোথায়? মানিকবাবুর 'গায়েন'-এর সঙ্গে এর তুলনা চলে না; কারণ অচিন্ত্যবাবুর গল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন ঠাটে বাঁধা। ...অবিশ্যি 'মুচিবায়েন' সম্পর্কে আমার নিজস্ব মত হল যে গল্পটি সম্পূর্ণ অসার্থক। ...কারণ গল্পটি আগাগোড়া লেখকের লজিক মতো অগ্রসর হয়েছে, গল্পের নিজস্ব লজিক উপেক্ষা করে। ...অবশ্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ নয় বলে তাঁর বক্তব্যও অত্যন্ত ম্রিয়মান।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটোগল্প সম্পর্কে দুটি সারকথা বলেছেন অনিলকুমার সিংহ : (১) অচিন্ত্যবাবুর গল্পের চরিত্রগুলি সাধারণ মানুষ—এ কথা অবলীলাক্রমেই মেনে নিয়েছি। কিন্তু সেইসব সাধারণ মানুষকে যখন ছাপার অক্ষরে দেখতে পাই তখন তারা সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ। (২) তাঁর কিছু কিছু ছোটোগল্পকে ততখানিই বিষয়মুখী (objective) বলব যতখানি বিষয়মুখীনতার মর্যাদা ফটোগ্রাফারের প্রাপ্য। অনিলকুমারের এই দুটি ধ্রুপদী মন্তব্য যান্ত্রিক এবং বাণিজ্যিক ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে চিরকালীন সত্য। সমাজ-বিচ্ছিন্নতা, সর্বৈব নেতিবাচকতা এবং ফটোগ্রাফি সার্থক ছোটোগল্পের জন্ম দিতে পারে না। জন্মের সঙ্গে যন্ত্রণা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলে সৃষ্টির যন্ত্রণাও সার্থক ছোটোগল্প নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

'গায়েন/মুচিবায়েন' সম্পর্কে এত কথা বলার পরেও অনিলকুমার সিংহ এই তর্কে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন, কারণ তিনি বিষ্ণু দে ও নীহার দাশগুপ্তের মেজাজটা ধরতে পেরেছেন, লিখেছেন : 'আসলে গোল বেধেছে বিষ্ণুবাবুর সহানুভবতার আধিক্য ও নীহারবাবুর কার্পণ্যের ফলে। বিষ্ণুবাবু অচিন্ত্যকুমারকে তাঁর প্রাপ্যের অনেক বেশি দেবার জন্য ব্যগ্র, অন্যদিকে নীহারবাবু তাঁর (অচিন্ত্যকুমারের) প্রাপ্যটুকুও পুরোপুরি দিতে চান না।' ফলত অনিলকুমার প্রবন্ধের প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন 'নীহারবাবুর সঙ্গে আমি একমত নই।' এবং বিষ্ণুবাবুর সমালোচনাকে বলেছেন 'ওস্তাদী মারপ্যাঁচের গোলক ধাঁধা' এবং প্রবন্ধের শেষে বিষ্ণু দে-র সমালোচনা সম্পর্কে শেষকথাটি বলেছেন, 'কিন্তু

বিষ্ণুবাবুর সমালোচনাকে আদর্শ সমালোচনা হিসেবে মেনে নিয়েই যদি প্রগতিশীল প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপিত হয়, তাহলে বলতে হবে—বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এখানেই সমাধিস্থ হলো।' সমাধিস্থ হয়নি, হওয়ার কথা নয়, কারণ যতদিন শ্রেণি-বিভক্ত সমাজব্যবস্থা থাকবে, ঐশ্বর্য-লোকের আধিপত্য থাকবে, বিচ্ছিন্নতাবাদ থাকবে, ভোগবাদ থাকবে, ততদিন এই সাপেক্ষ সমালোচনা থাকবে এবং থাকবে তার চেলা-চামুন্ডারা, সমাজের গতিকে প্রতিরোধ করতে। তবে পাশাপাশি অন্য পক্ষের, প্রগতিশীল সমালোচনাও থাকবে, তাকে ধ্বংস করা যায় না, কারণ সেটা সত্য, জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে আছে। সত্যকে ধ্বংস করা যায় না।

শেষ প্রবন্ধটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, প্রবন্ধ নয়, প্রবন্ধ আকারে সাত পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি, 'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু'। প্রকাশ তারিখ ১৩৫৪ সাল, ফাল্গুন সংখ্যায়। প্রবন্ধটি আত্মপক্ষ সমর্থন নয়। বিষ্ণু দে এবং নীহার দাশগুপ্তের মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে মার্কসিয় যুক্তি-বিজ্ঞান দিয়ে প্রত্যাখাত করা হয়েছে। এ ছাড়া সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে মানিকের বক্তব্যটিও এখানে প্রতিভাসিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই তিনি নীহার দাশগুপ্তের সমালোচনাটি ধরে লিখলেন, 'নীহারবাবুর মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কাঁচা বলেই 'গায়েন' ও 'মুচিবায়েন' এর তুলনামূলক পার্থক্যটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে, আজকের দিনে জীবনের গতির সঙ্গে বাস্তব ও সত্যধর্মী সামঞ্জস্য রাখার যে প্রগতিশীল সৎ প্রচেষ্টা'টুকু 'গায়েন' গল্পে তাঁর চোখে পড়েছে তাতেই তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। ...'মুচিবায়েন'-এ আজকের দিনে চাষাভুষো সবার জীবনের প্রথম ও প্রধান সত্য আড়ালে রয়ে গেছে বলে তাঁর কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'গায়েন'-এর আপেক্ষিক সাহিত্যিক সার্থকতা। এবং এ হিসেবে কথাটা সত্যই।'

এরপর মানিক সেখান থেকে সরে এসে সরাসরি তর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। 'মুচিবায়েন' গল্পটিকে সামনে রেখে তিনি সাহিত্যে যৌনবিকৃতির কথা এবং পাঠক-মনোরঞ্জনের কথা বলতে থাকেন : 'চাষাভুষো নিয়ে গল্প লিখব বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য' বলার পরেই কয়েক ছত্রের পর বলতে থাকেন : 'চেপে যাব চাষাভুষো পুরুষটার ও নারীটার অবসরহীন অকথ্য কষ্টের দেহরক্ষার সংগ্রাম, অথচ রসসৃষ্টি করব একমাত্র ওই দুটি ভুখা দেহের যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে—সাহিত্য সৃষ্টির এ ফাঁকি আজ অচল না হয়ে গেলেও ধরা পড়ে গেছে।' এমত যৌন-বিকারগ্রস্থতাকে মানিক একটি প্রচলিত উপমার দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, 'চাষী-মজুরদের দেহ নিয়ে সাহিত্যের হাটে এ ব্যবসা চালানোর সহজ-সরল মানেই হল পশু-পাখির প্রেমলীলা দর্শনে যে মনের বিকার তৃপ্ত হয়, সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে সেই মনের সেই বিকারকেই তৃপ্তি দান। 'মুচিবায়েন' সত্যিই তা অশ্লীল।' ভাষার শৈল্পিক বয়ানে অনুত্তেজিতভাবে তিনি যৌনলীলা, না বলে 'প্রেমলীলা' উল্লেখ করেছেন। ওই জায়গায় যৌনলীলার কোনো বিকল্প শব্দ হতে পারে না, নাকি 'প্রেম-লীলা' উল্লেখ করে বিদ্রূপকে শাণিত করেছেন? 'মুচিবায়েন' গল্পটিকে তিনি এককথায় বা কলমের এক খোঁচায় নাকচ করে দেননি, বলেছেন 'সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে', তারপর সেটাকে আর অচিন্ত্যবাবু ধরে রাখতে পারলেন না। সত্য কথাটা বলতে

বাধ্য হলেন মানিক : 'সত্যিই তা অশ্লীল।' পরে অশ্লীলতাকে আরও ব্যাখ্যা করে বলেন : 'দেহ তো আর অশ্লীল নয়, দেহের চেতনাও নয়— ওই চেতনার বিকৃতিই শুধু অশ্লীলতা।' উত্তরসূরিদের কাছে এ এক মূল্যবান ভাষণ।

এখানেই ইতি নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও টেনেছেন, যুক্তিকে আরও শাণিত করেছেন। লংক্লথের হাঁটুঝুল ময়লা পাঞ্জাবি, গোড়ালির ওপর মোটা কাপড়ের ধুতি পরা মানিক যে শুধু লেখার মজুর ছিলেন না, বিদেশি সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল সেটা বুঝতে পারা যায় পাণ্ডিত্য-অভিমানী বিষ্ণু দে-র পাণ্ডিত্য সুলভ লেখার প্রতিবাদ যখন পাণ্ডিত্য দিয়েই প্রতিবাদ করেন। বিষ্ণু দে যখন লিখছেন অশ্লীলতা বা বিকৃত যৌন-আবেদনের সাফাই গেয়ে অচিন্ত্যকুমারের পক্ষে কলম ধরে : 'শোলোকভের প্রথম উপন্যাস কম্যুনিস্ট ও কসাকদের যৌন দুর্বলতা বা যৌন-আত্মদানেই শেষ—এই অভিযোগে অপ্রকাশ হয়ে পড়েছিল, তখন সেই বই ছাপাতে গিয়ে গোর্কি কি প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়ে গিয়েছিলেন?' এর জবাব দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি লিখছেন : 'কম্যুনিস্ট ও কসাকদের দুর্বলতা যৌন আত্মদানেই শেষ'—কিন্তু এই শেষটাই আসল বা বইখানার শেষ কথা নয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার যৌন-সম্পর্কের বিপর্যয় সম্পর্কে 'হিউম্যানিটি আপরুটেড' বইখানার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা পড়ে দেখলেও বিষ্ণুবাবুর সাহায্য হতে পারে, খেয়াল হতে পারে যে যৌন বিপর্যয়েরও একটা বিপ্লবাত্মক সত্য থাকে—বিপ্লবটা বাদ দিলে যা অর্থহীন। কমিউনিস্ট ও কসাকদের যৌন-আত্মদানই শোলোকভের উপন্যাসটির প্রধান কথা বা মর্মকথা নয়—যদিও বিষ্ণুবাবু তাই ধরে নিয়েছেন।'

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের হয়ে চরম নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়ে বিষ্ণু দে ('মুচিবায়েন'-এর মর্মকথা যৌন-আত্মদান) যে ভাবে কলম ধরেছেন, সেই কলমের বা প্রবন্ধের মূল বক্তব্যটা বুঝতে পেরে মানিক লিখতে বাধ্য হলেন, 'বিষ্ণুবাবু এখানে 'আর্টের জন্যই আর্ট'-এর পক্ষেই একটু ঘুরিয়ে ওকালতি করেছেন। মার্কসবাদের মূলকথা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, লেখকের শ্রেণিগত চেতনার হিসেব না করেও লেখার বিচার চলে।' বিষ্ণু দে-র এমত শ্রেণিগত বিচ্ছিন্নতার অবস্থান থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতে বা বলতে বাধ্য হলেন : 'বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কতদূর অপরিচ্ছন্ন তার আরেক প্রমাণ লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যে পাই।' জটিলতামুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাট্য কথাটা হচ্ছে, লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ফলত আমাদের বুঝে উঠতে অসুবিধে হয় না যে লেখকের চিন্তাভাবনার শিকড় ছড়িয়ে আছে সমাজ-জীবনের গভীরে। সেখান থেকেই উঠে আসে লেখা।

সাহিত্যিক-কবি এবং সংস্কৃতির চালক-বাহকদের মধ্যে দুটি শ্রেণির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সেটা বুঝতে পারি, বিষ্ণু দে-র চিঠির বয়ানে প্রবন্ধটি পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর-প্রতিক্রিয়াটি উপলব্ধি করে : 'ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।'

এই বিখ্যাত তর্ক-বিতর্কটি থেমে নেই। সেটা বুঝতে পারি অশ্রুকুমার সিকদারের একটি প্রবন্ধ পাঠে, 'বিষ্ণু দে-র স্বধর্ম অন্বেষা' (প্রকাশিত : ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

দেশ-এ)। সেখানে তিনি লেখেন, 'কিন্তু মার্কসপন্থায় দীক্ষিত এই কবি (বিষ্ণু দে) বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও কোনোদিন উগ্র বামপন্থী মার্কসিস্ট' হয়ে ওঠেননি।...

রজের গারোদির মতো তিনিও মনে করতেন আর্টের ক্ষেত্রে পার্টি-লাইন বলে কিছু নেই।...

সেই সময়ে মার্কসবাদী হয়েও নিজের গোঁড়ামিমুক্ত অবস্থানে স্থির থাকা অপরিসীম মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক ছিল।...'

এই আত্মবিশ্বাস ছিল বলেই ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের 'পরিচয়'-এর শরদীয় সংখ্যায় তাঁর 'গল্প-উপন্যাসে সাবালক বাংলা' নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয় কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে।...

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বিষ্ণু দে-র মার্কসিস্ট দৃষ্টির বিকৃতির অভিযোগ করেন এবং বিষ্ণু দে-র বিপরীতে সাহিত্য বিচারে কমিউনিস্টদের 'দলগত মনোভাব'কে জোরালোভাবে সমর্থন করেন'।

অশ্রুকুমার সিকদার 'দলগত মনোভাব' কথাটাতে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। মানিকের প্রবন্ধে 'দলগত মনোভাব' নিয়ে কথা নেই। তিনি মানুষের জীবনে ও চেতনায় সংগ্রামের মুখ্যতাকে তুলে ধরেছেন সেই প্রবন্ধে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গায়েন এবং মুচিবায়েন গল্পদুটির মার্কসীয় আলোচনা করেছেন।

মানিক সাহিত্যে 'দলগত মনোভাব' কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি বলেই তিনি মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞান ও চেতনায় মহান সাহিত্যিক হতে পেরেছেন।

২

গায়েন : পুনর্মূল্যায়ন

১৯৪৭ সালে লেখা 'গায়েন' গল্পটি সম্পর্কে এককথায়-দুকথায় অনেক সমালোচক-আলোচক অনেক কথা বলেছেন। তাদের কথার মূল সুর প্রায় একই রকমের। কেউ বলেছেন প্রতিরোধের গল্প, প্রতিবাদের গল্প, কেউ বলেছেন অভাব-অনটনের গল্প দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা। এখানে দুজন মানিক গবেষকের কথা বলা যায়। তাঁরা কি বলেন 'গায়েন' প্রসঙ্গে? একজন গবেষক ড. সরোজমোহন মিত্র 'জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে লেখেন, 'সমাজে আজ নতুন চেতনা দেখা দিয়েছে। এই চেতনা কেবল দুঃখের কাহিনি শোনাবার জন্য নয়। বাঙলা সাহিত্যে এই সমবেদনার কথা অনেক আছে কিন্তু এই দুঃখ জয়ের পথের সন্ধান মানিকের পূর্বে আর কেউ এমন করে দেননি। 'গায়েন' গল্পে আছে তারই কথা'।

আমার তো মনে হয়েছে, সরোজমোহন কথিত 'তারই কথার' অন্তরালে বা গভীরে আছে কন্যাদায়গ্রস্ত এক গায়েনের পিতৃস্নেহের অসহায়তা, নীরব আর্তনাদ। আরেকজন মানিক-গবেষক নিতাই বসু 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে লেখেন 'গায়েন' প্রসঙ্গে 'গায়েন' গল্পের গায়েন রাজেন প্রতিদ্বন্দ্বী নরহরির কাছ থেকে শিখে নেয়

দুঃখ-দুর্দশা-দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি এঁকে মানুষকে খুশি না করে প্রতিকারের পথ দেখানোও তো শিল্পীর দায়িত্ব। এমন গান গাইতে হবে যা শুনে 'ক্রোধে ক্ষোভে তপ্ত হয়ে ওঠে নিশ্বাস, হাতগুলো যেন এগিয়ে যায় 'শিশুখেকো, মেয়েখেকো, মানুষখেকো রাক্ষসগুলির টুটি ধরে টেনে ফাঁসিতে লটকে দিতে।'

'গায়েন' সম্পর্কে দুই গবেষকের প্রায় একই রকম বক্তব্য, ক্রোধে ক্ষোভে তপ্ত নরহরি গায়েন, দুঃখ-দুর্দশা-দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি এই রাজেন গায়েন ঠিক তা নয়, এই আবহে ধরা পড়ে যায় কন্যাসন্তান আমোদের প্রতি রাজেনের পিতৃস্নেহ। কন্যাদায়গ্রস্থতার চিন্তাভাবনা। ছোটোগল্পের শর্তসাপেক্ষে সেটা প্রথমেই সূত্রাকারে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। ছোটোগল্পটির তিনটি বাক্যের প্রথম অনুচ্ছেদের পরেই মানিক গল্পের প্রধান চরিত্র 'পাকা টুলটুলে' হাসি-খুশি রাজেন গায়েন সম্পর্কে লিখেছেন : 'সম্প্রতি কিছুকাল জের চলেছে বিষণ্ণতার, মন খারাপের'। বৃদ্ধবাপ রাজেনের বিষণ্ণ এবং হাঁড়ি-মুখটা রাজেন দাসের অবিবাহিত বড়ো মেয়ে আমোদের চোখে ধরা পড়ে। এর কারণ জানতে চাইলে বাপ রাজেন উত্তর দেয় মেয়েকে ছড়া কেটে :

সাধে কি কেঁদে মরি, ছিঁড়ে দাড়ি,
মেয়্যার হয় না শ্বশুর বাড়ি
জগৎজনা দেয় টিটকারি
বুড়ো রাজেনের গলায় দড়ি—

আমোদের ধারণা তাঁর বাবার গায়েনের আসরে লোক ভেঙে পড়ে, বুড়োর সঙ্গে গানে পারে না কেউ পাল্লা দিয়ে সেজন্য বড়ো মেয়েকে ঘরে রাখার ছুতোয় 'জগৎজনা দেয় টিটকারি'। কিন্তু গায়েন রাজেন দাস, অবিবাহিত আমোদের পিতৃদেব, সেও কি তাই ভাবে মেয়ের মতো? এই প্রশ্নের উত্তরটা তুলে রেখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বান্দ্বিকতার সূত্রে। সেটা প্রকাশ পাবে গল্পের শেষে। গল্পের ক্লাইমেক্সে গল্পকার রাজেনের এক প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম হরিখালির নরহরি, সে আবার রাজেন দাসের শিষ্য। রাজেনের গানের বিষয়বস্তু ছিল, 'মাঠের ধান কোথায় গেল, মানুষের খাবার কে সরালো, অসহায় মানুষ কিভাবে কেঁদে ককিয়ে উপোস দিয়ে উজাড় হল, মায়ের বুকে শিশু মল, বাপ মেয়ে বেচল, স্বামী বৌ বেচল, সাদা রাজার রাজ্য কেমন ছেয়ে গেল সাদা কঙ্কালে'। রাজেন দাসের গায়নে ছিল ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও দুঃখ বেদনা, ছিল হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, 'কত রাত কত চোখের কত জলে সে বসুমতী ভিজিয়েছে দেশমায়ের দুঃখের কাহিনি গেয়ে। কত লোক হাজার হাজার রাজেনের গান শুনতে ভিড় করেছে, গঞ্জের মেলায় টাকা-কড়ি পেয়েছে। মেয়ের বিয়ের কথা সেভাবে ভাবেনি তখন।' কিন্তু তার গানে ছিল না প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিক্ষোভ বা আন্দোলনের মোটিভ। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিক্ষোভ বা আন্দোলনের মোটিভ ছিল নরহরির গায়নে, এখন সে রাজেন দাসের প্রতিদ্বন্দ্বী, এই হরিখালির নরহরি। একদা সে রাজেন দাসের শিষ্য ছিল। শিষ্য মানেই পুত্রতুল্য। এই নরহরির গানের বিষয়বস্তু মানিকের কলমে, 'মন্বন্তর এলে কেউ মরো না, কাঁদা-কাটা করো না, ফ্যান চেও না, কদম কদম বাড়িয়ে গিয়ে যার গুদামে চাল আছে

তাকে গাছের ডালে ফাঁসি দিয়ে—'। নরহরির আসরে শ্রোতার ভিড় বাড়তে থাকে, রাজেনের আসরে শ্রোতার ভিড় কমতে থাকে। নরহরির আয় বাড়তে থাকে, রাজেনের আয় কমতে থাকে। ঘাড়ের ওপর অবিবাহিত আইবুড়ো মেয়ে, ভারটা এখন বুঝতে পারে রাজেন। তাকে গ্রাম-সমাজের টিট্‌কারি শুনতে হয়। কন্যার বিয়ের দায়বদ্ধতা বুকের ভিতর চাগাড় দিয়ে ওঠে। এর ওপর বোবা বৌ, বিছানা নিয়েছে। বড়ো ছেলে বাইরে চাকরি করে, খবর রাখে না। ছোটো ছেলে গোল্লায় গেছে। ছোটো মেয়ে গঞ্জনা খেয়ে মরছে শ্বশুর বাড়িতে। মানিকের কথায়, 'দুবিঘে জমিজমা হল না, দুটো পয়সা জমল না'।

এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্র ছোটোগল্পকার। দ্বান্দ্বিক চরিত্রের স্রষ্টা। সমাজ পরিবর্তনের দিশারি। গল্পের দিক পরিবর্তনকারী, নির্দেশক। গল্পটা শেষ করলেন আচমকা, পাঠক বুঝে উঠতে পারে না। চট করে চাবুক।

একদিন রাজেন নরহরির গান শুনতে যায়। নরহরি জানতে পারে, বুঝতে পারে। গুরু রাজেন দাসকে দেখে নরহরি গান শুরু করে, 'হাত ধরে গান শেখালে, দিও না অভিশাপ/ দুটি পায়ে প্রণাম জানাই, যে গুরু সেই বাপ'। তারপরেই গান ধরে, প্রতিবাদের গান, প্রতিরোধের গান, ভয় না পাওয়ার গান। রাজেন মুগ্ধ হয়, রাজেন দাস শিষ্য নরহরিকে জড়িয়ে ধরে। রাজেন বলে, 'নরহরি তুই মোর গুরু। তোকে প্রণাম করি। ...হাত বাড়িয়ে সে পা ছুঁতে যায় নরহরির'। নরহরি বাধা দেয়। পাঠকের হৃদয় কাঁপে, মন কাঁপে, যখন সে মানিকের কলমে আচমকা শেষ বাক্যটি পড়ে : 'তবে বল মোর মেয়াকে লিবি? তোকে ছাড়া আর কারো হাতে মেয়া দিব না'। নরহরির পদস্পর্শ স্পষ্ট হয়ে যায়। কি গভীর মর্মবেদনা রাজেনের, কন্যাদায়গ্রস্ত কন্যার পিতৃদেবের। স্নেহাতুর বাবার, ব্যথাতুর বাবার অন্তর্গত আর্তি। নরহরি কি রাজেনের মেয়েকে গ্রহণ করল? ছোটোগল্পটিকে এইরকম একটি প্রশ্নের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে শেষ করতে পারতেন মানিক। কিন্তু চাবুক, সামাজিক মূল্যবোধের ওপর, সংস্কারের ওপর চাবুক বসালেন মানিক গল্পের শেষ বাক্যে, 'দু আঙুল কানে ঢুকিয়ে নরহরি বলে, বোলো না বাপ। শুনতে নাই, তোমার মেয়ে আমার বুন'।

থাক ফ্রয়েডবাদী তর্ক ও দর্শন, থাক মার্কসবাদী তর্ক ও দর্শন, থাক মানিক-সত্তার বিভাজন, গড়ে উঠুক, নির্মাণ হোক মানিক-দর্শন যেমন রবীন্দ্র-দর্শন। একদিন থেকে যাবে মানিকের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, সত্তা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দর্শনকে অনুপ্রাণিত করেছে লেনিনের এক বিশেষ উক্তি : learn from the masses, try to comprehend their action carefully, study the practical experience of the struggle of the masses.

ঘরে বসে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সমাজের নানা বানানো ঘটনার সংবাদ পড়ে বা বিদেশি সাহিত্য পড়ে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। জনগণ থেকে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। মানিক জানতেন, বুঝতেন, অনুভব করতেন।

৩

'গায়েন' ছোটোগল্পের বডি-ল্যাংগুয়েজ

ছোটোগল্পের গতিময় ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, উপমা, চিত্রকল্প, ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিতধর্মিতা এবং প্রতীকী ভাবনা। এসবই হচ্ছে ছোটোগল্পের বডি-ল্যাংগুয়েজ (উপযুক্ত বাংলা ভাবনায় এলো না) এবং আবহ বা ভাষাপ্রতিমা। এই ভাষাপ্রতিমা শিল্পের উৎকর্ষতা এবং সৌকর্যকে প্রসারিত করে। শিল্প যে জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত এই বোধের পরিচয় পাওয়া যায় মানিক সাহিত্যে, তথা ছোটোগল্পেও। নারায়ণ চৌধুরী সঠিক জায়গাটা ধরতে পেরেছিলেন মানিক সম্পর্কে : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহত্ত্ব তাঁর স্বভাবসুলভ চিন্তাশীলতায়, প্রজ্ঞায় এবং দার্শনিকতায়। তাঁর এই সহজাত দার্শনিকতার সঙ্গে শিল্পদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছিল'।

'গায়েন' ছোটোগল্পের উৎকর্ষতা বুঝতে পারা যায় চিত্রকল্প, ব্যঞ্জনা ইত্যাদির সার্থক প্রয়োগে। বিষয় ভাবনার সঙ্গে শিল্পদৃষ্টির সমন্বয় ঘটিয়ে শিল্পসত্তার পরিচয় দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটোগল্পের শুরুতেই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা 'তার ফোকলা মুখে গালভরা হাসি দেখলে জগৎ যেন বদলে যায়। পাকা টুলটুলে খুশির ফলটি ফেটে গেছে হঠাৎ, এখন থেকে পৃথিবীতে আর আনন্দের অভাব থাকবে না'। আনন্দ, হাসি, খুশি মিলেমিশে এক হয়ে গেছে বৃদ্ধ গায়েনের ফোকলা মুখের আনন্দের অভাবের সঙ্গে। এভাবেই গায়েনের জগৎ বদলে যায়, গায়নের মাধ্যমে। খুশির ফলটি ফেটে যায়।

শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে রাজেনের গান দিয়ে যে সেতু তৈরি হয়, সেটা যেন হারিয়ে যাচ্ছে, এটাকে বোঝাবার জন্য মানিক লিখেছেন, 'অরণ্য নাকি খুঁজে পাচ্ছে না বাতাস, সাড়া তুলতে পারছে না মর্মর ধ্বনি'। পরের উপমাটি এরকম, শ্রোতার সঙ্গে গায়কের সম্পর্ক প্রেম ভালোবাসার। মানিক লিখেছেন, 'জনতা তার চিরদিনের প্রেয়সী, কাঁধ ঘুরিয়ে উড়নি কোমরে বেঁধে কোঁচা ঝুলিয়ে বরবেশে সবার মধ্যে দাঁড়ালেই সে বক্ষলগ্না প্রিয়ার মতো অনুভব করে সমাবেশের হৃৎস্পন্দন...।'

দেশ স্বাধীন হলেও ইংরেজরা তখনও রয়ে গেছে। সেসময় গায়ে-গঞ্জে দুর্ভিক্ষের করাল পদক্ষেপের তীব্রতা বোঝাতে মানিক লিখেছেন, 'সাদা রাজার রাজ্য ছেয়ে গেল সাদা কঙ্কালে'। তখনও সাদা রাজাদের শেষ আধিপত্য রয়ে গেছে সামন্ত প্রভুদের ওপর। পরবর্তী চিত্রকল্পে বা উপমায় মানিকের সমাজ-সচেতনতার ছাপ স্পষ্ট। গায়েন রাজেন তার শিষ্য নরহরির গানকে স্বীকার করে নেয়, সে বুঝতে পারে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে, 'মনে মনে সে ভাল করেই জানে, দশজনে যা চায় তাই আসল, আর সব মিছে'। তবে দশজনের এই চাওয়াটা বিজ্ঞাপনের প্রচারের শিকার-প্রাপ্ত চাওয়া নয়, দশজনের চাওয়াটা মনের চাওয়া, তাগিদের চাওয়া। এই দশজনের কাছে নরহরির গানের চাহিদা গানের আসর এবং যন্ত্রণার্ত রাজেনের সরে আসার বিষণ্ণতাকে মানিক তুলে ধরেন একটি অসাধারণ চিত্রকল্পের মাধ্যমে, 'চালার জীর্ণ টিনে এক ঝাঁক পাখি উড়ে এসে বসে, নখের আঁচড়ের সঙ্গে কিচিরমিচির আওয়াজ তুলে ঘরের বিষণ্ন আবহাওয়া মুখরিত করার

চেষ্টাই যেন শুরু করে দেয়। হঠাৎ উড়ে যায় কোথায়'। নরহরির গান শোনা মানুষের গুঞ্জন যেন এখানে উপমিত হয়ে এসেছে, 'নখের আঁচড়ের সঙ্গে কিচিরমিচির আওয়াজ'। ছোটোগল্প রচনায় চিত্রকল্প-উপমা-ব্যঞ্জনার ভূমিকা হচ্ছে গতিশীলতার, নান্দনিকতার এবং ভাষার উৎকর্ষতার। সেজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোগল্পের একজন নান্দনিক শিল্পী, বিষয়বস্তু নির্ভর টেলার (Teller) নয়।

জীবনানন্দের ছোটোগল্পে আধুনিকতা ও জীবনবোধ

কাকে বলে আধুনিক এবং আধুনিকতা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর নিয়ে এখনও মতভেদ আছে। অধুনা-সময় কথাটা থেকেই আধুনিক এবং আধুনিক থেকেই আধুনিকতা এরকম পদ-পরিবর্তনের সারল্য নিয়ে আধুনিকতাকে মানা যায় না, যেন আরও কিছু বৈশিষ্ট বা লক্ষ্মণ আছে। সমসাময়িক ঘটনাবলির সামাজিক প্রভাবকে সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে ও নাটকে সংস্থাপিত করাই আধুনিকতা—এরকম চিন্তাভাবনাকে তবুও স্বীকৃতি দেওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকেই শুরু করা যেতে পারে। আধুনিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'দেনাপাওনা' ছোটোগল্পটি। মানা যায় কিন্তু এখানেই থামা যায় না, কারণ সমসাময়িক ঘটনাবলি নির্ভর করে অর্থপুষ্ট সমাজের পরিবর্তনের উপর। এই পরিবর্তনের কার্যকারণ সম্পর্কটা আধুনিকরা মনে রাখেন না, কিন্তু প্রগতিশীলরা মনে রাখেন। আধুনিকদের চোখ শুধুমাত্র সমসাময়িকতার দিকে এবং প্রগতিশীলদের চোখ সমসাময়িকতা ও তার কার্যকারণ সম্পর্কের দিকে। 'দেনাপাওনা' ছোটোগল্পটিতে সমসাময়িকতা আছে, ধারাবাহিকতা আছে, কিন্তু ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই।

এখানে আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ মতামতটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে, 'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয়, তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন'। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বাঁকটাকেই লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু কেন বাঁক? তার কারণ কি? এসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবেননি। এই বাঁকটাই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের যুগ-লক্ষণ যা সাহিত্যের গতিকে বদলে দেয়। আধুনিকতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের মতামতকেও আমরা গ্রহণ করতে পারি। তিনি বলেন, 'নতুন সময়ের জন্যে নতুন ও নতুনভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্য, নতুন চেতনা, ও নতুনভাবে আবিষ্কৃত পুরোনো চেতনারও যে একান্ত দরকার শিল্পে ও জীবনে এ-কালের কোনো কোনো বাঙালি কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন বলেই আজকের বাংলা কবিতা স্বভাবতই বিষয় ও রীতি নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষার একটা অব্যাহত প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে'। আমরা এখানে বাঙালি কবির স্থানে বাঙালি ছোটোগল্পকার পড়ে নিতে পারি। এতে আধুনিকতা তার বিষয়ভাবনা থেকে সরে আসবে না। জীবনানন্দের এই মন্তব্যের মধ্যেই তাঁর ছোটোগল্পে আধুনিকতার স্বরূপটি ধরা যায়। তিনি ছোটোগল্পের বিষয় ও রীতি নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তিনি ছোটোগল্পে এনেছেন নতুন সময়ের জন্যে নতুনভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্যবোধকে। ছোটোগল্প নির্মাণের প্রয়োজনে শিল্পে ও জীবনে তিনি এনেছেন নতুনভাবে আবিষ্কৃত পুরোনো চেতনাকে।

উল্লিখিত আধুনিকতা সম্পর্কে ওই বক্তব্যটি ছাড়াও অন্যত্র একটি প্রবন্ধে (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা) আধুনিকতা সম্পর্কে আরও বক্তব্য রেখেছেন জীবনানন্দ।

সেখানে তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়—'

কবিতা বিষয়ে জীবনানন্দ দাশের এই মূল্যবান বক্তব্যটি ছোটোগল্প বিষয়েও সমানভাবে সত্য জীবনানন্দের মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে।

জীবনানন্দের লেখা দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতা' ও 'আধুনিক কবিতা' বিশ্লেষণ করলে জীবনানন্দের মতানুসারে 'আধুনিকতা'র নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো ধরা যায়—

(১) নতুন সময়ের জন্যে নতুন ভাবনা, নতুন চেতনা।
(২) নতুনভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্য।
(৩) শিল্পে ও জীবনে নতুনভাবে অবস্থিত পুরোনো চেতনা।
(৪) বিষয় ও রীতি নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা।
(৫) যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতনতা।
(৬) আঙ্গিক ও ভাষার অপরূপ সঙ্গতি।
(৭) সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই বিপ্লব নয়, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের মুখে দাঁড়িয়ে এ বিপ্লব সমীকরণের চেষ্টা করবে সৃষ্টি রহস্যের নতুনতর অর্থসন্ধানে।
(৮) নিজের যুগের লক্ষণ এবং নিজের যুগকে ব্যাপক ও পরিষ্কারভাবে ধারণ করা।
(৯) বিজ্ঞানের ফলাফলকে অধিগত করা।
(১০) কোনো ধর্ম বা দর্শনের চলিত মীমাংসাকে স্বীকার করে কোনো বিশ্বাসের প্রসিদ্ধি লাভ করতে না পারা।
(১১) অন্তনিঃসহায়তা, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাস।
(১২) দেশকাল সন্ততি ও জড় পদার্থ।

একমাত্র জীবনানন্দের ছোটোগল্পে নয় এই বারোটি আধুনিকতার লক্ষণ কবিতা, গদ্য, গল্প সমগ্র রচনা বিশ্লেষণ করলে বেরিয়ে আসতে পারে।

'মানুষের মনের চিরপদার্থ সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বলা যেতে পারে'—জীবনানন্দ কথিত এই বিশিষ্টতাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কথিত নদীর বাঁক। জীবনানন্দীয় আধুনিকতার বারোটি প্রধান লক্ষণ ছাড়াও আরও কিছু লক্ষণ আছে যা জীবনানন্দের ছোটোগল্পকে আধুনিক ছোটোগল্প হিসাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছে, যেমন—

(১) নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব।
(২) নাগরিক জীবনে ও চরিত্রে ক্লান্তি, নৈরাশ্যবোধ, ভোগলিপ্সা ও নিঃসঙ্গতা।
(৩) ফ্রয়েডিও মনোবিজ্ঞানের প্রভাব।
(৪) মার্কসবাদী চিন্তাভাবনা ও ঐতিহ্য সচেতনতার দ্বন্দ্ব।
(৫) সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধে সংশয় এবং অনিশ্চয়তা।
(৬) দেহজ কামনা-বাসনাজনিত অন্তর্বেদনা এবং অন্তর্মুখিতা।

(৭) নাস্তিকতা এবং মৃত্যুচেতনা।

এইসব বিষয়ী লক্ষণগুলো জীবনানন্দের ছোটোগল্পে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। জীবনানন্দের ছোটোগল্পের আঙ্গিকেও আধুনিকতা স্পষ্ট। বিষয় অনুসারে আঙ্গিক এসেছে। আবার আঙ্গিক অনুসারে বিষয় এসেছে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজস্ব ভঙ্গিতে, ফলে ভাষা ও রীতি দুর্বোধ্য মনে হয় কখনো-কখনো। আঙ্গিকের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ—

(১) গদ্যরীতি এবং কাব্যরীতির মিশ্রণ।

(২) ভাষার প্রয়োজনে দেখা যায় প্রবাদ, চলতি শব্দ, তৎসম ও তদ্ভব শব্দ, বিদেশি শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার।

(৩) চেতনাপ্রবাহ এবং আত্মসংলাপ।

(৪) প্রাকৃতিক ব্যঞ্জনা এবং দার্শনিক প্রতীকী নির্মাণ, এখানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

(৫) ছোটোগল্পের মূল শর্তকে বজায় রেখে প্রচলিত শর্তের ধ্যানধারণাকে ভেঙে ফেলা। গল্পের পুরোনো ছাঁচকে ভেঙে নতুন ছাঁচ গড়ে তোলা।

(৬) কনে-দেখানোর মতো প্লটকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠকের সামনে বসানোকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া।

(৭) কখনো কখনো মনস্তাত্ত্বিক রহস্যময়তা

জীবনানন্দ দাশের ছোটোগল্পসমগ্র রচিত হয়েছিল ত্রিশ দশকে, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে। মাঝে দুটি বছর ১৯৩৪ ও ১৯৩৫, কোনো গল্পের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ত্রিশ দশকের সময়ও সামাজিক প্রভাব তাঁর ছোটোগল্পে পড়েছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রভাব পড়েনি। সমাজের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আছে। তার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে এবং সাংস্কৃতিক জগতে। যখনই জীবনানন্দ বেকার-জীবন নিয়ে এবং তাদের হতাশাগ্রস্ত মন নিয়ে প্রচুর গল্প লেখেন, তখনই বোঝা যায় ত্রিশের দশকে প্রচুর শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকার ছিল। এর প্রধান কারণ, ত্রিশের দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার। ১৯২৯-এর শেষ দিকে যে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হয় তা ভারতকে আঘাত করেছিল দু'ভাবে (১) কৃষিজ দ্রব্যের দাম প্রচন্ডভাবে পড়ে যাওয়া এবং (২) সম্পূর্ণ রপ্তানিকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে এক বিশাল সঙ্কট ডেকে আনা। ফলে ত্রিশের দশক চিহ্নিত হয়ে আছে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা ও গণদারিদ্রের দ্বারা। কারখানায় চাকরি নেই, অফিসে চাকরি নেই, কৃষিতে কাজ নেই। শহরে একমাত্র আছে ব্যবসার সুযোগ যাদের অর্থলগ্নি করার ক্ষমতা আছে, তাদের জন্য। ক্ষমতা থাকলেও ভয় আছে, ক্রেতার অভাবে উঠে যাওয়ার ভয়। আবার এই ত্রিশের দশকেই শ্রমিক আন্দোলন, কৃষি আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ত্রিশের দশকের বঙ্গসমাজকে প্রভাবিত করেছিল ব্রিটিশ শাসনের চরমতম বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই, জমিদার ও জোতদারের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ, ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সোচ্চার প্রতিবাদ, সুতিকল-চটকল ধর্মঘট, বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা, বাঙলা সাহিত্যে বাস্তবতা-আধুনিকতা-

শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে লেখালেখি তর্ক-বিতর্ক, ফ্যাসিস্ট বাহিনির দ্বারা অত্যাচারিত কবি ও লেখক যথা, ইতালিয় কবি দিনো কামপানা, জার্মান কথা-সাহিত্যিক জন স্টেফান গেয়র্গ, স্পেনের লেখক ফেদেরিকো গার্‌থিয়া লোরকা, কবি সেজার ভালেখা, ফরাসি কবি-লেখক রেণে শা, কবি নাজিব হিকমত এবং বাঙালি কথা-সাহিত্যিক সোমেন চন্দ (১৯৪২)। ত্রিশের দশকেই সাহিত্যে বামপন্থী চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে। ১৯৩৬-এ ছাত্র ফেডারেশন ও প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন চার অধ্যায় (১৯৩৪) এবং রাশিয়ার চিঠি (১৯৩০)। ব্রিটিশ শাসনের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখা কবিদের বই বাজেয়াপ্ত হয়। যথা—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'কালের ভেরী', নজরুল ইসলামের 'প্রলয়শিখা' ও 'অগ্নিবীণা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' ও কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের 'মন্দিরের চাবি'।

উত্তাল এবং গতিশীল ত্রিশের দশকের বাঁচার তাগিদে, স্বাধীনতার তাগিদে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-পরিবর্তনের প্রয়োজনে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তার ইতিবাচকতার দিকগুলো প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি কল্লোলীয় ছোটোগল্পকারদের গল্পের ওপরে বা ভেতরে এমনকি জীবনানন্দের ওপরেও নয়। এই ইতিবাচক সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামী আন্দোলনের প্রবাহকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে একটা সাংস্কৃতিক চক্রান্ত গোপনে বাড়তে দেওয়া হয়েছিল। তারই ফল 'কল্লোল যুগ'। ফ্রয়েডীয় চিন্তা-ভাবনা এবং রোমান্টিক রিয়ালিজম কল্লোলীয় লেখকদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল। অনেকে বলে থাকেন, জীবনানন্দ দাশের গল্পে কল্লোলীয়দের প্রভাব আছে, প্রভাব বলতে ফ্রয়েড-প্রভাবের কথা বলে থাকেন। জীবনানন্দের গল্পে এই তক্‌মাটা প্রথমেই সেঁটে দিয়েছেন কথাকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। জীবনানন্দ দাশের 'ছায়ানট' ছোটোগল্পটি পড়ে তিনি যে সমালোচনা লেখেন সেই সমালোচনার তিনি নামকরণ করেন 'মিথুন-সমীক্ষণ'। কিন্তু প্রবন্ধকার এবং ছোটোগল্প গবেষক ভূদেব চৌধুরী সেই তক্‌মাটা সরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন, এ গল্প 'মিথুন-সমীক্ষণ'-এর; আমাদের মনে হয় গল্প জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কবি-শিল্পী-জীবনানন্দের জীবন-সমীক্ষণ;—যে জীবনকে তিনি চিনেছিলেন নিজের বিশেষিত দেশকালের পাত্র তার চিরকালের চরিত্রে।' আমরা ভূদেব চৌধুরীর সঙ্গে একমত। আমরা আরও মনে করি ক্ষেত্রবিশেষে চরিত্রবিশেষে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের প্রতি জীবনানন্দের আস্থা থাকা সত্ত্বেও তিনি ফ্রয়েডিয় সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন, যেমন পেরেছিলেন বিজ্ঞান-সচেতন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন মার্কসীয় পথে, জীবনানন্দ চলে গিয়েছিলেন মানব-মানবীর জীবন-সমীক্ষণের পথে, নিজের চোখে দেখা সমকালীন জীবনের অন্তর্ভেদী ও অন্তর্মগ্ন প্রতীতির পথে যেখানে আছে মানুষের বিশাল পরিচয় প্রকৃতির মতো।

যতদূর জানা গেছে জীবনানন্দ নয়টি ছোটোগল্পের নামকরণ করেছিলেন। তার মধ্যে ছ'টির সঠিক তথ্য পাওয়া গেছে, তিনটির তথ্য অনুমান নির্ভর। মুদ্রণের ব্যাপারে সেরকম তাগিদ ছিল না বলেই গল্প লিখে পাণ্ডুলিপি ফেলে রাখতেন। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স্ খণ্ডে খণ্ডে জীবনানন্দের ছোটোগল্পের বই বের করেছেন।

৮ম খণ্ডে (১৯৯৩) সংগৃহীত গল্পগুলির নামকরণ জীবনানন্দ নিজেই করে গিয়েছিলেন, যথা, আর্টের অত্যাচার, বিস্ময়, শাড়ি, হাতের তাস, চাকরি নেই, ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া। ১৯৩৬ সালে লিখিত প্রথম কয়েকটি ছোটোগল্প বের হয় 'অনুক্ত' পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে, তার নামকরণ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়। সেখানে ৩টি গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়, ছায়ানট, বিলাস, গ্রাম ও শহরের গল্প। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স্ যেমন স্বীকার করেছেন 'অন্যান্য গল্পের নাম আমরা সেই গল্পের কোনো শব্দ বা শব্দসমবায় থেকে সংগ্রহ করেছি', সেরকমও কোনো স্বীকারোক্তি প্রথম প্রকাশিত বই-এ পাওয়া যায়নি। এখানে জীবনানন্দ যে কয়টি ছোটোগল্পের নামকরণ [৬ (সঠিক) + ৩ (অনুমান নির্ভর)] করে গিয়েছেন আমাদের আলোচনার সীমাবদ্ধতা সেই কয়টি গল্পের মধ্যে আবদ্ধ।

গল্পের নাম 'হাতের তাস' (১৯৩২)। 'প্রমথের চাকরি নেই, সে বেকার। কলকাতায় তিন চারমাস কলেজে পড়িয়ে দেশে ফিরেছে (এখন বাঙলাদেশ)। সে এম.এ. বি.এল.। ওকালতিতে পসার জমাতে পারেনি। সেখান থেকে প্রমথ সরে এসেছে। মায়ের কাছে যেমন সে উপেক্ষার তার চেয়েও বেশি সে উপেক্ষার পাত্র স্ত্রীর কাছে। এরপরেও প্রমথ হতাশ নয়, বিষণ্ন নয়, সে বাঁচতে চায়। কারণ তার কোনো আক্ষেপ ছিল না। তা একটি জিনিসের জন্যই প্রমথ অপেক্ষা করেছিল, সেটা শান্ত মধুর গৃহধর্মের জীবন, এ আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অ-সাধারণ নয়, কিন্তু তবুও এর প্রসাদ অত্যন্ত গভীর কিন্তু তবুও সে-স্বাদ চিনল না প্রমথ।' এটা প্রমথের আক্ষেপ, হতাশা বা বিষণ্নতা নয়। কিন্তু প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সে স্বাদ চিনেছে। গল্পের শেষে প্রমথ ভাবছে, 'জীবন খুব ভরসাজনক কতকগুলো জিনিসের জন্য অপেক্ষা করছে, একটা চাকরি, বার্থকন্ট্রোলের ক্যাপ, সুমিত্রার জন্য স্থায়ী রকমের একটা টনিক, যথেষ্ট শাড়ি ও গয়না। নিজের জন্য প্রতি মেইলেই বই ছবি। হতাশা, আত্মহত্যা, বধূনির্যাতন এসবের দিন চলে গিয়েছে। বিবাহকে বিচ্ছিন্ন করা মানে হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দেয়া, জীবনের বিশাল স্থির খেলোয়াড়ের ধর্ম তা নয়, তাস যা পেয়েছি, ঘুটিগুলো সে রকম এসে দাঁড়িয়েছে। সেইসব নিয়েই শেষপর্যন্ত অগ্রসর হওয়া বিশাল বিরাট মানুষের জীবন।' এই হচ্ছে আধুনিক পারিবারিক সুস্থ জীবন। এর সঙ্গে সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হবে। এ রকম জীবনবোধের গভীর অনুভব থেকেই প্রমথ অনেকক্ষণ গুম মেরে জামরুল গাছটার দিকে তাকিয়ে মাকে বলেছিল, 'শত দারিদ্র থাকলেও বিবাহিত জীবনে তোমরা ঢের সুখী'। তোমরা এবং আমরা, মায়েরা এবং প্রমথেরা, পুরাণের এবং নতুনের এরই মধ্যে জীবনানন্দের আধুনিক মন লুকিয়ে আছে।

'শাড়ি' (১৯৩২) নিয়েও একটা সিরিয়াস গল্প লিখে ফেলা যায়। 'শাড়ি' এখানে প্রতীক, ভোগাসক্তির ও হিংস্র লিপ্সার প্রতীক। তিনজনকে নিয়ে গল্প। উষা এবং ওর স্বামী, অন্য জন শাড়ি বিক্রেতা বিশ্বেশ্বর। উষার ক্ষোভ এবং অভিমান নিয়ে এই ছোটোগল্পটি। বাড়িতে শাড়ি বিক্রেতা এসেছে। নারীমনকে জয় করবার জন্যে একটি শাড়ি কিনে দেবার ইচ্ছে হয় রণজিতের। কিন্তু দাম শুনে এগোতে পারে না। কারণ 'দুবেলা অন্নসংস্থান করতেই জিভ বেরিয়ে যায়' রণজিতের। সব ক্ষোভ অভিমান ভুলে গিয়ে উষার একটি

মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি পছন্দ হলে রণজিৎ দেখতে পায় নিজেকে, সে যেন ক্রেতা উষা এবং বিক্রেতা বিশ্বেশ্বরের হিংস্র লিপ্সার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনানন্দকৃত 'হিংস্র লিপ্সা' শব্দ দুটি প্রয়োগে ভোগ্যসমাজচিত্র এবং যুগযন্ত্রণা পাঠকের ভিতরটা নাড়িয়ে দেয়। এখানেই জীবনানন্দের আধুনিকতা।

গল্পের নাম 'চাকরি নেই' (১৯৩২)। পঁয়ত্রিশ বছরের সুকুমার চাকরি হারিয়ে বাংলাদেশে ফিরছে স্টিমারে। দেশে আছে বাবা-মা-স্ত্রী ও তার ছোটো একটি মেয়ে। আর আছে তাদের নিজস্ব বাড়ি। স্বামীর চাকরি না থাকলে স্ত্রীর যে অবহেলা সেটা দেখানো হয়েছে এই গল্পে। কিন্তু গল্পকার হতাশাগ্রস্ত সুকুমারের ছবি তৈরি করেননি এখানে। গল্পের মাঝখানে কয়েকটি সূক্ষ্ম টানে জীবনানন্দ কয়েকটি হতাশার তীব্র-যন্ত্রণার রেখা তৈরি করেছেন ঠিকই যেমন, 'দু-এক ঘণ্টার ভিতরেই খুকিকে সে যেন আর চায় না' বা 'মেয়েটি রিকেটে ধিক্‌পিক্ করছে' বা 'সুকুমার তাকে কোলে নিল না' পরক্ষণেই আর একটু এগোবার পরেই দেখা যায় সুকুমার ভাবছে গভীর রাতে না ঘুমিয়ে, 'কোনো এক সংকল্পের কথা ভাবছিল সে, কোনো এক প্রয়াসের কথা, যার ওপর জীবনকে দাঁড় করানো যেতে পারে।' আরও একটু এগিয়ে গিয়ে জীবনানন্দ তাঁর নিজস্ব রীতিতে ছোটোগল্পটি শেষ করেছেন—

'এই তার স্ত্রী।

এবং এই খুকুনের মা।

কিন্তু তবুও এইসব দিয়েও নীড় গড়া যায়, শালিখবধূও তো অধিকাংশ সময়ই এমনইতর। যদি ষাটটা টাকা রোজগার করতে পারত সুকুমার, পঞ্চাশ টাকা'। ওঃ কি তীব্র যন্ত্রণা সুকুমারের। ওঃ কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা সুকুমারের।

ত্রিশের দশকের জীবনানন্দকে আমরা পেয়ে যাই নব্বইয়ের দশকে। এখানেই জীবনানন্দ আধুনিক এবং আধুনিকতাকে ছাড়িয়ে কালবেলার মুখোমুখি।

গল্পের নাম 'ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া' (১৯৩২)। বিরাজের বাবা-কাকা-জেঠাকে নিয়ে বাংলাদেশের এক একান্নবর্তী পরিবার। আর আছে, বিরাজের স্ত্রী, মেয়ে এবং ছোটো ভাই। সে খুশীমতো কবিতা লিখতে পারে না, সে নিজের মতো করে স্ত্রী কমলাকে পায় না। এই দুই প্রকার যন্ত্রণার মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে আসে অমলা, স্ত্রী কমলার ছোটো বোন। 'এই মেয়েটি ব্যাকুল চিতার মতো চমৎকার ছুটতে পারে। ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, ফরসা রং, চুলগুলো আরবি ঘোড়ার লেজের মতো একটা দ্রুতগতির পিছনে হিল্লোল উড়বে। নক্ষত্রের রাতে, মৃদু জ্যোৎস্নায় নদীর পারে এই সুন্দর চিতাকে নিয়ে ঢের আমোদ, উল্লাস, আতিশয্য'। কিন্তু অমলাকে নিয়ে বিরাজ বেড়াতে পারে না। একান্নবর্তী পারিবারিক শাসন। আমাদের মনে হয় শুধুমাত্র আর্থিক কারণেই পরবর্তীকালে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যায়নি। তার অন্যতম একটি প্রধান কারণ স্বামী-স্ত্রীর অবাধ স্বাধীনতার অভাব। অবশেষে প্রকৃতি বিরাজকে মুক্তি দেয়, 'ঝাউগাছের সারির পাশ দিয়ে শনশন করে বাতাস নিয়ে চলেছে সে, এই সন্ধ্যার সময় জীবন একটু নিস্তার। সব কিছুকে ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ক্ষিপ্র নিরবিচ্ছিন্ন সাইক্লিস্ট সে যেন নক্ষত্রগুলোর দিকে চলতে থাকে তারপব

একবার সেখানে পৌঁছুলে সেই অনন্ত নক্ষত্রের মাঠে, না আছে পরিবারের ব্যথা, কাকারা জ্যেঠামশাই, কমলা খুকি বা নিরর্থকতা। জীবন সেখানে মস্ত বড় একটা গভীর পরিসরের কথা পেয়েছে।'

এখানেই জীবনানন্দের জীবনবোধ, জীবনের প্রতি গভীর অতল অনুভব। গল্পের ভিতরেই তিনি বলেন, 'মানুষ বিলাস লালসা লাম্পট্য বা সুখ তত চায় না, বরং শান্তিতে মনের সাধে কথা বলে কাজ করে লিখে তার ভাল লাগে বেশি। জীবনের এইসব মৃদু রঙের, গভীর আকর্ষণ আর্টিস্টের জন্যই নয় যেন শুধু', সকলের জন্যই। নারীর সৌন্দর্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ক্ষণিকের মুক্তি এনে দেয় মস্ত বড় একটা গভীর পরিসরের কথা মনে করিয়ে দেয়। গল্পের শেষ : বিরাজ ঘাসের নরম ঘ্রাণও রঙের কোলে হারিয়ে গেছে। আর এখানেই কল্লোল যুগের গল্পকারদের থেকে এবং বামপন্থী লেখক শিবির থেকে জীবনানন্দ আলাদা, স্বতন্ত্র।

গল্পের নাম 'আর্টের অত্যাচার' (১৯৩২)। এই গল্পটি পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবনের গল্প নয়। বেসামাল সমাজের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে ত্রিশের দশকের অর্থনীতি। পারিবারিক সামাজিক মূল্যবোধ ভাঙতে শুরু করেছে। বিচ্ছিন্নতা, বিষণ্নতা, একাকিত্ব মানুষের জীবনকে বিশেষ করে এলিটিস্টদের ঘিরে ধরেছে।

গল্পকার ভেবেছেন, সেখানে একমাত্র মুক্তি আর্টের কাছে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের কাছে। এরপরেও এই গল্পে ভালোবাসার দুঃখবোধ এবং বেদনাবোধকে প্রাণিত করেছেন। জীবনানন্দের কাছে একমাত্র মানসিক শান্তি ঈশ্বরের কাছে নয়, পার্থিব প্রকৃতির সৌন্দর্যের কাছে। জীবনানন্দের ছোটোগল্পে ঈশ্বর খুঁজে পাওয়া যায় না। না, সংগ্রামী মানুষের কাছে এই আধুনিক জীবনবোধ পৌঁছে দিতে চাননি। তিনি এই জীবনবোধ পৌঁছে দিতে চেয়েছেন এলিটিস্টদের কাছে, কথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে। এখানেই 'আর্টের অত্যাচার' গল্পের সার্থকতা। 'আর্টের অত্যাচার' গল্পে অবিনাশ, নিখিল, দেবকুমার এরা মাঝে মধ্যে একসঙ্গে মিলিত হয়ে আড্ডা মারে। এরা সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র নিখিল ছাড়া। সে একটা ব্যাঙ্কে কাজ করত। তারপর ব্যাঙ্কটা ফেল হয়ে গেল। এরপর থেকে নিখিলেশ বেকার। নিখিল কবিতা লেখে এবং উপন্যাস লেখার চেষ্টা করে, দেবকুমার গল্প লেখে এবং অবিনাশ উপন্যাস লেখে। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠিত প্রফেশনের মধ্যে তীব্রভাবে থেকেও এরা আর্টের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। 'এরা কেউ কারু জন্যে অপেক্ষা করে না, কেউ কারু সঙ্গ চায় না।' এরা সকলেই আধুনিকতার যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে, এরা সবাই চার্লি চ্যাপলিনের মর্ডান টাইমস-এর (১৯৩৬) জগতে চলে যাচ্ছে। জীবনানন্দের কথায় 'ইডিয়ট হয় যাচ্ছে'। মডার্ন টাইমস-এর শুরুতেই দেখা গেল ভেড়া। ইডিয়ট এবং ভেড়া—এই দুটি প্রতীক কি ত্রিশের দশকের অলংকার? ভাবা যায়! এদের মধ্যে গল্প এগিয়ে গেছে নিখিলকে নিয়ে। নিখিল ব্যারিস্টার হতে পারত না বা একজন খুব বড়ো ব্যবসায়ী। এসব হওয়ার চেয়ে আরও কঠিন একজন বড়ো কবি হওয়া। নিখিল ভাবে, এরা জানে না শব্দের অত্যাচার কাকে বলে, হাজার হাজার শব্দের ভিতর থেকে একটিকে বেছে নিতে নিখিলের রাতের পর রাত কেটে গিয়েছে। 'তারপর দু-একটা কবিতা

বেরিয়েছে, কিন্তু তাতেও ঠিক ঠিক শব্দ এল কই—চিন্তাই বা রূপ পেল কোথায়। না না আর্টের অত্যাচার এরা জানে না।' এখানে উল্লিখিত 'এরা' কারা? এরা হচ্ছেন এলিটিস্ট, ক্যারিয়ারিস্টদের সন্তান, পার্থিব ভোগের প্রতি যাদের তীব্র আকর্ষণ। ক্রমে ক্রমে নিখিল বুঝতে পারল, 'সে কত একা, যে জীবন মনে মনে সে সত্য বলে ধরে রেখেছে পৃথিবীর কাছে তা কত হেয়।' এরকম মনের অবস্থায় একদিন স্কুল-ইন্‌সপেকট্রেস অমিতার সঙ্গে নিখিলের দেখা হয়, 'এই সেই অমিতা। নিখিলদের পাশাপাশি বাড়িতে মেহেরপুরে অনেক দিন এরা ছিল, নিখিলের ছোটোবেলার খেলার সাথী।' মেহেরপুরের অবিবাহিত অমিতা জীবিকার কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সে অনুভব করে সে একা, 'এই সময়টাই বড় একঘেয়ে, নিজেকে এমন একা মনে হয়। অমিতা জীবনের একাকিত্ব কাটাবার জন্য ল্যান্ডস্কেপের ছবি আঁকে, চাঁটগায়ের দিকে বাড়ি কিনা, সেখানে আকাশ পাহাড় নদী সমুদ্র বন সবই এমন সুন্দর তুমি দেখোনি নিখিল? অমিতাও জীবনের সৌন্দর্য খুঁজে পায় প্রকৃতির কাছে। নিখিলও একা, সেও কবিতা রচনায় এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে জীবনের আনন্দ খুঁজে পায়, 'চাঁদ এখনও আছে। আরও অনেক কটা দিন থাকবে। এই জ্যোৎস্নায়, এই বসন্তে শরীরটাকে এত ভাল লাগে, হৃদয়টাকেও। সোফায় শুয়ে শুয়ে জানালার কাছে জ্যোৎস্নায় নিখিল যে ধীরে ধীরে চুরুট টেনে চলেছে এর চেয়ে অনির্বচনীয় কি আর থাকতে পারে।' মাঝবয়সের জীবনের একাকিত্বের সময়টাতেই নিখিল এবং অমিতার দেখা। গল্পের শেষে তাদের বিনম্র আত্মভাষণ :

'বললামই তো ল্যান্ডস্কেপ
ল্যান্ডস্কেপ শুধু?

এর চেয়ে বেশি কিছু ভাল করে বশে আনতে পারি না।' 'বশে আনতে পারি না' এই কথাটির মধ্যে অমিতার তীব্র দুঃখবোধ এবং বেদনাবোধ জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে অমিতার শেষ কথাগুলো, 'কাল রাতে দেখলাম ঝাউগাছের পিছনে চাঁদ, জানালার কাছে অনেকক্ষণ বসে রইলাম, জ্যোৎস্নায় বসন্তের তেমনই যেন, তুমি বুঝতে যদি নিখিল, ঢের পুরোনো কথা মনে হল। বলতে বলতে অমিতার চোখ জলে ভিজে উঠল।' পুরোনো কথার মধ্যেই জীবনের সৌন্দর্য খুঁজে পায়, ভোগ-বিলাসের মধ্যে নয়।

গল্পের নাম 'বিস্ময়' (১৯৩২)। আধুনিক বিন্যাসে একটি অসাধারণ ছোটোগল্প। এই গল্পের নায়ক একজন কথা-সাহিত্যিক, সুবোধ। এখানে কোনো ধরাবাঁধা গল্প নেই। সুবোধের ভাবনা এবং কল্পনা নিয়েই গল্প এগিয়েছে। James Joyce-এর Interior monologue (স্বগতোক্তির চেতনা প্রবাহ)-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত। ১৯২২-এ জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কখনও কথাসাহিত্যের কল্পনার মধ্যে ঢুকে গিয়ে সুবোধ উপন্যাসের বা গল্পের চরিত্র হয়ে যায়। আবার কখনও কল্পনা থেকে বেরিয়ে এসে সুবোধ হয়ে যায়, ত্রিশের দশকের বিকৃত আর্টকে সিনেমাকে ঘৃণা করে। যথার্থ চ্যাপলিনকে মর্যাদা দেওয়া হয় না। এই গল্পে জীবনানন্দের জীবনবোধ এবং আধুনিক মনস্কতা তার উক্তিতেই বুঝতে পারা যায়—(১) মানুষকে একটা অনর্থক ব্যস্ততা শেখায়, (২) আমাদের জীবনটাকে বিকৃত-পরিবেশে টেনে আনে। ত্রিশের দশকের

এই জীবনবোধ থেকে আমরা এই নব্বই দশকে কি সরে আসতে পেরেছি? নাকি এই জীবনবোধকেই ধরে রেখেছি, মেনে নিয়েছি, নাকি ধ্রুপদী ভেবেছি?

জীবনানন্দের একটি অসাধারণ ছোটোগল্প 'বিলাস'। জীবনানন্দের কাব্যপ্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে এই গল্পটি। কাফকার নিঃসঙ্গতার গভীরতাকে ছুঁয়ে যায় এই গল্প। বাঙলাদেশের শিকড়ে গ্রথিত শান্তিশেখর সেন হয়ে যেতে পারে কাফকার গল্পের নিঃসঙ্গ নায়ক। এই নিঃসঙ্গ নায়ক শান্তিশেখর কাফকার মেটামরফোসিসের নায়ক গ্রেগর হয়ে যায় যখন পড়ি, 'কলকাতায় আমেরিকানদের একটা ইংরেজি সাপ্তাহিক কাগজে চাকরি করে। শান্তিশেখর এক-একটা রাত তিন-চারটে কাগজই তন্নতন্ন করে পড়ে ফেলে। ফলে রাত ভোর হয়ে যায়—ঘুম হয় না—পরদিন সারাদিন হাত-পা ঠান্ডা হয়ে থাকে—কেঁচোর মতন হয়ে থাকে শরীরটা—অফিস কামাই করে বিছানায় পড়ে থাকলেও—কেঁচোর মতন।' দুর্বার ক্লান্ত গ্রেগরও পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেছিল সে গুবরে পোকা বা আরশোলা হয়ে গেছে। গল্পের শেষে কাফকার গ্রেগর মারা যায়, জীবনানন্দের শেখরও মারা যায়। শান্তিশেখরের স্বপ্নের মধ্যে উঠে এসেছে হেডমাস্টার অপরেশবাবু। 'এটা কী বই?' হেডমাস্টারমশাই শান্তিশেখরের হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডাস-ক্যাপিটাল মানে কি? লিখেছেন কে'?

'মার্কস'।

'কে তিনি?'

'এই একজন সমাজ দার্শনিক আর কী— হয়তো বৈজ্ঞানিক?'

'কী লিখেছেন?'

'কী লিখেছেন' শান্তিশেখর বললে, 'উনি ভেবেছেন, সমাজের ব্যাকরণ লিখেছেন—'

এই হচ্ছেন গল্পকার জীবনানন্দ যিনি অবস্থান করেন আধুনিকতার মধ্যে এবং প্রগতিশীলতার মধ্যে। আমেরিকান অফিসের ইংরেজি সাপ্তাহিক কাগজের প্রুফরিডার এবং এম.এ. পাশ শান্তিশেখরের চিন্তাভাবনায় উঠে এসেছে ব্যবসায়ী সর্বেন ঘোষ এবং তাদের সঙ্গী সুস্মিতা সেন, ফিরিঙ্গি মেয়ে এডিথ ও উর্সুলা, মর্গ্যান সাহেব, গ্রিফিথ সাহেব, কার্লমার্কস এবং দাস ক্যাপিটাল, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধান-বীজধানের খুনোখুনি। আর এসেছে কিছু আধুনিক শব্দ (যা এখনও চলে আসছে) এবং শব্দ-নির্মাণ—লবঙ্গ দ্বীপ, লবেজান অন্ধকার, কফিহাউস, টিপিক্যাল বাঞ্চোৎটা, ফপর দালালি, তিব্বতী পবিত্রতা, অমাআঁধার, গোল্ডফ্লেকের টিন, ল্যাভেটারি ও টিস্যুপেপার, পাইপ ও পাউচ, স্কাইলাইট, ছায়াভূমি, হিমস্মৃতিভূমি, বৈরাট্যের ছায়ান্ধকার, এক জঙ্গল চুল ইত্যাদি।

এরপর আমরা যে গল্পের ভিতর ঢুকব, সেটির নাম 'গ্রাম ও শহরের গল্প'। ১৯৩৬ সালে লিখেছিলেন। অনেক দিন বেকার থাকার পর ১৯৩৫-এ জীবনানন্দ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপকের চাকরি পান। এবারের গল্প ভাবনায় লেখকের জীবন ও সমাজ অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা আরও ব্যাপক। অমলেন্দু বসু এই গল্প সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন 'বস্তুনিষ্ঠা জীবনানন্দের কল্পনায় প্রথম থেকেই প্রবল। গল্পটি দাম্পত্য জীবনের গল্প হলেও মূলত তির্যক প্রণয় বিশ্লেষণমূলক গল্প এবং বিশ্লেষণ হয়েছে গ্রাম ও শহরেব

পরিবেশের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে, যেন এক আধুনিক জীবনবোধের সচল আলেখ্য।' এই গল্পে তিনটি চরিত্র আছে, স্বামী-স্ত্রী প্রকাশ ও শচী, এবং তাদের বন্ধু সোমেন। সোমেন গ্রাম্য পরিবেশে শারীরিক টানে এবং আন্তরিক ভালোবাসায় শচীকে পেয়েছিল বিয়ের আগে। আদ্যিঅন্ত শহুরে যুবক প্রকাশকে বিয়ে করার পর শচীর স্বভাব পালটে যায়। সেই বিবাহিত শচীকে সোমেন পাওয়ার পরেও সোমেন ভেবেছে 'আজকে সে শচীকে পুরোপুরি নিজের যে কোনো প্রয়োজনে লাগাতে পারে।' শুধু শচী নয়, সোমেন নিজেও যা ছিল তা আর নেই। এখন আর সোমেনেরও উপায় নেই শহরের পাপচক্র পেরিয়ে আবার সেই বকমোহনার নদীর ধারে চলে যাওয়ার। অর্থনীতি এবং যৌননীতির দ্বন্দ্বে এক অবিস্মরণীয় আধুনিক চরিত্র এই সৌমেন।

আমার আলোচনার সীমাবদ্ধতার বাইরে গিয়ে মাত্র আর একটি গল্পের আলোচনা করব, গল্পটির নাম 'কথা শুধু— কথা, কথা, কথা, কথা, কথা' (১৯৩২)। লেখক গল্পের নামকরণ করেননি। অল বেঙ্গল সু ফ্যাক্টরির মালিক ভবশঙ্করের (আগে ছিলেন লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান) কাজ শুধু কথা দিয়ে মন ভোলানো। ভবশঙ্কর এ্যালবার্ট হলে (বর্তমান কফিহাউস) পোলিটিক্যাল মিটিং-এ কংগ্রেসের লেফট্‌দের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন 'আজ এ সময়ে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের আমি স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিতে চাই যে আমি বলশেভিক নই।' ত্রিশের দশকে মালিকদের এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। এই গল্পে রাশিয়া নিয়ে অনেক কথা বলেছেন ভবশঙ্কর। তবে এই গল্পে রাশিয়ার এবং মন্দা অর্থনীতির প্রসঙ্গ টেনে আনা অর্থই জীবনানন্দের রাজনৈতিক প্রগাঢ়তা প্রকাশ পায়। ত্রিশের দশকেই এলিটিস্টদের মধ্যে রাশিয়া ঢুকে গেছে। এই গল্পে ভবশঙ্কর বলতে বাধ্য হচ্ছেন : 'আজকাল বলশেভিকইজম বলে একটা কথা শোনা যায়, সোভিয়েট রাশিয়াকে কেউ প্রশংসা করে, কেউ নিন্দা করে।... রাশিয়ার চাষা ভুষোর গুনগান করলে ভবশঙ্কর।' জীবনানন্দ অঢেল টাকার মালিক এবং ব্যবসাদারদের নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন। এই সব ব্যবসায়ী এবং মালিকশ্রেণির কারবার ত্রিশের দশকের অর্থনৈতিক মন্দার যুগে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, যথা, ভবশঙ্কর, অবনীশ, দ্বিজেন, হেমেন, দেবব্রত ইত্যাদিরা। এরাই হচ্ছে ছাঁটমেটালের কারবারি, মজুতদার, কনট্রাক্টর, পাটের দালাল, আড়তদার ইত্যাদি। এরা শুধু জানে মেয়েমানুষ এবং অর্থশোষণ। এরা যখন রাশিয়া নিয়ে কথা বলে তখন তা কথার কথা হয়ে যায়। সেজন্য জীবনানন্দ বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেন, 'এই তরল খোকারাই দেশের কাগজের নেতা, দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সবই এদের হাতে।' তবু ভবশঙ্করের প্রতি জীবনানন্দের একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি থেকে যায়। এসব চরিত্রের বিপরীতে অবস্থান করছে বেকারেরা। তাদের নিয়েও জীবনানন্দ প্রচুর গল্প লিখেছেন।

দাম্পত্য জীবন এবং বেকার-জীবন বিষয়ক গল্পে-ছোটোগল্পে জীবনানন্দের ব্যক্তি জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। এর সদর্থক দিকটা হচ্ছে, তিনি গল্প লিখেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতার বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে। বিয়ের পর জীবনানন্দ চার/পাঁচ বছর বেকার ছিলেন। মন্দা অর্থনীতির বাজারে বেকার থাকার যন্ত্রণা এবং জ্বালা তাঁর গল্পে প্রতিফলিত

হয়েছে। বিবাহ জীবনে তিনি অসুখী ছিলেন। সুন্দরী স্ত্রীর উদাসীনতা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা তাঁকে নির্জন, নিঃসঙ্গ, একাকী করে তুলেছিল। এর অব্যক্ত জ্বালা এবং যন্ত্রণা ছোটোগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

এসব ছোটোগল্পের পরম পরিচয় আত্মমগ্নতা, অন্তর্মুখিতা এবং আত্মজৈবনিক মানসিকতা। এ ছাড়া অন্যসব জীবনানুভব স্পন্দিত ছোটোগল্পে বস্তুনিষ্ঠা ও সমাজ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক জীবনের পারিবারিক এবং সামাজিক জটিলতা ও সংকটাকুলতা জীবনানন্দকে শুধু ভাবিয়েছিল তা নয়, তাঁর মানসিকতাকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল বলেই নানা মাত্রায় তিনি ছোটোগল্পে ধরে রেখেছেন, এ যেন জীবনানন্দের আত্ম-অনুসন্ধান।

ছোটোগল্পের একটি নন্দনতত্ত্ব আছে। উপমা, চিত্রকল্প, শব্দনির্মাণ এসবের যথাযথ প্রয়োগে ছোটোগল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলাটাই হচ্ছে নান্দনিক বিষয়। জীবনানন্দ নান্দনিক চর্চায় সম্পূর্ণ সফল। অবশ্যই বলা যায়, তিনি গল্পকার নন, ছোটোগল্প শিল্পী। জীবনানন্দ কিভাবে মনের গহিনতাকে প্রকাশ করেছেন চিত্রকল্প, ব্যঞ্জনা, উপমার সার্থক প্রয়োগে, সে-সব ভাষাপ্রতিমার কয়েকটি উদাহরণ :

১) মনে হল, আমলকি পল্লবের থেকে শিশির ঝরে পড়ল যেন হেমন্ত রাতের পাখির পালকে, ছায়া-আঙুলের নিঃশব্দতায় বইগুলো অন্তর্হিত হয়ে গেল কোথায়। (বিলাস)

২) মুহূর্তের জন্যে নিজেকে বারবিলাসিনীর মতো মনে হচ্ছিল শচীর; আবাল্য আপ্যায়নকুশলা বারবিলাসিনী— এই শুধু; সোমেনেরও মনে হচ্ছিল শচীকে যেন খানিকটা meretricious, বোধ হচ্ছে। (গ্রাম ও শহরের গল্প)

৩) দিনের কর্কশতার অবসানে... ফুলের মতো নরম সুন্দর কোন এক রাত্তির দেশে বিকেলের জোনাকির নিরুজ্জ্বল হৃদয় পাখা ঘিরে যেমন ধীরে ধীরে ছায়া এসে হাত বুলায়। (বিস্ময়)

৪) তবুও সতীর মুখের কাপড় খোলা হল যখন আকস্মিক কি একটা পীড়ার আঘাতে হৃদয়ের রক্ত ঝঙ্কার দিয়ে উঠল যেন। নদীর জলে একাটি শীর্ণ করুণ মাছ যেন অকস্মাৎ জলখুম্বির কামড় খেল। (বিস্ময়)

৫) ছায়া ছায়া মেঘের ওপারে সূর্য আজ আর ইস্পাতের মতো কঠিন কিছু নয়। চিতার ছালের মতো উজ্জ্বল সুন্দর অবর্ণনীয় জিনিস সে, এই মেঘগুলো একরাশ রাজহাঁসের ডানার রো::র মতো দুলে দুলে সূর্যকে ঘিরে রেখেছে। (চাকরি নেই)

৬) সৈন্যের মনের ভিতর যত বড় তুমুল সমুদ্রই থাক না কেন ব্যারাকের প্রতিটি খুঁটি-নাটি নিয়মই প্রতিমুহূর্তেই তাকে হিমের মতো জমিয়ে জমিয়ে গড়ছে। (চাকরি নেই)

সাহিত্য-বৈয়াকরণ মাত্রই বলে থাকেন ছোটোগল্পের একটা স্ট্রাকচার আছে, একটা গ্রামার আছে। একটা আইডিয়ার শুরু থাকবে। তারপর সেই আইডিয়াকে ক্লাইমেক্সে এনে পাঠকমনে বিস্ময় সৃষ্টি করা বা চমক সৃষ্টি করা। ছোটোগল্পের নামকরণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইডিয়ার কেন্দ্রবিন্দুটি ধরেই নামকরণ করতে হবে। আইডিয়াকে প্লটে রাখা যায়, আবার আইডিয়াকে প্লটের বাইরেও রাখা যায়। জীবনানন্দ ছোটোগল্পের আইডিয়াকে স্বাধীনভাবে

প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পেরিয়ে প্রমথ চৌধুরী বা কল্লোলগোষ্ঠী পর্যন্ত ছোটোগল্পের যে ধারা-পথ তৈরি হয়েছে, জীবনানন্দ সেই ধারা-পথে হাঁটেননি। তাঁর মাথায় রবীন্দ্রনাথ, মোপাসাঁ, চেখভ, গোর্কি, তলস্তয়, টমাস মান, লরেন্স, হ্যামসুন ঘুরত না। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক জীবনানন্দ এঁদের লেখা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। আমার মনে হয়, প্রথা-বিরোধী ছোটোগল্পের যথার্থ রূপকার হচ্ছেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর ছোটোগল্পে ক্লাইমেক্স, এন্টি-ক্লাইমেক্স নেই। গল্পে বাঁধাধরা প্লট নেই। পল্লবগ্রাহিতা নেই, শৈথিল্য নেই, কৃত্রিম ভাষার স্মার্টনেস নেই। নিজস্ব স্বভাবের পরিবেশ থেকে ছোটোগল্প বেরিয়ে আসে। তাঁর ছোটোগল্প হঠাৎ শুরু হয়, হঠাৎ শেষ হয়। এখানে যে শেষ হতে পারে, এটাই বিস্ময়। আবার যেখানে শেষ হয়ে যাবার কথা সেখানে শেষ হচ্ছে না, এটাও বিস্ময়। আইডিয়ার বিস্তৃত ব্যবহারে তিনি নির্লিপ্ত, উদাসীন, মোহহীন। একটা বাঁকের মুখে লেখা ছেড়ে দেন, লেখাকে আর ধরে রাখেন না, প্রয়োজন বোধ করেন না। সেখানে পাঠক বিস্মিত হতে পারেন, আবার অনেক সময় নাও হতে পারেন। ত্রিশের দশকে এরকম আধুনিক ছোটোগল্প লেখা হয়েছে সেটা জীবনানন্দ না পড়লে অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। হঠাৎই মনে পড়ে গেল একজন মহিলা গল্পকারের কথা 'An Irish-American, Mary Lavin, argued the point in a story in her book, 'A single Lady' (1951), 'Life itself has very little plot', She said, Life itself has a habit of breaking off in the middle' (Modern English Short Stories (1956) বইটির ভূমিকা থেকে)। রক্ষণশীল ছোটোগল্পকারেরা বা সমালোচকেরা জীবনানন্দের ছোটোগল্পকে বাঙলা সাহিত্যে স্থান দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন, কিন্তু আমরা জীবনানন্দের জীবনমন্থনজাত বিস্ময়াবিষ্ট আধুনিক ছোটোগল্পকে বাঙলাসাহিত্যে বিশেষ স্থানটিই দেব, আগামীকাল দেবে।

জীবনানন্দের ছোটোগল্পে যৌনতা

মুখবন্ধ

যৌনতা জীবনের অঙ্গ, তারুণ্যে সেটা বিকশিত হয়। ষাটের পর থেকে এই বিকাশ ম্লান হতে হতে মৃত্যুতে এর পরিণতি। বিকৃত যৌনতা, অসুস্থ যৌনতা, পাশবিক যৌনতা ক্ষতিকারক, সামাজিক ও পারিবারিক ভারসাম্য নষ্ট করে, সামাজিক এবং ব্যক্তিক অগ্রগতির বিঘ্ন ঘটায়। আন্দোলনমুখী-সংগ্রামমুখী সুস্থ সমাজ-চেতনার বিপরীত শক্তি হচ্ছে অশিষ্ট-বিকৃত যৌনতা। ধনবৈষম্য ও ভোগ্যপণ্য সমাজের এক শক্তিশালী হাতিয়ার এই Vulgar-sex এবং Pervert-sex যা এখন বাংলা সাহিত্যকে এবং সংস্কৃতিকে প্রভাবিত কয়ছে, কলুষিত করছে। মানব-জীবনে যৌনতার পথে অগ্রগমনের একটা সীমা আছে, শিষ্টাচারের সীমা। এই সীমা অতিক্রম করলেই সেক্স ভালগার হয়, পারভার্ট হয়। অবাধ যৌন জীবন-যাপন কখনোই সামাজিক জীবন-যাপন হয়ে উঠতে পারে না। আরেকটা কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে, মূলত যৌনতার জগত, স্বাধীন জগত। সেখানে প্রভুত্ব চলে না, নরনারীর স্বাধীন মতামতের ওপর নির্ভর করে সুস্থির যৌনতা। অর্থের বা লোভের বিনিময়ে যৌনতাকে কেনা যায়, কিন্তু প্রভুত্ব খাটানো যায় না। প্রভুত্ব খাটালেই যৌনতা Vulgar হবে, নির্যাতিত হবে।

গল্পের দায়ে চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় জীবনানন্দ যৌনতার সূচিমুখে শিল্পিত ও সুস্থির কলমকে অনিবার্য করে তুলতে পেরেছেন তাঁর অধিকাংশ যৌনসচেতন ছোটোগল্পে। বাড়াবাড়ি নেই, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ ভেঙে যৌন-সীমা অতিক্রমের চেষ্টা নেই, যৌনতার অপপ্রয়োগ নেই। আসলে গদ্যকার জীবনানন্দ জীবনকে দেখতে চেয়েছেন বা অনুভব করতে চেয়েছেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। সেখানে যেমন সুস্থ যৌনতাবোধ আছে, সেরকম তার পাশাপাশি আছে অতিচেতন সৌন্দর্যবোধ, সেখানে কামনা-রক্তিম টসটসে শরীরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, খুঁজে পাওয়া যাবে শরীরের ভাষাকে, বোধকে। যৌনতার স্বভাবে তিনি দেখেছেন ত্রিশের দশকের যুগযন্ত্রণাকে, অবক্ষয়-শাসিত সমাজকে। তিনি দেখেছেন পাপের পথে, নিষ্প্রেম অন্ধকারের অভিমুখে শহর ও শহরতলির উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত পুরুষদের-নারীদের মানবিক মূল্যবোধকে মাড়িয়ে এগিয়ে চলতে। যৌনতার বিষ, প্রেমের ছোবল তাঁকে-সমাজকে আহত করলেও প্রেম ও যৌনতার মাধুর্যে জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা তিনি জানিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন ত্রিশ/চল্লিশের দশকের কুটিল-জটিল সামাজিক অবস্থান পুরুষকে এবং নারীকে অস্থির ও স্বভাবচ্যুত করেছে। 'ক্যাম্পে' কবিতা থেকে একটি পঙ্‌ক্তি তুলে আনা যায় এই প্রসঙ্গে : 'প্রেমের সাহস-সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণ্য মৃত্যু পাই।' ছোটোগল্পে যৌনতা প্রসঙ্গে এখানে প্রেমের

সাহস-সাধের সাথে যৌন-যন্ত্রণাকে অনুভব করতে হবে। ওই কবিতার আরেকটি পঙ্‌ক্তি : 'মৃত পতঙ্গের মতো আমাদের মাংস লয়ে আমরাও পড়ে থাকি।'

প্রেম ও যৌনতার প্রতিফলনে জীবনানন্দ তাঁর ছোটোগল্পে পুরুষের মনটিকে যেভাবে ধরতে পেরেছেন, নারীর মনটিকে ততখানি ধরতে পারেননি। যেখানে বিস্তৃতি লাভ করেছে প্রেমের ও যৌনতার অস্ফুট বেদনা ও অবরুদ্ধ আবেগ, সেখানে মৌলিক অনুষঙ্গ হিসাবে ছড়িয়ে আছে বিষণ্ণতার-হৃদয়বেদনার-বিচ্ছেদের নানারকম চিত্রকল্প-উপমা-প্রতীক। জীবনানন্দের কাছে যথার্থ যৌনতা স্থূলতার অভিব্যক্তি নয়, মনুষ্য ধর্মের উদ্দীপনা জীবনসঞ্চালক। যৌন-বিষাদ এবং বেদনা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নীলিমায় উত্তরিত হয় জীবনের সরল মাধুর্য মিশিয়ে।

জীবনানন্দ শুধুমাত্র অনুভব জগতের বা কল্পনা-জগতের বাসিন্দা ছিলেন না। তাঁর গভীর চিন্তা-ভাবনা সমাজ-চিন্তাভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাঁর ছোটোগল্প-পাঠে সমাজ-সচেতনতার বিষয়টা বুঝতে পারা যায়। তিনি সচেতন ছিলেন বস্তিবাসী নিরক্ষর নিঃসন্তান মজুর-শ্রমিক এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব ও দারিদ্র্য সম্পর্কে। এই সব শ্রেণির সমাজ-জীবনে যে হৃদয়হীন অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে সে সম্পর্কে গল্পকার জীবনানন্দ যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিলেন, যেমন ছিলেন যৌনতা সম্পর্কে। তিনি জেনেছেন এবং লিখেছেন যে রাজনৈতিক এবং প্রগতিশীল জনহিতৈষী অর্থনীতির কল্যাণ-সত্তা দ্বারা বিশোধিত করতে হবে আজকালকার দিনের সমাজ ব্যবস্থাকে। এইসব সমাজ-সচেতন চিন্তাভাবনার অনুষঙ্গ হিসেবে ছোটোগল্পে এসেছে তা নয়, সরাসরি এসেছে। জীবনানন্দের যৌন-সচেতন ছোটোগল্পগুলির অবস্থান নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে, অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। দাম্পত্য জীবনের অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা, যৌনসুখ পাওয়া না পাওয়ার ব্যথা-বেদনা-যন্ত্রণা থেকে নির্মিত হয়েছে এইসব ছোটোগল্পগুলি। জীবনানন্দের কাছে যৌনতা হচ্ছে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সমঝোতা। সামাজিক ও পারিবারিক বাধ্যবাধকতার বন্ধন প্রেমের ও যৌনতার সাবলীল বিকাশের পরিপন্থী। এর ফলে প্রেম ও অপ্রেমের দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে জন্ম নেয় যৌনবোধে সুস্থতা ও অসুস্থতা। এটা হচ্ছে জীবনের একটা মস্তবড়ো দিক বা বাঁক। জীবনকে নিয়ে ব্যবসা নয়, অর্থ-মহিমার তুলাদন্ডের ওজন নয়। জীবনকে নিয়েই জীবন। জীবনের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়ভোগী মানুষের পরিচয় পাই তাঁর ছোটোগল্পে যৌনতার আলো-আঁধারে। যৌনতা যেমন বিত্তশালীদের কাছে বিলাস এবং কামনা-লালসার অন্তর্গত পাঠ্যসূচি এবং দামি পণ্য, ঠিক সেরকম অবিত্তশালী পরিবারের কাছে অস্থির যৌনতা হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের ক্ষতিকারক হাতিয়ার এবং দাম্পত্য জীবনের গতিশীলতার ও অগতিশীলতার টানা-পোড়েন বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত। দাম্পত্য-জীবনের যৌনতার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। প্রেমই যৌনতাকে সঞ্চালন করে, পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় বা ঘটাতে পারে। যৌনতার সঙ্গে নিরাপদ ও বিধিবদ্ধ দেহ-ক্রিয়ায় একটা নিকট সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। জীবনানন্দের অধিকাংশ ছোটোগল্পে যৌনতা অবাধে এবং অপ্রয়োজনে প্রবেশ করেনি। গল্পের প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে। এমন অনেক যৌনসচেতন ছোটোগল্প আছে যা ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত অনুভূতিতে নিবিড় ও গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যৌনবোধকে।

জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিগত দাম্পত্য-জীবনের হতাশজনক, সাংসারিক নয়, শারীরিক প্রভাব পড়েছে তাঁর অধিকাংশ ছোটোগল্পে। এই বক্তব্য অনেকেই জীবনানন্দ সমালোচকেরা মান্য করেন, আমিও করি, একটু তফাতে থেকে। ছোটোগল্পগুলিকে প্রভাবিত করেছে সম্পূর্ণভাবে, এরকম মন্তব্যের দাবি আমি মানতে পারছি না। ব্যক্তিগত দাম্পত্য-জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি কজে লাগিয়েছেন নিজের মতো করে, কল্পনাকে সাথে রেখে। জীবনানন্দের জীবনী বলে, জীবনানন্দের স্ত্রী ভালোমন্দের উপযুক্ত স্ত্রী হয়ে উঠতে পারেননি। লাবণ্য দেবী (স্ত্রী) যতটা গৃহিণী ছিলেন ততটা সহমর্মিনী হয়ে উঠতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারোডি করে বলা যায়, জীবনানন্দের কাছে লাবণ্যদেবীর পরিচয়, 'নহো বধূ, নহো প্রেমিকা, নহো সহচরী, নহো সহধর্মী, নহো প্রেরণাদাত্রী।' এর ফলে জীবনানন্দের জীবনচর্যায় শান্তিও ছিল না, আনন্দও ছিল না। দাম্পত্য জীবনের যৌন জীবন থেকে তিনি প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিলেন, বিশেষ করে উত্তরকালে। যৌনজীবন তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, বেদনায় যন্ত্রণায় ভাসিয়েছে।

তাঁর অধিকাংশ ছোটোগল্প লেখা হয়েছে ত্রিশের দশকে। প্রাপ্ত ছোটোগল্পের সংখ্যা ১০৭টি এখনও পর্যন্ত। সে সময় জীবনানন্দের বয়েস ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। যৌনবোধের ও যৌনযন্ত্রণার তীব্র দাপাদাপির বয়েস। বিয়ের আগে বরিশালে তাঁর জীবনে ব্যক্তিগত প্রেমের অভিজ্ঞতা ছিল, ব্যর্থতা ছিল। তিনি ডায়েরির পাতায় লিখেছেন : A rural girl beloved who might flavour my life with love : Y wakes that but is far from that, She might be that but she is not that. এই Y-এর উল্লেখ তার ডায়রিতে অনেকবার পাওয়া যায়। মেয়েটিকে তিনি Y দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। পুরো নাম লেখেননি। মনে হতে পারে যমুনা বা যূথিকা হয়তো। বহুবিধ নারী কামনায় তাঁর রুচি ছিল না, আস্থা ছিল না, তাঁর ছোটোগল্পে বারবনিতার মুখ্য ভূমিকা নেই। অথচ তাঁর মধ্যে সৃষ্টিশীল অফুরন্ত প্রেম ছিল। দেহ থেকে সেই প্রেমের তীব্রতা ক্রমে ক্রমে সরে এসেছিল। স্ত্রীর তুলনায় তিনি যে দেখতে সুন্দর ছিলেন না, এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। প্রকৃতি-প্রেম তাঁকে তীব্র আকর্ষণে টেনে নিয়েছিল। তিনি প্রকৃতির বাসিন্দা হয়ে পড়েছিলেন। সেই জগতটা হচ্ছে নির্জনতার। যৌনতা ও প্রকৃতি-প্রেমের যৌথতা লক্ষ্য করা যায় তার কিছু ছোটোগল্পে। তার ফলে গদ্যে-পদ্যে নারী কখনও হয়ে উঠেছে প্রকৃতি, প্রকৃতি কখনও হয়ে উঠেছে নারী। নারী এবং প্রকৃতি জীবনানন্দের মনোজগতে রাতদিনের আলো-আঁধার প্রতিম হয়ে উঠেছে তাঁর অধিকাংশ ছোটোগল্পে এবং পদ্যে। ফলত লালসা-মুক্ত ও রিরংসা-মুক্ত যৌনচেতনাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন, এমনও ছোটোগল্প তাঁর লেখা আছে। এসব জীবনানন্দের 'মুডে'র ওপর নির্ভর করে। তিনি লিখেছেন : আমার মনে হয় বিভিন্ন রকম বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানাসময়ে নানারকম 'মুডস' খেলা করে। সেসব মুডগুলোর প্রভাবে মানুষ কখনও মৃত্যুকেই বধূঁ বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়। অপরের হতাশার ভেতরেই বীণার তার বাঁধবার ভরসা পায়।

নানাসময়ে নানারকম 'মুড' জীবনানন্দের যৌন সচেতন ছোটোগল্পে লক্ষ্য করা যায়। জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে একবার লিখেছিলেন 'মানুষের নানা Mood-এর প্রভাবে তার

প্রাণে সুখের আগুন লাগে। সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়'। জীবনানন্দের প্রেমজ ও দেহজ ছোটোগল্পে সেই আগুন সবখানে ছেঁয়ে আছে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, 'Mood-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভিতরে এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে তাতে serenity (স্বচ্ছতা) অনেক সময়েই থাকে না, কিন্তু তাই বলে তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন, বুঝতে পারছি না।' জীবনানন্দের অনেক গল্পে যেমন সুরের আগুন আছে, আবার serenityও আছে। জীবনানন্দের আলো আঁধারে প্রেম-অপ্রেমের সহবাস ঘটেছে। আলো-আঁধারের জীবনে এবং যৌনযন্ত্রণার দগ্ধ জীবনে তিনি প্রেমিকার চোখে বা স্ত্রীর চোখে ভালোবাসা খুঁজেছেন। হতাশার ভেতরেই বীণার তার বাঁধবার ভরসা পেতে চেয়েছেন। কালো সময়, সামাজিক পরিবর্তন, ব্যক্তিগত সাধুসংগ্রাম, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এরকম জটিল-কুটিল পথে এগোতে-এগোতে তিনি বুঝে নিতে চেষ্টা করেন মৃত্যু-প্রেম-অপ্রেম এবং যৌনতার বাস্তবতাকে। এর ফলে সমাজ ও জীবনের প্রবহমান নরনারীর মানসিক জটিলতা ও যৌনসচেতনতা ছোটোগল্পে স্বাভাবিকভাবে উঠে এসেছে, আবার কখনও কখনও মনস্তত্ত্বের আধারে উঠে এসেছে, পাঠকদের চিন্তাভাবনাকে বিপথে চালিত করবার জন্যে নয় বা যৌন-উত্তেজনার আগুন পোহাবার জন্যে নয়। শ্লীলতার সীমাকে অতিক্রম না করে তাঁর লেখা যৌন-সচেতন ছোটোগল্পে 'ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীরে'-এর ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু অশ্লীলতার স্থূলতা নেই। বস্তুনিষ্ঠা ও গভীর সামাজিক চেতনা অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে, জীবনানন্দের ভাবনা-চিন্তার প্রথম থেকেই প্রবল, প্রাক ত্রিশের দশক থেকেই। সমাজ, জীবন ও আধুনিক সভ্যতার নানান অবক্ষয়ে কবির আহত কণ্ঠ বলে ওঠো : 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন; মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে।' ফলে প্রেম ও যৌনতার মাধ্যমে গতিশীল জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা জানান তিনি, গল্পকার জীবনানন্দ প্রেমকে এবং জীবনযন্ত্রণাকে নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন বলেই প্রেমিক পুরুষের এবং গৃহজীবনে আবদ্ধ স্বামীদের যৌনতার নিবিড় বেদনা ও সূক্ষ্ম অনুভবগুলি দেখাতে পেরেছেন। কল্লোলগোষ্ঠীর অসংযমী ভাবাবেগ ও উদ্দামতা, সম্ভোগ-লালসা ও প্রেমের দেহার্তি গল্পকার জীবনানন্দের কলমে ছিল না। ছিল না ভাঙাচোরা অবক্ষয় শাসিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসন ও প্রতিবন্ধ সাহিত্য-তত্ত্বের কালোপ্রভাব ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন কৃত্রিমতার কূটতর্ক। জীবনানন্দের যৌনসচেতন ছোটোগল্পগুলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে শুনতে পাবো জীবনানন্দের কণ্ঠস্বর :

> ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়;
> তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে; মানুষের মন
> জানে জীবনের মানে; সকলের ভালো করে জীবন যাপন।

গল্পসূত্র

জীবনানন্দের সুপরিচিত ছোটোগল্প 'মেয়েমানুষ'-এ যে দুটি চরিত্র কাছাকাছি দেখা যায়, সে দুটি চরিত্র হচ্ছে চপলা এবং দ্বিজেন। সুশ্রী, বয়স চল্লিশের কাছে, নিঃসন্তান চপলা হেমেনের স্ত্রী এবং সুপুরুষ, সুচতুর দ্বিজেন লীলার স্বামী। হেমেন খাস্তগীর দ্বিতীয় শ্রেণির

ব্যবসায়ী, থাকে দক্ষিণ কলকাতায়। চেহারা কুৎসিত। লীলার চোখে হেমেনের চেহারা, টেকো মাথা-বোঁদা চেহারা-বুড়ো আঙুলের মতো নাক-ট্যাবা ট্যাবা মুখ-মুখ নাক টেবু টেবু-প্যাঁট প্যাঁট চোখ। জীবনানন্দের এই ঘরোয়া ভাষা ব্যবহার এখানে লক্ষণীয়। উনপঞ্চাশ বয়সি হেমেনের আফসোস তার স্ত্রী ছাড়া অন্য সুন্দরী মেয়েমানুষে আসক্তি থাকলেও জোটে না। সেজন্য হেমেনকে বেশ্যাসঙ্গ করতে হয়। 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছুঁড়িদেরকে এনে বায়স্কোপ দেখিয়ে ভাবতাম সব স্বাদ মিটল বুঝি।' হেমেনের বিপরীত চেহারা দ্বিজেনের। হেমেনের কথায়, 'তোমার সুন্দর চেহারা আছে। আমি আমার গুডউইল দিতে রাজি, তোমার চেহারা যদি পাই। তুমি তো বরাবরই মেয়ে পটকে এসেছ বিলেতে, ইন্ডিয়ায়। বড়োলোকের ছেলে, নিজে রোজগার করেছ, তার ওপর এমন চেহারাখানা।' তাহলে দ্বিজেনের, যে বনেদিয়ানায় বিস্তৃত উত্তর কলকাতার বাসিন্দা, মেয়েমানুষ ধরার সাথে একটা যৌন সম্পর্ক আছে, হেমেনের কথাবার্তায় সেটা এখানে স্পষ্ট। গল্প বলে দিচ্ছে, হেমেনের স্ত্রী চপলার সাথে দ্বিজেনের যৌনসম্পর্ক। হেমেন জানে, বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি বন্ধুর বৈধ ভালোবাসা যে নয়, সেটা এই গোপনিয়তার মধ্যে স্ফুট। দ্বিজেনকে যখন হেমেন বললে, 'দ্বিজু চলো আমরা টালিগঞ্জ, আলিপুর, চেতলা, বেহালা বেড়িয়ে আসি।' দ্বিজেন উত্তর দিয়েছিল, 'ফিরতে যে অনেক রাত হয়ে যাবে।' হেমেন বেশ জোর দিয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করেছিল, 'হোক'। দ্বিজেন 'হোক' এই উচ্চারিত শব্দটিকে পাশ কাটিয়ে বলে, 'তুমি যাও; আজ আমার দরকার আছে।' হেমেন একাই গেল, নিঃসঙ্গতার বেদনা নিয়ে। তারপরেই অনন্য জীবনানন্দ লিখছেন : আতার বিচির মতো অন্ধকার রাতে, টিপ্ টিপ্ ঝড়ে-পড়া বৃষ্টির রাতে, এই সময় বধূর মমতা ও ভালোবাসায় তার সমস্ত মনটা ভরে উঠল। যে বধূর মমতা ও ভালোবাসায় হেমেনের মনটা ভরে উঠেছিল সেই রাতে, সেই বধূর নাম চপলা, হেমেনের স্ত্রী। আর সেই রাতে দ্বিজেন বিশেষ দরকারের জন্য হেমেনের সঙ্গী হতে পারেনি, সেই দরকারটি হচ্ছে লুকিয়ে চপলার বাড়ি যাওয়া। জীবনানন্দ যৌনসম্পর্কটা গভীর ব্যঞ্জনায় ও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, দ্বিজেন বুঝে নিয়েছে যে রাত বারোটার আগে হেমেন ফিরবে না। দ্বিজেন সেই রাতে হেমেনের তেতলায় উঠে দেখল চপলা খাটে গড়াচ্ছে। চপলার চর্বিঠাসা বিরাট মেদাল শরীরটা দেখে প্রথমটা দ্বিজেনের মন কেমন কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তবুও ওই মেদের নীচে রয়েছে নমনীয় এক সুন্দর হৃদয়। মেয়েমানুষের রক্তমাংস এবং হৃদয়, যৌনতা এবং ভালোবাসা, সব মিলেমিশে একাত্ম হয়ে এক গভীর জীবনবোধে, পাঠককে পৌঁছে দিয়েছেন জীবনানন্দ। 'মেয়েমানুষ' তিনি শেষ করেছেন এইভাবে : 'কিন্তু তবুও তারপর (দ্বিজেনকে) বেরিয়ে যেতে হয়। গিন্নিরাও চায় যে তাদের স্বামী আসুক—এ অতিথি বেরিয়ে যাক, বেরিয়ে যাক। বেরিয়ে সে গেলই।'

চাবুকের মতো দুটো শব্দ 'গিন্নি' এবং 'অতিথি' এখানে জীবনানন্দ ব্যবহার করেছেন চপলা এবং দ্বিজেনের পরিবর্তে। অবক্ষয়ের শরীরে irony-র প্রচণ্ড কষাঘাত। আর তখনি ভেসে আসে জীবনানন্দ-লিখিত 'রাত্রি' কবিতা : 'নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়/লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।/তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,/বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।' Morbidity এবং Sex-obsession জীবনানন্দের ছোটোগল্পে এক

অন্যতম ব্যঞ্জনা বহন করে। দ্বিজেন এবং হেমেন Sex-obsession-এর জগতের অধিবাসী। জীবনানন্দের সমালোচকেরা মনে করেন, জীবনানন্দের বিবাহিত জীবনে কোনোরকম বোঝাপড়া ছিল না, ফলত দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। তাঁর অধিকাংশ ছোটোগল্প নিজের মতো করে না-পাওয়া যৌনযন্ত্রণার ফসল।

পরিবারকে সমৃদ্ধ করে দাম্পত্য জীবনের বোঝাপড়া এবং সুখ। এই সুখ এবং বোঝাপড়া একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতাবোধকে জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। অহংকার মুক্ত শরীরের দেয়া-নেয়া এবং ভালোবাসা ছাড়া শুধুমাত্র যান্ত্রিকতার পরিকাঠামোয় স্বামীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা একটা লোক-দেখানো সুখময় পরিবেশ তৈরি করে মাত্র, অন্তরটা ফাঁপা। এরকমই একটি ছোটোগল্প 'হিসেবনিকেশ'। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পঞ্চাশের অবনীশকে Sex-obsession ঘিরে থাকে। বন্ধু রাখাল বুঝতে পারে অবনীশ এবং অবনীশের স্ত্রী অমলাকে, ওদের মধ্যে রাখাঢাকা চমৎকার একটা বিচ্ছিন্নতা আছে। ভালোবাসা কোথায় আছে রাখাল জানে না। অমলা ঘরে থাকে না। সিনেমা দেখে বেড়ায় নিউএম্পায়ারে। রাতে ঘরে ফেরে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের অপ্রেমটাকে বেশ কৌশলের সঙ্গে ঢেকে রাখতে পারে অমলা। ওদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে। একদা গরিব ঘরের ছেলে অবনীশ আর্থিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, পরিশ্রম ও চরিত্রের জোরে, দুবার বিলেত ঘুরে এসে, প্রচুর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করে, বালিগঞ্জে বাড়ি করে এখন পঞ্চাশের অবনীশ Sex-obsession-এ ভুগছে। এই বয়সেও সে এখন সুন্দর। মেয়ে মানুষ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু কোথাও যৌন-অপপ্রয়োগের লক্ষণ নেই, স্পষ্টতা নেই। হাহাকার আছে, যৌনকাতরতা আছে যৌনতার জন্য, ভালোবাসার জন্য। আসলে যাদের মনে সৌন্দর্যবোধ নেই, জীবন-সংস্কৃতি যারা গড়ে নিতে পারে না, অন্য মেয়েদের প্রতি যাদের ছুঁকছুকানি-ঘুরঘুরানি তাদের ঘরে ধূর্ত বন্ধুরা ঢুকে অসুখী দাম্পত্য জীবনের সুযোগ নিতে ওত পেতে থাকে, উজ্জ্বল উদাহরণ দ্বিজেন ও রাখাল। এই গল্পের রাখাল, অবনীশের খুবই কাছের বন্ধু, ভাবে, 'এরপর থেকে অমলাকে অবসর মতো একটু-আধটু দেখবে সে—তা নাহলে মৃত্যু অব্দি এমন একাদশী করে মরবে মেয়েটা?'

'প্রণয় প্রেমের ভার' ছোটোগল্পটিতে যৌনচেতনার প্রবাহ অত্যন্ত সংযত ও সংবেদনশীল। হেমলতা এবং সুবোধ স্বামী-স্ত্রী। সুবোধ লেখক, হেমলতা গৃহবধু। ওদের বিবাহিত জীবনের ভালোবাসার ও যৌনতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে এই ছোটোগল্পটি। চেতনা প্রবাহের গল্প। সুবোধ ভাবছে ভালোবাসার অবস্থান নিয়ে। যেমন,

(১) বাস্তবিক জীবনে কোনো ভালোবাসা নেই। পরের ভালোবাসার গল্প শুধু আঘাত দিতে আসে।

(২) পৃথিবীর প্রেমের গল্পগুলোর কথা ভাবছিল সে, সব এখন ইন্দ্রিয়াতীত অলৌকিক দেশের বলে মনে হয়, আমাদের রক্তমাংসের জগতের থেকে যেন ঢের দূরে—তবুও নাকি রক্তমাংসেই পৃথিবীর সঙ্গেই অত্যন্ত সাধারণ সুলভ হয়ে মিলে রয়েছে।

(৩) প্রেমকে তো-তারা বাদ দিতে পারে না, রচনার ভিতর জীবনকে তো প্রতিফলিত করতে হবে।

প্রেম-ভালোবাসাময় রক্তমাংসের শরীরের কথা ভাবতে ভাবতে সুবোধের নজরে আসে কামনার একটি দৃশ্য। পাশের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়ে সুবোধ দেখছে বুড়ো কেরানি শঙ্করবাবু তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর সাথে মসকরা করছে কোলের ওপর বসিয়ে। এই 'মসকরা'কে জীবনানন্দ ব্যাখ্যা করেছেন, 'বিশ্রম্ভ আলাপ ও পরস্পরের গায়ে ঈষৎ অশ্লীল কামনাজাত আদর।' জীবনানন্দ এখানেই থেমেছেন। 'অশ্লীল কামনাজাত আদর', কি রকম হতে পারে পাঠকেরা তা জানে বলেই নিখুঁত বর্ণনার প্রয়োজন বোধ করেননি। শিল্পের ভাষা হচ্ছে ব্যঞ্জনার ভাষা, ইঙ্গিতময়তার ভাষা, সংযমের ভাষা। বস্তুত যৌনতার ভাষাও হবে ব্যঞ্জনার ভাষা, যেমন এই গল্পে আরেক স্থানে গল্পকার লিখেছেন, 'ছেলেটি কলেজের লম্বা ছুটিতে বাড়িতে এসে প্রথম রাতেই জ্যোৎস্না-মাখা শয্যায় স্ত্রীর সঙ্গে যে কত কি আবেগের বিরাট বিচিত্র হাট পেতে বসেছে সে সব অসহ্য রোমহর্ষ উগ্রমদের মতো মনে হল সুবোধের।' এখানে 'অসহ্য রোমহর্ষ উগ্রমদের' আরেকটু বর্ণনা দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি পরিমিতিশীলতার কথা ভেবে প্রয়োজনবোধ করেননি। বলিষ্ঠ গল্পকারদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে পরিমিতিবোধ, সংযমবোধ, চলচ্চিত্র-সম্পাদনার মতো একটি সদর্থক সম্পাদনা। আবেগকে-অপ্রাসঙ্গিত চিন্তাভাবনাকে সংযত রাখতে হয়।

এমনিতে গল্পের নায়ক সুবোধ বই-কাগজ-অফিস ও নিজের কাজকর্ম নিয়েই থাকে। কিন্তু মাঝে-মাঝে সে জানোয়ারের মতো দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। এরপর আর সবিস্তারে যৌনবর্ণনায় যাননি গল্পকার। এ কথা থেকে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে সুবোধের মধ্যেও Sex-obsession কাজ করে। সুবোধ ইংরেজি এবং জার্মানি প্রেমের এবং যৌনতার উপন্যাস পড়তে-পড়তে অবদমিত যৌন প্রবহমানতাকে রোধ করে। আর সুবোধের বিশ বছরের স্ত্রীর জীবনে প্রেম এবং যৌনতা ফুরিয়ে গেছে। সুবোধের কাছে হেমলতা এখন, বাজে খাওয়া তালগাছের মতো সমস্ত শরীরের বিরস কঠিন একটি দণ্ড বিশেষ। ফলত সুবোধ হেমলতার মধ্যে প্রেমিকাকে পায় না, পেয়েছে জীবনের রূপরসের প্রতি স্পৃহাহীন জড়পিন্ড এক বাঙালি রমণীকে। 'প্রণয় প্রেমের ভার' এই ছোটোগল্পটিতে যৌন আতিশয্যের অনেক সুযোগ ছিল। জীবনানন্দ সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি। অনেকে ভাবতে পারেন ব্রাহ্ম-রক্ষণশীলতা তাঁকে প্রভাবিত করেছে। আমরা তা মনে করি না, কারণ জীবনানন্দের ভাবনা-চিন্তা-দার্শনিকতার পাঠ নিলে বুঝতে পারা যাবে তার মধ্যে আছে প্রগতিশীল-রুচিশীল আধুনিক মনোভাব। তাঁর গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তার নিজস্ব ঘরানার শৈল্পিক ভাষার যথার্থ প্রয়োগে। এখানেই তাঁর স্বসত্তার আধুনিকতা।

'মেয়েমানুষের রক্তমাংস' একটি যৌন-মনস্তাত্ত্বিক ছোটোগল্প। অন্তঃসলিলা নদীর মতো যৌনপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে অজিত এবং লীলার ভাবনাচিন্তা ও কথাবার্তার মধ্যে। কখনও শরীরী ভাষায় তা প্রকাশ পায়। 'মেয়েমানুষের রক্তমাংস' এই নামকরণটির মধ্যে লুকিয়ে আছে নরনারীর জৈবিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব-সংঘাত। দাম্পত্য শিহরণ, ফরাসি রিয়ালিজম ও অশ্লীলতা, সাহেব-পাড়ার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেম, আনাতোল ফ্রাঁসের মাদার অব পালখানা, অভদ্র অশ্লীল জটিল উপন্যাস, আখখুটে মেয়েছেলে ইত্যাদি এসব শব্দগুচ্ছ একটা যৌন-আবহ তৈরি করেছে এই ছোটোগল্পে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। এখন দাম্পত্য

জীবনের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়, এখন সেটা দাঁড়িয়েছে পুরুষমানুষ ও মেয়েমানুষের জৈবিক সম্পর্কে। একবিংশ শতাব্দীর এই সম্পর্কের কথা ত্রিশের দশকেই কাটাছেঁড়া করে দেখিয়েছেন ক্রান্তদর্শী জীবনানন্দ, এই গল্পে এবং আরও অনেক গল্পে। ত্রিশের দশকের এই ছোটোগল্পটিতে একবিংশ শতাব্দীর দাম্পত্য জীবনের কথা আরও বলেছেন : পৃথিবীর প্রায় স্বামীরই যে আজন্ম ভরেও তাদের স্ত্রীর শরীরের ওপর বিন্দুমাত্র অধিকারও থাকে না। দাম্পত্যের আনন্দ স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়-মনের নিরবচ্ছিন্ন, উত্তর প্রত্যুত্তরের চমক দিয়ে নয়, দেহকে নিয়ে অনেকখানি। দেহের অবাধ, অগাধ আদানপ্রদান নিয়ে অনেকখানি। সংযমে ও পরিমিতি-বোধে তন্ময়-নিষ্ঠ জীবনানন্দ যৌনতাকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাননি। নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল এই গল্পে। এই গল্পে তৃতীয় কোনো পুরুষ নেই, নারী নেই। শরীরের কোমলতা-শীতলতা-উষ্ণতা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের ও শরীরের প্রয়োজন নিয়ে কথাবার্তা এবং দুজনে পুনরায় দেহের কাছে, প্রেমের কাছে ফিরে আসা, এটাই দাম্পত্য জীবনের সুস্থতার চরম উৎকর্ষতা। দাম্পত্য জীবনের সুখ প্রেমে এবং যৌনতায়, শুধুমাত্র স্বামীর প্রতি সংসারের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতায় নয়। জীবনানন্দের অধিকাংশ দাম্পত্য জীবনের গল্পে স্ত্রীর অবুঝ আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, যৌন-নিঃস্পৃহতার ফলে দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা ও বেদনার কাহিনি প্রসারিত। সেদিক থেকে এই ছোটোগল্পটি ব্যতিক্রম এবং বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক।

একঘেয়ে জীবন থেকে, দাম্পত্য জীবনের নিরামিষ প্রেম-প্রণয় থেকে, ক্লাবের একঘেয়ে আনন্দ থেকে মুক্তি চায় উত্তর পঞ্চাশের দুই বড়ো ব্যবসাদার ভাদুড়ি এবং সমরেশ। 'একঘেয়ে জীবন' ছোটোগল্পটির মূলকথা এটাই ভাবা যেতে পারে। তবে এই মুক্তি ওদের নিয়ে যেতে চায় মানুষের কাছে নয়, প্রকৃতির কাছে নয়, ঈশ্বরের কাছে নয়, ভ্রমণে-গানে-সংস্কৃতির জগতেও নয়, নিয়ে যেতে চায় যৌন ক্ষুধার আঁধার জগতে, বিশেষ করে ভাদুড়িকে। এটাই বোধহয় ধনী ব্যবসায়ীদের সংস্কৃতি। ধন্যবাদ জীবনানন্দ, এ রকম একটি ছোটোগল্পের জন্য। ভাদুড়ির কোম্পানির টাইপিস্ট মিস হ্যানবারি, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছুঁড়িটাকে নিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা করে ভাদুড়ির। ভাদুড়ির কথায় 'আমার এক-এক সময় মনে হয় সব ফেলে দিয়ে ওকে নিয়ে সটকে পড়ি।' কিন্তু দাম্পত্য জীবনের দায়বদ্ধতার জন্যে ভাদুড়ির মনের এই বিকৃত ক্ষুধা মনের ভিতরেই থেকে যায়। আর এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় বিকৃত বা অবদমিত যৌনক্ষুধা সম্পর্কে জীবনানন্দের ভাবনাচিন্তার ইতিবাচক মনোভাব। জীবনানন্দের ইতিবাচক মনোভাবটি ভাদুড়ি মশাই প্রকাশ করেছেন এইভাবে, 'কিন্তু তারপর মনে হয়, ধ্যেৎ সেই বাইশ-পঁচিশ-ছাব্বিশ-সাতাশ-আঠাশ-ত্রিশ বছর থেকে জীবনের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এমন কত সুন্দর মেয়েমানুষই তো দেখলাম। সুযোগ তো কম পেলাম না, কিন্তু তবুও সর্বসম্মত ধর্মনীতি সচ্চরিত্রতার পথেই তা নিজেকে দেখে এসেছি। পথটাকে বিপথ বলে বুঝে এসেছি। হয়তো দুটোই পথ। কিন্তু তবুও মনের এ সংস্কার ছাড়াতে পারিনি।'

'ছায়ানট' ছোটোগল্পটি নারীপুরুষের প্রেম ও যৌনতার সহ-অবস্থান নিয়ে একটি সাধারণ দুর্বল ছোটোগল্প। যৌনাশ্রিত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই

কাহিনির দুই পুরুষ ও এক নারীর মধ্যে, চিরাচরিত ত্রিভুজ প্রেমের একটি খণ্ডচিত্র। নায়ক এখানে কথক। নায়ক তার নিজের বাড়িতে কুনিমাসি ও তার মেয়ে রেবাকে থাকতে দিয়েছে। আর আছে রেবার পরিচিত এক ছোকরা ডাক্তার। রেবা কখনও নায়কের মাথা টিপে দেয়, আবার কখনও ডাক্তারকে চুমো খায়। নায়ক চুমু খাওয়ার শব্দ শোনে। সেসময় রেবার প্রেম-যৌনতার সততা নিয়ে নায়েকর মনে চিন্তা-ভাবনার টানাপোড়েন চলতে থাকে। জীবনানন্দ দেখিয়েছেন, আশ্রিতা ও বাড়ির মালিকের সম্পর্কের মধ্যে যৌনতার ভূমিকা। বাড়ির মালিকের যৌন আকাঙ্ক্ষার সাধ আহ্লাদ রেবাকে মেটাতে হয়, তার ভেতর যে একটা অস্ফুট আর্থিক ও অনটনের হাতছানি আছে, সেটা জীবনানন্দের ভাষায় এভাবে এসেছে : 'আমার হাত দুটো তার হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে সে আমার বুকের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে,—যে অক্ষয় নির্ভর নিয়ে মেয়ে বাসি-মড়া বাপের বুক জুড়ে থাকতে পারে, এ জিনিসও তাই...অন্য কিছু নয়।' এই গল্পে যৌনতার অসংযমী বিস্তৃতি নেই। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট উদাহরণ : দরজা জানালা বন্ধ। বিছানায় শুয়েছিলাম। রেবা মাথা টিপছিল। এই অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে যৌনচেতনার সব উপাদানই আছে বিশেষ করে যখন লেখা হয় 'দরজা জানালা বন্ধ'। যৌনকল্পনাটাই যৌনতার নান্দনিকতা। খোলামেলা। সম্পূর্ণ শারীরিক বর্ণনাটা যৌনউত্তেজনার খোরাক জোগায়। সেটা সাহিত্যে স্থূলতার পরিচায়ক এবং অপপ্রয়োগ। এই গল্পের মূল সত্যটা যৌনতা বা প্রেমের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নয়, জীবনবোধে ধরা পড়েছে গল্পকারের ঝকঝকে একটি গভীর মন্তব্য : 'বুকের ভিতর যে ক্ষুধা জমে তা সহজে মরতে চায় না।' এখানে তিন জনের বুকের ক্ষুধা তিন রকমের—(১) রেবার ক্ষুধা বেঁচে থাকা, (২) নায়কের ক্ষুধা যৌনতা, (৩) ডাক্তারের ক্ষুধা প্রেম এবং যৌনতা।

'গ্রাম ও শহরের গল্প' লেখা হয়েছিল ১৯৩৬-এ। সেসময় (ত্রিশের দশক) কালি-কলম ও কল্লোলের লেখকেরা ক্লেদাক্ত ও যৌনজীবনের অন্ধকার দিকটা বেছে নিয়েছিলেন এবং একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইউরোপিয় সংস্কৃতির প্রভাবে। এইসব কল্লোলিয় লেখকেরা জীবন-পৃথিবীর পাঠশালা থেকে শিক্ষা লাভ করেননি, ইউরোপীয় ও আমেরিকান পাঠশালা থেকে গল্প-কবিতা-উপন্যাস শিক্ষালাভ করেছিলেন, প্রেরণা পেয়েছিলেন, জীবন থেকে নয়। আর ইংরেজির অধ্যাপক ধীর-স্থির জীবনানন্দ উভয় পাঠশালা থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। বাস্তব জীবন থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর লেখায় তিনি বঙ্গ-সংস্কৃতির আবহ তৈরি করতে পেরেছিলেন নিজস্ব অনুভবে এবং চিন্তাভাবনায়। গল্পের বিষয়ে তিনি নিয়ে এলেন মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের কৃত্রিম জীবনের চিন্তাভাবনা এবং কার্যকলাপ। সেখানে যৌনতাও এসে যায় সম্পূর্ণ বিষয় না-হয়েও যেমন এই 'গ্রাম ও শহরের গল্পটি' গল্পের শচী, প্রকাশ এবং সোমেন সেইরকম তিনটি চরিত্র। একদা শচী যখন গ্রামে থাকত তখন সে ভালোবাসত গ্রামের ছেলে সোমেনকে। তারপর শচী বিয়ের পর প্রকাশের স্ত্রী হয়ে চলে আসে শহরে। একদা কৈশোর উত্তীর্ণ শচী এবং সোমেন গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশে শরীরী স্পর্শে যৌনচেতনার প্রবাহে শরীর ভাসিয়ে দিয়েছিল। তারপর অনেক বছর কেটে যায়। বারো-

চোদ্দ বছর পর আবার যখন শচীর সাথে সোমেনের দেখা হয় প্রকাশের ড্রয়িংরুমে; তখন শচী বিত্তশালী স্বামী প্রকাশের স্ত্রী। এ সময় গ্রামের মেয়ে শচীকে দেখে সোমেনের মনে হয়েছে meretricious (চাকচিক্য, কিন্তু নগণ্য) এবং দুর্মূল্য harlot (বেশ্যা)। তারপর কোনো এক দুপুরে অতীতের যৌনআকাঙ্ক্ষার টানে পুনরায় মিলিত হতে পারেনি শচী এবং সোমেন। অথচ উভয়ের মধ্যে যৌনমিলনের টানটান আকাঙ্ক্ষা ছিল। জীবনানন্দ এই মুহূর্তটাকে উজ্জ্বল রেখায় স্বাতী-নক্ষত্র করে তুলেছেন, 'আজকের দুপুরের জন্যে অন্তত শচী সেই শচী হয়ে গেছে। আজকে সে শচীকে পুরোপুরি নিজের যে-কোনো প্রয়োজনে লাগাতে পারে—শচী সে জন্যে প্রস্তুত, ব্যাকুল। কিন্তু সোমেন শচীর ড্রয়িংরুমে আর এক মুহূর্তের জন্যেও টিকে থাকতে পারছে না। একটা হ্যাভেনা নিয়ে এক মুহূর্তের ভেতরেই রাস্তায় উঠল গিয়ে।' যে শচী সোমেন সম্পর্কে ভেবে এসেছে যে সোমেন জীবনকে অশ্লীলভাবে দেখে, শচীর সে ধারণা পালটে যায়। এবার শচী বুঝতে পারে, সোমেন চায় জীবন। অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে, মূল্যবোধের সপক্ষে জীবনানন্দের উজ্জ্বল জীবন-দর্শন। এই ছোটোগল্পটিতে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া আছে। সেটা জানা যায় জীবনানন্দের ডায়রি পড়ে, তিনি লিখেছেন : Y : What of her? ...No letter nothing...I can imagine her in romantic setting : kissing and kind. এই Y নামক মেয়েটি জীবনানন্দের খুড়তুতো বোন বুলুর বান্ধবী। গল্পে এই Y হচ্ছে গ্রামের মেয়ে শচী। কারণ জীবনানন্দের একটি উপন্যাসের মলাটে তাঁর নিজের হাতে লেখা আছে Y শচী।

জীবনানন্দের 'বিলাস' একটি অসাধারণ ছোটোগল্প। গল্পের নায়ক শান্তিশেখরকে ঘিরে হয়ে উঠেছে একটি মনস্তাত্ত্বিক ছোটোগল্প। উপাখ্যানে এসেছে সর্বেন ঘোষ, স্কুল জীবন থেকে শান্তিশেখরের বন্ধু। সর্বেন ঘোষ যৌনতার পরিবেশে থাকতে ভালোবাসে, শান্তিশেখরের বিপরীত চরিত্র। সর্বেন ঘোষের যৌনসঙ্গিনী সুস্মিতা একদিন রাত নটায় শান্তিশেখরের অফিস ঘরে আসে। সেসময় শান্তিশেখর সাংবাদিকতার কাজে প্রুফ দেখায় মগ্ন ছিল। শান্তিশেখর ভেবে পায় না সুস্মিতা কেন আসে, বিপত্নীক শান্তিশেখরকে ভালোবাসতে, নাকি যৌনতা বিক্রির প্রয়োজনে। সুস্মিতা শান্তিশেখরের বুকে হাত রাখে, হাতটা সেখানেই থাকে। নিজের হৃদয়ের দিকে সেই হাতটা এগোতে দেয় না শান্তিশেখর। রাত এগারোটার আগেই সর্বেন ঘোষের মোটর গাড়ি চলে যাওয়ায় শান্তিশেখর সুস্মিতাকে ট্যাক্সি ডেকে তুলে দেয়। সুস্মিতা পাঁচ টাকা শান্তিশেখরের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। শান্তিশেখর দেয়। অফিসে ফিরে এসে ভাবে, সর্বেন ঘোষের কাছ থেকে এই পাঁচ টাকা আদায় করে নিতে হবে। মার্কসবাদ-পড়ুয়া শান্তিশেখরের যৌনাদর্শ তার ভাবনার মধ্যে স্পষ্ট : ছ্যাকরা গাড়ির পক্ষীরাজের জীবন তো আমাদের—ধর্মের ষাঁড়ের জীবন তো নয়; নানা মেয়ের মুখ চেয়ে চলতে হলে ষাঁড়ের মতো শরীর চাই, ধর্মের ট্যাঁকের মতো টাকা; সেই সব নেই আমাদের, ঘানিগাছে ঘুরে আমাদের শরীর গেছে—টাকা মনিবরা খাচ্ছে। গৃহিণীর খোঁজ পাই প্রেমে নয়—যৌনতার পথে মিলনে-টিলনে—কালে ভদ্রে। বিলাস যৌনতার বিষয় নিয়ে নয়। জীবনের বিলাস কারা ভোগ করে এবং কিভাবে করে তাদের নিয়ে গল্প। যদিও 'বিলাস' নিয়ে সর্বেন ঘোষের একটি আইরোনিক্যাল মন্তব্য

আছে। তার মতে, 'বিলাস মানে খুব সম্ভব বিষয়-আশয়ের মায়া কাটিয়ে ন্যালা-ভোলা জিনিস নিয়ে ভোম্ হয়ে থাকা। কাম-অর্থ-ক্ষমতা, লোলুপতা-দম্ভ-ঘৃণা, রিরংসা-যৌনতা—এই সব নিয়ে উঁচু মধ্যবিত্ত সমাজের কথাচিত্র। এইসব কথাচিত্রের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে বিপত্নীক শান্তিশেখরের একাকিত্বের যন্ত্রণা।

'সাত কোশের পথ' অন্য আঙ্গিকে লেখা একটি স্বতন্ত্রধর্মী ছোটোগল্প। প্রবোধের জীবনে তিনটি নারীর তিনরকম মানসিকতার অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই তিন নারী হচ্ছে উর্মিলা, উষা এবং মালতী। উর্মিলাকে প্রবোধ বিয়ে করেছে। উর্মিলাকে পেয়ে দাম্পত্যজীবন তার সুখের। বিয়ের বছর দুই আগে প্রবোধ যাকে ভালোবাসত সেই উষা প্রবোধের ঘর-সংসারে বিয়ের পরেও আসে। আর আছে একজন। সেই নারী প্রবোধের কৈশোরের প্রণয়িনী, নাম মালতীলতা। গেঁয়ো স্বামী ও চারটি সন্তান নিয়ে সে গ্রামে থাকে এখনও। গল্পকার মালতী সম্পর্কে লিখছেন, 'এমন সুন্দরী, অথচ এত সুলভ, বরাবরই মালতী খুব সুপ্রাপ্য ছিল। অনেকদিন পর সেই মালতী সাত ক্রোশের পথ পেরিয়ে এসেছে প্রবোধের বিবাহিত জীবনের সংসারে বেড়াতে। এমন দিনে এসেছে যেদিন প্রবোধের বাড়ির সবাই নিমন্ত্রণ খেতে গেছে গাঙ্গুলিদের বাড়ি। বাড়িতে প্রবোধ একা। তারপর জীবনানন্দ একটি শিল্পিত যৌন পরিবেশ তৈরি করেছেন : প্রবোধকে মালতী পেয়ে বসেছে, এই মেয়েটির হাত থেকে কিছুতেই প্রবোধ নিজেকে ছাড়াতে পারছে না। তারপর মেয়েমানুষ যখন অন্ধকারে ব্যাঘ্র হয়ে পড়ে, প্রবোধ পালিয়ে গেল, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। সমস্ত পৃথিবীর রূপ-কে এ মেয়েটি যেন কাদাকৃমি করে দিয়েছে। মেয়ে মানুষের সৌন্দর্য এরপর থেকে বিস্ময় ও কল্পনার প্রয়াসের জিনিস, কিছু নয় যেন। যেন স্তরে স্তরে তার পাক চেপে আছে।...

আট-নয় বছর আগে বিবেকহীন করুণ রৌদ্রের উলঙ্গ আগুনে দগ্ধ না-হয়ে যাওয়া মালতীর যৌনক্ষুধা যেরকম ছিল, আট-নয় বছর পরেও একইরকম আছে, তা বুঝতে পেরে প্রবোধ বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। প্রবোধের পালানোর চিত্রকল্পটি এরকম : গোধূলির আবছায়ায় লক্ষ্মী পাখির শিশিরাক্ত ডানা দেখে মেঠো ইঁদুর যেমন ধানের সোনার শিষ ছেড়ে পালায় তেমনি (প্রবোধকে) পালিয়ে যেতে হল। এই অসাধারণ চিত্রকল্পটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের।

'ভালোবাসার সাধ' ছোটোগল্পে অন্তর্গত নদীর মতো সারা গল্পে ছড়িয়ে আছে যৌনতার প্রবাহ। এই গল্পের বলার ভঙ্গিটি অন্যরকম। গল্পের বক্তা তার বাবা-কাকার কথা বলছেন। বিপত্নীক কাকা তারানাথ। বয়স চল্লিশ। ঝি-এর প্রতি তার আসক্তি, নারী-লালসার প্রয়োজনে। বাবা-কাকার কথাবার্তা থেকে সেটা বুঝতে পারা যায়। 'অন্ধকারের ভিতর কাকা ধীরে ধীরে বাবার গায়ে হাত রেখে—'আমাকে মাপ করুন। চাকর উঠিয়ে দিয়ে আমি যে-ঝিটাকে রাখতে বলেছিলুম, সেই মূর্খতাকে আপনি ক্ষমা করুন'।

—তুমি যে বলেছিলে ঝি-টা খুব কাজের।

—জানি না। কিন্তু তাকে দেখে মনের ভিতর কেমন একটা আস্বাদ জন্মেছিল।

—আসক্তি?

—হ্যাঁ, সাধ মেটেনি, মিটবে না কোনোদিন, যে কামনা পরিতৃপ্ত হয়নি, হবে না, সেটাকে কোথায় ছুঁড়ে ফেলব আমি।—বলতে বলতে কাকা থেমে গেলেন। পরে এই কাকা বক্তার বাবার কাছে স্বীকার করেছেন যে নারী-লালসা বড় বিশ্রি জিনিস, বড় যন্ত্রণা দেয় মানুষকে। তারপরেও কাকা ঝি সম্পর্কে দাদাকে বলছে, 'মেয়েটি বাইশ-তেইশ বছর বয়স মাত্র। দেখতে বেশ সুস্থ এবং সুশ্রী'। এই কাকা এক বছর না পেরোতেই স্ত্রীর মৃত্যুর তিন-চার মাস পরেই কলকাতা থেকে একটি গোপন রোগ নিয়ে ফিরেছে। অতএব দাদার কথা মতো সে আর পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না।

সাংসারিক মানুষের কাছে যৌন লালসা যে কতটা বিষের তার মূলভাবনা 'ভালবাসার সাধ' ছোটোগল্পটির মধ্যে রেখে গেছেন গল্পকার জীবনানন্দ দাশ। কোথাও যৌনচিত্রের প্রদর্শনী নেই, যৌনউত্তেজনার বর্ণনা নেই, ভাষা নেই। সামাজিক সমস্যার মধ্যে তিনি অবদমিত যৌনতাকে নিয়ে এসেছেন। শুধু আছে বিপত্নীক সৎ দাদার কাছে ছোটোভাইয়ের নারী লালসার পাপবোধের স্বীকৃতি, যেন খ্রিস্টান-কনফেশন। এর পরবর্তী জেনারেশন কাকার ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুশোচনা, যৌনঅনুপ্রেরণা নয়।

'বাসনার দেশ' যথার্থ এই ছোটোগল্পটিতে গল্প-শিল্পী জীবনানন্দ দাশ এক চাকুরিজীবী পুরুষের মধ্যে যৌনবাসনা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বাসনার এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ছবিটা স্পষ্ট করেছেন। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যৌনতা এবং প্রকৃতিকে অস্বীকার করা যায় না। এর মধ্যে স্বাভাবিকতা আছে এবং দ্বন্দ্বও আছে। নায়ক বক্তা বলছেন, 'সেই সব নারী আবছায়া, আমার জীবনে এই সমস্তই মিলে রয়েছে'। মানুষের জীবনের চিন্তা এবং অপচিন্তার ছটফটানির টানাপোড়েন এই গল্পটিকে স্পর্শ করেছে। গল্পের বক্তা নারীজগৎ থেকে সরে এসে কোনো এক সন্ধ্যায় মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তখন সে ভাবে, 'কার্তিকের বিকেলে আমাকে একটা নিঃসঙ্গ শালিখ করে দাও।... সেই শালিখের হৃদয়ের ভিতর আমাকে মানুষের মনন ও স্বপ্ন দাও।' চেতনার স্রোতে ভাসছে গল্পের কথক। ভাবছে, 'তাকিয়ে দেখলুম জীবনের নানারকম বিবর্ণ মাংসখোর ঘুরছে ফিরছে, ঘুরছে—তাদের হাসি-তামাশা কথাবার্তা কোনোদিন ফুরোবে না।' এ সময় জীবনানন্দ মালতী নামে এক যুবতিকে নিয়ে এলেন এই ছোটোগল্পে, 'বাসনার দেশ'-এ। নদীর কিনার দিয়ে মেঠোপথে উত্তমপুরুষটির মুখোমুখি দাঁড় করালেন সেই নারীকে, মালতীকে। এই নারী ক্রমশ গল্পের বক্তার কাছে প্রকৃতি-কন্যা হয়ে ওঠে। মালতীর সুঠাম, দীর্ঘ গড়ন, চমৎকার জমাট খোঁপা, সুন্দর কালো মুখশ্রী বক্তাকে যৌন-আকর্ষণে টেনে নিতে পারেনি, বক্তার মনে হয়েছে, এই নারী প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, বক্তার ভাবনায় উঠে এসেছে : 'তারপর মালতী পশ্চিম সীমানার অন্ধকারের ভিতর মিলিয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখিনি কোনোদিন। চারিদিকে ঘাসের দেশ, ধানের দেশ।...হৈম শালিখপুরের দিকে নরম নদী, মেঘের রাজ্য ও কঙ্কাল পাহাড়ের দেশে। কুয়াশা আক্রান্ত চিল রাজকন্যার মতো গভীর ডানার বিকাশে রজনী।' এরপর অন্ধকার কতবার এল গেল, কিন্তু কথক আর কোনোদিন প্রকৃতিকন্যা মালতীকে দেখেনি।

'বেশি বয়সের ভালবাসা' ছোটোগল্পে ভালোবাসা ও যৌনতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের বিতর্কিত ধারণা বুঝতে পারা যায় আভার মেজদা সুহৃদের বলার ভেতর দিয়ে :

'ভালোবাসা বলে কোনো জিনিস নেই, ছোটোবেলা নির্বুদ্ধিতা বেশি, সেক্স এট্রাকশন কম, বয়স হলে এটা উলটে যায়, কিন্তু তবুও ভালোবাসা নামেই এ জিনিসটাকে আমরা চালাই। আমাদের এ ভুল ধারণা যে অল্প বয়সের ভালোবাসাই গাঢ়, যত বয়স বাড়ে, ভালোবাসা তত জমে। বেশি বয়সের ভালোবাসার ভিতর সন্দেহ-শ্লেষ-ঠাট্টা-বৈদগ্ধ-ক্ষুধা-লাম্পট্য-উপেক্ষা-আক্রোশ-ঘৃণা সবই থাকে। এ সবের সমবায়ে ভালোবাসা নামে যে জিনিস হৃদয়ের ভেতর উদিত হয় তা প্রাণকে এমন নিবিড়ভাবে অভিভূত করে রাখে, জীবন যেন তখন আর কিছু চায় না।' এই ছোটোগল্পটি আভা এবং আভার মেজদা সুহৃদকে নিয়ে। আভা বিদ্যালয়-শিক্ষক, কবি আভার প্রেমে পড়েছিল পনেরোতে। চারবার ভালোবেসেছিল। শেষ ভালোবাসা বাইশ বছর বয়সে, টেকেনি। বোনের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে সুহৃদ এই মন্তব্য করে, 'ভালবাসা বলে কিছু নেই'। আভার ব্যর্থ প্রেম নিয়ে ভাইবোনের কথাবার্তা এবং কথোপকথন। এবং পুনরায় বেশি বয়সের আভার জন্য প্রেমের ফাঁদ তৈরি করা। এই ফাঁদ তৈরি করেছে মেজদা সুহৃদ। আভা জানে না। সুহৃদ বলেছে ওর এক বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার। তাকে সুহৃদ আভার কথা বলেছে। সে এক সন্ধ্যায় আভাকে দেখতে আসবে। আভা খুশি। সে ভাবছে এবার সে আর ব্যর্থ হবে না। জীবনানন্দ এরপর এই বেদনাদায়ক ছোটোগল্পটি শেষ করছেন এইভাবে : 'সুহৃদ জানে আভাকে নিয়ে বিধাতার মতো সেও আজ একটু খেলল, ড্রয়িং রুম গোছানো হবে, সন্ধ্যা উৎরে যাবে, রাত হবে, মেয়েটি ছটফট করবে, কিন্তু তবুও আভার জীবনে কোনো রাজকুমার মন্ত্রীকুমার কোটালকুমারও নেই, ইনজিনিয়ার নেই, কী আছে? অনেক অলিগলি দিয়ে হয়তো আরও গল্প লিখে কবিতা লিখে, ফ্লার্ট করে একজন বুড়ো মাস্টার হয়ে মরতে হবে আভাকে, একজন বুড়ো মাস্টার হয়ে মরতে হবে সুহৃদকে।'

তাদের জীবনে আর কোনো জাদু নেই। গল্পের যবনিকা অসাধারণ। উচ্চবিত্ত পরিবারের নাগরিক জীবনের নাটক নিয়ে মূলত ভালোবাসার যন্ত্রণার একটি অসাধারণ মন-চিত্র।

'প্রণয়ী-প্রণয়িনী' ছোটোগল্পে কিভাবে পরস্ত্রীকে প্রণয়ের নামে যৌন-উপভোগের নিচুতলায় নামিয়ে আনা যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা করেও অবিবাহিত রমেশ তা পারেনি। শশধরের স্ত্রী বিরজা রমেশের বাল্য বান্ধবী। রমেশ প্রতি সন্ধ্যা কাটিয়ে যায় বিরজার বাড়িতে এসে। ওর সাথে রমেশের কথাবার্তা হয়, তর্ক-বিতর্ক হয়। ওদের কথাবার্তা ও তর্ক-বিতর্কের বিষয় সতীত্ব-প্রেম-ভালোবাসা-দেহসম্ভোগ এবং বিরজার বুড়ো স্বামী। বিরজাকে উত্তেজিত করে, বিরজা উত্তেজিত হয় না। বিরজার স্বামী শশধরের লগ্নির কারবার। সেজন্য শশধরকে রাত করে বাড়ি ফিরতে হয়। একদিন শশধর রাতের অন্ধকারে ঘরে ঢুকে বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়ে দেখে রমেশ ও বিরজা বসে আছে। গল্প করছে। শশধর কিন্তু রমেশকে ঘর থেকে বার করে দেয়নি। বরং রমেশকে সামাজিক উপদেশ দিয়েছে, তারই সারাংশ : 'শোনো ছোকরা, তুমি মনে করছো পরের স্ত্রী খেলার জিনিস। তুমি কি ভেবেছ আমার স্ত্রী এতো সস্তা! বিরজা ন্যায়ত আমার পত্নী। তাকে নিয়ে আমি যা খুশি তাই করতে পারি—সেই অধিকার ধর্মত ন্যায়ত আমার আছে। অন্যের স্ত্রীব

কাছে তো আমি যাই না। এই পঞ্চাশ বছর বয়স হল। একদিনের জন্যেও পরের স্ত্রীর ওপর এক মুহূর্তের জন্য এক বিন্দুও লোভ করিনি। কিনতু তোমরা এডুকেটেড, তোমাদের দশরকম কাজ আছে, এসব তোমাদের মানায় না; এতে শিক্ষা-দীক্ষারও গ্লানি হয়—শেষে মানুষের কোনো শ্রদ্ধা থাকে না এডুকেশনের ওপর। আজকালকার মেয়েরাও আগেকার মতো নেই। সতীত্ব আছে বটে, কিন্তু এ সতীত্ব কি সেই সতীত্বের মতো? সেই সতীত্বের তেজ কোথায়? সেই তেজ আর নেই। কালে-কালে সত্যি মিইয়ে যায়। রাগ কোরো না রমেশ, তোমাদের মতো এডুকেটেড লোকের কথায় আমার বিশ্বাস নেই; যত এডুকেশন পাবে তত বদ মতলব! এটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল রমেশ, সেই পাড়াগাঁয়ের দিনে বাল্যে যৌবনে যাই হোক না, যত পিরিতই থাকুক না কেন, তোমাদের বিরজা এখন পরের স্ত্রী। তবে এখনকার ছেলেদের এই পরের স্ত্রী নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করবার সাধটা তো গেল না; ও সাধটা যায়ও না, আরও বেশি বাড়ে। তাই যদি তোমার মতলব, তো পাড়াগাঁ ছেড়ে কলকাতা—এ ভালো জায়গায় এসেছ, শিকার এখানেই মেলে।'

এটি শশধরের নীতিবাগিশদের মতো একটানা সামাজিক বক্তৃতা নয়, বিভিন্ন পর্যায়ের সংলাপের সারসংক্ষেপ। তৎকালীন (ত্রিশের দশক) সমাজ-জীবন ঘেঁটে ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন শশধরের মুখ থেকে যথার্থ কথাগুলি বেরিয়ে এসেছে, যা এখনও একবিংশ শতাব্দীতেও তারা ধারাবাহিকতা অপরিবর্তনশীল। কিন্তু শেষপর্যন্ত এডুকেটেড রমেশ প্রণয়ের আধুনিক ব্যাখ্যায় (যেখানে যৌনউপভোগ লুকিয়ে আছে) তার প্রিয় বাল্যবান্ধবী বিরজাকে (রমেশের চেয়ে বয়সে বড়ো) টলাতে না পেরে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে বিরজাকে বলে, 'সন্তানের স্নেহও তুমি বুঝলে না। জীবনে কি আছে তোমার? সাত বছর ধরে রাতের পর রাত একটা সত্তর বছরের বুড়োর সঙ্গে সন্তান জন্মাবার ব্যর্থ চেষ্টা আছে শুধু।' সত্তর বছরের বুড়ো একটা হেরে যাওয়া আক্রোশ থেকে বলা সত্ত্বেও রমেশের বক্রোক্তি বিরজাকে টলাতে পারেনি। দাম্পত্য জীবনের যৌনতার ব্যবহারকে ক্রান্তদর্শী গল্পকার জীবনানন্দ নষ্ট হতে দেননি। ওখানেই তিনি গল্পটির সমাপ্তি রেখা টেনে দিয়েছেন।

'হেমন্তের দিনগুলো' ছোটোগল্পে অভাবি সংসারের টানাপোড়েন এবং অসিত ও সীতার দাম্পত্য-জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে। সীতার প্রসবকালীন মৃত্যু আছে। কিন্তু যৌনচেতনার কোনো সংযুক্তি নেই। তবে গল্পের শেষে জীবনানন্দ 'সঙ্গম' কথাটা ব্যবহার করেছেন এইভাবে, 'রমেশের বাড়ির ভাড়াটেদের একটি বাজে স্ত্রীলোকের সঙ্গে অসিতের বেশ জমে উঠল। সুযোগ পেলেই বিধবাটি অসিতের কাছে আসত। এ কোনো মিলন নয়—সঙ্গম নয়—আলাপ পরিচয়ও নয়। অদ্ভুত এই খেলা—এর কোনো বিষময় পরিণতিও নয়।' এখানেই গল্প শেষ। 'এই খেলা...' —এটাই শেষ বাক্য। এটাই জীবনানন্দের গল্পলেখার স্বতন্ত্রতা, হঠাৎ ছোটোগল্পটাকে চরম জায়গায় এনে ছেড়ে দেওয়া। বেঁচে থাকার লড়াই দেখাতে-দেখাতে হঠাৎ বাজে মেয়ের প্রসঙ্গ এনে গল্প শেষ করে দেওয়া। অসিতের স্ত্রীহীন-পুত্রহীন ফাঁকা জায়গাটাকে ভরিয়ে দেওয়া। একি বিধবার প্রতি ভালোবাসা, নাকি বিধবার প্রতি যৌন-আকাঙ্ক্ষা, প্রশ্ন থেকে যায়।

অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও সন্দেহ নিয়ে আলোচনা আছে 'কল্পজিনিসের জনম ও যৌবন' ছোটোগল্পে, যথা, (১) মানুষের জীবনের ও ভিতরের কথাগুলো অবৈধ রহস্যের কুয়াশার

ঢাকা, কখনও কুশ্রী, কখনও অমৃতের মতো অপরূপ। (২) প্রেম মানে দাম্পত্য প্রণয় নয়, নিত্য নতুন নারী নিয়ে বিচিত্রতা। (৩) স্বামী তার স্ত্রীটিকে সন্দেহ করে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, পরস্পরের মধ্যে না আছে ভালোবাসা, না আছে মনের মিল। এসব ঘটে দাম্পত্য জীবনে নারীরা যখন মনে করে তার নরম শরীরটা তার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পুরুষেরা যখন মনে করে তার বৃত্তি-মেধা-পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত অর্থ তার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সেখানে ভালোবাসা থাকে না, দেহে ও প্রেমে স্বার্থপরতা এসে যায়। আর তখনই চলে আসে এবং মনে চাপ সৃষ্টি করে যৌনযন্ত্রণা বা বিকৃত যৌনক্ষুধা, হতাশা থেকে। এইসব কারণে গল্পে অমূল্য এবং সুষমাকে রানি বলে : আমরা যা চাই, ভালোবাসতে গিয়ে আমরা যা আকাঙ্ক্ষা করি সেই কল্পজিনিসের জন্ম ও যৌবন আমাদের নিজের মনের ভিতরেই, সাংসারিক জগতে তা মৃত ও নিঃশেষিত। বা অবলা ঠাকরুন অমূল্যকে যখন বলেন, তর্ক আমি করতে পারব না ভাই অমূল্য, তর্কের মানুষ আমি নই। আমি বুঝি শুধু প্রেম-বিচ্ছেদের আনন্দ ও বেদনার আন্তরিকতাটুকু।

জীবনানন্দ দাশের অসাধারণ একটি ছোটোগল্প, 'করুণার পথ ধরে'। একদিকে মৃতসন্তানদের পিতা অবিনাশ, অন্যদিকে প্রাক্তন প্রেমিকা অমলাকে ঘিরে অবিনাশের জীবনের কামনা-বাসনা-প্রেম-ভালোবাসা। একদিকে মৃতসন্তানের জন্ম দিতে মৃতপ্রায় অবিনাশের স্ত্রী, অন্যদিকে অবিনাশের প্রণয়িনী অমলা, যে এখন বড়ো ঘরের সুখী গৃহবধূ। একদিকে স্বদেশি সাবানের দোকানে কাজ করতে-করতে শুয়োর বনে যাওয়া অবিনাশ, অন্যদিকে অমলার শরীরের প্রেমের কথা ভাবতে-ভাবতে প্রেমিক এবং কামুক হয়ে ওঠা অবিনাশ। এইসব দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতার ভিতর দিয়ে অবিনাশের অস্তিত্ব, অবিনাশের চিন্তা-ভাবনা এবং সঙ্কট। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বিংশ শতাব্দীর ধাবমান চরিত্র এই অবিনাশ। জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি চিন্তাভাবনার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অবিনাশের বেঁচে থাকার এবং যৌন যন্ত্রণার দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এই ছোটোগল্পটি থেকে তুলে আনা কয়েকটি বাঙ্ময় চিত্রকল্প : (১) হৃদয়ে কামনা ও বেদনার কোনো কুজ্ঝটিকার জন্ম হল যেন (২) দিনের সমস্ত কাজ ফুরিয়ে গেলে অবিনাশ প্রেমের কবিতা পড়ে, প্রণয়ের গল্প পড়ে (৩) নক্ষত্রের রূপোলি আগুনে আকাশভরা গাঁয়ের মৃত রূপসীরা হিজলের জলে।...ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে তার প্রণয়িনীর ডাক এক মোহময় সেতু রচনা করবে। (৪). রক্তের ভিতর কামনার রক্তিম প্রেম। (৫) পৃথিবীর অশ্লীল আঘাত মানুষকে স্থিরতা দেয় না। (৬) কাপড় কাচা সাবানের কারবার খুলে অবিনাশ ঘোষাল শুয়ার হয়ে গেল। বুনো শুয়ারও নয়, চামারের পোষ্য শুয়ার, সারা গায়ে কাদা, সারা দেহে খিদে।

এখানে অবিনাশ স্বদেশি সাবানের দোকানের কর্মচারী, কাজ করতে-করতে সে এখন শুয়ারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। শুয়ার এবং অবিনাশ প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে ফ্রানৎজ কাফকার বিখ্যাত ছোটোগল্প 'মেটামরফোসিস'-এর কথা। সেখানে গল্পটির বিষয়ে আছে, গ্রেগরি কাজ করতে-করতে পোকা হয়ে যায়। জীবনানন্দ জ. ১৮৯৯ এবং কাফকা জ. ১৮৮৩ দুজনেই এই দুইটি ছোটোগল্প লিখেছেন ত্রিশ/আটত্রিশ বয়সে। কাফকা লিখেছেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। জীবনানন্দ লিখেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। দুটি

মহাযুদ্ধের সামাজিক ফসল পৃথিবী বিখ্যাত দুটি ছোটোগল্প। বিষয়ের বিস্তৃতি ভিন্ন, ব্যবহার-প্রকল্প আলাদা। একদিন পৃথিবীর পথে চলতে গিয়ে দু-একজন নারীর সংস্পর্শে এসে হৃদয়ের ভিতর যৌনতার গাঢ়তা জন্মেছিল অবিনাশের। অবিনাশ বুঝতে পেরেও প্রতিবাদ করে বা ঠাট্টা করে এই স্বাভাবিক হৃদয়জাত বিমর্ষ সত্যকে উড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়। প্রাক্তন প্রণয়িনী অমলা দুঃসাধ্য মেহগিনি কাঠের মতো সুন্দর আশ্চর্য পুরুষ মানুষকে (অমলার স্বামীকে) অনেক দিন পর খুঁজে পেয়েছে, অবিনাশকে ভুলে গেছে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা নিজের স্ত্রীকে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় অবিনাশ দেখে। তার শরীর হিম, তার শরীরের রং মুমূর্ষু কার্তিকের ঘাসের মতো হলুদ। তার দেহ মাংসের নয়, হাড়ের নয়। কৃষ্ণচূড়া গাছের ক্ষীণপ্রাণ শাখা আজ আছে, কাল থাকবে না। জীবনানন্দের অনেক ছোটোগল্পের মতো এই ছোটোগল্পটিতেও অবদমিত যৌনতা এবং ভালোবাসার অবস্থানকে শিল্পিত রূপে দেখতে পাওয়া যায়, করুণার পথ ধরেই সেটা আসে।

জীবনানন্দ দাশের একটি ছোটোগল্প ১৯৯৮ সালে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় জীবনানন্দ একমাত্র এই ছোটোগল্পটি লিখেছিলেন। গল্পটির নাম 'সোমনাথ ও শ্রীমতী', গল্পের দুটি প্রধান চরিত্র। নামকরণ জীবনানন্দ দাশের নয় বলেই জানা যায়। নিম্নবিত্ত ঘরের স্বামী-স্ত্রী সোমনাথ ও শ্রীমতীর সামাজিক ও আর্থিক দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে এই গল্পে জীবনানন্দ 'প্রালেটারিয়েট' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এর আগে অনেক ছোটোগল্পে কথাপ্রসঙ্গে তিনি মার্কস-লেনিন-স্টালিন-দাস ক্যাপিটাল-কমিউনিস্ট এইসব মার্কসিয় শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। ত্রিশ/চল্লিশের দশকে মার্কসিয় আন্দোলন সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কংগ্রেসের কথাও গল্প প্রসঙ্গে এসেছে। তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল। অনেক কবিতাতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে 'সোমনাথ ও শ্রীমতী' গল্পটি রাজনৈতিক সচেতন গল্প বলা যায়। এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঁচার লড়াই-এর গল্প। অনুষঙ্গ হিসেবে যৌনতার ছায়াপাত ঘটেছে। শ্রীমতী বলছে, 'আমাদের কোনো জীবন নেই—ভঙ্গিও নেই। তবে টাকার দিকে আমি মন দিয়েছি। টাকা পাবার জন্য অনেক দূর পর্যন্ত যেতে রাজি আছি।' অবশ্যই যৌনতাকে ব্যবহার করে বা মূলধন করে। ফলত শ্রীমতীর কাছে যে পুরুষেরা আসে, তাদের নিষেধ করা যাবে না কারণ তারা নিজেরা ক্ষয় বুঝে সরে যায়, তাছাড়া এই অবক্ষয়ের শতাব্দীতে কিছুই ক্ষয় নয়। উপভোগ করার ছেঁড়া-ছেঁড়া নীল করবীর রক্তজবার রক্তাক্ত মানুষদের ইতিহাস। শ্রীমতীর ভিতর কিভাবে অবক্ষয় বাসা বাঁধল। শুধুই কি অভাব-অনটন, ভোগ-উপভোগ। এছাড়াও অন্য একটি মূল কারণ আছে। সোমনাথ ও শ্রীমতীদের রক্তে পারিবারিক যৌন-অবক্ষয়ের বীজ ঢুকে আছে। একটা অবৈধ যৌন-সম্পর্কের জনশ্রুতি আছে, সুরনাথের মায়ের সঙ্গে সোমনাথের বাবার এবং সোমনাথের মায়ের সঙ্গে সুরনাথের বাবার। সুরনাথ হচ্ছে সোমনাথের মাসতুতো ভাই। এই সুরনাথ, সোমনাথ ও শ্রীমতীকে নিয়েই অভাব অনটনের এবং যৌনমূলধনের গল্পটি নানা মত-মতান্তর ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে শেষ হয়েছে।

কথামুখের শেষ কথা

জীবনানন্দ দাশ একবার একজনকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ছেলেবেলা থেকে গল্প-উপন্যাস স্বদেশী ও বিদেশী নেহাৎ কম পড়িনি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচে নি'। বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি বড়ো আবিষ্কার ত্রিশের দশকে লেখা জীবনানন্দ দাশের কথা-সাহিত্য। পঞ্চাশের দশক থেকে এই আবিষ্কার-কর্মটি ঘটতে শুরু করেছে। জীবনানন্দের অপূর্ণ ইচ্ছা এবার পূর্ণ হয়েছে। এবার তিনি শুধুমাত্র কবি জীবনানন্দ দাশ নন, তিনি এখন একজন শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক। এখানে তার যৌনবোধ বা যৌনতা প্রভাবিত ছোটোগল্পের বিষয় ও নির্মাণ সম্পর্কে কিছু সার কথা বলা যায়।

(১) মূলত দাম্পত্য-জীবনের স্থিরতা ও অস্থিরতা নিয়েই জীবনানন্দ দাশের ছোটোগল্প নির্মাণ। অনেক ছোটোগল্পে স্থিরতা ও অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে এসেছে নারী ও যৌন প্রসঙ্গের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এসবের ভিতর দিয়ে যে দার্শনিক জীবনানন্দকে পাই, সেই জীবনানন্দ হচ্ছেন সুস্থির প্রকৃতি-প্রেমিক এবং মানবজীবন-প্রেমিক। হিংসা-বিদ্বেষ-প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-নাটুকেপনা-নিষ্ঠুরতা এবং উচ্চজাত্যের বিলাস, আভিজাত্যের বিলাস ইত্যাদির কড়া সমালোচক।

জীবনানন্দের অনেক ছোটোগল্পে নায়িকাদের অর্থনীতির প্রতি দাসত্ব এবং স্বামীর প্রভুত্ব লক্ষণীয় এবং সেখানেই যৌনতার উৎসমুখ অবস্থান করে। তাদেরই গল্প বলেছেন তিনি।

(২) সমাজের মূল্যবোধকে দাঙ্গা-মন্বন্তর-কালোবাজারি-চোরাই ব্যবসা-নারী ব্যবসা-পাশবিক বিশ্বযুদ্ধ-অভাব-অনটন-মুনাফার নির্দয় লোভ ভেঙে দিচ্ছে, ভেঙে দিচ্ছে মানব জীবনের সুস্থ-যৌনতার পরিবেশকে।

(৩) জীবনানন্দের বেশ কিছু ছোটোগল্পে আছে যৌনশীতল অসহিষ্ণু স্বার্থপর নববধূর কাহিনি। ফলে অবদমিত বাসনা থেকে স্বামীর পরকীয়া যৌনবোধ জন্ম নিচ্ছে।

(৪) জীবনানন্দ কিছু যৌনস্পর্শ-জাত শব্দ ব্যবহার করেছেন যা তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয় : সমুন্দির, বেহদ্দমাগি, ভাতার খাগি, সঙ্গম, মাগি-মিনসে, বাঞ্চোৎ ইত্যাদি।

(৫) দুঃসহ দাম্পত্যের চেয়ে বিবাহ-বিচ্ছিন্নতা ও বিবাহবন্ধন-মুক্তি অনেক শ্রেয়, প্রতিফলিত হয়েছে তার ছোটোগল্পে। যৌনজীবনে নারীর প্রত্যাখ্যান এবং নাটুকেপনা যৌন-অসুস্থতার মূলে অবস্থান করে।

(৬) জীবনানন্দ যেভাবে পরিণত দাম্পত্য জীবনকে দেখেছেন, সেটা এইরূপ : কালক্রমে মানুষের প্রেম-প্রণয়-যৌনবোধ ফিকে হয়ে যায়। তখন দিন-যাপনের গ্লানি দুঃসহ হয়। তবে ভদ্র-সংযত মানুষ দাম্পত্য জীবনের স্থিতাবস্থা মেনে নেয়।

(৭) জীবনানন্দের ছোটোগল্পে এমন অনেক নাগরিক চরিত্র আছে যারা বিদেশি নভেল পড়ে অবদমিত মনের যৌনসুখ পাবার চেষ্টা করে।

(৮) জীবনানন্দের প্রায় অধিকাংশ ছোটোগল্পের বিষয় প্রায় একই রকমের, অনেক সমালোচক তাই মনে করেন। যথা, বড়োলোকি বিলাস ও আভিজাত্য, ব্যবসায়ী এবং

কালোবাজারি, অর্থ লগ্নিকারি ও চোরাকারবারি, দাম্পত্যজীবনের তিক্ততা ও মাধুর্য, লালসা ভোগলিপ্সা, নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, গ্রাম্যজীবনের পরিবেশে দারিদ্র-অভাব-অনটন ইত্যাদি। এই বিষয় ধরে চরিত্রগুলো এভাবে এসেছে—বেকার যুবক, সংসারে অবহেলিত নারী-পুরুষ, কলেজের শিক্ষক, ভৃত্য ও পানবিড়ির দোকানদার, মায়ের দুর্দশা, দাম্পত্য জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, সাহিত্যিক-কবি-লেখক, চামড়ার ব্যবসাদার, জীবনানন্দের ব্যক্তি জীবনের পটভূমি, কাপড় কাচা সাবানের স্বদেশি কারবারি, সাধারণ কেরানি ইত্যাদি। এদের বেঁচে থাকা প্রেম নিয়ে, মায়ামমতা নিয়ে, অভাব-অনটন-সংসার নিয়ে, যৌনতা ও যৌনস্বপ্ন নিয়ে, অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস নিয়ে, আবার ভোগ-বিলাস ও নারীসঙ্গ নিয়ে।

(৯) এই নাগরিক সমাজের শত সংঘাত দীর্ণ জীবনযাপনের সংস্পর্শে এসে ভেঙে যাচ্ছে মুগ্ধতার দিন, খুঁজে পাই সমাজের ভিতরকার অন্তর্সংঘাত, অন্তঃসারশূন্যতা, বিত্তশালি মানুষের নষ্ট অভিপ্রায় এবং যৌনলালসা মানুষের ক্ষুদ্রতা-নীচতা-পরশ্রীকাতরতা। এভাবেই জীবনানন্দের ছোটোগল্পে চলে এসেছে ইতিহাস-চেতনা, অবক্ষয় এবং যৌনতা স্বাভাবিকভাবে, ত্রিশের দশকের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে যা এখনও প্রাসঙ্গিক।

কথামুখের শেষকথা শেষ করছি এই বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দাশের দুটি যথার্থ মন্তব্য দিয়ে : 'মানবমৈত্রীর পরিবর্তে জাতিবিদ্বেষ, দেশে দেশে সংঘর্ষ, নিরবচ্ছিন্ন রক্তান্ধকার, আধুনিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা, অশুদ্ধ ভাবনা ও বিমিশ্র বাসনার শূন্যতা ও নিষ্ফলতা আড়ষ্ট করে রেখেছে। পরের জিনিসে লোভ, নিঃসহায়কে নিংড়ানো, শোকাবহ স্বৈরাচার, বারবার যুদ্ধ, মন্বন্তর ও কালোবাজারের অন্ধ বিমূঢ়তা সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু তবুও এটা মানবসভ্যতার উষা কুয়াশা, গোটা ভবিষ্যৎ হয়তো মানুষের সম্মুখে—এ কথা ভেবে ও মানুষের মানবতা মাঝে-মাঝে স্তিমিত হওয়া সত্ত্বেও তা পুনরায় জ্যোতিষ্ক্রিয়। এই সত্য মনে রেখে আমরা মানুষের প্রতি আস্থা না হারিয়ে তার প্রকৃত প্রতিভা-সঙ্গত বাস্তব মর্মের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে থাকব।'

উপরের স্বমন্তব্য মাথায় রেখে, মানুষের প্রতি আস্থা না হারিয়ে যৌনতার সুস্থিরতাকেই পরোক্ষভাবে জীবনানন্দ তার যৌনসচেতন ছোটোগল্পে গ্রহণ করেছেন, ইতিবাচক জীবনচর্চার ক্ষতিকারক উপাদান হিসেবে।

'কল্লোল যুগে'র ছোটোগল্পকারদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত্রিশের দশক একটি গুরুত্বপূর্ণ দশক। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির মাঝখানের সময়টা ত্রিশের দশক। এই দশকেই সাইত্রিশ বছর বয়সে কবি মায়াকোভস্‌কি আত্মহত্যা করেন। লন্ডনে ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষণ দেন। কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রলয় শিখা' গ্রন্থের জন্যে কবি ছ'মাসের কারাদন্ডে দণ্ডিত হন। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়েছিল ইয়োরোপে 'New writing' আন্দোলন। ১৯৩৫, ২১ জুন শুরু হয়েছিল শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন। এর পরের বছরেই ফ্যাসিস্ট বাহিনি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিবাদী লেখক ফেদেরিকো লোরকাকে হত্যা করে। ১৯৩৬ সালেই নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ পাঠ করলেন 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র ২য় সম্মেলনে Bengali literature to-day; position of modern writers। 'ছিন্ন করো ছদ্মবেশ' প্রবন্ধ লিখে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ জানালেন সরোজ দত্ত। ত্রিশের দশকের শুরুর সামান্য আগে-পরে প্রকাশিত হয়েছিল কল্লোল (১৩৩০), কালি কলম (১৩৩৩), প্রগতি (১৩৩৪), শনিবারের চিঠি (১৩৩১), পরিচয় (১৯৩১), অগ্রণী (১৯৩৯),—এই সব পত্র-পত্রিকার ওপর ত্রিশের দশকের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল।

এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে কল্লোল যুগের ছোটোগল্পকারদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের চোখে কতখানি এবং কোন মাপের ছোটোগল্পকার হিসেবে গণ্য ছিলেন আজকের পাঠক বুঝতে পারবেন। এও বোঝা যাবে, 'কল্লোল যুগ' বলে কথিত সেই কল্লোল যুগের ছোটোগল্পকারদের সাহিত্যিক ভাবভঙ্গি কতটা কৃত্রিম এবং আন্তরিক। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের ছোটোগল্প পড়ে মন্তব্য করেছিলেন তারা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তাঁদের উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' ও 'দিবারাত্রির কাব্য' নিয়ে তিনি কিছু মন্তব্য করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে তারাশঙ্কর প্রথম দেখেছিলেন ১৯৩৩ সালে। সেদিন তারাশঙ্কর সমাজ-সেবক কর্মীর মুখপাত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সাথে কথা বলেছিলেন মাত্র। পরে ১৯৩৭ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'রাইকমল', 'ছলনাময়ী' ও 'জলসাঘর' নামে তিনটি গল্পগ্রন্থ সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পড়তে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'রাইকমল' গল্পের বইটি

পড়ে ১৯৩৭, ১০ ফেব্রুয়ারিতে তারাশঙ্করকে একটি চিঠি লিখে জানালেন, 'তোমার বইখানি পড়ে খুশি হয়েছি।...'রাইকমল' গল্পটির রচনায় রস আছে এবং জোর আছে। তাছাড়া এটি ষোলো আনা গল্প, এতে ভেজাল কিছু নেই। পাত্রদের ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেল সেটি গড়ে তোলা সহজ নয়।'

'রাইকমল' প্রথমে গল্পাকারে পরে উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরের চিঠিতে (১২/৩/৩৭) রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'তোমার ছোটোগল্পের কতকগুলি আমার ভালো লেগেছে, দু-একটা আছে কষ্টকল্পিত। তোমার স্থূলদৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানি না—কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্ম স্পর্শ আছে। তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়ে দেখা দেয়, তাতে বাস্তবের কোমর বাঁধা ভাণ নেই, গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন, তুমি যে তাদের দলে নাম লেখাওনি তাতে খুশি হয়েছি। লেখার অকৃত্রিমতাই সবচেয়ে দুরূহ।' তারাশঙ্কর তাঁর 'রসকলি' গল্পগ্রন্থটি কবিকে উৎসর্গ করেছিলেন। 'রসকলি' গল্পটি ছাপা হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায়। সেই উৎসর্গিত বইটির প্রাপ্তি স্বীকার করে এবং গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ২৯ মে, ১৯৩৮-এ, 'তোমার লেখা যতই পড়চি ততই বুঝছি তুমি একজন লিখিয়ে বটে, তাতে সন্দেহ নেই। যে সব চরিত্র এঁকেছ তারা সজীব হয়ে উঠেছে, তাদের নিয়ে যে খেলা খেলিয়েছ, মনের মধ্যে সে ছাপ দিয়ে যায়, রেশ রাখে।' তারাশঙ্করের গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য মন্তব্য, 'গল্প লেখায় তুমি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অগ্রণীদের মধ্যে' বেরিয়েছিল একটি চিঠিতে (২২.১০.৩৯)।

'কালি-কলম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকদের মধ্যে একজন ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পরে তিনি 'কল্লোল' পত্রিকায় অনেক ছোটোগল্প লিখেছিলেন। তবে তাঁর লেখার ধরন কল্লোলগোষ্ঠীর ছোটোগল্পকারদের চেয়ে আলাদা ছিল। সমাজের দারিদ্রকে তিনি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেননি। অভিজ্ঞতা এবং হৃদয় দিয়ে বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বলেছেন, 'শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু-কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা। সেইসঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতায় তাঁর বিষয়গুলো সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি। নবযুগের-সাহিত্যে নূতন একটা কান্ড করেছি জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তার দেখিনি। দরিদ্র নারায়ণের মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যেসব চিত্র দেখেছি, তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলার কারি-পাউডারি ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।' অথচ বুদ্ধদেব বসু শৈলজানন্দের গল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন : **'writes with instinct than intellect, without, I suspect, knowing or even intending the effect he is going to produce. There is nothing brilliant about him.'**

একবার বনফুল 'শনিবারের চিঠিতে' রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেটা পড়েছিলেন। বনফুলকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠান। তারপর থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাথে বনফুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বনফুল তাঁর

লেখা উপন্যাস এবং ছোটোগল্পের করডিয়াল কপি পৌঁছে দিতেন রবীন্দ্রনাথকে, কয়েকটা বই রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গিত বইটির নাম 'কিছুক্ষণ'। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন (১৯৩৮) 'তোমার 'কিছুক্ষণ' আমার নামে উৎসর্গ করবার ইচ্ছে করেছ...'। আটকে পড়া ট্রেনের যাত্রীদের বিচিত্র চরিত্র নিয়ে লেখা বনফুলের 'কিছুক্ষণ' দীর্ঘ গল্পটি। বনফুলের ছোটোগল্পের বই 'বৈতরণী তীরে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ মতামত জানান চিঠিতে (২৩.৯.৩৬), 'তোমার ছোটোগল্পগুলিও পড়ে দেখলুম কাঁচায় পাকায় মেশেল। বাছাই করার দরকার ছিল। 'টাইফয়েড' গল্পটি ভালো। যদি বাহুল্যের বেগ সামলিয়ে ছেকে দিতে পারতে তাহলে ভোজটা জমতো ভালোই। এরপর বনফুল রবীন্দ্রনাথকে পাঠালেন 'বনফুলের আরও গল্প' বইটি। রবীন্দ্রনাথ বনফুলের ছোটোগল্প পড়লেন। পড়ে চিঠিতে লিখলেন (১৯৩৯), 'তোমার এবারকার গল্পগুলো পড়ে কি মনে হল বলি। যেন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, হাটে যাবার মেঠো রাস্তায় যেতে-যেতে, যা তোমার চোখে পড়েছে, তোমার বইয়ে সেগুলোকে গেঁথে রেখেছ।...এরা আদরনীয় নয়, পর্যবেক্ষনীয়।' বনফুলের ছোটোগল্পে ও-হেনরি ও শেখভের প্রভাব আছে, রবীন্দ্রনাথ সেটা ধরতে পেরে বনফুলকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি ও-হেনরী কিংবা শেখভের গল্প পড়েছ? তোমার গল্প পড়লে ওদের গল্পের কথা মনে পড়ে।' রবীন্দ্রনাথ কোনো একটি পত্রিকায় বনফুলের 'মানুষের মন' গল্পটি পড়ে খুশি হয়েছিলেন। এই গল্পের মোটিভ হচ্ছে, সংকটের মুখে কেমন করে একজন সামাজিক মানুষ তার বহুদিনের বিশ্বাসের ওপর আর ভরসা রাখতে পারছে না, অসহায়ভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাকেই আঁকড়ে ধরে। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি পড়ে বনফুলকে বখশিস্ দিতে চেয়েছিলেন। বনফুলের ছোটোগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামতটি হচ্ছে, বর্তমান যুগ সাহিত্যের ওপরে বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে। আগাছা পরগাছা বনস্পতি সব কিছুতেই যে দৃষ্টি সে টানে সে কৌতূহলের দৃষ্টি। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে উপেক্ষিত অনতিগোচরের দিকে। তাতেও রস আছে, সে হচ্ছে কৌতূহলের রস। সাজ পরানো কনে দেখানোর মতো করে প্রকৃতিকে দেখাতে গেলে, ওই রসটি থেকে বঞ্চিত করা হয়। অতএব রবীন্দ্রনাথের মতামতানুসারে বনফুলের ছোটোগল্প দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায় এবং বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে আবৃত।

যে বুদ্ধদেব বসু সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'The age that had produced Tagore was long over', রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচক সেই বুদ্ধদেব বসু একটি চিঠিতে (৩০.১.৩৩) রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন, 'আমার কাছে আপনি দেবতার মতো। আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি।' বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যে স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সাথে বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিন পর্যন্ত ছিল। বুদ্ধদেব বসু নিজের লেখা বই রবীন্দ্রনাথকে নিয়মিত পাঠাতেন মতামতের জন্যে যেমন তিনি পাঠিয়েছিলেন 'বাসরঘর' নামে একটি ছোটোগল্পের বই। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে (২৫.১০.৩৫) মতামত লিখে পাঠালেন, 'গল্প হিসেবে তোমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ

কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বেগে বয়ে চলেছে।...চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু জটিলতা বিস্তার করবার অবসর পায়নি। তোমার গল্পের বিশেষত্ব এই যে যেখানে শেষ হল বই, গল্পটা রয়ে গেছে তার পরের দিকে। এই তোমার গল্প না-বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন দাঁড় করাতে পেরেছ তা তোমার কবিত্বের প্রভাবে।' রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর গল্পের কাঠামো নিয়ে বলেছেন মাত্র, বিষয়বস্তু নিয়ে নয়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাব নিয়ে একটি অপরিণত কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে বিষয় করে, 'সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর / আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো / যুগসূর্য ম্লান তাঁর কাছে...।' রবীন্দ্রনাথ ওই কবিতা পড়ে বা শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিলেন। পরে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন যে ওই কবিতা রবীন্দ্র-বিদ্রোহ নয়। কবিতাটি ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রণাম। অচিন্ত্যকুমারও তাঁর লেখা উপন্যাস, ছোটোগল্প ও কবিতার বই পাঠাতেন, সামান্য মতামত জানার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ছাপতে পারলে প্রচার হয়, বিক্রি হয়। গল্প বিষয়ে যে সব মতামত রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন অচিন্ত্যকুমারকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিঠির ভাষণ (আশ্বিন, ১৩৩৫), 'যাদের অল্পশক্তি তারাই রচনায় নূতনত্ব ঘটাতে চায় চোখ ভোলাবার জন্যে। কিন্তু যখন তোমার প্রতিভা আছে তখন তুমি চোখ ভোলাবে কেন, মন ভোলাবে। তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে-মনে তোমার প্রশংসা করেছি। সেই কারণে এই দুঃখবোধ করেছি কোনো-কোনো বিষয়ে তোমার অত্যন্ত পৌনঃপুণ্য আছে। বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুন প্রবৃত্তি। ...আমাদের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে এই প্রবৃত্তির উৎসুকতা অনেকের মধ্যে আজকাল দেখা যায়। তার প্রধান কারণ মানুষের জীবনক্ষেত্রের বিচিত্র ব্যাপারে তাদের ঔৎসুক্য নেই। সেই কারণেই এই এক নেশা নিয়েই তারা নিজেকে ভোলাতে চায়।...লালসার অতি বর্ণনায় আমরা মানুষের যে মূর্তি দেখি সেটা বীভৎস। এ রকম রোগ-বিকারের স্থান সাহিত্যে নয়। এটা ডাক্তার শাস্ত্রে শোভা পায়। তোমার বর্ণনীয় চরিত্রে মাটির সকল প্রকার সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের অনুরাগ তুমি উজ্জ্বল করে দেখাতে চেষ্টা করেছ। এটা ভালোই, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছে, এটা তুমি বিশেষ চেষ্টা করে করেছ।' এছাড়া অন্য একটা চিঠিতে (ভাদ্র, ১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অচিন্ত্যকুমারের গল্প বিষয়ে, 'বিদঘুটে জিনিস নিয়ে যদি কেরামতী দেখাতে পারি তবে তার জন্যে যে বাহবা সেও খুব ফাঁকির জিনিস হওয়ার আশঙ্কা অর্থাৎ বিষয়টা যাই হোক, রচনাটা সত্য হওয়া চাই। আন্তরিকতা যদি না থাকে, কেবল থাকে নূতনত্ব তবে মরণং ধ্রুবং।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পবিষয়ে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত এই শব্দগুলো 'মৈথুন প্রবৃত্তি, লালসা, ফাঁকির জিনিস, চোখ ভোলানো, রোগবিকার, বিদঘুটে বিষয়, আন্তরিকতাশূন্য' লক্ষণীয়, যার ধারাবাহিকতা এখনও চলছে প্রতিষ্ঠিত ছোটোগল্পকারদের হাতে।

১৯৩৫/৩৬ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানির পাবলিসিটি অফিসার ছিলেন। সেসময় তিনি একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের সাথে

তার কোনো পরিচয় বা সাক্ষাৎকার ঘটেনি। পরে একদিন রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ধুলিধূসর' নামে ছোটোগল্পের বইটি আসে। রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে একটি চিঠি লেখেন (১৯.৩.৩৯), 'তোমার 'ধুলিধূসর' বইটিতে তোমার লেখা কয়েকটি ছোটোগল্প পড়তে পাওয়া গেল। বইটির নামের ছাপে এই গল্পগুলির একটি সংজ্ঞা তুমি দিয়েছ। বোধহয় জানাতে চাও এর অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা এবং ঘটনা প্রাত্যহিক তুচ্ছ জীবনযাত্রার ধুলো পড়ে ম্লান। কিন্তু আমি মনে করি নে এ সংজ্ঞা তোমার গল্পগুলি সম্বন্ধে ঠিক খেটেছে। প্রথম গল্পটি পড়েই দেখা গেল, এ তো নেহাৎ পায়ে হাঁটা দাগ পড়া চলতি জীবনের কথা নয়।' প্রায় একমাস বাদেই রবীন্দ্রনাথ পুনরায় আরেকটি চিঠি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে (৮.৪.৩৯) লেখেন, 'ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার যে সব সুপ্রত্যক্ষ ছবি তোমার গল্পগুলিতে তুমি প্রকাশ করেছ তা পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। তোমার অস্খলিত গতি লেখনী রচনা শক্তির উচ্চপর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে সন্দেহ নেই।' দুটি মন্তব্যে তফাৎ আছে সন্দেহ নেই। ফলে যথার্থ সমালোচনা নয়। এসব ভালোলাগা মন্দলাগার পরিপ্রেক্ষিতে থাকে, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ। এসব মতামত 'চাওয়া হয় দেওয়া হয়' গোছের। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের সাথে প্রবোধকুমার সান্যালের প্রথম যোগাযোগ ঘটে চিঠির মাধ্যমে। প্রবোধকুমার সান্যাল 'মহাপ্রস্থানের পথে' উপন্যাস লিখে দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশংসাপত্র চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন (৭.৯.৩৬), 'সম্প্রতি বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই বাহির হইবে। অনেক দিন হইতে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছি, কয়েক ছত্র লেখা আদায় করিয়া লইব। পত্রের উত্তর না পাওয়া অবধি পুস্তক প্রকাশ বন্ধ রাখিব।' রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন এবং একটি সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ প্রবোধ সান্যালের ছোটোগল্প নিয়ে সামান্য আলোচনা করেন 'রোমান্স প্রসঙ্গ' নামক একটি লেখায়, বিশেষ জায়গায়। রবীন্দ্রনাথের 'রোমান্স প্রসঙ্গ' রচনাটি বেরিয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৪০-এর বৈশাখ সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে লিখেছিলেন, 'প্রবোধ সান্যালের 'কলরব' পড়লাম। তাঁর রচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হল।...যেমন অনাদৃত পল্লি, ...এ বাড়িতে তেমনি বহুলোকের চিত্ত দৈন্যের যত কিছু উচ্ছিষ্ট স্তূপাকার হয়ে বাতাস মলিন করে তুলেছে। কলরবের বাসাখানাও অসুস্থদেরই বাস। সেই হিসেবে এই হাসপাতালী গল্পটাকেও কি রোমান্স বলব না। গল্প জুগিয়েছে সংসার থেকে দূরের দৃশ্যে। এই দূরের হাওয়া বিচিত্রবর্ণ বসন্তের হতে পারে—হতে পারে ফ্যাকাশে রঙের দরিদ্র শীতের।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে 'কলরব' কাহিনিতে অসুস্থদের ভীড়। এই ভীড়ের মধ্যে রোজকার জীবনযাত্রা থেকে বেরিয়ে আসা যায়। প্রবোধ সান্যাল সেভাবে আসেননি। এই কাহিনিতে আছে নিকট থেকে দূরে যাওয়া, বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া। রবীন্দ্রনাথের মতে সেজন্যে ছোটোগল্পটি রোমান্টিক। তিনি চিঠির আরেক জায়গায় বলছেন, 'প্রবোধ সান্যালের 'কলরব' আর 'নিশিপদ্ম' বই দুটি আমার হাতে পড়ল' এরা সম্পূর্ণ অন্যজাতের। নবীন মতওয়ালাদের সাহিত্যে ভীরুতা আছে যথেষ্ট। এরা সুন্দরকে ভয় করে পাছে কেউ গাল

দিয়ে বসে, এসব মন ভোলাবার ছল। বলতেই হবে খাঁটি রিয়ালিজম এ নয়। এটাকে বাইরে থেকে, দেখতে মনে হয় সাহসিকতা কিন্তু বস্তুতই এটা ভীরুতা।' এভাবেই রবীন্দ্রনাথ কখনো-কখনো 'চাওয়া হয় দেওয়া হয়' মতামতের উর্ধ্বে উঠে বিদ্রূপ ও শ্লেষের সাহায্যে কল্লোলযুগের গল্পকারদের সাহিত্য রচনার মুখোশকে অনাবৃত করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাথে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এক গভীর সম্পর্ক ছিল। ধূর্জটিপ্রসাদ কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক নন। তিনি 'সবুজপত্রে'র বুদ্ধিদীপ্ত ছোটোগল্পকার। 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক খুবই নিকটের এবং আন্তরিক। ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের কবিতার এক ছত্র নিয়ে একটি গল্প লিখেছিলেন। গল্পটির নাম, 'একদা তুমি প্রিয়ে।' ধূর্জটিপ্রসাদের একটিমাত্র ছোটোগল্পের বই, 'রিয়ালিস্ট'। সেই ছোটোগল্প বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তোমার বইয়ের যে নাম দিয়েছ 'রিয়ালিস্ট', তার মধ্যে বিদ্রূপের অট্টহাস্য রয়েছে। রিয়ালিজম যে কত অদ্ভুত তা তোমার গল্পে ফুটিয়ে তুলেছ। মানুষ দুর্বৃত্ত হতে পারে স্বভাবতই কিন্তু মানুষ রিয়ালিস্ট হবার জন্য কোমর বাঁধলে সেটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েই।' ধূর্জটিপ্রসাদের ছোটোগল্প এবং 'অন্তঃশীলা' উপন্যাস পড়েই কি রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছেন, 'আগামী যুগ নতুন ধারায় নতুন পদ্ধতিতে আপন প্রকাশের সন্ধান করবে।' ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ যে কতটা সঠিক তা প্রমাণ করে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ছোটোগল্পকারদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার গল্প। সামাজিক দায়বদ্ধ ছোটোগল্পের নতুন ধারা এবং নতুন পদ্ধতি এখনও তারা খোঁজ করে চলেছে।

ত্রিশের দশকের ছোটোগল্পকারদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষভাবে কল্লোল-গোষ্ঠীর ছোটোগল্পকাররা, রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেও রবীন্দ্রনাথের অনুগ্রহ পেতে আগ্রহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার প্রভাবেই এরকম অনুগ্রহ পাবার মূল কারণ। একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর একমাত্র ব্যতিক্রম। বিভূতিভূষণও খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। একবার প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। পরে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথকে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি পড়তে দিয়ে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন শেষ জীবনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন। শরীরও অসুস্থ। সম্পূর্ণ 'পদ্মানদীর মাঝি' পড়ে উঠতে পেরেছিলেন কি না এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই। তবে মতামত তিনি জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মাণিকের খানিকও ভালো। মাঝির ভাষায় ভদ্রলোকের কথা বলা হয়েছে।' বিভূতিভূষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে সুস্পষ্ট।'

তবে তিরিশের দশক যে অর্থে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে, প্রতিবাদে, যুদ্ধের বীভৎসতায় এবং সাম্যবাদের উজ্জ্বল ভূমিকায়, সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথ ত্রিশের দশকের ছোটোগল্পকারদের সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন তা যথার্থ নয়। বিশেষভাবে তিনি, দশকের কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের ওপর, মতামত আরোপ করেছেন গল্পের আঙ্গিক, বিষয়ভাবনা এবং মিথুন প্রবৃত্তির ওপর। একদিকে রবীন্দ্র-বিরোধিতা, অন্যদিকে

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্র পাওয়ার জন্যে রবীন্দ্র সান্নিধ্য, এটাই ছিল কল্লোলগোষ্ঠীর গল্পকারদের দ্বি-মুখী স্বভাব, নাটুকেপনা এবং নাগরিক কৌশল, চমৎকার গিমিক। এইসব মতামত পাওয়ার পেছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করে তা হচ্ছে সাহিত্যে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য যশ ও খ্যাতির স্বার্থে, যা আজও চলছে। এরকম উদ্দেশ্য প্রবণতার বাইরেও সাহিত্য-সৃষ্টিতে মগ্ন লেখকেরা ছিলেন এবং থাকবেন, ছিলেন বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন ইত্যাদি। এরা রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হননি।

'তরী হতে তীরে' ও ছোটোগল্পকারদের গল্প প্রসঙ্গে

নানারকম বই পড়তে-পড়তে কিছু বই-এ লক্ষ্য করি ছোটোগল্প ও গল্পকারদের নিয়ে লেখা নানারকম তথ্য। এরকম একটি বই হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'তরী হতে তীরে'। এরকম আরও বই আছে, সেসব বই থেকে ছোটোগল্প ও গল্পকারদের নিয়ে লেখা নানারকম তথ্য যদি বের করে আনা যায় তাহলে ছোটোগল্প ও গল্পকারদের সম্পর্কে তথাকথিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন করা যায়। সেসব বই-এর লেখকেরা যেভাবে লিখেছেন ঠিক সেভাবেই কখনও প্রত্যক্ষ উক্তিতে, কখনও বা পরোক্ষ উক্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রয়োজনে মাঝে-মাঝে সংযোজন করতে হয়েছে।

'তরী হতে তীরে' হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত এই বইটির কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু পড়েছেন কম। এরকম বই-এর পাঠক আলাদা, সবাই নয়। সেজন্যে এই বইয়ের পাঠকও কম। এই বইটি পড়তে-পড়তে লক্ষ্য করেছি ছোটোগল্প ও গল্পকারদের নিয়ে জানা-অজানা অনেক তথ্য। এ ছাড়া আছে লেখকের তির্যক মন্তব্য। নারায়ণ ভট্টাচার্য নামে যে একজন গল্পকার আছেন, তিনি যে ভালো গল্প লেখেন, এসব আমাদের অজানা। এই নারায়ণ ভট্টাচার্যকে লেখক জানেন এবং তিনি তার ছোটোগল্প পড়েছেন। লেখকের কথাই এখানে তুলে ধরছি।

"প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, সে যুগে নারায়ণ ভট্টাচার্য নামে একজন গল্পকার ছিলেন যাঁর নামোল্লেখ পর্যন্ত কোথাও দেখিনা অথচ পল্লীবাসী বাঙালির বঞ্চিত জীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনি তিনি অজস্র লিখে যেতেন।...নারায়ণ ভট্টাচার্যের কথা বিশেষ করে মনে আসে কারণ তাঁর আগে অমনভাবে বাংলা কাহিনির ক্ষেত্রে নির্বিত্তের আবির্ভাব বোধ করি হয়নি—সহজ এবং সস্তা হৃদয়াবেগ অবশ্য একটু বেশি ছিল, কিন্তু সেটাও তো বাঙালি জীবনে সত্য।" শশীভূষণ দে স্ট্রিটে অবস্থিত ক্যালকাটা হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন নারায়ণ ভট্টাচার্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বসুমতী অফিসে প্রায় নিয়মিত আসতেন ১৯২১ সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাঁকে বসুমতীর বিজ্ঞাপনে বর্ণনা করা হত, 'বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী' বলে এবং তিনি এলেই রহস্য করে দেখিয়ে দেওয়া হত একটি আরাম কেদারা, বলা হত ওইটিই সেই 'শূন্য সিংহাসন' সেখানে পা ছড়িয়ে বসে তিনি আলবোলায় টান দিতেন।...

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র; বেশ কয়েক বৎসর (১৯২৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় পর্যন্ত) রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ খুব ছিল। বিশেষত

সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে হৃদ্যতার জন্যই সম্ভবত। কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা চলে যে শরৎচন্দ্রের মরমী মনে সাহিত্য ও জনজীবনের সংযুক্তি ছিল অকাট্য। অমৃতলাল বসুর মতো শরৎবাবুও তালতলার চটির অনুরাগী ছিলেন।"

১৯২১ সাল, শূন্য সিংহাসন, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, তালতলার চটি, হৃদ্যতা— এসব তথ্য ইতিহাসের অজানা বিষয় হতে পারে একজন লেখকের লেখার বিচারে। হীরেন্দ্রনাথ কলকাতার তালতলা অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তালতলার চটির কথাটা এখানে ভেবে থাকতে পারেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় প্রচুর ছোটোগল্প লিখেছেন। যে রকম তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন এবং যে রকম তিনি প্রচারিত হয়েছেন, সে রকম তিনি পঠিত নন এবং আলোচিত নন যেরকম শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পঠিত এবং আলোচিত, এখনও। তার সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথের মন্তব্য এই বই-এ আছে। তিনি লিখেছেন—

"একটু ধৃষ্টতা মনে হবে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে যাদের কাছে বাস্তবিকই বিরাট প্রত্যাশা ছিল, অন্নদাশঙ্কর তাদের অন্যতম অথচ বহুচিন্তা ও সংবেদনশীল রচনা তাঁর হাত থেকে বেরলেও আমি যেন কোথায় তিনি মনকে চোখ ঠেরে গোঁজামিল দিয়ে চলেছেন ভেবে একটু বিচলিত। তাঁকে নিয়ে আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, এভাবে কিছু বলাও অনুচিত হবে। কিন্তু যেহেতু তিনি মহৎ লেখকের বিবিধ উপলক্ষণ নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আজও আমাদের সীমিত পরিবেশে শিল্পপথ পরিচায়ক বলেই সম্মানিত, ঠিক সেহেতু আমার মনের খেদ (এবং সঙ্গে সঙ্গে যা পেয়েছি সেজন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা) প্রকাশ না করে পারছি না। সংসারে অনেকটা গতানুগতিকতা বর্জন করার পর যেন তাঁর মননের হাঁফ ফুরিয়ে আসছে আশঙ্কা করে কি দুঃসাহসী মৌলিক সমাজ চিন্তার ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস থেকে তিনি নির্বৃত্ত হয়ে রইলেন?"

গোজামিল দিয়ে চলেছেন, দুঃসাহসী মৌলিক সমাজ চিন্তাবাবনা থেকে নির্বৃত্ত— এইসব মন্তব্য এখন প্রমাণিত বলেই হয়তো পাঠক তাঁকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেননি যেভাবে গ্রহণ করেছেন শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিককে।

মুলক্‌রাজ আনন্দ-এর সাথে আমরা, যারা লেখালেখি করি, সবাই পরিচিত। তাঁর অনেক খারাপ-ভালো-উল্লেখযোগ্য গল্প আমরা ইংরেজিতে, বাংলায় অনুবাদ পড়েছি। বাংলায় অনূদিত ছোটোগল্পের বইও বের হয়েছে। তবে প্রেমচাঁদ, কৃষণচন্দর, ফুলেশ্বর **রেণুদের** মতো মুলক্‌রাজ তত পঠিত নন বাঙালি পাঠকদের কাছে। ইংরেজিতে লেখা কুলী (১৯৩৩) এবং দুটি পাতা একটি কুঁড়ি (১৯৩৭) বাংলায় অনুবাদ অনেক বছর আগেই বের হয়েছিল। বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত (লাহোর, লন্ডন, কেমব্রিজ, পি.এইচ.ডি.) কথাশিল্পী মুলক্‌রাজ আনন্দ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য।

"একটু বলতে হচ্ছে মুলক্-এর কথা কারণ সে তো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি। জহীর-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র হিসেবে বিদেশী প্রগতিবাদী, লেখককুলে তার প্রতিষ্ঠায় কম্যুনিস্ট

আন্দোলনের সহায়তা ছিল তার মস্ত পুঁজি। ভারতবাসী হয়েও ইংরেজি ছাড়া যারা অন্তরের কথা প্রকাশে অসমর্থ বলে ঘোষণা করে থাকেন, তাদের সম্বন্ধে আমার বিরূপতা যে আছে স্বীকার করছি। মুলক্-এর লেখার গুণ আর প্রগতি সাহিত্য প্রচেষ্টায় তার নিয়ত সহযোগিতার মূল্য আমি একটুও অস্বীকার করি না। কিন্তু সাধারণত ইংরেজি লিখিয়ে ভারতীয়দের বিষয়ে আমার মনোভাব অপ্রসন্ন।...

"যাই হোক, মুলক্-এর সঙ্গে এই বিষয়ে মাঝে-মাঝে বিতর্ক পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু তার সম্পর্কে আমার তারিফের কতকগুলো বাধা আজ পর্যন্ত থেকে গিয়েছে। আমার মতো যার মন, তার পক্ষে সহ্য করা একটু শক্ত যে সংস্কৃত একেবারে না জেনে কেউ ভারতীয় হয়ে Hindu View of Art সম্বন্ধে বই লিখতে পারে যা মুলক্ যুবাবয়সে বিলাতে করেছিল, যেমন ছাপিয়েছিল Indian Cooking সম্বন্ধে বইও। আমার রীতিমতো মুশকিল লাগে হজম করতে যে কেউ চা-বাগান না দেখে, এমনকি, কলকাতা থেকে পূর্বে কখনও না গিয়ে 'Two Leaves and a Bud' গল্প লিখবে।...আমরা কজন মিলে বাংলা ছোটোগল্পের একটা সঞ্চয়ন ইংরেজিতে তৈরি করে দেব যেটা মুলক্ ইয়োরোপে নিয়ে গিয়ে বিদেশের (সুতরাং আমাদের চোখে মর্যাদায় সম্ভ্রান্ত) কোনো প্রকাশককে গছিয়ে দিতে পারবে। প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের Modern Review-তে অনূদিত একটা গল্প, বিশ্বভারতীর ছাড়পত্র পেলে রবীন্দ্রনাথের গোটাদুয়েক গল্প, তাছাড়া বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশঙ্কর প্রভৃতির লেখা বাছাই হয়েছিল। খুঁটিনাটি মনে নেই, তবে আমি তর্জমা করি তারাশঙ্করের 'তারিনী মাঝি', আর আমার প্রিয় গল্প বিভূতিভূষণের 'যাত্রাবদল' অনুবাদ কবেন স্বয়ং সুধীনবাবু।...

"বেশ কিছুকাল পরে এবং যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে, শোনা গেল মুলক্‌রাজ যে ব্যাগে আমাদের এই বাংলা গল্প সংগ্রহ নিয়ে ঘুরছিলেন, সেটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।...আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল, তবে দূষব কাকে, নিজেরাও যে বোকা, নকল নিজের কাছে রাখিনি,...

"ক্রমে ঘটনাটি ভুলে যাওয়া গেল, কিন্তু কয়েক বছর বাদে হঠাৎ নজরে এল Tomorrow নামে এক সংকলক বিলাতে সম্পাদনা করেছেন প্রগতি লেখক সংঘের প্রাক্তন সভ্য আহ্মদ আলী (পরে পাকিস্তানবাসী, বোধহয় চীনে কিছুকাল পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতও), যাতে আমার 'তারিনী মাঝি' ইংরেজি আকারে বেরিয়েছে।...এখনও মাঝে-মাঝে ভাবি মুলক্-এর 'ব্যাগ' হারানোর কথা। আর দুঃখ করি, বাকি সবকটা গল্পের কী হল কল্পনা করে।" মুলক্ রাজ প্রসঙ্গে এই গর্হিত ঘটনাটি আমাদের অনেকের কাছেই এক অজানা তথ্য। সাথে সাথে বিপরীত ভাবনাটাও মনের মধ্যে এসে যায়, হীরেন্দ্রনাথের বাংলা ছোটোগল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ।

গল্পকার সোমেন চন্দ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে। তবু শোনা যাক হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য। তিনি লিখছেন—

"ওই দিন ঢাকায় (৯ মার্চ ১৯৪২) তরুণ সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের সুপরিকল্পিত আক্রমণে নিহত হলেন, অকালে নিভে গেল সাহিত্যে এমন এক প্রতিভা যাব

মধ্যে দেখা গিয়েছিল মহত্ত্বের সুস্পষ্ট আভাস, সঙ্গে সঙ্গে সরল, সবল, সজাগ এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব যা পরাধীন নিপীড়িত সমাজে নির্বিত্তের মুক্তিপ্রয়াসে লিপ্ত হয়ে সকলের সমাদর পেয়েছিল। সোমেন চন্দ রেল আর সুতাকল শ্রমিক থেকে বিদগ্ধ কলাবিদ পর্যন্ত বহুজনের একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।...সোমেন চন্দ-এর অসামান্য গল্প 'ইঁদুর' আই-সি-এস অশোক মিত্রের অনুবাদে ছাপা হয়, এটিই লেখকের স্মরণীয় রচনা।"

সোমেন চন্দের সাথে হীরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি ঐতিহাসিক।

"বেশ মনে আছে সুরেন গোস্বামী এবং সজ্জাদ জহীরকে নিয়ে ঢাকা গিয়েছিলাম সংঘ স্থাপন ব্যাপারে—হয়তো তখন প্রথম দেখি কিশোর সোমেন চন্দকে, কিন্তু তার অবিস্মরণীয় প্রতিভা প্রকটিত হয়েছিল কিছু পরে, 'ইঁদুর' 'বনস্পতি' প্রভৃতি বিস্ময়কর গল্পরচনায়, ৪২ সালের মার্চ মাসে ফ্যাসিস্ট গুন্ডাদের অস্ত্রাঘাতে তার মৃত্যু হলে দেশের এক অপূরণীয় ক্ষতি। যার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় যক্ষ্মার আক্রমণে সুকান্ত ভট্টাচার্যের উদ্দীপ্ত কবি জীবনের অকাল অবসান।"

তরুণ লেখক রণেশ দাশগুপ্ত, সুরেন গোস্বামী, সজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ এবং তাদের চেষ্টায় ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের পত্তন, সংঘের সাথে কিশোর সোমেন চন্দের যোগাযোগ, সংঘের পত্তন নিয়ে কবি মোহিতলাল মজুমদারের রুষ্ট হওয়া—সাহিত্যে প্রগতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে এ সব ইতিহাসের উপাদান হতে পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে হীরেন্দ্রনাথের হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার স্পষ্টতার মধ্যে ধরা পড়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার অন্য পরিচয়। তিনি লিখেছেন—

"ত্রিশের দশকে রাঢ়ভুমির লালমাটি আর ব্রাত্য মানুষের কাহিনি নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হাতে 'কল্লোল' যুগকে পরিণতি না হোক সচেতন জঙ্গমতায় উপনায়ন, প্রতিভার সঙ্গে মননের মিশ্রণে আসক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কঠিন প্রয়াস হামসুন এবং গর্কিকে একসূত্রে বাধার জন্য। আর সাহিত্যের সোনার খনির গভীরে নামার বক্ষভেদী বাঞ্ছায় জর্জর হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের রূপ অন্বেষণ শুরু করলেন। 'ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য' তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। অশান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে চলতে চাইলেন এবং পরে গাল কুড়োলেন মোহিতলাল মজুমদারের কাছে : 'চিন্ময় বাস্তবের পরিবর্তে জড়-বাস্তবের উপাসনা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে...রূপকার কবির আসন হইতে রূপ-বিদ্রোহী কর্মকারের পদবীতে নামিয়াছেন।' গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে মহত্তম যিনি, সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনের গভীরে অশান্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে একেবারে কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরে অবস্থান ও কর্মপ্রযত্ন নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর মতো ব্যক্তি আমাদের সর্ব অর্থে দুঃখী ও দুর্বল পরিবেশে শান্তি না পেলেও উপশম অন্তত পেয়েছিলেন, তাই দেখতাম তাঁকে সোৎসাহে শুধু '৪৬নং'-এ, কিম্বা অনুরূপ আয়োজন নয়, জনসভা ও পার্টির বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে—চিন্মোহনবাবু মনে পড়িয়ে দিলেন '৪৬নং'-এ মানিকবাবু একবার পড়লেন 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি। যাতে রয়েছে আশ্চর্য কিষাণ নারী 'ময়না-র মা'-র ছবি। আমার মনে আসছে, চিন্মোহনবাবুর বিয়ের পব

'৪৬নং'-এ বন্ধুরা মিলে আনন্দ করছেন। উমাকে বলছেন মানিকবাবু যে তাঁর দারুণ হিংসে হচ্ছে। কী কপাল চিনুবাবুর, যে এত ভালো বউ হল। আরও ভাবছি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারির কথা, মানিকবাবুর সঙ্গে আমি চলেছি চট্টগ্রামে; কম্যুনিস্ট প্রার্থী কল্পনা দত্তের সমর্থনে সভায়, সেখানে উভয়ে বক্তৃতা করব। গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরগামী স্টিমারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল গল্পে, জ্যোৎস্নায় ভরা পদ্মার অপরূপ মাধুর্য দেখে মুগ্ধ হলাম। পদ্মা নদীর মাঝির যিনি স্রষ্টা, তাঁকে পাশে রেখে সেই পাড়ি সহজে ভুলবার তো নয়।...

"বিশ্ববরেণ্য চিত্রকর পিকাসো ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে বলেছিলেন : 'চিরকালই আমি নির্বাসিত। আজ আমার নির্বাসন ঘুচল।' একটু অহংকার নিয়েই বলি যে মানিকবাবু এ ভাবেই ভেবেছিলেন। লঘু নয়, গভীর চিন্তারই এই ফল।...

"পিকাসো বুঝি বলেছিলেন : 'ছবি আঁকা শুধু ঘর সাজানোর জন্য নয়। ছবি হচ্ছে হাতিয়ার, লড়াইয়ের অস্ত্র, যা দিয়ে আমি আত্মরক্ষা করি, শত্রুকে আঘাত করি।' শিল্পকে অস্ত্র বলে স্থির করা নিয়ে আমরা কম্যুনিস্টরা অবশ্যই মাঝে-মাঝে মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছি।...

"এদেরই উদ্যোগে (কুতুব পাবলিশার্স) বোধ হয় ৪৫ সালে আমি মানিকবাবুর 'পদ্মা নদীর মাঝি' ইংরেজিতে তর্জমা করি; বাস্তবিক উপভোগ করেছিলাম কাজটা, এই অনুবাদ নিয়ে অল্প একটু গর্বও বোধ করি, কিন্তু ভাগ্যচক্রে এর প্রচার তেমন জুৎসই হয়নি। প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ার পর আবার ছাপবার ব্যবস্থা ঘটেনি।"

'কল্লোল' যুগের বিপরীতে মানিকের জীবনের রূপ অন্বেষণ, ভাবের আকাশের বিপরীতে মাটির পৃথিবীর খোঁজ, জড়-বাস্তবের উপাসনা, মনের গভীরে অশান্ত জিজ্ঞাসা, পার্টিতে যোগদান, একাকিত্বের অবসান, পার্টির কাজে বক্তৃতা দেওয়া, অনুবাদ হীরেন্দ্রনাথের ও মানিকের গল্পপাঠ, ভালো বউ না পাওয়ার দুঃখ, মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য, পিকাসোর কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া ও ছবিকে হাতিয়ার মনে করা—এ সব জানা-অজানা তথ্য জানতে পারা যায় এবং পিকাসো সম্পর্কেও কিছু তথ্য।

বিশেষ করে প্রগতি লেখক সংঘের কথা আলোচনা করতে গিয়ে হীরেন্দ্রনাথ সমসাময়িক অনেক লেখকদের কথা বলেছেন। যেমন বলেছেন তারাশঙ্কর সম্বন্ধে—

"ত্রিশের দশকে রাঢ়ভূমির লালমাটি আর ব্রাত্যমানুষের কাহিনি নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব।...

"তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে-মাঝে অস্বস্তিবোধ করলেও বেশ একটু কাছে আসছিলেন। প্রগতি লেখক সংঘে সাগ্রহে যোগ দিলেন।... কম্যুনিজমকে কখনও নিজের জীবনদর্শন বলে তারাশঙ্করবাবু গ্রহণ করেননি। বরং ছিল গান্ধী চিন্তার সঙ্গে তাঁর মর্মের সংযোগ, কিন্তু বিচিত্র বর্গের বাঙালি জীবন অবলোকন ও অনুধাবনে চক্ষুষ্মান ও হৃদয়বান এই যশস্বী কখনও সমসমাজের তত্ত্ব ও কর্মযজ্ঞকে অবজ্ঞেয় মনে করেননি, বৈরী শিবিরেও মিশে যাননি। বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে যামিনী রায়ের পাশের বাড়িতে প্রথম তাকে দেখি; নগ্নগাত্র, গলায় মালার মতো ঝুলছে উপবীত, কথার ধরনে গ্রামের ছাপ আর রাঢ়ের টান, ব্যবহারে অমায়িক, আলাপে সহজ, ব্যক্তিত্বে অজটিল—বাড়ি গাড়ি

ইত্যাদি করে টালায় যখন বাস তখনও দেখেছি তেমনি...তারাশঙ্করবাবু যখন রাজ্যসভার সদস্য, প্রায়ই দিল্লি থেকে দূরে থাকতেন, একবার লিখলেন মধুর ক'লাইনের চিঠি, আমাকে দেখেছেন স্বপ্নে—আনন্দের ধাক্কা লেগেছিল বুকে, কারণ সেই সময়টাতেই কয়েকটা এলাকা থেকে প্রচার চলছিল যে তিনি কম্যুনিস্টদের নিয়ে তিক্ত বিরক্ত।..."

হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্যে দক্ষতার বিচারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান ছিল পাশাপাশি। তিনি লিখেছেন—

"১২ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) থেকে অন্তত চারদিন আবার কলকাতা শহরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গ্রাস থেকে নিজেকে ছিনিয়ে রেখেছিল। এবার উপলক্ষ্য হল আজাদ হিন্দ ফৌজেরই আবদুর রশিদ আলির মুক্তি—ইংরেজ চেয়েছিল যাতে হিন্দুরা দাবিতে না যোগ দেয়...ব্যর্থ চেষ্টা করতে পারি সেদিনের উন্মাদনার চেহারা আঁকতে—তবে পাঠককে বলব সংগ্রহ করে পড়ুন মানিকবাবুর লেখা 'চিহ্ন' যাতে রয়েছে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিনের অবিস্মরণীয় ছবি, আর তারাশঙ্করবাবুর 'ঝড় ও ঝরা পাতা', যা হল ফেব্রুয়ারি দিনগুলির প্রতিকৃতি—যে বলে বলুক লেখাটা ফোটোগ্রাফের ধরনে আর তাই নাকি তোলা বিচারে মহৎ শিল্প বুঝি নয়। কিন্তু যখন গণজাগরণ বিপ্লবের আকার নিতে চাইছে তখন তার অবিকল বর্ণনাতে ফুটে ওঠে সৃষ্টিশীল শিল্পের প্রতিটি উপলক্ষণ।"

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তারাশঙ্কর এবং মানিক পাশাপাশি অবস্থান না করলেও গণজাগরনে এবং মানবিক তত্ত্বাবস্থানে এই দুই মহান ছোটোগল্পকার পাশাপাশি অবস্থান করেন। যদিও তাদের শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। মানিক শ্রেণি-সংগ্রামে বিশ্বাসী, তারাশঙ্কর শ্রেণি-সমন্বয়ে বিশ্বাসী। মানিক বস্তুবাদী তারাশঙ্কর নিয়তিবাদী।

প্রমথ চৌধুরীর ভাবশিষ্য, 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর গল্পকার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"স্বয়ং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৫ সালে লিখলেন 'অন্তঃশীলা' যার নায়ক সমাজবাদের প্রতিপক্ষ রূপে চিহ্নিত হলেন, কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব 'আবর্ত'-এ দেখা গেল দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং অবশেষে 'মোহনায়' সেই নায়ক কানপুরের গরিব শ্রমজীবীর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লেন, 'কাছে থেকে দূরে যারা, মূক যারা দুঃখে শোকে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে' বলে রবীন্দ্রনাথ যাদের হৃদস্পন্দন শোনার আকুতি প্রকাশ করেছিলেন, তাদেরই আত্মীয় হবার জন্য দেখা গেল ধূর্জটিপ্রসাদ সৃষ্ট নায়কের ব্যাকুলতা।"

হীরেন্দ্রনাথের কথায়, সাহিত্য-চিন্তায় বুদ্ধিবৃত্তির ঔজ্জ্বল্যে ধূর্জটিপ্রসাদ তখন প্রায় অদ্বিতীয়। 'মজলিসী মানুষ অথচ কোথায় যেন নিয়ত লড়ছিলেন নিজের একাকিত্বের সঙ্গে।'

সত্তরের দশকের মতো চল্লিশের দশকেও লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের দেশব্যাপী বিভীষিকার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তবে সত্তরের দশক ও চল্লিশের দশকের আন্দোলনের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য একরকম ছিল না। হীরেন্দ্রনাথ চল্লিশের দশকের কথাকারদের সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা তুলে ধরছি—

"দেশব্যাপী তখনকার বিভীষিকার মোকাবিলা করছিলেন লেখক-শিল্পীকুল। সেদিনের দুঃসহ বাস্তবকে স্বীকার না করে তার বিপক্ষে নির্ভীক লড়াইয়ের উদ্দীপনা ছিল বিবিধ শিল্প সৃষ্টিতে। ফিরিস্তি দিচ্ছি না। কালানুক্রমে তথ্য সাজাচ্ছি না। কিন্তু তখনই প্রকাশ হয়েছিল তারাশঙ্করবাবুর 'মন্বন্তর' (যার ইংরেজি তর্জমা আমি করি 'Epoch's End' নাম দিয়ে), বেরিয়েছিল গোপাল হালদারের সুবৃহৎ উপন্যাস (তিনখণ্ডে), মানিকবাবুর অসংখ্য শাণিত গল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রমুখের বহু *মর্মস্পর্শী কাহিনি।" হীরেন্দ্রনাথের 'মর্মস্পর্শী কাহিনি' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ।* অনেকে মনে করে থাকেন এই লেখকেরা রাজনীতির প্রভাবে, প্রভাবিত। আসলে এটা প্রচার এবং বিরোধিতা। এঁরা সামাজিক দায়বদ্ধতার মর্মস্পর্শী যথার্থ লেখক।

সাহিত্য-জগতে গল্পকার রমেশচন্দ্র সেন এবং গোপাল হালদার সম্বন্ধে আলোচনার ফাঁক থেকে গেছে অনেকখানি। এদের সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"রমেশচন্দ্র সেনের মিঠে হাতের লেখা কাহিনির কদর হয়তো আজ নেই, কিন্তু তাঁর মতো প্রকৃত মহাজনকে আমাদের কাজে (চিন্তা) আকৃষ্ট করেছিল। বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঠিক রাখার কাজে প্রধান অবদান ছিল অজাতশত্রু গোপাল হালদারের—মাঝে-মাঝে তাঁকে 'সর্বঘটে কাঠালিকলা'র মতো ব্যবহার হয়তো আন্দোলিত করেছে, কিন্তু হাসিমুখে সর্ববিধ কর্মে যোগ দিতে কুণ্ঠিত তাঁকে কখনও দেখা যায়নি। মুশকিল হচ্ছে নাম করা আর না করা নিয়ে। তবে উল্লেখ করতেই হয় অন্তত দুজন গল্পকারের যাদের প্রতিভার ভাতি বাংলা রচনার গৌরব -- এরা হলেন নরেন মিত্র আর সমরেশ বসু, যিনি (সমরেশ বসু) আজ কিছু পরিমাণে বিতর্কিত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব কিন্তু কল্পনার বিস্তার ও বাস্তবায়নে যার স্বাক্ষর বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী।" কথাশিল্পী রমেশচন্দ্র সেনের বামপন্থী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ওপর আলোচনা মাত্র শুরু হয়েছে। মধ্যবিত্ত সংকট, সমাজ সংকট এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে তার প্রতিফলন, জীবনের মূল্যবোধ সঞ্জাত দ্বিধাদ্বন্দ্ব নরেন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে ছড়ানো। এছাড়া অতীতের কথাশিল্পী মণীন্দ্রলাল বসু সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না। এক সময় এই কথাকার হীরেন্দ্রনাথের ছাত্র জীবনকে জাগিয়ে রাখতেন। তিনি উচ্ছ্বাসবোধ করতেন একদা-খ্যাত কথাশিল্পী মণীন্দ্রলাল বসুর "রমলা" উপন্যাস এবং "অশোক" গল্পটি নিয়ে। সোমনাথ লাহিড়ীর লেখা 'কলিযুগের গল্প' নামে একটি বলিষ্ঠ ছোটোগল্পের বই আছে। সোমনাথ লাহিড়ীর গল্প-লেখা নিয়ে হীরেন্দ্রনাথের মন্তব্য : "তিনি ছিলেন শাণিত, লিখনে ও কথনে পারদর্শী। সঙ্গে-সঙ্গে ব্যঙ্গ পরায়ণ। এমনভাবে যে মনে হত নিজেই ভুলে গেছেন যে হাসি হাসছেন তার পিছনে কান্না লুকিয়ে আছে— তাঁর ক্ষেত্রে বাস্তবপক্ষে কম্যুনিস্ট কর্ম-ব্যাপৃতি এক সাহিত্যিক প্রতিভাকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে...।"

হীরেন্দ্রনাথের কলমে যে সকল ছোটোগল্পকার এবং তাদের গল্প উঠে এসেছে, তারা সবাই ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকের। তৎকালীন সামাজিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের লেখার ধরন-ধারণ ও তথ্যনিষ্ঠ মননশীলতা তুলে ধরে আগামীদিনের ছোটোগল্প গবেষকদের কাজকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

শ্রেণি ও বর্ণবৈষম্য সমাজে আর্স্কিন কল্ডওয়েলের ছোটোগল্প

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমাজের যে শ্রেণিবিন্যাস সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব একটা পরিস্কার নয়। আমাদের একটা সরল ধারণা আছে, সেখানে সবাই ধনসম্পদের মালিক। সেখানে আছে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা। নাগরিক জীবনের নানাবিধ কষ্ট দূর করেছে বিজ্ঞাননির্ভর প্রযুক্তি। কিন্তু মালিক থাকলেই শ্রমিক থাকতে হবে। এটাই সমাজের মূল শ্রেণিবিন্যাস। আর্স্কিন কল্ডওয়েল কিন্তু অন্য কথা বলেন। তাঁর ছোটোগল্পগুলো পড়লে আমরা দেখতে পাবো অন্য আমেরিকা। কল্ডওয়েল প্রায় শ'খানেক ছোটোগল্প লিখেছেন। তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর বিশ্বপ্রশংসিত উপন্যাসের নাম, টোবাকো বয় (১৯৩২); গডস লিটল একর (১৯৩৩), জর্জিয়া বয় (১৯৩৪), ট্রাবল ইন জুলাই (১৯৪০)।

ছোটোগল্প পাঠে প্রত্যয়সিদ্ধ সিদ্ধান্তে আসা যায়, সর্বদেশের ভোগসর্বস্বতা ও সম্পদ সর্বস্বতার বিরুদ্ধে আর্স্কিন কল্ডওয়েল (জন্ম ১৯০৩) এক সোচ্চার এবং বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তিনি ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং এ বিষয়ে ১৯৩৮ সালে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রথম প্রথম তাঁর লেখা প্রচুর ছোটোগল্প অধিকাংশ পত্রিকার সম্পাদকেরা ছাপাননি। লেখা ফিরিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র 'নিউ মাসেস' পত্রিকা তার লেখা ছাপিয়ে গিয়েছিলেন।

আর্স্কিন কল্ডওয়েলের ছোটোগল্প লেখার অনুপ্রেরণার নেপথ্য ভূমিকা থাকতে পারে এইভাবে : তিনি নানা ধরনের কাজ করেছেন যথা—কারখানায় শ্রমিকের কাজ, মাঠে তুলো তোলার কাজ, রেস্টুরেন্টে রান্নার ও বয়ের কাজ, মালবোঝাই গাড়ি চালানোর কাজ, খেতে আলু তোলার কাজ, সেলস্ম্যানের কাজ, কাঠুরিয়ার কাজ ইত্যাদি। তিনি স্টেজে সহকারী হয়েছেন, কারোর দেহরক্ষী হয়েছেন, পেশাদারি হিসেবে ফুটবলও খেলেছেন।

এসব অভিজ্ঞতা থেকে তার ছোটোগল্পে উঠে এসেছে আমেরিকার দারিদ্র, নিগ্রো-নির্যাতন, তীব্র সমাজ সচেতনতা, গভীর জীবন-প্রেম। তার ছোটোগল্পে যেমন আছে ভালোবাসার কথা, মানবপ্রীতির কথা, মার্কিন গ্রাম জীবনের কথা, তেমনি দেখিয়েছেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষক নিপীড়ক ও শোষিত-নির্যাতিতদের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক। তার গল্পে আছে ঘৃণা, ক্রোধ, ক্ষোভ, বিষাদ, আশা, ভালোবাসা, প্রতিবাদ।

নিগ্রো নির্যাতনের ওপর কল্ডওয়েলের বিখ্যাত ছোটোগল্প 'জনগণ বনাম কৃষ্ণাঙ্গ আবে লাথান'। এই গল্পে লুথার জমিদার। ভাগচাষি আবে লাথান। আবে লাথান চল্লিশ বছর ধরে ভাগচাষির কাজ করছে। তবু জমিদার তাকে চলে যেতে বলে সপরিবারে।

জমিতে আবে লাথানের আর প্রয়োজন নেই। চল্লিশ বছর কাজ করেও জমিতে তার কোনো অধিকার নেই যে আবে লাথান প্রতিবাদ করে 'যেতে আমি পারবো না মি. লুথার'। মিথ্যা ওয়ারেন্ট বের করে জমির মালিক লুথার। আবে লাথান লুথারকে মেরেছে। আবে লাথান জেলে যায়। আবে লাথানের বড়ো ছেলে হেনরি উকিল ধরতে যায়। উকিল হেনরিকে বলেন, 'তোমাকে তো বলেছি, এ মামলা আমি ছোবো না। ...তোমরা নিগারেরা মাঝে-মাঝে জেলে গিয়ে ঘানি ঘোরালেই থাকো ভালো।...পয়সা যদি থাকত তাহলে ছিল অন্য কথা'।

মামলা না-লড়ার কারণ আবে লাথান জানতে চাইলে হেনরি বলে, 'আমাদের গায়ের রঙ কালো। বোধহয় সেজন্য'। ছোটোগল্প এখানেই শেষ। নিগ্রোদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি নিঃশব্দে জায়গা করে নেয় পাঠকের মনের ভেতর।

দারিদ্রের প্রামাণ্য দলিল 'ডরোথি' নামে ছোটোগল্পটি। (১) আমেরিকান এক বেকার মেয়ে। মেয়েটির চটির সুকতলাটি ছেঁড়া। (২) মেয়েটির একটি মাত্র নীল ফ্লানেলের স্কার্ট। ও-টি পরেই কয়েক রাত ঘুমিয়েছে। স্কার্ট জুড়ে ধুলো-ময়লা। গায়ের জামা ময়লা, কোচকানো ও রঙচটা। ভেজা টুপি শুকোলে যে রকম হয় বেকার মেয়েটির টুপিটা সেরকম। (৩) বাবা মারা গেলে মায়ের ভরণপোষণের জন্য মেয়েকে চাকরি খুঁজতে হয়। (৪) ক্ষুধার্ত মেয়েরা অনেক সময় রেলস্টেশনেই রাত কাটিয়ে দেয়। (৫) আমেরিকার অনেক জায়গায় বেসরকারি চাকরি সংস্থা আছে। আছে বালটিমোরে, আটলান্টায়, নিউ অরলান্সে, ফিলাডেলফিয়ায় এবং রিচমন্ডে। সারা গল্পে ডরোথি নামে ওই মেয়েটি চাকরি খুঁজে যাচ্ছে।

একটি দুর্ধর্ষ ছোটোগল্প 'শনিবারের বিকেল'। অকপটে বলা, সাবলীল গতিতে চলা এই গল্পটিতে কোনোরকম ভাষার জটিলতা বা কৃত্রিম রীতির মারপ্যাচ নেই। অবশ্য কল্ডওয়েলের কোনো গল্পেই থাকে না। তবে গল্প বলার একটা নিজস্ব রীতি কল্ডওয়েলের আছে। এই স্টাইলটিকে বলা যায় কল্ডওয়েলীয় রীতি। ভয়ংকর ঘটনাতেও তিনি আসক্ত হয়ে পড়েন না। কল্ডওয়েলের বর্ণনার ভিতর দিয়ে যে নিরাসক্তির প্রকাশ ঘটে চলে তা পাঠকের মধ্যে আভ্যন্তরীন নিষ্ঠুরতাকে আরও বেশি উস্‌কে দেয়। কিভাবে পবিত্র এক নিরপরাধ নিগ্রোকে লিঞ্চিং করা হল-তাই নিয়ে 'শনিবারের বিকেল'। এক শ্রেণির দর্শকদের কাছে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। শনিবারের বিকেলে সময় কাটাবার জন্য দোকানের ঝাপ কেনাকাটা সাময়িকভাবে বন্ধ করে সবাই যাচ্ছে লিঞ্চিং দেখতে।

ঠান্ডা মাথায় এই গল্পে যে লিঞ্চিং করা হয়েছে এক পবিত্র নিগ্রোকে, ঠিক সেভাবে ঠান্ডা মাথায় কিছুই ঘটেনি এমন একটা ভাব নিয়ে ছোটোগল্পটি লিখেছেন কল্ডওয়েল। এটাই কল্ডওয়েলের নিজস্ব স্টাইল যা পাঠককে চমকে দেয়। চমকাবার জন্য গল্পের শেষ লাইন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না যা এক সময় শেষ লাইনের গুরুত্ব ছিল ছোটোগল্পের গঠনরীতি হিসেবে। 'শনিবারের বিকেল' পড়ার পর পুরো গল্পটা আমাদের নাড়ায়। আমাদের জাগায় ঘৃণাবোধ।

এক শনিবারের বিকেলে উইল ম্যাক্সি নামে এক বয়স্ক নিগ্রোকে, যার বউ আছে এবং তিনটি বড়ো মেয়ে আছে, সামান্য অপরাধে লিঞ্চিং করা হয়েছে বীভৎসভাবে। ম্যাক্সির

অপরাধ দুটি। (১) সে ফ্রেড জ্যাকসনের বড়ো মেয়েকে বকেছে। (২) সে সাদাদের চেয়ে তুলো আর ফসল বুনে বেশি রোজগার করে। সাদারা সবাই মিলে ম্যাক্সিকে ধরল। গুলি করল। গাছে ঝোলাল। প্রচুর লোক লিঞ্চিং দেখতে এল। আর সেই সুযোগে ডক ক্রোমারের ছেলে সেখানে এসে কোকা-কোলা বিক্রি করে মুনাফা লুটে নিল। লিঞ্চিং শেষ হলে যে যার জায়গায় ফিরে এসে প্রতিদিনের মতো কাজকম্মো শুরু করল। পাঠকের মধ্যে উত্তাপ দিয়ে নিরুত্তাপ এক শনিবারের বিকেল চলে গেল।

'মিছরিঅলা বিচাম' গল্পের প্রধান চরিত্র সাত ফুট লম্বা এক নিগ্রো। সে কাজ করে সাদাদের বাড়ির খচ্চর দেখাশোনার। এই নিগ্রোটির নাম বিচাম। সে একদিন কাজের শেষে দশ মাইল দূরে থাকা তার প্রেমিকাকে দেখতে যায়। প্রেমিকা অপেক্ষা করে থাকে। কোনো এক রোববার রাতে বিচাম আসবে। এক রোববারে বিচাম রওনা দেয় বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। দশ মাইল পথ, সে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। তার হাঁটা দেখে নিগ্রোরা ভয় পায়। সাদারা এই হাঁটাকে অহংকারী মনে করে। একটা শহর পেরোতে হবে বিচামকে। সাদাদের শহর। শহরের পর আর দুমাইল। আর মাত্র দুমাইল পথের শেষে অপেক্ষা করে আছে একটি কালো মেয়ে যে পরিশ্রমী বিচামকে ভালোবাসে। কিন্তু বিচাম পৌঁছতে পারে না। সাদাদের শহরের পুলিশ বিচামকে আটকায়।

পুলিশ প্রশ্ন করে : এত তাড়া কিসের?

বিচাম উত্তর দেয় : নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। সাদার মুখের ওপরে কালোর ওরকম কথা পুলিশ সহ্য করতে পারে না। পুলিশ বিচামকে ধরবার জন্য এগোয়। বিচাম এটাকে অপরাধ বলে মনে করে না। সে এগিয়ে চলে। পুলিশ পায়ে গুলি চালায়। চলা থেমে যায়, যে আছে অপেক্ষা করে তার সঙ্গে আর বিচামের দেখা হয় না।

এভাবেই নিগ্রোদের স্বাধিকার, মানমর্যাদা, আত্মসম্মান ইত্যাদির অবমাননা নিয়ে লেখা কল্ডওয়েলের কলম এতো সূক্ষ্ম যা পাঠকের অতল মনের উদাসীনতাকে ঝলসে দেয়।

'মাইনের দিন' কল্ডওয়েলের একটি অন্য ধারার ছোটোগল্প। এই গল্পে যথার্থ কল্ডওয়েলকে পাওয়া যায় না। গল্পটার মধ্যে নেতিবাচক প্যাশন আছে, স্পিড আছে, যৌনতা আছে। আছে রেপ, আছে মদের নেশা এবং বাজি ধরা। এমত কারণে ছোটোগল্পটি পাঠককে নিরাশ করে, মরবিড করে তোলে। মাইনের দিনে সাইপ্রেস গাছের নিচে চাপা পড়া এক নিগ্রোকে লাশবহনকারী গাড়ি করে সৎকার করতে নিয়ে যায় দুই সহকর্মী জেফ এবং রেড। মৃত নিগ্রোটার পাঁচটা সোনা বাঁধানো দাঁত জেফ দেখতে পায়। রেড জেফকে মাথায় রেঞ্জের বাড়ি মারে এবং সব কটা সোনাবাঁধানো দাঁতের অধিকার কেড়ে নেয়। আবার গাড়ি চালাতে-চালাতে একটি মেয়েকে খেতে কাজ করতে দেখতে পায়। মেয়েটি একা। ওরা দুজনে মেয়েটিকে রেপ্ করতে যায়। দুজনের মধ্যে কে আগে রেপ্ করবে তা নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হলে মেয়েটি পালায়। সংঘর্ষে জেফের কানকাটা যায়। এরপর দুজনে লাশ-বহনকারী গাড়ি ফেলে রেখে বিলিয়ার্ড রুমে ঢুকে বাজি রেখে খেলা শুরু করে। দুর্গন্ধ ছড়াবার আগেই মার্শালের লাশ ফেলবার নির্দেশ ওরা শোনে না। গল্পের শেষ : 'যাও' জেফ বলল, 'মার্শালকে গিয়ে বল, আমি বলেছি ভাগতে, জাহান্নামে

যেতে—আমি আর রেড এখন খেলছি।' এই ছোটোগল্পটি পড়লে পূর্বের ধারণাই ফিরে আসে যে কল্ডওয়েলের লেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরাসক্তি যা যান্ত্রিক বা উদাসীনতা নয়। একে বলা যায় ইনার ইনভলভমেন্ট।

আর্স্কিনের বৈশিষ্ট্যহীন 'অতিথি' ছোটোগল্পটি স্মরণযোগ্য গল্প হয়ে উঠতে পারেনি। তবে একটি অভিজ্ঞতা সার্বজনীন হয়ে ওঠে যে পৃথিবীর সব সভ্য দেশে প্রেমের ভাষা এক। এখানে সতেরোর লরা বব নামে এক তরুণকে ভালোবাসে। বব চাকরি পেলেই বিয়ে করবে। এরকম কথা হয়ে আছে। একদিন লরার বান্ধবী দ্রুজিলা লরার বাড়িতে অতিথি হয়ে আসে। বব দ্রুজিলার সঙ্গে মেলামেশা করে। লরাই সুযোগ করে দেয়। ভালোবাসা পালটে যায়। বব বলছে, 'আমি জানতাম লরাকে যতটা ভালোবাসি, তার থেকেও দ্রুজিলাকে বেশি ভালো লাগছে'। আমাদের দেশেও এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

'এর মধ্যেই সারা শহরে খবর ছড়িয়ে গেছে—জিম কার্লিসলে তার আট বছরের মেয়ে ফ্লারাকে গুলি করে মেরেছে'। অংশটি তুলে ধরা হল 'দুহিতা' নামে ছোটোগল্পটি থেকে। লেখকের আরও একটি অসাধারণ ছোটোগল্প এই 'দুহিতা'। বাবা কেন আট বছরের মেয়েকে হত্যা করল? সমাজের কাছে কল্ডওয়েলের পরোক্ষ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর আট বছরের মেয়ে ফ্লারার বাবা জিম দিয়েছে, 'ভাগে অনেক জমি চষেছি। কিন্তু ওরা এসে সব কিছু নিয়ে গেল। এতদিন উপার্জন করার পর তো আর ভিক্ষে করতে বেরনো যায় না। ওরা এল, আর সব নিয়ে গেল, মেয়েটা ভোরবেলায় উঠে আবার বলল—খিদে পেয়েছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।' 'ও মাঝ রাতে উঠে ফের বলল খিদে পেয়েছে, আমি আর পারছিলাম না ওর এই ঘ্যানঘ্যানানি সহ্য করতে।' 'গত একমাস ধরে মেয়েটা এই কথা বলে যাচ্ছে।' এটাই চল্লিশের-পঞ্চাশের দশকের আমেরিকার সমাজ-বুভুক্ষা। আর্স্কিনের ছোটোগল্পে আছে সমাজ-ইতিহাসের উপাদান। ব্যক্তি সংকট এবং সমাজ সংকট একাত্ম হতে পেরেছে কল্ডওয়েলের ছোটোগল্পে। কোনোটার প্রাধান্য নেই। এখানেই ছোটোগল্পকারের স্বকীয়তা।

'একটি নিঃসঙ্গ দিন' এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প নয়। তবে পড়ার পর মনে সাময়িকভাবে দুঃখবোধ ক্রিয়াশীল হয়। এটি কল্ডওয়েলের খিদের গল্প নয় বা শোষণ-প্রতিবাদের গল্প নয়। একটি অন্য ধারার গল্প। এই গল্পে একটি দর্শন আছে, ভোগবাদের দর্শন। মানুষের শরীর কেন? খাদ্যের জন্য, কাজের জন্য এবং যৌন-উপভোগের জন্য। মানুষ তখনই নিঃসঙ্গ হয় যখন শরীর থাকা সত্ত্বেও সে কিছুই পায় না। বিশেষ করে যৌনতা। এই গল্পে মানুষটি হচ্ছে সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত একটি মেয়ে, নাম ক্যাথরিন। এক বৃদ্ধার কাছে সে থাকে। বৃদ্ধা দিনরাত শাপান্ত করে। ক্রাচের ধার দিয়ে মেয়েটিকে মারে। এসব পীড়নের কারণ মেয়েটি বৃদ্ধার কথামতো কাজ করে না। বৈঁচি কুড়োতে যায় না। বৈঁচি ফল না আনলে রাতের খাওয়া হবে না। মারের ভয়ে ক্যাথরিন বৈঁচি কুড়োতে যায়। সেখানে লুকিয়ে দেখে পাঁচ-ছটি ওর বয়সি ছেলেমেয়ে নগ্ন হয়ে স্নান করছে, আনন্দ করছে, ছোটাছুটি করছে। ওরা কত স্বাধীন ওরা কত মুক্ত। ওরা যৌবনকে কি সুন্দর কাজে লাগাচ্ছে। বৈঁচি ফল বৃদ্ধার জন্য কুড়িয়ে আনে। বৃদ্ধা গোগ্রাসে বৈঁচি খাচ্ছে। কিন্তু ক্যাথরিনকে টেনে নেয় পুনরায় সেই নদীর তীর, সেই চারণ-ভূমি যেখানে পাঁচ-ছটি নগ্ন

ছেলেমেয়ে স্নান করছে, ছোটাছুটি করছে। সে পুনরায় রাতে সেখানে যায়। গাঢ় অন্ধকারে ক্যাথরিন কিছুই দেখতে পায় না। শুধু ওদের আনন্দঘন গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিল। তাদের গলায় সুরের মূর্ছনা শুনে ক্যাথরিন বুঝতে পারছিল ওরা ঝোরার জল ছেটাচ্ছিল আর জলের ধারে ঘাসে ছাওয়া তীরের ওপর নগ্ন হয়ে শুয়ে ছিল। এসব ভাবনা ক্যাথরিনকে হতাশ করে। হতাশা ওকে নাটকীয়ভাবে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। ছোটোগল্পকার গল্প শেষ করেছেন, 'কুয়াশা বিদীর্ণ করে সকালের প্রথম রশ্মি রাস্তায় শুয়ে থাকা ওর দেহটাকে ছুঁল। অন্ধকার ভেদ করে ছুটে আসা গাড়ি ঘণ্টা খানেক আগে ওর শরীরটাকে প্রাণহীন করে দিয়ে গেছে।...ও ছিল নগ্ন।...একটু স্মিত হাসিতে ওকে মনে হচ্ছিল সেরা সুন্দরী। এ রূপ এ অঞ্চলে ছুটে চলা ভ্রমণার্থীরা কখনও দেখেনি।' এই গল্পের অনুবাদক রত্না দাশগুপ্ত। অনুবাদে আড়ষ্টতা আছে। টানটান সরলতা নেই। বিদীর্ণ, রশ্মি, উচ্চকিত, ভ্রমণার্থী—অনুবাদে এসব শব্দের ব্যবহার সাবলীলতাকে নষ্ট করে। মাইনের দিন, অতিথি গল্পের অনুবাদক সব্যসাচী দেব। তার অনুবাদেও আছে আড়ষ্টতা কোনো কোনো জায়গায়, সাবলীল হয়নি। কিছু উদাহরণ, দরজার পাশের গাছ থেকে তোলা পিচটা, আমি তাকে বিদায়-সম্ভাষণ, পচা খচ্চর-মাংসের দুর্গন্ধ, অজস্র বিরাট চেহারার শিকারী পাখি, পড়ন্ত সাইপ্রেস গাছের নীচে চাপা পড়েছিল, ইত্যাদি। পাশের, অজস্র, পড়ন্ত এসব শব্দের ব্যবহার ভাষার দিক থেকেও সাবলীল নয়।

এই কালেকশানে দুটি অনুবাদ আছে। (১) আমার বাবার রাজনৈতিক নিয়োগ, (২) যে রাতে বাবা বাড়ি ফিরেছিলেন। এই দুটি অনুবাদ আদৌ ছোটোগল্প নয়। আর্স্কিন কল্ডওয়েলের 'জর্জিয়া বয়' নামে বিখ্যাত উপন্যাসের একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় দুটো এখানে অনুবাদ করে ছোটোগল্প বলে বিভ্রান্ত করা হয়েছে পাঠককে। এই বইয়ের সম্পাদক সব্যসাচী দেব একটি ভালো ভূমিকা লিখেছেন। সেই ভূমিকাতেও তিনি এই ত্রুটির কথা উল্লেখ করেননি বা কি কারণে ওই দুটি অধ্যায় ব্যবহার করেছেন তার সঠিক ব্যাখ্যাও দেননি। হয়তো তার নজর এড়িয়ে গেছে। তবু একটু বলি, 'যে রাতে বাবা বাড়ি ফিরেছিলেন' অধ্যায়ে গল্পকার আমেরিকার নিম্ন মধ্যবিত্তের মায়ের মাতৃত্বকে এবং আমাদের দেশের ওই শ্রেণির মায়ের মাতৃত্বকে এক আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। ওই অধ্যায়ে মা মার্থা বলছেন, 'এই বাড়িতে যা চলছে ওর মধ্যে কী করে একটি শিশুকে আমি বড়ো করে তুলি'। এ যেন আমাদেরও মায়ের কথা। অতএব ওদের সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি বলে আলাদা কিছু নেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

এই আলোচনার উপসংহারে সব্যসাচী দেবের কথা দিয়ে শেষ করছি 'বস্তুত আমেরিকার ধনতান্ত্রিক সমাজের যে চোখ ধাঁধানো, বর্ণোজ্জ্বল সুখী চেহারাটা নানা রচনা এবং হলিউড চলচ্চিত্রের সুবাদে সারা পৃথিবীর সামনে প্রচারিত, কল্ডওয়েলের রচনায় পাওয়া যায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত এক ছবি'। এবং এটাই সত্যিকারের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চেহারা। এটাই শ্রেণিবিভক্ত, বর্ণবিভক্ত আমেরিকান সমাজের স্পষ্ট চেহারা।

তলস্তয়ের ছোটোগল্পে তৎকালীন রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিবেশ

১

রাশিয়ার চমৎকার বৈপ্লবিক পরিবেশের মধ্যেই লিও বা লেভ তলস্তয়ের জন্ম (১৮২৮) এবং মৃত্যু (১৯১০)। তলস্তয়ের জন্মের আগে থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই বিপ্লবের ধারা অব্যাহত ছিল। ১৮৬১ সালের অনেক আগে থেকেই রাশিয়ায় আরম্ভ হয়েছিল সামন্তযুগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব।

১৮৬১ সালের অনেক আগে থেকেই রাশিয়ার কৃষকসম্প্রদায় জমির সঙ্গে ছিল আমরণ বাঁধা। চাষিদের গণ্য করা হত জমিদারের অন্যান্য সম্পত্তি, যথা লাঙল-ঘোড়ার মতো খুবই প্রয়োজনীয় উৎপাদক সম্পত্তি। সেজন্য চাষিদের খুশি মতো চলাফেরার বা জমিদারের সামান্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করার বিন্দুমাত্র অধিকার ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদের সূচনায় শ্রমিকের অফুরন্ত প্রয়োজন দেখা দিল রাশিয়ায়। বুর্জোয়াদের প্রয়োজন হল প্রচুর শ্রমিকের। স্বভাবতই বুর্জোয়ারা তাদের স্বার্থের প্রয়োজনে জমিদারের অত্যাচার নিপীড়নের হাত থেকে ভূমিহীন চাষিদের বাঁচাবার জন্য সজাগ হল এবং নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এল। জমিদারের চূড়ান্ত শোষণে ও অত্যাচারে কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে আগে থেকেই তীব্র অসন্তোষ জমতে শুরু করে দিয়েছিল। সেজন্য ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তারুতিনোর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করার পর কৃষকদের কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ শোনা গেল—'আমরা অত্যাচারী আক্রমণকারীদের কবল থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছি। আর এখনও আমাদের মালিকরাই আমাদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে।' এরপর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভূমিদাসরা প্রায়ই বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিল। ১৮১৮-১৮২০ সালে ডন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভূমিদাসদের এক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সে সময় জার সম্রাটের সৈন্যবাহিনীতেও অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রচন্ডভাবে দেখা দিয়েছিল। কৃষক বিদ্রোহের নেতা ছিলেন গেরাসিম কুরিন। সামন্তবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে এবং কৃষক বিদ্রোহের সপক্ষে প্রথম যে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছিল, তাঁদের বলা হত 'ডিসেম্‌ব্রিস্ট' (রুশভাষায় দেকাব্রিস্ত)। তাঁদের প্রথম বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে, ১৮২৫ সালে। এই ডিসেম্‌ব্রিস্টদের মধ্যে অনেকেই জমিদারী শ্রেণিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শ্রেণিধর্ম ও সম্পদ ত্যাগ করে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে ভূমিদাস প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন এবং ওই প্রথাকে তাঁরা দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ মনে করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ জার-সৈনিকের সহায়তায় এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের উচ্ছেদ, ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তি

এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন। ডিসেম্‌ব্রিস্ট নেতাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন প্যাভেল পেস্তেল। তিনি রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কয়েকজন বিখ্যাত বিপ্লবী কবি, যথা, কনড্রাতি, রিলিয়েভ এবং আলেকজান্ডার বেস্তুজেভ, ডিসেম্‌ব্রিস্টদের সমর্থনে কবিতা লিখে সাক্ষ্য রেখে গেছেন। এইসব বিপ্লবী কবিরাও চাইতেন প্রজাতন্ত্র শাসন, ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ, এবং কৃষকদেরকে ভূমি বন্টন। কবি রিলিয়েভ বিদ্রোহের নেতৃত্বও দিয়েছেন, বলেছিলেন 'আমাদের বিনাশ অনিবার্য। কিন্তু আমাদের দৃষ্টান্ত হবে চিরস্মরণীয়' কিন্তু ডিসেমব্রিস্টদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যর্থ হওয়ার পর জারের শাসকগোষ্ঠির হাতে নেতা পেস্তেল ও কবি রিলিয়েভের ফাঁসি হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছিল এই, পরবর্তীকালে নির্ভীক রুশ বিপ্লবের পতাকা হাতে নিয়ে ভূমিদাস প্রথা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে-চালাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে। অবশেষে ১৯১৭ সালে অক্টোবর মাসে যখন বিপ্লবের চরম সমাপ্তি ঘটল, তখন লেনিন প্রথমেই গিয়েছিলেন ডিসেম্‌ব্রিস্ট শহিদদের সমাধিক্ষেত্রে অর্ঘ্য দান করতে।

তলস্তয় কিন্তু ডিসেম্‌ব্রিস্টদের বৈপ্লবিক চেতনাকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তাদের বীরত্বকে অস্বীকার করতে পারেননি। এ বিষয়ে ভিক্টর শখ্‌লভস্কি বলেন : Tolstoy did not believe in revolution, though he admired the Decembrists : The Decembrists were religious, fearless man, and I think of them with increasing respect.

আর সে সময় থেকেই মানুষের হতাশা, লালসা, স্বার্থপরতা, ধর্মান্ধতা রাশিয়ার সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত করেছিল। স্বৈরতান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক শাসনের জন্য মধ্যবিত্ত মানুষের সুখ নেই, শান্তি নেই। শিক্ষার সংকোচ, শ্রেণিবৈষম্য, স্বার্থপুষ্ট অভিজাতদের সস্তা আমোদ-প্রমোদ। এক শ্রেণির মানুষ-এর হাত থেকে আমূল মুক্তি চাইছে, ভূমিদাস প্রথার শোষণের হাত থেকে মুক্তি। অন্য শ্রেণির মানুষ চাইছে সংস্কার, ধর্মীয় সংস্কার। মুষ্টিমেয় শ্রেণি চাইছে শুধুমাত্র নিজের উন্নতি এবং ভোগের পরিবেশ। আর তারই পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক বৈপ্লবিক পরিবেশও সেসময় রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে গড়ে উঠেছিল। তলস্তয়ের বড়ো গল্প 'সুখের সংসার'-এ সেসময়কার বিপ্লবী কবি লের্মন্তভের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই 'বিদ্রোহী সে কার ঝড়, দুর্যোগ, যেন শান্তি পাবে ঝড়ে'। ভূমিদাস প্রথার দুঃসহভাব, কৃষকদের ওপর জমিদারদের অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়ন, জারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং সামাজিক অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি পটভূমিকে আশ্রয় করে তখনকার বহু রুশ সমাজসচেতন লেখক-কবি-শিল্পী বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট রচনা সৃষ্টি করেছিলেন।

পুশকিনের 'ইয়েভজনি ওনেগিন', লের্মন্তভের 'এ হিরো অফ আওয়ার টাইম', গোগলের 'ডেড সোল' এবং তুর্গেনিভের 'এ স্পোর্টস ম্যানস্ কোচেস্' ইত্যাদি রচনাবলিতে ভূমিদাস প্রথার অচলতা, গির্জার ধর্মান্ধতার ফলে অচল সমাজ ব্যবস্থা, সত্য ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য আকুলতা ইত্যাদি বিষয়বস্তু ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে

উল্লেখযোগ্য। এই সব মূল্যবান সৃষ্টি পাঠকদের সমাজচেতন বৈপ্লবিক স্তরে উন্নীত করেছিল এবং সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল। শিল্পী প্যাভেল ফেদোতোভের প্রতিভাদীপ্ত চিত্রাঙ্কনগুলিতে ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চিত্রিত হয়ে আছে, বিশেষ করে 'দি মেজরস্ কোর্টশিপ', 'ফিদেলকাম ডেথ' ছবি দুটিতে।

ডিসেম্ব্রিস্ট বিদ্রোহের পর বৈপ্লবিক আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে। ক্রমবর্ধমান সামাজিক পুঁজিবাদী এবং অচল সামন্তবাদী সমাজ-এ দুয়ের মধ্যে অসঙ্গতি ও বিরোধ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠল। তলস্তয়ের প্রাপ্ত যৌবনকালেই এই তীব্র সংকট রাশিয়ায় দেখা দিল। ১৮৫৩ সালে শুরু হল ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। তলস্তয় এই জার-সরকারের হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন ২৫ বৎসর বয়সে। ১৮৫৬ সালে শর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধের অবসান হয়। এই দুঃসহ শর্ত প্রমাণ করে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও প্রাণশক্তিহীনতা। অবশেষে ১৮৬১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি ভূমিদাসদের মুক্তি দিলেন জার সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্দার। কিন্তু পুরো শর্তটাই ছিল চালাকি। কৃষকদের বলা হয়েছিল বিনামূল্যে সব জমি তাদের কাছে হস্তান্তরিত করা হবে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল সামন্তবাদী বন্ধন থেকে এই মুক্তি নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কৃষকরা পেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট জমির টুকরো। এইভাবে তাদের উপার্জিত অর্থ পুনরায় মালিক ও মহাজনদের পকেটেই ফিরে গেল।

পুনরায় কৃষকরা প্রাক্তন মালিকদের অধীনেই দাস হতে বাধ্য হল। জমিদাররা পূর্বের মতোই চাষিদের ওপর অত্যাচার চালাতে লাগল। তলস্তয়েরও অনেক জমি ছিল। তিনি ছিলেন বিশাল জমিদার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। অতএব তলস্তয়ের কাছেও ব্যক্তিগত জমির স্বার্থই প্রধান, ভূমিদাসদের স্বার্থ নয়। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থাকেই তিনি প্রথম প্রথম মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে সংস্কারপন্থী ও মানবতাবোধে অনুপ্রাণিত হওয়ায় উদারনীতির কথাবার্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, কাজে কর্মে নয়। তবে জমি হাতছাড়া করেননি। পরিবারের নামে লিখে রেখেছিলেন।

অতএব এমত ভূমিদাস প্রথা রোধের বিরুদ্ধে পুনরায় কৃষক সম্প্রদায় সজাগ হল। কৃষকেরা তাদের আনুষ্ঠানিক মুক্তির জবাব দিল বিদ্রোহের মাধ্যমে। মাত্র এক বৎসরের মধ্যে এই ধরনের বিদ্রোহের সংখ্যা ছিল এক হাজার। তখন তলস্তয়ের বয়স ত্রিশের কোঠায়। এসময় তাঁর কোনো গল্পে বিদ্রোহের প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পড়েনি।

২

তলস্তয়ের শৈশবকাল থেকেই রাশিয়ান শিল্পসাহিত্যে দুটি ধারা বর্তমান ছিল। (১) সরকারের এবং জমিদারদের অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং শোষিত মানবজাতির পক্ষে শিল্প-সাহিত্য। (২) সকল শ্রেণির মানবজাতির প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে শিল্প-সাহিত্য। সারা বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যে শ্রেণি-সংগ্রামের ভিত্তিতে এটাই দু-লাইনের সংগ্রাম। স্বভাবতই জমিদার শ্রেণির লোক তলস্তয় দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাহিত্যের জগতে

প্রবেশ করলেন। তলস্তয়ের পিতা ছিলেন জমিদার এবং অত্যাচারী। তিনি জার সরকারের সৈন্যবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে কাজ করতেন। তলস্তয়ও জারের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। এর পর তলস্তয়ের উচ্চশিক্ষা ছিল। রাশিয়া ছাড়াও আরবি ও তুর্কী ভাষা জানতেন। শ্রেণিসূত্রে তাঁর মধ্যে ছিল জমিদারি ও সামন্তবাদী মনোভাব। ভোগবিলাস ও নারী লালসা তার মধ্যে ছিল প্রধান। শিক্ষাসূত্রে তাঁর মধ্যে ছিল অভিজাত শ্রেণির আভিজাত্যবোধ। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন সরকারের প্রতি অনুগত। নামসূত্রে তিনি ছিলেন সিংহের মতো বলশালী। লেভ মানে সিংহ এবং তলস্তয় মানে শক্তিশালী। এমত সামাজিক অবস্থান থেকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন, ক্রীতদাসবৎ কৃষকদের ওপরে জমিদারদের নিষ্ঠুর জুলুম ও নির্দয় অত্যাচার। সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন, যুদ্ধের বীভৎসতা ও গরিব মানুষদের ওপর সরকারের অত্যাচার ও নিপীড়ন। লক্ষ্য রেখেছেন, মধ্যবিত্তদের ওপর অভিজাত সম্প্রদায়ের জুলুম। অনুভব করেছেন, নারী ধর্ষণের জন্য বিবেকের দ্বন্দ্ব, মানবিকতার দংশন। অতএব তলস্তয়ের মধ্যে দেখতে পাই সামন্তবাদের সংকট ও দ্বন্দ্ব। এইসব দ্বন্দ্বের প্রতিফলন তাঁর সৃষ্টিতে কি উপন্যাসে, কি ছোটোগল্পে, কি নাটকে প্রত্যক্ষভাবে এসেছে। সামন্তবাদের বিরোধিতা করেননি, মানবিক ও খ্রিস্টান দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংস্কার করতে চেয়েছেন। সামন্তবাদের বিরুদ্ধে যে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ সমাজে ও সাহিত্যে সংঘটিত হচ্ছিল তা থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বিচ্ছিন্ন ছিলেন বলেই ভূমিদাস প্রথা বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি গল্প-উপন্যাস লেখেননি। প্রেমের কাহিনি লিখতে গিয়ে সমালোচনা করেছেন মাত্র। আবার ভূমিদাস প্রথার বীভৎসতা গল্প-উপন্যাসে উল্লেখ করেও সরাসরি বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমর্থন করতে পারেননি। যার জন্য ম্যাক্সিম গোর্কি রেগে গিয়ে তলস্তয়কে ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে চিঠি লিখে জানালেন—"In these grim times when blood is flowing on the soil of your country, and when hundreds and thousands of decent, honest people are dying for the right to live like human beings, instead of cattle (ব্যক্তিগত সম্পত্তি), you whose word is heeded by the whole world, find it possible merely to repeat once again the fundamental idea behind your philosophy 'Moral perfection of individuals' is the aim and meaning of life for all people."

গোর্কির রেগে যাওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। রাশিয়ার বৈপ্লবিক ঘটনা সম্পর্কে (১৯০০-১৯০৫) বিদেশি সংবাদপত্র যখন তলস্তয়ের কাছে জানতে চাইলেন, তখন তলস্তয় সেই পত্রিকায় 'রাশিয়ার সামাজিক আন্দোলন' নামে বিপ্লববিরোধী এক প্রতিক্রিয়াশীল প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

তলস্তয়ের ওপর লেনিনের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্লেষণেও দেখতে পাই, তিনি মহান শিল্পীকে বা তাঁর প্রতিভাকে, কলমের শক্তিকে অস্বীকার করেননি। লেনিন অস্বীকার করেছেন, তিনি দৃপ্ত প্রতিবাদ করেছেন তলস্তয়বাদকে যা ছিল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর। লেনিন তলস্তয়ের ওপর যে প্রবন্ধ লিখেছেন

'লেভ তলস্তয়—রুশ বিপ্লবের দর্পণ' তার অপব্যাখ্যা করে অনেক সমালোচক বোঝাতে চান যে তলস্তয়ের লেখা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দর্পণ। এটা ভুল ব্যাখ্যা। ওই প্রবন্ধে লেনিন শুরু করেছেন, "মহান শিল্পী যে বিপ্লবকে (১৯০৫-১৯০৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) স্পষ্টতই বুঝতে পারেননি। যার থেকে তিনি স্পষ্টতই রয়েছেন ফারাকে তারই সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখানোটাকে আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত এবং কৃত্রিম হতে পারে।' যে দর্পণ সবকিছুকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে না সেটাকে তো দর্পণ বলা শক্ত। লেনিন দর্পণ বলতে এখানে বলতে চেয়েছেন 'বাস্তবিকই তার একখানা দর্পণ হল তলস্তয়ের অভিমতের অসঙ্গতিগুলো।' তলস্তয়ের ধারণাগুলি হচ্ছে 'আমাদের কৃষক বিদ্রোহের দুর্বলতর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর একখানা দর্পণ।' লেনিন স্পষ্টই তলস্তয়বাদকে দোষারোপ করে বলেছেন যে তলস্তয়বাদ ছিল প্রথম বৈপ্লবিক অভিযানের পরাজয়ের সবচেয়ে গুরুতর একটা কারণ।

৩

অতএব অতি সহজেই কথাটা খুবই স্পষ্ট, তলস্তয়ের জীবনসীমা রাশিয়ার যে বৈপ্লবিক পরিবেশে ও অগ্নিগর্ভ সামাজিক অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সেই পরিবেশের কোনো প্রভাব তাঁর লেখা গল্প কাহিনির ওপর নেই। যদিও কিছু গল্প কাহিনিতে এসে গেছে বিপ্লবের নেতিবাচক দিকগুলো। এগুলো ছাঁটাই করলে দেখা যাবে কাহিনির মূল বিষয় অভিজাত শ্রেণির অবক্ষয়, ভন্ডামি। নরনারীর দৈহিক প্রেমাবেশ ও নিউটেস্টামেন্টের চিন্তাভাবনা মাত্র।

রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা সে সময় ছিল অগ্নিগর্ভ। কয়েকটি উদাহরণ : কলে কারখানায় মজুর ছাঁটাই, সশস্ত্র পুলিশ দ্বারা ধর্মঘট দমন, গ্রামের পঞ্চায়েত কুলাকদের (ধনীচাষি) প্রভুত্ব এবং গরিব চাষিদের রক্তশোষণ। সে সময় চাষিদের ঘোড়া লাঙল ছিল না। গরিব চাষিরা নিজেদের জমি কুলাকদের দিতে বাধ্য হতো ও নিজেরা ক্ষেতে মজুর হয়ে খাটতো। এই পঞ্চায়েত তলস্তয় সমর্থন করেছিলেন। ঘোরতর অসঙ্গতির জন্য গরিব কৃষকদের ভোগ করতে হয়েছিল দুঃসহ যন্ত্রণা ও নিষ্ঠুর নিপীড়ন। তলস্তয়ের যৌবনকালেই শিকার থেকে ফিরে এসে রাশিয়ার জমিদারেরা কৃষকের মুন্ডচ্ছেদ করত। না, তলস্তয়ের গল্পকাহিনিতে পাঠকেরা পড়ে এসব জানতে পারবে না। শোষকের অত্যাচার নিষ্ঠুরতা এবং শোষিতদের রুখে দাঁড়াবার কাহিনি তলস্তয় পছন্দ করতেন না।

ইতিবাচক বৈপ্লবিক পরিবেশের ভিত্তিটা ছিল সে সময় ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে, শোষণ ও অতিরিক্ত মুনাফাজনিত পুঁজিবাদী সংকটের বিরুদ্ধে, জার ও অনুগত আমলাদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, গণজাগরণ এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে ব্যাপক গণসংগঠন। তলস্তয়ের সময়কালেই বৈজ্ঞানিক বৈপ্লবিক পরিবেশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মার্কস, এঙ্গেলস। তারও পরবর্তীকালে প্লেখানভ এবং তরুণ লেনিন। অথচ মার্কস সমসাময়িক সাহিত্যিক তুর্গেনেভ ও শেচেদ্রিন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তলস্তয়ের বিশ্বজোড়া সাহিত্য নিয়ে কোনো আলোচনা বা কথা বলেননি। তলস্তয়ের

গল্পকাহিনি বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাবাদের বিরুদ্ধে তুলে ধরেছে শ্রেণিহীন মানবিক প্রেম, গীর্জাহীন খ্রিস্টধর্ম এবং শ্রেণিসংগ্রামহীন অহিংসা। বাইবেলের নিউটেস্টামেন্ট দ্বারা প্রভাবিত তলস্তয়বাদের ওই তিনরকম অবস্থা ছিল তৎকালীন রাশিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবেশ সৃষ্টির চরম পরিপন্থী। শুধু বাইবেলের নিউটেস্টামেন্ট নয়, সমাজতান্ত্রিক চীনে বিতর্কিত কনফুসিয়াস ও বুদ্ধের দ্বারাও তলস্তয় প্রভাবিত ছিলেন।

আসলে তলস্তয় বুর্জোয়া মানবতাবাদী ছোটোগল্পকার। জারের যুদ্ধ এবং বিপ্লববাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ উভয়ের মধ্যে তিনি একই রকম নিষ্ঠুরতা দেখেন। শ্রেণিসংগ্রামকে বা আরও সরলীকরণ কথায় সমাজকে তিনি বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ দিয়ে বুঝতে চান না। সমাজকে তিনি ব্যাখ্যা করেন ধর্মীয় আইডিয়া দিয়ে এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে, সামাজিক কার্য-কারণ সম্পর্ক এড়িয়ে গিয়ে। সেজন্য তাঁর গল্পকাহিনি দুশ্রেণির। প্রথম শ্রেণির গল্পকাহিনিতে প্রকাশ পেয়েছে তলস্তয়ের অভিজ্ঞতাবাদ। অভিজ্ঞতাবাদ দিয়ে বিচার করেছেন যুদ্ধের বীভৎসতাকে এবং অভিজাত পরিবারের ভন্ডামিকে। দ্বিতীয় শ্রেণির গল্পকাহিনিতে প্রকাশ পেয়েছে খ্রিস্টবাদ।

তলস্তয়ের প্রথম দিকের গল্পকাহিনি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত। সতেরো বৎসর বয়সেই তিনি জারের হুসার বাহিনিতে যোগ দেন। তারই অভিজ্ঞতা 'দুই হুসার' গল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপর ১৮৫২ সালে জারের গোলন্দাজ বাহিনিতে যোগ দেন। সে সময়ে পাহাড় অঞ্চলে একটি অভিযানের পর 'আক্রমণ' নামে একটি গল্প লেখেন। ভূমিদাস থেকে মুক্ত-প্রয়াসী কৃষকদের এড়িয়ে গিয়ে চেচেন্‌দের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানকে ভিত্তি করে 'কসাক' নামে একটি বড়ো গল্প লিখলেন। সৈনিকের অত্যাচার ও নরনারীর যৌনসম্পর্ক এই গল্পে পাঠকদের টেনে রাখে। নিজের ব্যক্তিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও নানা ধরনের রুশ সৈনিকদের জীবনধারা নিয়ে চমৎকার গল্প লিখলেন 'বনানী ধ্বংস'। একবার তলস্তয় এক হোটেলে যান। সেখানে তিনি শোনেন এক ভবঘুরে গায়কের গান। রাস্তাঘাটে, হোটেলে গান গেয়ে পয়সা উপার্জন করাই তার জীবিকা। দামি ও অভিজাত হোটেলের বাবুরা তার গান শুনে একটা ফুটো পয়সাও ভবঘুরে গায়ককে দেয় না, এই নিয়ে তিনি লিখলেন 'ল্যুসের্ন' গল্প। বুর্জোয়া সমাজের শূন্যগর্ভ নীতিবোধ চাবুকের মতো ফুটে উঠল এই গল্পে।

জনৈকা ধনী মহিলার যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু, একজন কৃষকের শান্ত মৃত্যু এবং একটি ভূপতিত বৃক্ষের নীরব মৃত্যু—এই তিনটি মৃত্যুকে নিয়ে তিনি গল্প লিখলেন খ্রিস্টধর্ম প্রভাবিত "তিনটি মৃত্যু"। এই পর্যায়ের গল্পগুলো অভিজাত শ্রেণির ভন্ডামি, প্রতারণা, যৌনতা, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা এসব দেখানো হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এই সকল গল্পে অনুপস্থিত।

তলস্তয় ১৮৫১ সালের মাঝামাঝি একবার রেইড করতে গিয়েছিলেন। তারই ভিত্তিতে 'রেইড' গল্পটি লেখা। 'রেইড' গল্পটির প্রথমে নাম ছিল 'ককেশাস থেকে একটি চিঠি'। এই গল্পের ভিতর দিয়ে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে এন্টি-ওয়ারের আদর্শকে তলস্তয় ফুটিয়ে তুলেছেন। তখন রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামী আন্দোলন

চলছিল। সেই আন্দোলনের কোনো ছাপ এই গল্পে নেই। এবং ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন নিয়ে তিনি সে সময় কোনো গল্প লেখেননি।

এ সময় আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'সুখের সংসার'। উল্লেখযোগ্য এই কারণে যখন রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামী আন্দোলন চলছে এবং জারের সৈন্যবাহিনি বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেসময় সরকারি চাকুরে তলস্তয় লিখলেন একটি নিটোল উজ্জ্বল প্রেমের গল্প, 'সুখের সংসার'। এই গল্পে তিনি প্রেমের মহিমাকে উজ্জ্বল করে মানবপ্রেমকে মুক্তির পথ হিসেবে অঙ্কিত করেছেন। অল্পবয়সি স্ত্রী ও দ্বিগুণ বয়সি স্বামীর মধ্যে সংসারের অশান্তি ও ভুলবোঝাবুঝি সন্তানসন্ততির পর একমাত্র ভালোবাসার দ্বারা মিটিয়ে ফেলা যায়। তলস্তয় তারই কাহিনি লিখেছেন। এই গল্পটির দুর্বার রোমান্টিকতা এতো মুগ্ধ করে যে আবেগশীল পাঠকের কাছে নরনারীর দৈহিক ও মানসিক অসঙ্গতিগুলো ধরা পড়বে না। গল্পটিতে তলস্তয়ের প্রথম জীবনের প্রেমিকার ছায়াপাত ঘটেছে। জমিদার কন্যার জবানীতে গল্পটি বলা হয়েছে। এ সময় অর্থাৎ ১৮৫০-৫১ সালের মধ্যে তিনি হৃদয়বৃত্তির উন্নতির জন্য 'A soldier's Herald' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। সেখানে তিনি কয়েকটি নীতিধর্মী ছোটোগল্প লেখেন, তার একটি, 'বৃক্ষের পতন'। এর পরবর্তী দশক থেকে তলস্তয় গল্পকাহিনির ব্যাপারে যৌনতার সঙ্গে আপস করলেন। ভিক্টর শখ্‌লভ্‌স্কী 'লেভ তলস্তয়' গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনশো পঁয়ত্রিশ পাতায় লিখেছেন "at the end of the 1880 Tolstoy was engaged in writing stories and also articles on the subject of sex." এ সময়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন ক্রোয়েটজার সোনাটা, ফাদার সিয়েৰ্গি, দি ডেভিল ইত্যাদি গল্পকাহিনি এবং যৌন-আপসের পক্ষে একটি প্রবন্ধ 'On Relations between Sexes'. আর এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮১ সালের ১ মার্চ সশস্ত্র বিপ্লবীরা জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে বোমা মেরে হত্যা করে। আশির-দশকে রাশিয়ায় পঞ্চাশটি কারখানায় ৮০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়েছিল। জারের সশস্ত্র সিপাহী ধর্মঘট দমন করার আদেশ পায়। চারদিকে শ্রমিকেরা তারই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। অনাহার, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে নিজস্ব কায়দায় লড়ছে। কারণ কয়েক বছর আগে প্যারি কমিউনের (১৮৭১, ১৮ই মার্চ) প্রতিরোধ লড়াই থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তলস্তয়ের লেখায় প্যারী কমিউনের প্রভাব নেই। কার্ল মার্কসের কণ্ঠস্বর রাশিয়ার শ্রমিকরা শুনতে পেয়েছিল, 'কমিউন, প্রকৃত অর্থে শ্রমিক শ্রেণির একটি শাসন ব্যবস্থা যে শাসন ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত এমন একটি রূপ নিয়েছিল, যার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক শোষণ-মুক্তি সম্ভব ছিল।' কিন্তু জীবিত কার্ল মার্কসের কণ্ঠস্বর তলস্তয়ের কানে পৌঁছায়নি। এসব সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা থেকে তলস্তয় সরে গিয়ে বাইবেলের নিউটেস্টামেন্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লিখলেন 'ক্রোয়েটজার সোনাটা'। রাশিয়ার অভিজাত পরিবারের দীর্ঘ কাহিনি ক্রোয়েটজার সোনাটা। গল্পে বাইবেলের কাহিনির প্রভাব আছে। এই কাহিনিতে স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করছে যে, গানের শিক্ষকের সঙ্গে স্ত্রীর যৌনসম্পর্ক আছে। পরে স্বামী স্ত্রীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। যৌন-সন্দেহ মানুষকে কীভাবে তিলে-তিলে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে তারই বীভৎস রসের কাহিনি। যে

প্রেম, অহিংসা, বিনয় মানুষকে মানবিক ও সংবেদনশীল করে তোলে যা তলস্তয়বাদের উপাদান, সেখান থেকেও তলস্তয় সরে এসে নেতিবাচক ইতি টেনেছেন কাহিনিটিতে। অথচ তলস্তয় বিঠোফেনের গান ভালোবাসতেন বলেই কাহিনির নামকরণে বিঠোফেনের গানের কলি ব্যবহার করেছেন।

সামাজিক বাস্তবতার বিচারে এই কাহিনিটি যে প্রতিক্রিয়াশীল সামান্য উদাহরণেই ধরা যায় 'চাষি বা মজুরের ছেলেপুলে দরকার, অন্নসংস্থান করা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে, কিন্তু তবু ওদের ছেলেপুলে দরকার। কিন্তু আমাদের মতো লোকের (অভিজাত ধনী) বেশি ছেলে চাই না। কেবল বাড়তি ঝামেলা। ভবিষ্যতে সম্পত্তি ভাগাভাগি। ওরা হল বোঝা।' 'ক্রোয়েটজার সোনাটা'য় তলস্তয়ের পিতৃতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে যা সে সময়ে বিপ্লবকালীন অবস্থার পরিপন্থী। 'তলস্তয়ের স্ত্রী এই গল্প পড়ে রুষ্ট হয়েছিলেন। তিনিও একটি পালটা গল্প লিখেছিলেন। সেটা ছাপা হয়নি। জার তৃতীয় আলেকজান্দারের স্ত্রী এই কাহিনি পড়ে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তারই কথায় এই বইটি সে সময় নৈতিক কারণে, কখনোই রাজনৈতিক কারণে নয়, নিষিদ্ধ হয়েছিল। লেনিনও বলেন, 'ক্রোয়েটজার সোনাটা'য় নিজ মতাদর্শে অটল থেকে তলস্তয় বলেছেন, নারীর মুক্তি কলেজে নয়, পার্লামেন্টে নয়, সেটা শয়ন কক্ষে।'

'ডেভিল' গল্পটি অনেক আগে লেখা হলেও তলস্তয়ের মৃত্যুর পর বের হয়েছে। এখানেও সেই স্বামী-স্ত্রীর যৌন-সন্দেহ। চাষিনীর সঙ্গে স্বামীর যৌন সম্পর্ক আছে জানতে পেরে শিক্ষিত স্ত্রী স্বামীকে দোষারোপ করে। স্বামী তারপর চাষিনীকে হত্যা করে এবং পরে নিজে আত্মহত্যা করে। গল্পটি জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই নেওয়া। পারিবারিক অশান্তির ভয়ে এই গল্পটি তলস্তয় অনেক বছর লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এই সময়ের আরও একটি বিষণ্ণ দীর্ঘ গল্প 'ইভান ইলিচের মৃত্যু'। যৌনতার সঙ্গে অধ্যাত্ম জীবনের ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট। মৃত ইভান ইলিচের শয্যাপার্শ্বে তাঁর স্ত্রী ভাবছেন, কতটা পেনসন তিনি পাবেন। তিনি যা পাবেন বুঝে নিতে হবে, আদায় করতে হবে। মৃতের শয্যাপার্শ্বে বন্ধুরা ভাবছে, আর কতক্ষণ শোকের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে। ক্লাবে যেতে হবে। তাস খেলতে হবে। শবানুগামীরা ভাবছে, সমাধি কর্মের শেষে কৃপণ ইভানের বিধবা স্ত্রী ভালোভাবে খাদ্য পানীয় দেবে তো? ইভানও জীবিতকালে জীবনের চারদিকে দেখেছে অন্যদের মিথ্যাচার। এই গল্পের প্লট নিয়েছেন, তারই এক আইনজ্ঞ বন্ধু যে তুলা নামক স্থানে ক্যানসারে মারা গিয়েছিল। এই গল্পেও তখনকার কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাব নেই। অভিজাত পরিবারের ভন্ডামির কাহিনি।

'ফাদার সিয়ের্গি' একটি বড়ো গল্প। ফাদার সিয়ের্গি জনৈক রূপবান রাজপুরুষ। বর্মধারী অশ্বারোহী সৈন্যদলের সেনাপতি। সম্রাট প্রথম নিকোলাইয়ের স্ত্রীর রাজ-পরিচারিকার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তারপর হঠাৎ বিয়ের মাসখানেক পূর্বে চাকরি ছেড়ে, অল্প বিষয় সম্পত্তি বোনকে দিয়ে সন্ন্যাসী হবেন বলে মঠে চলে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে তার নাম হয় ফাদার সিয়ের্গি। ফাদার সিয়ের্গি গল্পটি এক যৌনতাড়িত সন্ন্যাসীর গল্প। ১৮৯৮ সালে যখন তলস্তয়ের বন্ধুবৎসল লেখক গোর্কিকে রাজনৈতিক কারণে জেলে বন্দি করে রাখা হয়, সে সময় এই যৌনতাড়িত বড়ো গল্পটি

বের হয়। আর এই সময় লেনিনের শ্রমিক শ্রেণির 'মুক্তি সংগ্রাম সংঘ' স্থাপিত হয়। সময়টা ছিল রুশদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ারের সময়। প্রায় ৩০০০ হাজার ছোটো-বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এক লক্ষের ওপর মজুর বেকার ছিল। তাদের অন্নকষ্টের কথা সে সময় ভাবা যায় না। এসব সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন গল্পটিতে তলস্তয় আঙুল দিয়ে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন—মঠ বা গির্জা হচ্ছে এক-একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ফাদার সিয়ের্গি হচ্ছে সেই ব্যবসার মূলধন। তিনি ধর্মীয় লোকদের কাছে মহান সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ, এক কথায় ভগবান। কিন্তু তিনি জানেন, তিনি কে? তিনি সামান্য মানুষ যাকে যৌনতা সর্বদা তাড়া করে। তিনি দেখিয়েছেন দুমুঠো অন্নের জন্যই সবাই ধর্ম করে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবার জন্য নয়। অবশেষে ফাদার সিয়ের্গি স্বীকার করেন, তিনি দর্শন প্রার্থীদের ধর্মের মুখোশ পরে ঠকাচ্ছেন। অবশেষে তিনি গল্পের প্রায় শেষ সীমায় এসে বলে ওঠেন, 'আমি সাধু সন্ত নই। আমি পাপী। নোংরা, ব্যাভিচারী, ঈশ্বরদ্বেষী, প্রতারক।' 'ফাদার সিয়ের্গি' সম্পর্কে গোর্কির কঠোর বাস্তব মন্তব্য Lev Tolstoy does not like people, no. He only sets in judgement on them, and he judges harshly, very, very harshly. I do not like his idea of God either. What sort of God is this. It is a particle of Count Lev Tolstoy and not God... (Letters : Gorky).

'বল নাচের পর' ছোটোগল্পটি তলস্তয়ের শেষ বয়সের লেখা একটি অসাধারণ প্রেমের গল্প যে প্রেমের সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন একটি সামাজিক সম্পর্ক। বল নাচের সময় এক যুবক কাজান শহরের কোনো এক সামরিক অধিনায়কের কন্যার প্রেমে পড়েন। মেয়েটিও যুবকের প্রেম নিবেদনে সাড়া দেয়। পিতার সম্মতি নিয়ে মেয়েটি যুবককে তার বাড়িতে বল নাচের পরের দিনও আসতে বলে। যুবকটির, শুধু মেয়েটিকে নয়, হাসিখুশি প্রাণস্ফূর্তিতে ভরপুর মেয়ের বাবাকেও ভালো লাগে। কিন্তু তার পরদিন যখন যুবক সেই মেয়েটির বাড়ি যায় তখন দেখে মেয়েটির বাবা পলাতক এক তাতার সৈন্যকে (সৈন্যটি বড়ই গরিব এবং নিম্নশ্রেণির) বেত্রাঘাত করে যাচ্ছেন যতক্ষণ না সে মারা যায়। এই নিষ্ঠুর দৃশ্যটি যুবকটিকে মেয়েটির প্রেম থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় শ্রেণি সচেতনতার দিকে। সে মেয়েটিকে ত্যাগ করে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক পরিবেশ স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিস্তার লাভ করে। সে সময় তলস্তয় শেষ বড়ো গল্প লেখেন, 'হাজি মুরাদ'। আসলে এটি একটি উপন্যাস। হাজি মুরাদ মুসলমান নয়, খ্রিশ্চিয়ান নয়, প্রতিমার পূজারী নয়। হাজি মুরাদ একজন যোদ্ধা মাত্র যে যোদ্ধা কৃষকদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে। কিন্তু কৃষকদের এই স্বাধীনতা বাইবেল দ্বারা অনুশাসিত। কৃষকদের এই স্বাধীনতা যা তলস্তয় ওই গল্পকাহিনিতে বলতে চেয়েছেন, লেনিনের পথে সমাজতান্ত্রিকতার জন্য হাজি মুরাদের যুদ্ধ নয়। সেটা ছিল কৃষকদের শুধুমাত্র খাজনা মকুবের জন্য। এটাই হাজি মুরাদের যুদ্ধ।

তলস্তয়ের দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলোতে চাষি-মজুররা এসেছে বাইবেলের অনুশাসন শুনতে এবং জীবনকে সে ভাবে ঠিকঠাক করে নিতে। তলস্তয় বাইবেলের

(নিউটেস্টামেন্ট) অনুশাসন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গল্পগুলো লিখেছেন। যখন তিনি এই গল্পগুলো লিখতে শুরু করেন তখন ক্রিমিয়া (১৮৫৩) ও বুয়োরের (১৮৯৯) যুদ্ধের পর রাশিয়ার জনসাধারণ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে ঝুঁকছে। রাশিয়ার প্রায় এক হাজার যুবক বৈপ্লবিক প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে কৃষকের পোষাকে সজ্জিত হয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে একদল কৃষকদের উত্তেজিত করে বিদ্রোহ করার আশা নিয়ে এবং বাকিরা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করার জন্য গ্রামের মধ্যে গিয়েছিল। রাশিয়ার বিপ্লবী যুব সমাজের এই অভিযান 'জনগণের মধ্যে যাওয়া' নামে পরিচিত ছিল। একদিকে কৃষকদের মধ্যে স্বাধিকার অর্জনের লড়াইয়ের জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রচার ও সংগঠন, অপরদিকে কৃষকদের মধ্যে খ্রিস্টবাদ ও খ্রিস্ট অনুশাসন প্রচারের জন্য তলস্তয়ের লেখনী ধারণ। প্রথমটি প্রগতিশীল, অপরটি প্রগতিবিরোধী অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল। গল্পগুলো আলোচনা করলেই এর তাৎপর্য ধরা পড়বে।

একটি গল্পের নাম 'যেখানে প্রেম সেখানে ভগবান'। মার্টিন এবডিশ নামে এক মুচির পরিবার নিয়ে গল্প। মুচির সবাই ছিল, স্ত্রী পুত্রকন্যা। সবাই মারা গেছে। কেন মারা গেল। অভাবে, অনটনে? কোন্ সামাজিক দোষে মারা গেল? গল্পে এসব নেই। সবাই মারা যাবার পর মুচির নিঃসঙ্গতাকে নিয়েই গল্প। এবার এবডিশ কিভাবে বাঁচবে? তলস্তয় পথ দেখালেন, আর্তের সেবা কর। গরিব মানুষের সেবা কর। এই সেবা করাটাই মুক্তি। তাহলে তো এটাই পথ তলস্তয়ের যে ধনী শোষণ করবে, সম্পত্তির সম্পদ ভোগ করবে এবং গরিব গরিবের সেবা করবে। এই গল্পে তলস্তয় গরিব মুচিকে নিউ টেস্টামেন্ট পড়তে উপদেশ দিয়েছেন। এবং বলেছেন, যিশু পাপী-তাপী শ্রমিকদের মধ্য থেকেই তাঁর শিষ্যদের বেছে নিতেন। তলস্তয় ধরেই নিয়েছেন শ্রমিকরা পাপী। যারা শ্রম বেচে বেঁচে থাকে, তারা কি ধরনের পাপ করে?

এ রকম আরও একটি গল্প গড়ে উঠেছে দরিদ্র মুচি ও তার স্ত্রীকে নিয়ে। গল্পের নাম 'মানুষ কিসের দ্বারা বাঁচে?' দরিদ্র মুচি পরিবারের দুঃখ কষ্টের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন তলস্তয়, 'প্রতিবেশিদের ভালোবাসলেই সমাজের দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে'। যখন মুচি শুনল তাদের গ্রামের এক মহিলা মৃত মায়ের তিনকন্যাকে আশ্রয় দিয়েছে, তখনই মুচি বুঝতে পারল যে গরিব হলেও অপরকে সাহায্য করতে হবে প্রেমের দ্বারা। এই গল্পেও একজন মানবরূপী ঈশ্বরের ভূমিকা আছে, নাম সাইমন। এখানেই সামাজিক ব্যাপারটা স্পষ্ট। নিশ্চয়ই গরিবেরা সমাজে ভালোবাসা পায় না। উচ্চ শ্রেণির কাছ থেকে পায় নির্দয় নিষ্ঠুর ব্যবহার। অতএব উচু শ্রেণির লোকেরা যাই ব্যবহার করুক, তোমরা সবাইকে ভালোবাসো। কারোর সম্পত্তির প্রতি হিংসা কোরো না। তলস্তয় এটাই চান।

'অনুশোচনাকারী পাপী' নামে তলস্তয় এক পাপীকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। যে সতেরো বৎসর পাপময় জীবনযাপন করেছে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সে ঈশ্বরের কাছে অনুশোচনা করেছে। মৃত্যুর পর সে স্বর্গে প্রবেশ করতে চাইলে সেন্ট পিটার তাকে তাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু সেন্ট জন্‌ও যখন তাকে তাড়াতে চাইল তখন পাপীটি বলল 'স্বর্গীয় জন তুমিই তো লিখেছো ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। তোমরা প্রত্যেককে ভালোবাসিও'। শুনে জন্‌ পাপীকে স্বর্গের দুয়ার খুলে দিলেন। অতি কৌশলে তলস্তয় সমাজে পাপ ও পাপীকে স্বীকৃতি দিয়ে বসলেন। অর্থাৎ যত খুশি পাপ কর, তবে মৃত্যুর পূর্বে কাল্পনিক ঈশ্বরের কাছে অনুশোচনা করলেই হল। প্রসঙ্গত বলি, তলস্তয় নিজেই এক সময় আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত ছিলেন।

তলস্তয়ের কালেই প্রচারিত, শ্রেণি বিরোধের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা অর্থনৈতিক্‌ কারণ। সেটা তলস্তয় অস্বীকার করে বলেন, তার মতে খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসের অভাবই হল সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য এবং বিরোধের কারণ। 'প্রভু ও ভৃত্য' গল্পটির ভিতর দিয়ে তলস্তয় সে কথাই বলতে চেয়েছেন। প্রভুর নাম ভ্যাসিলি এবং ভৃত্যের নাম নিকিতা। প্রভু ভ্যাসিলি দূর-গাঁয়ের কোনো এক ভূ-স্বামীর কাছ থেকে সবার আগে সস্তায় কাঠ কেনার জন্য বিকাল বেলাতেই নিকিতাকে নিয়ে শ্লেজ গাড়িতে করে রওনা দিয়েছে। আবহাওয়া শীতল এবং তুষার ঝড় বইছে। এই দুর্যোগময় আবহাওয়াতেও ভ্যাসিলি যাচ্ছে। কারণ ভয়, যদি কেউ আগে পৌঁছে যায়। তাহলে সে সস্তায় কাঠ কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু বাইরের ভীষণতম ঠান্ডা ভ্যাসিলিকে প্রচুর গরম জামা গায়ে থাকা সত্ত্বেও কাবু করে ফেলল। কিন্তু নিকিতার সামান্যতম আলখাল্লাও নেই। তবুও তাকে ঠান্ডা কাবু করতে পারল না। কারণ সে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ঈশ্বরকে ডাকছে। কিন্তু একবারও নিকিতা গরম পোষাক নেই বলে প্রভুকে অভিশাপ দিচ্ছে না। পরের দিন ভোরে গিয়ে যখন কাঠ কেনার জায়গায় পৌঁছল শ্লেজ গাড়িটি, দেখা গেল ভ্যাসিলি নিকিতার ওপর মরে পড়ে আছে। আর নিকিতা প্রভুর চাপে বেঁচে আছে। তলস্তয় বলতে চেয়েছেন, অর্থের লোভে ভ্যাসিলি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল, তাই সে মারা গেছে। আর নিকিতার অর্থ নেই, সেজন্য নিকিতার ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাবার ভয়ও নেই, তাই সে বেঁচে গেছে। আসলে নিকিতা প্রভুর উষ্ণ চাপে বেঁচে গিয়েছিল। এবং তলস্তয় কৌশলে বলতে চেয়েছেন যে অর্থ থাকলেই মানুষ ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে অতএব বিশ্বের সকল দরিদ্রগণ, সর্বদা অর্থবিমুখ থেকো। আসলে সমাজে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরা ধর্মের ভয়ে নিজেরা কখনও কাতর হয় না। তারা ভালোভাবেই জানে, ঐশ্বরিক সুখের চেয়ে ঐশ্বর্যের সুখ অনেক বড়ো। সেজন্য শোষিতরা যাতে ঐশ্বর্যের সুখের জগতে প্রবেশ করতে না পারে তারজন্য ধর্মের ভয় তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। তলস্তয়ের সেই মনোভাবের পরিচয় এই গল্পে পাওয়া যাচ্ছে। তলস্তয়ের ধর্মীয় নৈতিকতাকে বাদ দিলে গল্পের সমাপ্তিতে আছে সমাজ-সচেতন শিল্পীর পরিচয়।

ঐশ্বর্যে যে সুখ নেই, আজীবন ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েও একথা প্রচার করে গেছেন তলস্তয় এবং যেহেতু সামন্ত প্রভুরা বা পুঁজিবাদীরা অপরের শ্রমে নিজেদের দেহ মনকে সুস্থ রাখে। তলস্তয় গরিবদের শ্রম করে যেতে উপদেশ দিয়েছেন 'ইলিয়াস' গল্পে। ইলিয়াস এবং শামশেমাগি, স্বামী-স্ত্রী। একসময়ে তাদের প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল, সন্তান-সন্ততি ও তাদের স্ত্রীদের কলহ, পশু মড়ক ও চাষবাসের ফলন কম ইত্যাদির জন্য তাদের ঐশ্বর্য নষ্ট হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে ইলিয়াস ও তার স্ত্রী গরিব হয়। তখন একমাত্র বেঁচে থাকার জন্য

তারা অপর এক ঐশ্বর্যশালী প্রতিবেশীর বাড়িতে শ্রমের বিনিময়ে কাজ করে। সেখানে প্রতিবেশীর অতিথিরা যখন তাদের দুরাবস্থার কথা জানতে পারল, তখন তারা ইলিয়াস ও শামশেমাগিকে প্রশ্ন করল "আচ্ছা ঠাক্‌মা, আগেকার সুখ আর এখনকার দুঃখ সম্পর্কে তোমার মনের কথাটা বলতো।" শামশেমাগি উত্তর দেয়, "যতদিন ধনী ছিলাম কখনও সুখ পাইনি। কিন্তু আজ যখন আমরা ভাড়াটে মানুষের মতো বেঁচে আছি তখন আমরা পেয়েছি সত্যিকারের সুখ। তখন দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার সময় ছিল না। আর এখন দুশ্চিন্তা নেই। সময় আছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার। পঞ্চাশ বছর ধরে সুখ খুঁজে খুঁজে এতদিনে পেয়েছি।" অতিথিরা হেসে উঠল।

কৌশলে তলস্তয় এই মন্ত্রই দিয়ে গেছেন উত্তরসূরীদের যে অপরের ভাড়াটে মজুর হয়ে থাকাটাই সুখের। তবে কাজের ভেতরেই মানুষ বেঁচে থাকে, সমাজ-সচেতনতার এই বাস্তবতাটাও এই গল্পে বুঝতে পারা যায়।

জমির লোভ নিয়ে গড়ে উঠেছে "একজন মানুষের কতটা জমি দরকার"। গল্পটি বহু আলোচিত এবং বিখ্যাত। তলস্তয় মনে করেন, গরিব কৃষকেরা বেশ সুখে শান্তিতে আছে। তাদের কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। কারণ তাদের লোভ নেই, অল্পেতেই সন্তুষ্ট। এরপরেও যদি কোনো গরিব কৃষকের জমির প্রতি তীব্র লোভ থাকে তাহলেই লোভ নামক দুই শিংঅলা শয়তান তাদের ওপর মরণ কামড় বসাবে। যেমন এই গল্পে গরিব পাখোমের ওপর লোভ নামক শয়তান মরণ কামড় বসিয়েছে। গল্পটি দুইবোন ও জমির প্রতি লোভকে নিয়ে। এক বোন গরিব, গ্রামে থাকে। স্বামীর সামান্য চাষবাস। অন্য বোনটি ধনী, শহরে থাকে। স্বামীর মহাজনী কারবার। ধনী বোনটি গরিব বোনের স্বামী পাখোমের কানে বড়োলোক হওয়ার ও বেশি জমি কেনার মন্ত্র দিল। এতে কিন্তু গরিব বোনের সায় ছিল না। একজন মজুর সঙ্গে নিয়ে পাখোম জমি কিনতে যায় বাসকিরদের দেশে, ভলগা নদীর তীরে। বাসকিরদের সর্দার স্টার্শিনা পাখোমকে খুশি মতো জমি দিতে রাজি হল ১০০০ রুবলের বিনিময়ে। তবে শর্ত একটাই। পাখোমকে যত জমি চায় তত জমি ঘুরে চিহ্ন দিয়ে ফিরে আসতে হবে সূর্যাস্তের আগে। পাখোম রাজি হয়। টুপিতে রাখা রুবল স্টার্শিনার পায়ের কাছে রেখে একটি ছোটো পাহাড় থেকে সে রওনা হল। সে উর্বর জমিতে একের পর এক দাগ বসাতে বসাতে অনেক দূর চলে গেল, সূর্যাস্তের কথা ভুলে গিয়ে। পাহাড়, পাহাড়ের চূড়ায় বাসকিরদের ও স্টার্শিনা, কাউকেই আর দেখা যাচ্ছে না। যখন সূর্যাস্তের কথা মনে পড়ল, তখন দেখল সূর্য পশ্চিম প্রান্তে একেবারে ঢলে পড়েছে। তখন সে ক্লান্ত, তবু সে ছুটতে আরম্ভ করল। ছুটতে-ছুটতে গায়ের জামা, জলের ও খাবারের পাত্র সব ফেলে দিল। এভাবে ছুটতে-ছুটতে সে পাহাড়ের তলায় এসে পড়ে গেল। সে পুনরায় উঠে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে লাগল। বাসকির দল তাকে ক্রমাগত করতালি দিয়ে উৎসাহিত করতে থাকে। পড়তে-পড়তেও একবার দু'হাত বাড়িয়ে দিল টুপিটার দিকে, সেটাকে স্পর্শ করল একবার। পাখোমের মজুর ছুটে গেল প্রভুর কাছে। অচেতন পাখোমকে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার মুখ থেকে অবিরাম রক্তের স্রোত বইছে। অবশেষে তাকে কবর দেওয়া হল। মাত্র ছ'ফুট জমি লাগল। এই গল্পের মধ্যে

একটি উপকাহিনি আছে যা নাকি গল্পের ফর্মের গুরুত্বকে নষ্ট করেছে। তা না হলে তলস্তয়ের এই গল্পটি ফর্ম হিসেবে চমৎকার। 'প্রভু ও ভৃত্য' গল্পের মতোই গল্পের কাঠামো মজবুত। কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু উদ্দেশ্যমূলক। যেখানে জমির জন্য সে সময় রাশিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ প্রায়ই ঘটত সেখানে এ রকম একটি গল্প লেখার উদ্দেশ্য কি কৃষককে জমির লড়াই থেকে সরিয়ে আনা? এই গল্পটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আন্তন চেখভ লিখেছেন 'গুজবেরিজ' গল্পে 'ধর্মীয় মতে হয়তো বলা যায় যে মানুষের মাত্র সাত ফুট মাটি দরকার কিন্তু তা শুধুমাত্র একটি মৃতদেহের জন্যই যথেষ্ট। একটি মানুষের প্রয়োজন সাত ফুটের বেশি, গোটা ভূ-সম্পত্তির চেয়েও বেশি। বস্তুতপক্ষে গোটা পৃথিবীটাই প্রয়োজন'।

তলস্তয় 'সময় থাকতে আগুন নেভাও' গল্পে বলেন, 'আমি যদি তোমাকে আঘাত করি, তুমি অপর গাল পেতে দিয়ে বলবে, আমি যদি দোষ করে থাকি আমাকে মার'। 'না-প্রতিরোধে'র চিন্তাভাবনা সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে এবং সামাজিক শোষণকে শক্তিশালী করে। তলস্তয়ের ওই গল্পে আছে সম্পদশালী দুই চাষি প্রতিবেশী। তাদের নাম গাভরিল ও ইভান। এরা প্রায়ই মারামারি করত, আদালতে যেত। ইভানের বৃদ্ধ বাবা সন্তানকে বুঝিয়ে দিলেন যে এভাবে বিবাদ করলে তোমাদেরই ক্ষতি। যার জন্য ইভানের বাবা স্বশ্রেণির সঙ্গে বিবাদ করত না। অবশেষে ইভান বাবার শিক্ষা মেনে নিয়ে গাভরিলের সঙ্গে হাত মেলাল। অর্থাৎ গ্রামের দুই সামন্ত প্রভু গ্রামে প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য নিজেদের মধ্যে বিবাদ চিরদিনের জন্য মিটিয়ে নেয়।

মনিব-শ্রমিকের সম্পর্ক 'শিব ও শয়তান' নামক গল্পে দেখাতে গিয়ে তলস্তয় বলেছেন, শ্রমের বিনিময়ে মনিবকে যদি ক্রীতদাসেরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট রাখতে পারে তাহলে মনিবও ক্রীতদাসদের সুখে রাখে। মনিব ও ক্রীতদাসদের শান্তিপূর্ণ সমঝোতা অনেকে সহ্য করতে পারে না বলেই একশ্রেণির শয়তান তাদের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করে। এখানে শিব হচ্ছে মনিব এবং শয়তান হচ্ছে শ্রমিক নেতা। এই শয়তান সকল ক্রীতদাসকে বলে, 'আমরা ভালোভাবে আমাদের মনিবের সেবা করি, তাঁকে খুশি রাখতে সব কিছু করি। তাকে খুশি করা বন্ধ করে দাও, একদিন তাঁর স্বার্থে ক্ষতি কর, দেখবে তিনিও অন্য সব খারাপ মনিবদের মতো আরও খারাপ ব্যবহার করবে'। অবশেষে ক্রীতদাসরা নেতার কথা মতো তার কথা প্রমাণ করল। কিন্তু মনিব উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে এবং অন্যান্য ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখার জন্য দাসনেতাকে জেলে না পুরে তার পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দিয়ে চাকরি থেকে ছাঁটাই করল। মালিকের বিপক্ষে শ্রমিক আন্দোলন বানচাল করে দেওয়ার এতবড়ো শিক্ষা তলস্তয়ই দিয়ে গেছেন তার গল্পের ভিতর দিয়ে। কারণ পুনরায় বলি, সে সময় রাশিয়ায় মালিক-শ্রমিকের মধ্যে শ্রেণি সংগ্রাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্লেখানভ। পরবর্তীকালে লেনিন।

তলস্তয়ের দুটি গল্প যথাক্রমে 'যে শস্যের দানা ছিল ডিমের মতো দেখতে' এবং 'ক্ষুদে শয়তান কি করে প্রায়শ্চিত্ত করল' বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ এই দুটি গল্পে খ্রিস্টিয় সমাজবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় যা নাকি অনেক দুঁদে সমালোচক ওই দুটি গল্পের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করে তলস্তয়কে একজন সমাজবাদী বলে এবং চূড়ান্তরূপে প্রগতিশীল বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। প্রথম গল্পটিতে বৃদ্ধ কৃষককে জার প্রশ্ন করছেন, 'জমি কার?' বৃদ্ধ

কৃষক উত্তর দেয় 'ভগবানের'। পৃথিবী তখন ছিল মুক্ত। কেহ পৃথিবীকে তার বলে দাবি করবে না। যে মানুষের যতটা শস্য প্রয়োজন ততটাই সে পেত। মালিকের বাড়তি শস্য কিভাবে সমাজকে ক্ষতি করে এমন চিন্তাভাবনার উচ্চারণ আছে দ্বিতীয় গল্পটিতে। এই প্রসঙ্গে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যের থিয়রির সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও তলস্তয়ের চিন্তাভাবনায় বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের স্থান নেই, আছে খ্রিস্টিয় সমাজবাদের স্থান।

তলস্তয়ের এই যে বিশ্বাস 'অহিংসার শক্তি হল একটি আত্মিক শক্তি এবং মানুষ যদি এই শক্তি অর্জন করতে পারে তাহলে মানুষের পশুশক্তি পরাজিত হবে'-এর মূলে আছে যিশু এবং বুদ্ধদেব। তলস্তয় 'মোমবাতি' গল্পের ভিতর দিয়ে এই বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করেছেন। এক জমিদারের এক গোমস্তা ছিল। এই গোমস্তাটি অত্যন্ত দাম্ভিক ও ভয়ংকর অত্যাচারী। গোমস্তার নির্দয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সেই অঞ্চলের সকল চাষি ক্ষেপে যায়। কারণ গোমস্তা ধর্মে আঘাত করে নির্দেশ জারি করেছেন যে ইস্টার পর্বেও চাষিদের মাঠে চাষ করতে যেতে হবে। চাষিরা জানে ধর্মীয় পর্বে কাজ করা মানে পাপ করা। তারা পাপ করতে চায় না। কিন্তু গোমস্তার অত্যাচারের কথা ভেবে তারা গোমস্তাকে হত্যা করবে বলে স্থির করে। একজন বৃদ্ধ চাষি এই পরামর্শে বাধা দেয়। সেই বৃদ্ধ চাষিটি গোমস্তার আদেশ মতো ইস্টারের পর্বের দিনও লাঙলের ফলায় মোমবাতি জ্বালিয়ে চাষ করে এবং ইস্টারের প্রার্থনার গান গায়। এই দৃশ্য দেখে অত্যাচারী গোমস্তা অহিংসক ও বিনয়ী গোমস্তায় পরিবর্তিত হয়। গোমস্তার প্রতি দৈহিক ও আর্থিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষিদের সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে সরিয়ে এনে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য চাষিদের সংগ্রাম দেখিয়েও আপসের দিকে সরে এসেছেন। একমাত্র অহিংসা নীতিকে রাশিয়ার বিপ্লবকালীন অবস্থায় এস্টাব্লিস্ট করার জন্য। এটি হৃদয় পরিবর্তনের গল্প।

এজন্যই লেনিন তলস্তয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রয়োগ করে বলেন 'আমাদের একালে তলস্তয়ের মতবাদকে আদর্শ স্থানীয় করে তোলা. তাঁর 'না প্রতিরোধ', 'পরমাত্মার' উদ্দেশ্যে তার আবেদন, নৈতিক আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁর উপদেশ, তাঁর বিবেক আর বিশ্ব প্রেমের উপদেশ, তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনা আর শান্তভাবের প্রচার ইত্যাদিকে ন্যায্য প্রতিপন্ন বা সহনীয় করে তোলার প্রত্যেকটা চেষ্টার ফলে অতি প্রত্যক্ষ এবং অতি প্রগাঢ় ক্ষতি হয়।'

তলস্তয়ের কাছে যুদ্ধ এবং বিদ্রোহ বা বিপ্লবের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। সেজন্য তলস্তয়ের প্রথম পর্যায়ের গল্প-কাহিনি যুদ্ধের বীভৎসতা, অভিজাত সম্প্রদায় ও শাসকগোষ্ঠীর ভন্ডামি, প্রতারণা, মিথ্যাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে স্বাভাবিক এবং আন্তরিক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অপরদিকে যখন রাশিয়ায় শ্রেণিসংগ্রাম, কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক কৃষকের পক্ষে সশস্ত্র অভ্যুত্থান, এবং মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাধারা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তলস্তয় তখন ওই সবের বিরোধিতা করে দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পকাহিনিতে শ্রেণিসহযোগিতা, অহিংসা, প্রেম, বিনয়, এক কথায় খ্রিস্টিয় সমাজবাদের পক্ষে লেখনি ধারণ করেছিলেন। তলস্তয়বাদ খ্রিস্টিয় সমাজবাদেরই একটি ধারা বিশেষ। তলস্তয়ের বিশেষভাবে নীতিপ্রধান ছোটোগল্পগুলো সমাজতান্ত্রিকতার বৈপ্লবিক পরিবেশের প্রচন্ড পরিপন্থী এবং সমাজে শোষণকে জিইয়ে রাখার জন্য তলস্তয়বাদ প্রচন্ড

রকমের শক্তিশালী হাতিয়ার। যার উত্তরসাধক এখনও আছে কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে দেশে এবং বিদেশে।

কৃষকদের সঙ্গে তলস্তয়ের তীব্র মেলামেশা থাকলেও তিনি কৃষকদের ভিতর বৈপ্লবিক চেতনাকে আবিষ্কার করতে পারেননি, বরং কৃষকের সারল্যকে বিভ্রান্ত করেছেন। এ বিষয়ে গোর্কি এক চিঠিতে তলস্তয়ের বিরুদ্ধে প্রচন্ড অভিযোগ করে বলেছেন, 'তিনি রাশিয়ার কৃষকদের চিনতে-বুঝতে পারেননি।'

মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে অবশেষে তলস্তয় বুঝতে পারেন সামাজিক শোষণকে। তিনি বলেন, 'অভিজাতের বৈভব সমারোহ যে শুধুমাত্র ক্ষেত-মজুরের আর চাষি মেয়েদের চাষের ফলে হয়েছে তাই নয়। আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে মানুষের রক্ত শোষণ করেই হয়েছে।' সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক পরিবেশের, শ্রেণি-সংগ্রামের এবং মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষের বিরুদ্ধে তলস্তয়বাদকে প্রতিষ্ঠিত করার অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তিনি শেষ বয়সে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পথকে মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। গোর্কি সে কথা স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন, 'তলস্তয় বলেছেন, 'বাইবেলের কতকগুলি উক্তি বড়ই জটিল, যেমন ধরা যাক এই পৃথিবী ঈশ্বরের এবং তার সমৃদ্ধিও'। উক্তিটির অর্থ কি? ধর্মশাস্ত্রের দিক থেকে ধরতে গেলে উক্তিটির কোনো সার্থকতাই নেই, বরং জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের গন্ধই যেন তা থেকে বার হচ্ছে।'

এই তলস্তয়। মহান মানবিক তাকেই বলব যিনি নিজের ভুল একদিন না একদিন বুঝতে পারেন এবং নিজের কাছে পরাজিত হয়েও তা সকলের কাছে স্বীকার করতে পারেন।

এতদিন যে ঈশ্বর তলস্তয়ের চিন্তাজগতে, আত্মার জগতে ও লেখার জগতে একছত্র নায়কের মতো অবস্থান করত, তাকেও তলস্তয় শেষ বয়সে বিদায় দিয়েছেন। শেষ বয়সে ডায়েরিতে তলস্তয় উল্লেখ করেন, "I dreamt of denial of God" সেই ডায়েরি পড়ে গোর্কি লিখেছেন, "In the diary which he (Tolstoy) gave me to read I was amazed by his strange euphuism (ফাঁকা কথার রচনাশৈলী) "God is what I wish".

ফ্রানৎস কাফকার আত্মকথা পর্যালোচনা

ফ্রানৎস কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) আত্মজীবনী লেখেননি। তবে তাঁর জীবনী লেখা হয়েছে। তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রড লিখেছেন। না লিখলেও কাফকা আত্মকথা লিখেছেন চিঠিতে ডায়েরিতে এবং আত্মকথা নিয়ে ডোরার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেছেন। তিনি বাবাকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন পয়ত্রিশ বছর বয়সে। তবে ঐ চিঠিটি তিনি শেষপর্যন্ত পোস্ট করেননি। বাবার হাতে পৌঁছোয়নি। কাফকার মৃত্যুর পর কাফকার পাণ্ডুলিপির স্তূপ থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাক্স ব্রড চিঠিটিকে উদ্ধার করেন এবং প্রকাশ করেন। এর আগে কাফকা উনত্রিশ-ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম প্রেমিকা ফেলিস বাওয়ার নামে এক অভিজাত চাকরিরত মহিলাকে প্রচুর চিঠি লেখেন। তাঁর প্রেমবার্তা এবং অন্যান্য বিষয় জানিয়ে দেন। ফেলিস বাওয়ারের বয়স তখন পঁচিশ। প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি বা তারও বেশি কাফকা চিঠি লিখেছিলেন, প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে, চিঠি লেখা শুরু করেন ১৯১২ তে, শেষ করেন ১৯১৯ সালে। কাফকার শেষ প্রেমিকা ডোরা ডায়মন্ত। এখানে চিঠির প্রসঙ্গ আসে না। তবে ডোরা ডায়মন্ত কাফকা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানিয়েছেন কথাবার্তায়—সাক্ষাৎকারে এবং নানারকম বক্তব্যে। কাফকার প্রিয় বন্ধু (সম্ভবত ১৯০৪ সাল থেকে বন্ধুত্ব) ম্যাক্স ব্রডের সঙ্গে কাফকার কথাবার্তা থেকে কাফকার নিজস্ব কথাবার্তা জানতে বুঝতে পারা যায়। এইসব লেখালেখি ও কথাবার্তা থেকে ফ্রানৎস কাফকা আত্মজীবনী না লিখলেও আত্মজীবনীর যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়। মানুষ কাফকাকে চিনতে-বুঝতে অসুবিধা হয় না। রাগ-ক্রোধ-ঘৃণা-প্রেম-দায়িত্ববোধ শূন্যতা-হতাশা-বিষণ্নতা-উৎফুল্লতা-কল্পনা-রোমান্টিকতা এবং মেধা—এ সব নিয়েই কাফকাকে পাওয়া যাবে তাঁর ডাইরিতে এবং চিঠিপত্রে, ডোরাতে এবং ব্রডেতে। তাঁর নিজের কথা, নিজের পরিবারের কথা, নিজের অনুভবের কথা, নিজের সাহিত্য-সৃজনের কথা সহজ সরল ভাবে, কোনোরকম ভণিতা না করে বলতে পেরেছেন। সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কেও নিজের ধ্যান-ধারনার কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি, অকপটে বলেছেন। কথা-সাহিত্যিক কাফকাকে পাঠক চেনেন, জানেন তাঁর ব্যতিক্রমী শিল্প-সত্তাকে। এ নিয়ে সারা বিশ্বে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এমনকি তাঁর লেখা এক সময় অনেক দেশে নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু মানুষ-কাফকাকে আমরা এই সব সৃজনশীল লেখালেখির মধ্যে যথেষ্ট খুঁজে পাই না। যদিও তাঁর গল্পে-উপন্যাসে তাঁর বাবা-মা-বোন প্রভাব ফেলতে পেরেছে। সেটাও জানতে বুঝতে হলে পড়তে হয় নিখুঁতভাবে তাঁর চিঠিপত্র-ডাইরি এবং ফ্রানৎস কাফকা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়, ছড়ানো-ছিটানো সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয়টি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা

আলোচনার সূত্রপাত, যা মানুষ-কাফকাকে বুঝতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার আশায় থাকব।

(ক) পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ফ্রানৎস কাফকা

নিঃসঙ্গ-নীরব-হতাশ-বিষণ্ণ-একাকী-চুপচাপ থাকা কাফকাকে পরিবার-বিচ্ছিন্ন বলা যাবে না। পরিবার নিয়ে এবং পরিবারের কাছেই তিনি থাকতে ভালোবাসেন। পরিবারের আর্থিক চাপকে তার অসহ্য ও নির্দয় মনে হলেও, বাবা-মার প্রতি রাগ-ক্রোধ-ঘৃণা থাকলেও, তবু তিনি বলেন 'মা আমাকে স্নেহ করেন যতখানি ঠিক ততখানি বুঝতেও ভুল করেন। অবশ্য সেটা স্নেহের ফল। ...মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বেশ উন্নতি হয়েছে। এখনও হচ্ছে। আমাদের ধমনীর বয়ে যাওয়া রক্ত যে একই, এই বোধ, কিছুটা কার্যকরী হতে শুরু করেছে।' ফলত তিনি পরিবারের মানসিকতা থেকে সরে যাননি। পলায়ন মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। মা সম্পর্কে লিখেছেন, 'হতভাগী মা আমার। কিন্তু আমি তো তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আবেগে জড়িয়ে ধরে চুমু খাই এবং শেষ অব্দি তাঁর ঠোঁটে হাসিও ফুটিয়ে তুলি'। টাকা-পয়সার হিসেব-নিকেষ ভালো করতেন। লিখেছেন, 'তাড়াহুড়ো করে সুদের অঙ্ক কষলাম। তারপর মাকে এক হাজার ক্রোলেন এর বণ্ড কেনার পরামর্শ দিলাম'। পরিবার সম্পর্কে কাফকার কথা জানতে পারি প্রথম প্রেমিকা ফেলিসের বাবা কার্ল বাওয়ারকে লেখা একটি চিঠিতে : বিগত কয়েক বছরে মায়ের সঙ্গে দিনের কুড়িটির বেশি কথা আমি বলিনি, বাবার সঙ্গে প্রতিদিন 'হ্যালো' ছাড়া খুব বেশি কিছু বলেছি বলে আমার মনে হয় না। ...আসলে পারিবারিক জীবনবোধটাই আমার নেই।' মা তাঁর অন্তরবাসিনী, কিন্তু মায়ের বাইরের আচরণের উদাসীন বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন কখনো, কখনো।

যৌবনপ্রাপ্ত সময় থেকেই তাকে চাকরিতে নামতে হয়। নানাধরনের চাকরি তিনি করেছেন। ফলে অনেক ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও তাঁর পারিবারিক দায়বদ্ধতা ছিল। তবু তিনি বাবা-মায়ের ডাকা সান্ধ্য আসরে উপস্থিত থাকতেন। বাড়িতে বোন ও তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে সময় কাটাতেন। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে কাফকাই ছিলেন বড়ো। তাঁর দুই ছোটো ভাই গেয়র্গ কাফকা (জ. ১৮৮৫) পনেরো মাস বেঁচে ছিলেন এবং হেইনরিখ কাফকা (জ. ১৮৮৯) ছ'মাস বেঁচে ছিলেন, শিশু অবস্থাতেই মারা যান। বাকি তিন বোনের নাম এলি-ভালি-ওটলা। ওটলা ছিল কাফকার প্রিয় ছোটো বোন। একবার কাফকা ফেলিসকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন, 'না, আমি আমাদের পরিবার ছেড়ে একা থাকি না'। ঠাকুমার প্রতি কাফকার ছিল অগাধ গভীর টান। ঠাকুমার মৃত্যু সম্পর্কে কাফকা লিখেছেন, 'ঠাকুমা মারা যাওয়ার সময় শুধুমাত্র নার্সই তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন। নার্স বলেন, মারা যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ঠাকুমা বালিশ থেকে একবার মাথা তুলেছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল তিনি কাউকে খুঁজছেন। তারপরেই তিনি শান্তভাবে মাথাটা নামিয়ে নেন এবং মারা যান'। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ঠাকুমার এই নিঃসঙ্গতাবোধ কাফকার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল নিশ্চয়। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে ঠাকুমা কোনো আত্মীয়স্বজন বা ঘনিষ্ঠ কাউকে দেখে যেতে পারলেন না। কাফকার এই উদ্ধৃতি, কাফকার এই অনুভব। এখান থেকেই

জন্ম নিতে পারে কাফকার মানবিকতাবোধ। পরবর্তীকালে মানবিক সম্পর্ক নিয়ে কাফকা প্রিয় বোন ওটলার সঙ্গে গভীর আলোচনা করতেন। তিনি লিখেছেন, 'আমরা দুজনেই, ওটলা এবং আমি, সমস্ত মানবিক সম্পর্কের ব্যাপারে কি মারাত্মক ভাবেই না ফেটে পড়ি।'

বোন ওটলার বাড়িতে কাফকা যেতেন, থাকতেন। ওটলা দু-একটি ছবি করেছিলেন স্বল্প দৈর্ঘ্যের। কাফকা ওটলার ছবি দেখতেন, আলোচনা করতেন। ওটলার ছবিতে কৃষিজীবী ও জনগণের প্রাধান্য থাকত। কাফকা অনুভব করেছেন যে সমস্ত জনগণ তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে কোনো না কোনো কারণে বাধা পেয়ে হাত গুটিয়ে বসে, ওটলার কৃষিজীবী নায়ক তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। এভাবে ওটলার ছবি দেখে কৃষকদের অনুপ্রেরণা কাফকাকে উৎসাহিত করে। কাফকা মনে করতেন তাঁর ছোটো বোন 'ওটলা যথেষ্ট শক্ত ধাতের মেয়ে, সে একবার এক অচেনা শহরে খুব সুখেই ছিল, আমার প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রেখে'। অথচ, ওটলা দাদাকে লিখে জানিয়েছে, 'বার্লিনে সে সুখে নেই'। কাফকা বিশ্বাস করতেন না, কারণ ওটলার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল, স্নেহ ছিল। ওটলা সম্পর্কে কাফকা ফেলিসকে জানান, 'আমার সব থেকে ছোটো বোনটি (যে সবে কুড়ি পেরিয়েছে) প্রাগে আমার সব থেকে ভালো বন্ধু। অন্য দুই বোনও অবশ্য বেশ হৃদয়বান ও সহমর্মী।'

হেরমান কাফকা হচ্ছেন কাফকার বাবা। বাবা-মায়ের প্রতি, অভিযোগ-ক্ষোভ-ঘৃণা আছে। তার কারণ কি এই, তাঁদের বাবা-মায়ের কাছে শুধু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই কাফকার প্রয়োজন, আর অন্য কিছুর মধ্যে (তাঁর সৃজনশীলতা/গভীর পড়াশোনা/ লেখালেখি) কাফকার দেখভালের কথা তারা ভাবতেন না? বা কাফকার স্বাস্থ্যের কথা, (শরীরের কথা সর্দি-কাশি-অনিদ্রা-মাথার যন্ত্রণা-শারীরিক দুর্বলতা)? বাবা আড্ডা ও তাস খেলা নিয়ে থাকতেন, মা দোকান নিয়ে থাকতেন। কাফকার দিকে নজর দিতে পারতেন না। তবে মা জুলি কাফকা ছেলের খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখতেন। খেত না বলে মা কষ্ট পেতেন। কাফকার প্রেমিক ফেলিস বাওয়ারকে চিঠি লিখে বলতেন, ফেলিস যেন কাফকাকে নিয়মিত খাওয়ার কথা বলে। ফেলিসকে মা চিঠিতে লিখতেন 'কিন্তু ও (কাফকা) এত কম খাওয়া-দাওয়া করে এবং এত কম ঘুমায় যে, শুধুমাত্র ওই কারণেই ওর শরীরটা সারছে না। ...ওকে প্রশ্ন করো, ও কি ভাবে জীবন যাপন করে, কি খায়, দিনে কতবারইবা খায়।' ফেলিস বাওয়ারকে কাফকা নিজেই তার স্বাস্থ্য ও খাবার সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমার স্বাস্থ্য একটু ভালো হয়েছে, আমার স্বাস্থ্যের গড়নের অনুপাতে সামান্য একটু মোটা হয়েছি। আমার গতকালের মেনু ছিল : সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে দুবার দুধ, মধু, দুবার মাখন, দুটি রোল; বেলা ১১টায় আড়াইশো গ্রাম চেরি; দুপুর ১২টায় গরুর মাংস, শাক্-আলু, পুডিং এবং রোল; বিকেল ৩টায় এক কাপ দুধ, দুটি রোল; বিকেল ৫ টায় চকোলেট, মাখন, ২টি রোল; সন্ধে ৭টায় সবজি-স্যালাড, পাউরুটি চীজ; রাত ৯টায় ২ পিস কেক, দুধ। ঠিক আছে?' কতটা ঠিক আছে, সন্দেহ আছে, কারণ এর পরেও যক্ষ্মার হাত থেকে মুক্তি পাননি অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে।

পারিবারিক জীবনবোধ সম্পর্কে সরাসরি কাফকা, 'আমি আমার পরিবারে, সব থেকে স্নেহপ্রবণ এবং হৃদয়বান মানুষের মধ্যেই বসবাস করি, তবু তাঁদের কাছে আমি, বা আমার কাছে তাঁরা একজন আগন্তুকের চেয়েও বেশি অচেনা বলে মনে হয়।' এটাই বোধ হয় একজন ব্যতিক্রমী সৃজনশীল কথা-সাহিত্যিকের যথার্থ মনোভূমি, যেখানে পারিবারিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ভিতর দিয়েই তাদের চলাফেরা। এই দ্বান্দ্বিকতাই তাদের সৃজনশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই দ্বান্দ্বিকতার স্বরূপ চিহ্নিত হয়ে আছে কাফকার স্বভাবে আচরণে। কাফকার বিশ্লেষণে সেটা স্পষ্ট হয়। কারণ গল্পে উপন্যাসে কাফকার বাবার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে ফ্রানৎস কাফকা লিখেছেন, 'আমার সমস্ত লেখাই তোমাকে নিয়ে; আমি আমার সমস্ত লেখায় শুধু এটুকু করেছি, আমি শোকাশ্রু ঢেলেছি যে অশ্রু আমি তোমার বুকে মাথা রেখে ঢালার কোনো সুযোগ কখনো পাইনি।' বাবা হেরমান কাফকার চরিত্র মেটামরফোসিস, দ্য জাজমেন্ট, ট্রায়াল ইত্যাদি গল্পে উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায়। বাবাকে লেখা কাফকার দীর্ঘ চিঠিতে বাবা সম্পর্কিত নানাধরনের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যেমন, 'তোমার আন্তরিকতাহীনতা, পোষা কুকুরের মতো আজ্ঞানুবর্তী থাকার মানসিকতা এবং পরাশ্রয়ী হয়ে থাকার আগ্রহ'। পারিবারিক বাস্তবতা নিয়ে ফ্রানৎস কাফকা চিঠির শেষে বাবাকে জানিয়েছেন, 'স্বভাবত চিঠিতে যেভাবে আমি যুক্তিগুলি হাজির করেছি, বাস্তবে তাকে ঠিকমতো মেলানো যাবে না'। সার্বজনীন ক্ষেত্রে যথার্থ গভীর জীবনবোধ থেকে উঠে আসা ফ্রানৎস কাফকার এই মন্তব্য আমাদের সচেতন করে।

(খ) প্রথম প্রেমিকা ফেলিস বাওয়ার সম্পর্কে ফ্রানৎস কাফকা এবং ফ্রানৎস কাফকা সম্পর্কে ডোরা ডায়মন্ত, তাঁর দ্বিতীয় প্রেমিকা এবং একমাত্র বিবাহিত স্ত্রী। ভালবাসার কথা, প্রেমের ভাষা।

ফেলিস বাওয়ার জন্মেছেন ১৮৮৭ সালে। কাফকা জন্মেছেন ১৮৮৩ সালে। কাফকা চার বছরের বড়ো। এক সময়ে দুজনেই অস্ট্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন, সেখানেই দুজনের জন্ম, ইহুদি পরিবারে। মতান্তরে কাফকার জন্ম চেকোশ্লোভাকিয়ায় এখনও অনেকে বলে থাকেন, কাফকা হচ্ছেন অস্ট্রিয়ান উপন্যাসিক। কারণ যে সময় তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার আগে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় প্রাগ অস্ট্রিয়ার অংশে ছিল। অনেকে এই বিশেষণ যোগ করেন, কাফকা জার্মান চেক কথা-সাহিত্যিক। ফেলিসের আরও দুবোন দুভাই আছে। ওদের নাম এলসি ও এর্না (দু বোন) এবং ত্র্যস্তনি ও ফার্দিনান্দ (দু ভাই)। এর্নাকে কাফকা খুবই স্নেহ করতেন। ফেলিসের বাবা ছিলেন বিদেশি ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট। ফেলিসের বাবা-মা (ডিভোর্স) আলাদা হয়ে গেলে এবং বাবা ওদের ছেড়ে চলে গেলে ফেলিস বাওয়ারের ওপর সংসারের চাপ এসে পড়ে। সাংসারিক এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতার জন্য ফেলিস একুশ বছর বয়সে চাকরি জীবন শুরু করেন গ্রামাফোন কোম্পানিতে। সেখানে তিনি শর্টহ্যান্ড-টাইপিস্টের চাকরি করতেন। এরপর তিনি অনেক সংস্থায় চাকরি করেছিলেন কাফকার মতোই। ম্যাক্স ব্রডের পৈতৃক বাড়িতে ব্রডের মধ্যস্থতায় ফ্রানৎস কাফকার সঙ্গে ফেলিস বাওয়ারের প্রথম আলাপ হয়। প্রথম যে

চিঠিটি কাফকা ফেলিসকে লেখেন, সেখানে তিনি নিজের পরিচয়টা এভাবে দেন, 'আমার নাম ফ্রানৎস কাফকা, আমি সেই লোক, প্রাগে ডিরেক্টর ব্রডের (মাক্স ব্রডের বাবা অ্যাডলফ ব্রড) বাড়িতে এক সন্ধ্যায় যাঁর সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় হয়।' পরে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে কফিহাউসে। চিঠির আদান-প্রদান চলতে থাকে। তার পর কাফকা এবং ফেলিসের মধ্যে প্রেম গড়ে ওঠে।

প্রেম গড়ে ওঠা ও শেষপর্যন্ত ফানৎস কাফকার সঙ্গে ফেলিস বাওয়ারের বিয়ে হয়নি। এক সময়ে দুজনেই বিয়ে করার জন্য স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিল। কাফকার চিঠিতে-চিঠিতে ধরা ছিল ভালোবাসার দৃঢ়তা এবং দুর্বলতা, আবেগ এবং রোমান্স। কাফকা ফেলিসের ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাটিয়ে উঠেছিলেন হতাশা, বিষণ্নতা, নিঃসঙ্গতা এবং মানসিক যন্ত্রণা। অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সৃষ্টিমূলক সাহিত্য রচনায়। ফেলিস তাঁকে উৎসাহিত করতেন। ফ্রানৎস কাফকার মূল্যবান রচনা (গল্প-উপন্যাস) এই প্রেমপর্বেই রচিত হয়েছিল, সৃষ্টিশীল রচনার কাজও চলছিল। তবু বিয়ে ভেঙে যায়, দুবার এনগেজমেন্ট হওয়ার পরেও, একবার ১৯১৪-তে, আরেকবার ১৯১৭-তে। এ সময়ে কাফকার যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ে। শেষ বিচ্ছেদের পর এক বছর তিন মাস কেটে যায়। তারপর ফেলিস বাওয়ার বিয়ে করেন অবস্থাপন্ন এক ব্যবসায়ীকে। এই বিয়ে অটুট ছিল। এক পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে ফেলিস সংসারে জড়িয়ে পড়েন।

ফেলিসকে লেখা কাফকার চিঠিতে কাফকার অন্তর্বেদনা বুঝতে পারা যায়, 'আমার প্রবল শারীরিক ও মানসিক শক্তি দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আপনাকেও আমার বিষণ্নতার মাঝে টেনে আনার। তাহলে বুঝতে সাহায্য করবে আমার জ্বালা ও অস্বস্তি, খিটখিটে স্বভাবের উৎসগুলি কি? গতকাল আমার উদ্বেগ, আমার দুঃখ এত গভীর ছিল যে, আমি প্রায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলাম।' ফেলিসের অস্তিত্ব কাফকার রক্তে-মাংসে-মনে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যে এই বিশ্বের প্রথম সারির সৃষ্টিশীল কথা-সাহিত্যিকের কলম থেকে বের হয়ে এসেছিল, 'আপনি পছন্দ করুন বা নাই করুন, এই মুহূর্তে আমি নিজেকে আপনার পায়ে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার মেজাজে আছি।'

তবে কাফকা নিজের শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি ফেলিসকে জানাতে ভুল করেননি, লিখেছেন, 'বিয়ের জন্য যে সুস্থতাটুকু দরকার তা আমার নেই এবং এইভাবে একাকিত্বের কর্তৃত্বটুকুই হয়ে উঠুক একান্তভাবে আমার নিজস্ব।'

কাফকা কি এতো ভালোবাসতেন ফেলিস বাওয়ারকে! কাফকার ভালোবাসা কি এতোই গভীর! আশ্চর্য। নাকি আবেগের উৎস হচ্ছে নারীর ভালোবাসা; সৃষ্টিশীল প্রেরণার উৎস হচ্ছে নারীর সৌন্দর্য এবং প্রেম। এই কথাগুলি নাড়া দেয় কাফকার লেখা পড়ে, 'অনেক উঁচু আকাশে ওড়ার একটা ব্যঞ্জনা আছে। আমার মনে হয়, একটি মানুষ অসাধারণ তৃপ্তি পেতে পারে এভাবে যদি সে অনেক উঁচু আকাশে ওড়ার সুযোগ পায় এবং তাঁর সুতো বাঁধা থাকে অন্য কারওর হাতে, যেমন আমার সুতোটিকে রেখেছ তুমি (ফেলিস)'।

একজন সৃষ্টিশীল লেখকের ভিতর এতটা ভালোবাসার তোড় থাকতে পারে, ভাবা

যায় না। লেখক যুবকের আকুতি-মিনতি পরিপূর্ণ হৃদয়ের ঝাঁকানিতে ভালোবাসার মুখ খুলে যায়, ভাষা অনর্গল কথা বলে, 'প্লিজ তুমি আমার সঙ্গে থাকো, আমাকে ছেড়ে যেও না। আমার ভেতরের শত্রুর মধ্যে কেউ যদি তোমাকে চিঠি দেয়, প্লিজ, তুমি তাকে বিশ্বাস করো না। যেখানে জীবন বস্তুতই এত কঠিন এবং দুঃখদায়ক সেখানে একটি মানুষ কিভাবে নিঃস্ব হয়ে অন্য কাউকে আঁকড়ে ধরবে, তার একমাত্র সম্বল হিসেবে যেখানে কিছু লিখিত শব্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। আঁকড়ে ধরা বলতে তো তাই, যার জন্যে রয়েছে আমাদের দুটি হাত। অন্য এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'একটি মানুষ যখন ভালোবাসে, সে এক নতুন আত্মসংরক্ষণের শক্তি অর্জন করে।' অবশেষে কাফকা স্বীকার করলেন ফেলিস বাওয়ারের প্রতি তাঁর নৈকষ্য ভালোবাসার আপ্লুত কণ্ঠস্বর, তিনি জানালেন, 'আমি তোমাকে কানে-কানে বলছি, I love you। ফেলিস আমি তোমাকে এত ভালোবাসি যে, আমি যদি তোমাকে ধরে রাখতে পারি, তাহলে আমি চিরদিন বেঁচে থাকতে চাইব।' কাফকা ফেলিসকে পাঁচশো (৫০০) চিঠি বা তারও বেশি হতে পারে, লিখেছেন। তাঁর ছিল একদিকে গভীর ভালোবাসার টান, এই টানটাই ছিল তাঁর সাহিত্য রচনার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আরেক দিকে ছিল সাহিত্য সৃজনশীলতার প্রতি আমরণ টান। ফেলিসের বাবা কার্ল বাওয়ারকে লেখা চিঠিতে কাফকার কথাতেই তা স্পষ্ট, 'আপনার মেয়েকে এ যাবৎ ৫০০ চিঠিতে যে কথা জানিয়েছি তার পুনরাবৃত্তি আমি এখানে করতে চাইছি না। কিন্তু প্লিজ, এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাটা একবার ভেবে দেখুন : আমার সমস্ত সত্তা ছুটছে সাহিত্যের পেছনে, বিগত ত্রিশ বছর বয়স থেকেই শুরু হয়েছে আমার এই অবিশ্রাম একই অভিমুখের দিকে দৌড় এবং যে মুহূর্তে আমার এই দৌড় বন্ধ হবে সেই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু অনিবার্য।' ওই চিঠিতে তিনি নিজের স্বভাব ও আচরণের কথাও ফেলিসের বাবাকে জানিয়েছেন, 'আমি চুপচাপ থাকতে ভালোবাসি, কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। অসামাজিক, খিটখিটে মেজাজ, বিষণ্ন, স্বার্থপর, অমূলক আতঙ্কগ্রস্ত, উদ্বিগ্নতায় পরিপূর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্যের এক আজব জীব। মূলত এসবের জন্যে আমার কোনো দুঃখবোধও নেই। ...আর আপনার মেয়ে? যার স্বাস্থ্যবান প্রকৃতিই তাকে একটি সুখী দাম্পত্য জীবন এনে দিয়ে সক্ষম, সে কিনা আমার মতো একটি কিম্ভূত মানুষের সঙ্গে জীবন কাটাবে?' তারপর 'হে বন্ধু, বিদায়'। কাফকা সরে আসেন ফেলিস বাওয়ারের জীবন থেকে। এভাবেই কাফকার ভালোবাসার এবং ফেলিসের ভালোবাসার আবেগ প্রবণতা স্তিমিত হয়ে আসে। ভালোবাসার কাছে মাথা নত করা যায়। কাফকা করেছেনও ফেলিসের ভালোবাসার কাছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করা যায় না। কাফকা করেননি। অবশেষে কাফকা কি ভেবেছিলেন যে ফেলিস ধনী এবং বুর্জোয়া সমাজে বিশ্বাসী (ওর বন্ধু ম্যাক্স ব্রড সমাজতান্ত্রিক ছিলেন) কাফকার জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন না? হয়তো এই দুয়ের দ্বন্দ্বে মান-অভিমান ও অহংকারের কোনো এক রহস্যময় সংঘাত তাদের গভীর ভালোবাসাকে ভেঙে দিয়ে গেছে, বিয়ের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেছে। ধূসর হয়ে যায় ফেলিসের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথাবার্তা, 'তুমি ছাড়া আমি বাঁচবো না।'

আবার কাফকার দ্বিতীয় প্রেমিকা জুটে যায়। ওর নাম ডোরা ডায়মন্ত। তীব্র ভালোবাসার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন পুনরায়। ডোরা ডায়মন্তও। ম্যাক্স ব্রডের লেখা কাফকার জীবনীতে লেখা আছে যেখানে কাফকা বলছেন, 'মানুষকে মানুষ এতো ভালোবাসতে পারে জানা ছিল না।' কাফকার শেষ প্রেমিকা ডোরা ডায়মন্তের ভালোবাসায় আমরণ নিজেকে আটকে রেখেছিলেন। এই ডোরা ডায়মন্ত কাফকার চেয়ে পনেরো বছরের ছোটো ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৯৮, কাফকার জন্ম ১৮৮৩ সালে। দুজনেই ছিলেন ইহুদি। ডোরা এবং ডোরার দাদা ছিলেন কমিউনিস্ট। ডোরা মার্কসিস্ট ইভনিং স্কুলের কর্মী ও ছাত্রী ছিলেন। ডোরা ১৯২৯ সালে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হোন। এই ডোরাকে কাফকা ভালোবেসেছিলেন, ডোরাও কাফকাকে। ডোরা লিখেছেন, ম্যাক্স ব্রডকে 'কাফকা আমাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। আমি ওকে ভালোবাসি'। কাফকাই প্রথম ডোরাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ডোরার বাবা-মা রাজি হয় না, যুক্তি কাফকার বেশি বয়স। কিন্তু যেদিন কাফকা ডোরার বাড়িতে গিয়েছিল, সেদিন ডোরার নিজের হাতে রান্না করা সুপ খেয়ে কাফকা উৎসাহ বোধ করেছিলেন। সেদিনই একটি ঘটনা ঘটে যায়, দার্শনিক ঘটনা। ডোরা রান্নাঘরে মাছ কাটছিল ধারাল ছুরি দিয়ে। সে সময় কাফকা পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, 'এ্যাতো নরম কোমল আঙুলগুলোয় রক্ত চিহ্ন, রক্তের কলঙ্ক, কি নিষ্ঠুরতা!'

একবার ডোরা ডায়মন্তকে কাফকার ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ডোরা জানিয়েছিল যে কাফকার ধর্ম-বিশ্বাসে আগ্রহ ছিল ঠিকই, তবে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন না। এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও বিশ্বাস করতেন না। বাল্টিক সাগরের বালুকাময় তটে প্রথম ডোরা দেখেছিল কাফকাকে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল ছ'ফুট লম্বা, মায়াবী চোখ, সমুন্নত কপাল পয়ত্রিশ উর্দ্ধ এক যুবক কাফকাকে যিনি শিশুদের সঙ্গে খেলছেন, গল্প করছেন। এই স্মৃতি আমরণ ডোরাকে জাগিয়ে রেখেছিল ডোরার মনের ভিতরে-বাহিরে। পরে এই কাফকাকেই ডোরা বিয়ে করেছিলেন বাবা-মার অমতে, ১৯২৩ সালে। ডোরা লিখছেন, '১৯২৩-এ আমি জার্মান-চেক লেখক ড. কাফকাকে বিয়ে করেছিলাম। ও মারা গেছে ১৯২৪-এ'। এক বছরের ওদের দাম্পত্যজীবন, ডোরা এবং কাফকার। এটাও একটা বিশ্বের ব্যতিক্রমী ঘটনা কাফকার জীবনে, ওর ব্যতিক্রমী লেখার মতোই। এক বছরেই ওরা বার্লিনের একটি ফ্ল্যাটে সংসার পেতেছিলেন। বার্লিনে ডোরা নিজের সংসারে যখনখুশি জীবনের আকাশে উড়তে পারেন। ধনী পিতার অভিভাবকত্বের শাসন নেই, স্নেহপ্রবণ পিতার তদারকি নেই।

কাফকার জীবনধারা সম্পর্কে ডোরার কাছ থেকে পাওয়া কিছু তথ্য : (১) কাফকা সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে লেখক জীবন নিয়ে থাকতে চায়। (২) শব্দ পছন্দ করতেন না, কোলাহল তো নয়ই। (৩) প্রতিদিন লেখার টেবিলে বসতেন। রাতে কেরোসিন বাতির আলোতে লিখতে বড় পছন্দ করতেন। (৪) যেদিন ডোরা কাফকাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন তিনি ফেলিস বাওয়ারকে বিয়ে করেননি? সেদিন কাফকা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'নিঃসন্দেহে ফেলিস ভালো মেয়ে। তবে ও ছিল ধনী ও বুর্জোয়া। ফেলিস চেয়েছিল আরামদায়ক সচ্ছল জীবন-যাপন এবং ঘড়ি ধরা নিয়মানুবর্তিতা।

(৫) একবার রান্নাঘরে ডোরার হাত থেকে একটি কাচের পাত্র পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। কাফকার কানে যায়। তিনি রান্নাঘরে এসে ডোরাকে বলেন, 'এক মুহূর্তে সমস্ত ধ্বংস হতে পারে। আর কি সত্যি, কত সামান্য শব্দ তুলে।' একটি দার্শনিক ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করে ফেলেন কাফকা এবং ডোরার মনে ধরে যায় এই দার্শনিক ব্যঞ্জনাটি, যা তিনি স্মৃতি-ভূমি থেকে তুলে ফেলতে পারেননি।

কাফকা যখন মারা যান ১৯২৪, জুন মাসের ৩ তারিখে অস্ট্রিয়ার সেনোটেরিয়ামে, রক্ত-বমনে, যক্ষ্মায়, তখন ফ্রানৎস কাফকার পাশে ছিলেন একমাত্র ডোরা, তাঁর স্ত্রী ডোরা ডায়মন্ত। আবার কাফকার উজ্জ্বল কথাটিকে পুনরাবৃত্তি করে এই অধ্যায় শেষ করি, 'মানুষ যে মানুষকে এত ভালোবাসতে পারে জানা ছিল না'।

(গ) ফ্রানৎস কাফকার জীবনে ও মননে নারী, যৌনতা ও অশ্লীলতা

কাফকার চল্লিশ বছরের জীবনে নারীর অভাব ঘটেনি। এই মুহূর্তে ফেলিস এবং ডোরাকে সরিয়ে রেখে আরও চারজন প্রেমিকার কথা বলা যায়— (১) মিলেনা চেসেসকা। তিনি কাফকার লেখা অনুবাদের অনুমতি চেয়েছিলেন এবং সেসময় বন্ধুত্ব থেকে প্রেম গড়ে উঠেছিল। চেসেসকা মনোরোগী ছিলেন। কাফকা ছাড়াও ভালোবাসতেন আরও কয়েকজন পুরুষকে। বাবার টাকা চুরি করে খরচ করতেন। পরে তাকে কিছুদিনের জন্য মানসিক হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। (২) জলি ওরিজেফ, ইনি পরিচারিকা ছিলেন। বেশ কয়েকদিন একসঙ্গে ছিলেন। (৩) গার্তি ওয়াসনার। ১৮ বছরের সুইস যুবতী। নারীর ভালোবাসা, নারীর বন্ধুত্ব ও প্রীতি, নারীদের সঙ্গে আড্ডা, নারীদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা লেখকদের-কবিদের অনুপ্রাণিত করে, উজ্জীবিত করে, ফ্রানৎস কাফকাকেও করেছে। কাফকাকে আরও একটু বেশি করত, যন্ত্রণায় বিদ্ধ করত। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'মেয়ে দেখলেই আমার মধ্যে এক তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হয়। যন্ত্রণাটা এমনই যে কি বলব। এটা না কোনো যৌন উত্তেজনা, না কোনো দুঃখ। শুধুমাত্র যন্ত্রণা, স্রেফ যন্ত্রণা।' আবার কখনো যন্ত্রণা মুছে যায়। নারী নিয়ে আসে কাফকার জীবনে, 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'। আর সে সময় কাফকার কলমে উঠে আসে স্বাভাবিক অকপট সত্যভাষণ, 'কফি-হাউসে একটি মেয়ে। তার পরনে আটোসাঁটো স্কার্ট। সাদা ঢিলেঢালা কুচি দেওয়া সিল্কের ব্লাউজ, খালি গলা, মাথায় ধূসর টুপি, প্রাণবন্ত হাসি ছড়ানো স্বর্গীয় মুখ, বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিক দুটি চোখ।' তাহলে এই কি সেই ফেলিস বাওয়ার। এর সঙ্গেই কি ম্যাক্স ব্রড, কাফকার প্রিয় বন্ধু, কাফকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন? হ্যাঁ দিয়েছিলেন। কাফকা লিখছেন, 'এর (ফেলিস) সম্পর্কে ভাবলেই আমার সারা মুখমণ্ডল আনন্দে ছলকে ওঠে।' কাফকা এভাবেই লক্ষ্য করেন নারীর যন্ত্রণা এবং আনন্দ। নিজের যন্ত্রণা এবং আনন্দ।

সামাজিক উৎসবে মহিলাদের চাল-চলন সম্পর্কে কাফকা যে মন্তব্য করেন, বর্তমান সময়েও সেই মন্তব্য দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। মহিলারা এমন একধরনের ভাণ করার চেষ্টা করেন যেন নষ্ট করার সময় বিন্দুমাত্র তাদের হাতে নেই। এই প্রসঙ্গেই কাফকা লেখেন, 'সামাজিক উৎসবগুলি যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি বোঝা হয়ে ওঠে।'

কাফকার ভিতরে যখন বিক্ষোভ ও যন্ত্রণা কাজ করে, তখন তিনি মাঝে মধ্যে কফি-হাউসে চলে যেতেন। কোনো না কোনো বান্ধবীর সাক্ষাৎ পেলে তার সঙ্গে আড্ডা মেরে নিজেকে প্রশমিত করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ডায়েরিতে : আজ কফি-হাউসে ওয়ের ফেলের সঙ্গে কাটল। ...ওর ওই কাঠের চেয়ারে বসে অর্ধেক হেলান দিয়ে অর্ধেক সামনের দিকে ঝুঁকে আছে মুখের ভারি সুন্দর গড়নটি। বুকের ওপর কিছুটা চাপ দিয়ে থাকা আর মেদহীন মুখের পরিপূর্ণতার কারণে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলা। আশেপাশের সকলের থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা। উদ্ধত নিখুঁত। চলমান বিপরীত অদ্ভুত মুখের মূল রেখাগুলি সুন্দর ফুটে উঠেছিল।

যৌবন সম্পর্কে কাফকার মন্তব্যে বুঝতে পারা যায় হতাশা জড়িত অনুভবের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। যৌবনের অর্থহীনতা, যৌবনের ভয়, অর্থহীনতার ভয়—একটি অমানবিক জীবনের অর্থহীন উত্থান। এইভাবে কাফকার ভাবনা চিন্তায় এসে যায় নরনারীর গোপন ইচ্ছে এবং অশ্লীলতার জঘন্যতা যা নরনারীর আত্মপরীক্ষার সময় মানুষ সেগুলি নিবিড়ভাবে বিবেচনা করতে কখনোই চাইবে না। এই প্রসঙ্গে কাফকার কথা, 'মহত্ত্বের এবং উদারতার শুভ দিক, সুন্দর দিকগুলির সঙ্গে তুলনা করলে ওই ইচ্ছেগুলিকে কেবল মনে হবে স্বার্থপরতা। তার বেশি কিছু নয়। এই অশ্লীলতা তার নিজের খাতিরেই টিকে আছে, 'একদিন অনুধাবন করবে যে এই বোঝা নিয়ে তুমি এই বিশ্বের মাঝে ক্রমাগত অতলে তলিয়ে যাচ্ছ, ডুবে যাচ্ছ। ...এই অশ্লীলতা, এই অপবিত্রতাই হচ্ছে সেই গভীর তল যা তুমি লক্ষ্য করবে তোমার খুব নিকটেই উপস্থিত। আর সেই গভীরতায় না আছে লাভা, না আছে আগুন, আছে কেবল নোংরা অপবিত্র বস্তুরাজি, আছে কেবল অশ্লীলতা। এটাই হচ্ছে উপরিতল এবং নিম্নতল।'

কাফকার যৌন-বোধ বুঝতে পারা যায় বাবাকে লেখা কয়েকটি বাক্য ব্যবহারে। সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে তাঁর বাবা হেরমান কাফকা কোনো ব্যাপারেই, না সাহিত্য-নির্মাণে, না বিয়ের ব্যাপারে নাক গলাননি। সেই ক্ষোভে তিনি লিখেছেন 'এখানে, নির্ধারিত বিষয়টি হল, শ্রেণির-জাতির এবং সময়ের সাধারণ যৌন-নৈতিকতা বা কর্তব্য পালন।' কাফকার জীবনে হেরমান কাফকা সেটা পালন করেননি, এমনকি নজরও দেননি। এই প্রসঙ্গে আরেক জায়গায় ফ্রানৎস কাফকা লিখেছেন, 'বিপদের সম্ভাবনার মুখোমুখি বলতে শুধুমাত্র শহুরে ছেলে মেয়েদের অসৎ যৌন ক্রিয়াকলাপ, আচরণ এবং বাজে স্বভাবটুকু ছাড়া অন্য কোনো বিপদ ছিল না।' এটা কাফকা সামাজিক পরিবেশ থেকেই নিজে-নিজে শিখেছিলেন। উপদেশ ছাড়া বাবা-মা কোনোদিনই যৌনতার ভালো-মন্দ শিক্ষা দেননি, স্কুলজীবন থেকেই। এটাই কাফকার ক্ষোভ। একবার জলি ওরিজেভ নামে এক পরিচারিকা কাফকার প্রেমে পড়ে যায়। বেশ কিছুদিন ওরা দুজনে একসঙ্গে ছিলেন। যার জন্য একটা চেক-প্রবাদ কাফকার মনে গেঁথে গিয়েছিল : 'তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে গেলেও পরিচারিকার জন্য মদের পেয়ালা রেখে দিন, তাহলেই দেখবেন আপনি জ্ঞানী হয়ে উঠেছেন।' পুনরায় তিনি লিখেছেন বাবাকে, 'তুমি আসলে এটুকু দেখতে চেয়েছিলে, যে বাস্তবে কখনও ঘটনাচক্রে অশ্লীল কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা, এটাও তোমার নিজের পরিবার এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখার একটা কৌশল।'

যৌনতাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক রক্ষণশীলতা এবং কাফকার খোলামেলা চলাফেরার একটি দ্বন্দ্ব বুঝতে পারা যায় কাফকার চিন্তা ভাবনায়। এবং এই দ্বন্দ্বটা কাফকার ষোলো বছর বয়স থেকেই শুরু হয়েছে, যেখানে তিনি লিখেছেন, 'বিশ্বের আদিমতম যুগের মতো খোলামেলা নাঙ্গা ভাষায় কথা বলার বিষয়, অন্যদিকে আবার এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি ও ভাষার ব্যবহার তখনও খুব বেশি প্রচলিত হয়নি। তখন আমার বয়স নিশ্চয়ই ষোলোর বেশি নয়।' সেই বয়সে বাবার যৌনতা বিষয়ে মামুলি উপদেশটাই সারা জীবন বহন করা সত্ত্বেও একটা দূরত্ব ও দ্বন্দ্ব থেকে গেছে পরবর্তীকালে ফ্রানৎস কাফকার জীবনে। তিনি লেখেন, 'ব্যক্তিগত ভিন্নতা বিষয়ে আপনার সামান্যতম অনুভূতিটুকুও যদি না থাকে তাহলেও কিন্তু আপনার উচিত প্রত্যেককে তার নিজের রাস্তায় চলতে দেওয়া।' ফ্রানৎস কাফকা সারাজীবন নিজের রাস্তায় চলেছিলেন।

(ঘ) নিজের লেখালেখি (গল্প-উপন্যাস) সম্পর্কে ফ্রানৎস কাফকা

ফ্রানৎস কাফকা যত গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, সব লিখেছেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এবং খবরের কাগজে প্রকাশিত নানারকম ঘটনা থেকে, যে সব ঘটনা কাফকাকে বিস্মিত করত, এবং নাড়া দিত। সেখানে অবশ্যই রোমান্টিকতা, কল্পনা, নিজস্ব ভঙ্গি জড়িয়ে থাকত। ফেলিস বাওয়ারকে লেখা একটি চিঠিতে এ কথার সন্ধান পাওয়া যায়, 'বিভিন্ন কাগজপত্র থেকে যে সমস্ত খবর আমাকে বিস্মিত করে, সেগুলি কেটে রাখা, বিশেষ করে যে খবরগুলি আমাকে নাড়া দেয়, যে খবরগুলো ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, ...সেই খবরগুলো খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখতে ইচ্ছে করে। ...বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকেও ক্লিপিংস-এর সংগ্রহ বেশ মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে।' গল্পকার হিসেবে এ অভ্যাসটা সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যেরও আছে।

কাফকা একটানা লিখতে পারতেন না। ফেলিসকে তিনি বলছেন, 'আমি কোনোকিছুই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো তর্ তর্ করে লিখে উঠতে পারি না। বিশেষ করে সেই লেখা, যে লেখাটি লিখব বলে মনে মনে স্থির করি। একটানা লিখলে লেখা নিম্ন মানের হয়, একথা তিনি মান্য করতেন। এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি ফের অনুভব করলাম বড়ো লেখার ক্ষেত্রে সমস্তটা এক নাগাড়ে লিখে ফেলার চাইতে একটু-একটু করে, এক একটা অংশ ধরে-ধরে লিখে যাওয়া অনেক ভালো। এক নাগাড়ে লেখার চেষ্টা করলে লেখাটা নিম্ন মানের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এবং আমার জীবনের দশা এই ধরনের নিম্ন-মানতাকে কখনোই প্রশ্রয় দেয় না।' আরেকটি উদাহরণ টানা যাক এই প্রসঙ্গে। কাফকা ফেলিসকে লিখছেন 'মেটামরফোসিস' দীর্ঘ গল্পটি সম্পর্কে, 'আর তিন কি চারটি সন্ধ্যা পেলেই আমি এটিকে শেষ করে ফেলতে পারব।' কোনো গল্প উপন্যাসই তিনি একটানা লিখে উঠতে পারতেন না, চাইতেনও না। কারণ লেখাটি নিম্ন মানের হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। যে কোন লেখার ব্যাপারে আমিও একটানা লিখে উঠতে পারি না।

'দ্য ট্রায়াল' উপন্যাসটি লিখতে কাফকার দু-তিন বছর লেগেছিল। তিনি লিখেছেন ডায়েরিতে, 'রুশ গল্পটি শুরুর আগে 'দ্য ট্রায়াল' শেষ করে ফেলা উচিত ছিল আমার। এই হাস্যকর আশা নিয়ে আপাতভাবে পেছনে রয়েছে অনেকে। শুধুমাত্র প্রকাশ ভঙ্গিমার

কিছু খুঁটিনাটি দিকের কথা ভেবে আমি ফের 'দ্য ট্রায়াল' লেখা শুরু করলাম—এতে কিছু ফল যে পাওয়া গেল না, তা বলব না।' তিনি 'দ্য ট্রায়াল' উপন্যাসটির প্রকাশ ভঙ্গিমা ও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ভাবিত ছিলেন। এ ভাবেই তিনি গল্প-উপন্যাস ফেলে রাখতেন, পরে আবার লিখতেন। 'দ্য ট্রায়াল' উপন্যাসটি লিখবার জন্যে একবার কাফকা অফিস থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছিলেন।

'ইন দ্য পেনাল কলোনি'—কাফকার একটি বিখ্যাত দীর্ঘ গল্প। একদিন বিকেলবেলা ওয়েরফেলের বাড়িতে তিনজনকে ওই গল্প শুনিয়েছিলেন। এনথার, ম্যাক্স ব্রড ও পিক ছিলেন সেই পাঠের আসরে। পাঠ শেষ হলে কাফকা বললেন, 'লেখাটি লিখে পুরোপুরি আমি অতৃপ্ত নই।' সেই পাঠের আসরে ওয়েরফেল কিছু কবিতা পড়ে শোনালেন। এনথার দুটি নাটক পড়ে শোনালেন। এইভাবে ওদের গল্প-কবিতা পড়িয়ে শোনার আড্ডা বসত। লেখক-কবিদের এরকম ঘরোয়া আড্ডার ব্যাপারটি এখনও আছে, এখানেও আছে। তবে এখানে মহিলাদের উপস্থিতি খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না। একবার কাফকা ফেলিসকে 'দ্বাররক্ষী' নামে একটি গল্প পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। নিজের গল্প-পাঠ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার উচু স্বরে তাকে গল্প-পাঠ শোনাতে হয়েছে এবং এই পাঠ একেবারে প্রাণহীন মনে হয়েছে।'

ফেলিসকে লেখা চিঠিতে জানা যায় যে কাফকা একটি ছোটোগল্প লিখেছিলেন 'দ্য ম্যান হু ডিস্‌অ্যাপিয়ারড'। গল্পটি কাফকা শেষ করে যেতে পারেননি। পরে ম্যাক্স ব্রড কাফকার মৃত্যুর পর ১৯২৭ সালে সম্পাদনা করে 'আমেরিকা' নাম দিয়ে দীর্ঘ গল্পটি প্রকাশ করেন। কাফকা এই গল্পটি সম্পর্কে ফেলিসকে লিখেছেন, 'যে গল্পটি আমি লিখতে শুরু করেছি, তার একটা ছকও তৈরি করে ফেলেছি। গল্পটির নাম, 'দ্যা ম্যান হু ডিসঅ্যাপিয়ারড', ঘটনাটি ঘটেছে ইউনাইটেড স্টেটস্ অফ আমেরিকার প্রেক্ষাপটে।'

'দ্য ভিলেজ স্কুল মাস্টার' গল্পটি লিখতে-লিখতে কাফকার রাত পৌনে দুটো বেজে গেছিল। প্রায় শনিবারই সারা রাত ধরে কাফকা গল্প/উপন্যাস লিখতেন। এটাও বুঝতেন এভাবে লিখে যাওয়াটা শরীরের পক্ষে আদৌ ভালো নয়। এ সময়ে তিনি মনে করতেন, 'বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিষ্ঠানের মতোই যে কোনো বিরোধিতা বা সংগ্রামকে শেষ করে দাও। এটাই যথেষ্ট।' এর পরেও কাফকা ডায়েরিতে লিখে রাখেন, 'যাই হোক, এ কথা ভোলা উচিত নয় যে, একটি গল্প, যদি তা টিকে থাকার পক্ষে আদৌ কোনো যুক্তি থাকে তাহলে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেই গল্পের ভিতরেই বিরাজ করছে প্রাতিষ্ঠানিক নানান গুণাবলি, এমনকি তা পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই।' এ কথা বলা সত্ত্বেও আমরা মনে করি তাঁর লেখা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ একটি ছোটোগল্প 'মেটামরফোসিস' সম্পর্কে ভাবতে কষ্ট হয় যে ঐ গল্পে 'প্রাতিষ্ঠানিক নানা গুণাবলি' আছে। অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা থেকেও আসে ছদ্ম হতাশা ও বিষণ্ণতা। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'অবশ্য কেউ জানে না যে, সে যে হতাশায় ভুগছে তা আদৌ প্রত্যাশিত নাকি অপ্রত্যাশিত। কিন্তু হতাশায় যখন যে ডুবে যায় তখন সে অন্য আরও একজনের সমর্থক হয়ে ওঠে।' এখানে কাফকার মধ্যে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, প্রত্যাশিত ও

অপ্রত্যাশিত বিষয়ে দ্বান্দ্বিক সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। মূলত প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতায় তাঁর কণ্ঠস্বর ও লেখ্যস্বর জাগ্রত।

থামতে জানেন না লেখক ফ্রানৎস কাফকা, তাকে লিখতেই হবে। শারীরিকভাবে কষ্টকর লেখার জগৎ থেকে তিনি ফিরবেন না। কষ্ট হলেও তিনি লিখবেন। ১৯১৪, ৩১শে ডিসেম্বরের ডাইরিতে বলেছেন, 'অনিদ্রা, মাথার যন্ত্রণা, দুর্বল হৃদয়, এসবের সমস্ত লক্ষণগুলিই যখন আমার মধ্যে রয়েছে তখন আমার এই ক্ষমতাও আর বেশিদিন টিকবে না। এ ভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু কোনোটাই শেষ করে উঠতে পারছি না। 'দ্য ট্রায়াল', 'কালডা রেলপথের স্মৃতি', 'দ্য ভিলেজ স্কুল মাস্টার', 'দ্য অ্যাসিসটেন্ট এটর্নি' এবং আরও ছোটো ছোটো লেখা শুরু করেছি। শেষ করেছি কেবল, 'ইন দ্য পেনাল কলোনি' এবং 'দ্য ম্যান হু ডিসঅ্যাপিয়ারড'। অনেক গল্পের মতোই নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখেছেন, 'কালডা রেলপথের স্মৃতি'। তার অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে গ্রাম-জীবন, কৃষক জীবন। তিনি ডায়েরির পাতায় লিখেছেন, 'আমার জীবনে একটি অংশ, আজ থেকে বহু বছর আগে, রাশিয়ার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি ছোট্ট রেলওয়ে কোম্পানিতে আমি চাকরি করতাম। ...যাত্রী বলতে কেবল দু'একজন কৃষক। ...এই সমস্ত গ্রামীণ মানুষেরা প্রত্যেকেই ছিল ভীষণ আন্তরিক ও সামাজিক।' এই অভিজ্ঞতার দর্শন থেকেই কাফকা আবিষ্কার করেন চিরসত্য সুসমাচারটি যা তিনি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন, 'একাকিত্ব, নির্জনতা সমস্ত কিছু থেকেই অনেক-অনেক বেশি ক্ষমতাশালী যা মানুষকে জনসমুদ্রের স্রোতের দিকেই নিয়ে যায়। ...আমি জনগণের সঙ্গে অনেক বেশি ওতঃপ্রোত হয়ে পড়েছিলাম যা কখনও সম্ভব বলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। ...পাঁচটি গ্রামের লোকদের নিয়ে আমাকে অনেক কাজ করতে হয়।' ... ...এই লোকগুলিকে এতটাই ভালোবাসতাম।' ফ্রানৎস কাফকাকে নিয়ে এই বঙ্গদেশে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুই কাজ হয়নি, একপেশে হলেও কাজ এখন এগোচ্ছে। এমনকি একসময় ত্রিশের/চল্লিশের দশকে কাফকার সাহিত্যে অনেক দেশে বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আমাদের কাছে একসময় বিশেষ করে ত্রিশ/চল্লিশের দশকে কাফকার ইমেজ ছিল একজন নিঃসঙ্গ নির্জনপ্রিয় বিছিন্ন ব্যতিক্রমী মরবিড লেখক। পরবর্তীকালে এই ইমেজটি ভেঙে যেতে থাকে। এখন আরও ভাঙছে। কাফকা যে প্রাণবন্ত মানুষ এবং সমাজের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন নন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে যে মূল্যায়নটি উঠে আসবে, সেটাই হবে যথার্থ এবং সঠিক প্রমাণিত কাফকা-বিচার।

নিজের লেখালেখি সম্পর্কে কাফকার ধারণা তাঁর কথায়, 'লেখক হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ খুবই সাধারণ, আমার স্বপ্নময় অন্তর্লীন জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রতিভা আমার সমস্ত বিষয়কেই পেছনের ইতিহাসের দিকে ঠেলে দিয়েছে।' ফলত তিনি মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করতেন। এই যন্ত্রণা অনেক সময় কাফকাকে হতাশ ও বিষণ্ন করে তুলত। একেই বলে সৃষ্টির যন্ত্রণা, সৃষ্টির তাগিদ। কাফকারই কথা, 'আমার বহুদিনের পুরোনো যন্ত্রণা এখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি।' এই যন্ত্রণা থেকেই তিনি বলতে পারেন, 'গতানুগতিময়তাকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছি না।' নিজের লেখালেখি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। লেখার জন্যই তিনি লিখতেন না। বিনোদনের জন্যে তিনি

প্রাতিষ্ঠানিক গল্প লিখতেন না। গতানুগতিক লেখা তিনি লিখতে চাইতেন না। লেখার নিজস্ব রাস্তা তিনি আবিষ্কার করতেন। সেই ভিন্ন রাস্তায় বা নিজের রাস্তায় তিনি চলতে অভ্যস্ত হতেন। তিনি ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছেন এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'ব্যক্তিগত ভিন্নতা বিষয়ে আপনার সামান্যতম অনুভূতিটুকুও যদি না থাকে, তাহলেও কিন্তু আপনার উচিত প্রত্যেককে তার নিজের রাস্তায় চলতে দেওয়া।' ফেলিসের বাবা কার্ল বাওয়ারকে একটি চিঠিতে তাঁর লেখালেখি সম্পর্কে লেখেন, 'আমার সমগ্র সত্তা ছুটছে সাহিত্যের পেছনে; বিগত ত্রিশ বছর বয়স থেকেই শুরু হয়েছে আমার এই অবিশ্বাস একই অভিমুখের দৌড় এবং যে মুহূর্তে আমার এই দৌড় বন্ধ হবে সেই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু অনিবার্য।'

ডায়েরির অধিকাংশ পাতায় ছড়িয়ে আছে, ঠিকমতো লিখতে না পারার এবং সময় বের করতে না পারার হতাশা এবং যন্ত্রণা তাঁকে গ্রাস করত। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আরো একটা গল্প লেখার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ফলাফল শূন্য। ...কোনো গল্প দেখেছি রাতের মধ্যে লিখে ফেলতে না পারলে সকালে উঠেই তা কোথায় উড়ে যায়। এখন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে 'দ্য অ্যাকসিড্যান্ট এটর্নি' গল্পটা। অথচ আগামীকাল আমাকে ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। ...ফ্যাক্টরির চিন্তা, আমার ধারাবাহিক লেখার প্রায়শ্চিত্ত।' সে সময় তিনি একটি ফ্যাক্টরিতে ডিকটেশনের চাকরি করতেন। তিনি লিখেছেন, 'ফ্যাক্টরিতে সাড়ে ছটা পর্যন্ত কাজ করে, পড়ে, ডিকটেশন দিয়ে, শুনে, ফলাফলহীন ভাবে লিখে কাটালাম। ...কবিত্বহীন, নীরস গদ্যময় পৃথিবীর সঙ্গে আমার এই অতি দ্রুত যোগাযোগ আমাকে হতাশ করে তোলে'। ফ্যাক্টরিতে না যাওয়ার জন্যে বাবার কাছে কাফকা বকুনি খেতেন। সে জন্য তিনি আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে নিজেকে প্রশ্ন করেন, 'আমি আমার লেখালেখির মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পারব তো?' চাকরি জীবনের সঙ্গে লেখক জীবনের দ্বান্দ্বিক সংঘাত, ফলত যন্ত্রণা হতাশা বিষণ্ণতা।

একটি গল্প লেখার জন্য তিনি যে কত পরিশ্রম করতেন, অতৃপ্ত থাকতেন, নিজের লেখাকে সমালোচনা করতেন, সেটা তাঁর ডায়েরির কথাবার্তায় স্পষ্ট, 'এই মাত্র গল্পের শুরুটা আবার পড়লাম। এ্যাতো বাজে হয়েছে যে আমার মাথাটাই ধরে গেল। এই গল্পের সমস্ত সত্যতা সত্ত্বেও সত্যিই এটি বাজে, বিচার-বুদ্ধিহীন পণ্ডিতসুলভ এবং গতানুগতিক। গল্পটি ঠিকমতো পরিপুষ্ট হয়ে ওঠার আগেই আমি লিখে ফেললাম।' লেখালেখির জন্যে কাফকা অনেকবার নিজের পরিবার ছেড়ে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। খাওয়া দাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। চাকরি ছাড়তেন, আবার অন্য চাকরি করতেন।

(ঙ) দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১) ও বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০) সম্পর্কে কাফকা

দস্তয়েভস্কি যে শ্রমিকদের কোয়ার্টারে মারা গেছিলেন এবং ছাত্ররা চেয়েছিল, দস্তয়েভস্কির চেনটা তাঁর কফিনের পেছন পেছন বহন করে নিয়ে যাবে, কাফকার ডাইরিতে তার উল্লেখ আছে। তিনি সেখানে লিখেছেন : 'ছাত্ররা চেয়েছিল দস্তয়েভস্কির চেনটা তার কফিনের পেছন পেছন তারাই হাতে করে নিয়ে যাবে। দস্তয়েভস্কি শ্রমিকদের কোয়ার্টারে মারা যান এক ভাড়া বাড়ির ছ'তলায়।'

একবার দস্তয়েভস্কি এক মহিলা চিত্রকরকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, 'সমাজ-জীবন চক্রাকারে ঘোরে। ঠিক সেরকম যারা কেবল যন্ত্রণার বোঝা মাথায় নিয়ে ঘোরাফেরা করেন তারাই বোঝেন একে অপরকে। তাদের এই যন্ত্রণাকে ধন্যবাদ, কেননা শুধুমাত্র এই যন্ত্রণার কারণেই তারা একটি বৃত্ত রচনায় সফল হয়েছেন বলে একে অপরের প্রতি তাঁদের এক ধরনের সমঝোতামূলক সমর্থন রয়েছে।' এইসব সামাজিক চিন্তাভাবনা কাফকাকে অনুপ্রাণিত করত বলেই তিনি জানান : "চোটেক পার্কে বসে নিজের সমর্থনে লেখা দস্তয়েভস্কির কিছু কাগজ পড়লাম।' সমাজের সঙ্গে কাফকার যে একটা গভীর সম্পর্ক ছিল দস্তয়েভস্কি-পড়াশোনাতেই বোঝা যায়। বাল্যবন্ধু ম্যাক্স ব্রডের সঙ্গে দস্তয়েভস্কির লেখার মানসিকতা নিয়ে কাফকার মত পার্থক্য দেখা যায়। ম্যাক্স মনে করেন, দস্তয়েভস্কি তাঁর লেখায় খুব বেশি করে মানসিক রোগগ্রস্তদের প্রশ্রয় দেন। কাফকা সেটা মনে করেন না। তিনি বলেন, 'এটা ম্যাক্সের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তারা আদৌ মানসিক রোগগ্রস্ত নয়। তাদের রোগগ্রস্ততা কেবল চরিত্রায়ণের কাজেই ব্যবহৃত। তা ভীষণ উপযোগ্য এবং ফলপ্রসু, মূল্যবানও বটে। আর দস্তয়েভস্কি তা অজান্তেই করে যান সর্বতোভাবে লেখাটিকে ভাল করে তোলবার জন্যে।' এরপর কাফকা একটা উদাহরণ ব্যবহার করেন, 'কারামোজভসের বাবা, যদিও এক আস্ত শয়তান, কোনোভাবেই বোকা নন। বরং যথেষ্ট চালাক, প্রায় ইভানের মতোই, এবং আর যাই হোক সে তার ভাইপোর থেকে অন্তত অনেক বেশি চালাক।' এখানে চরিত্রায়ণের প্রয়োজনেই মানসিক অবস্থানটা তুলে ধরেছেন দস্তয়েভস্কি। দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে কি গভীর পড়াশোনা থাকলে এ রকম মতবাদের বিপরীতে অবস্থান করা যায়।

ফ্রানৎস কাফকা ফরাসি কথা-সাহিত্যিক বালজাক পড়তেন। বালজাক সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বালজাক বছরের পর বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট রুটিন মেনে গিয়েছিলেন, যা আমার কাছে কৌতূহলের মনে হয়েছে। তিনি সন্ধে ৬টায় ঘুমিয়ে পড়তেন। মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠতেন। বাকি রাতটুকুও পরবর্তী সময়ে ১৮ ঘণ্টা বসে কাজ করতেন। এই সময়ে তিনি প্রচুর পরিমাণে কফি খেতেন। এর ফলে ওঁর হৃৎপিন্ডটার ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যায়। বালজাকের সব গল্প আমার ভাল লাগত না। বালজাকের দুটি বিখ্যাত ছোটোগল্প 'The wild Asis skin' ও 'A Passion in The Desert' কাফকা পড়ে থাকতে পারেন হয়তো।

(চ) 'মেটামরফোসিস' (Dieverwanding) দীর্ঘ ছোটোগল্পটি সম্পর্কে ফ্রানৎস কাফকা

'মেটামরফোসিস' ফ্রানৎস কাফকার একটি বিখ্যাত দীর্ঘ গল্প আমরা মনে করি, বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের দশটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে 'মেটামরফোসিস' একটি। এই ছোটোগল্পটির বলিষ্ঠতা এতখানি যে ছোটোগল্পের তথাকথিত সংজ্ঞাকেই পালটে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ফ্রানৎস কাফকা ডায়েরিতে চিঠিতে কখনও এই গল্পকে বলেছেন গল্প, আবার কখনও বলেছেন ছোটোগল্প, আবার কখনও বলেছেন উপন্যাস। লেখক লেখার ভাবাবেগে এবং তাড়নায় যা খুশি বলতে পারেন, আসল কথা বলবেন ছোটোগল্প-বিশেষজ্ঞ সমালোচকেরা, তর্কে-বিতর্কে সমাধান সূত্র খুঁজে। এই গল্পটি তিনি একটা সিটিং-এ

লেখেননি। লিখেছেন, রেখে দিয়েছেন, আবার লিখেছেন। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৫ সালে। কাফকার ত্রিশ/একত্রিশ বছর বয়সে লেখা এই অনুপম ছোটোগল্পটি। ১৯১৪ সালের ১৯ জানুয়ারির পাতায় তিনি লেখেন, 'মেটামরফোসিস' বিষয়ে এক মারাত্মক অস্বস্তি এখনও রয়ে গেছে আমার ভিতর। এর শেষটা একেবারে অপাঠ্য। উপন্যাসটির মজ্জাতেও মনে হয় যথেষ্ট ত্রুটি রয়ে গেছে। অবশ্যই এটা আরও ভালো দিকে মোড় নিতে পারত যদি আমি উপন্যাসটির লেখার সময় অত বিশ্রীভাবে ব্যবসার কারণে বাধাপ্রাপ্ত না হতাম।'

এরও আগে ১৯১২-র নভেম্বরে ফেলিস বাওয়ারকে লেখা একটি চিঠিতে জানা যায় 'মেটামরফোসিস' গল্পের সূত্রপাত। কাফকা ফেলিসকে জানাচ্ছেন, 'ভীষণ অস্বস্তি ও দৈন্যতার মধ্যে যখন বিছানায় পড়েছিলাম, তখন আমার মাথায় একটা ছোটোগল্প দানা বাঁধে। আর সেটাই এখন আমাকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।' ফ্রানৎস কাফকার চিঠি পড়ে জানা যায় ওই গল্পটিই হচ্ছে 'মেটামরফোসিস' গল্পটির সূত্রপাত। এই গল্পটি সম্পর্কে তিনি আরও জানান, 'আমি এবার আমার ছোটোগল্পটিকে পাশে সরিয়ে রেখেছি, ... গল্পটি বাড়তে বাড়তে বেশ বড়ো মাপের একটি গল্প হতে চলেছে।' লক্ষ্য করা যায় কাফকা এখানে গল্পটিকে ছোটোগল্প বলছেন, দীর্ঘ গল্প, উপন্যাস বলেননি। আসলে গল্প ও ছোটোগল্প লেখক কাফকার কাছে একার্থক হয়ে যাচ্ছে। লেখকদের কাছে এটাই হতে পারে যথাযথ সংজ্ঞা মেপে বা সাজিয়ে সৃষ্টিশীল বা ব্যতিক্রমী গল্পকারেরা গল্প লেখেন না। ফেলিসকে লেখা কাফকা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, 'এটি একটি ভয়ের গল্প এবং গল্পটি তোমাকে, ভয়ে একেবারে চমকে দেবে'। আরও বলেছেন, 'এটি একটি বীভৎস গল্প'। তবে গল্পটি লিখে কাফকা অতৃপ্ত নন, তিনি জানান, 'এবং সামগ্রিকভাবে লেখাটিতে আমি খুব একটা অতৃপ্ত নই'। কিন্তু আমাদের কাছে 'মেটামরফোসিস' কোনোক্রমেই ভয়ের বা বীভৎস গল্প নয়। অন্য মাত্রায়, অন্য মানসিকতার একটি দীর্ঘ ছোটোগল্প। তবে এই গল্পটির নায়কের Tragic Death কান্নায় স্তব্ধতায় পাঠকদের মানবিকতার চুম্বকে টেনে রাখে। আর এর জন্যেই ফ্রানৎস কাফকা ফেলিস বাওয়ারকে লিখেছেন, 'কাঁদো, প্রিয়তমা কাঁদো, এখন কান্নার সময়। মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমার গল্পের নায়ক মারা গেছে। ...সকলকে শুধরে দিয়ে অবশেষে সে শান্তির মৃত্যু পেয়েছে। ...গল্পটির কিছু অধ্যায়ে আমার নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দশা এবং কিছু বাধা ও বাহ্যিক যন্ত্রণার ছবি ভীষণ নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। আমি বুঝি, এটা আরও পরিচ্ছন্ন করা যেত, অথচ দেখছি এই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা গেছে এমন কিছু অধ্যায়ে যেগুলি আবার গুরুত্বহীন। আর এটাই আমার কাছে মারাত্মক যন্ত্রণার।'

কাফকার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'মেটামরফোসিস' গল্প সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখা যায়। সামাজিক বস্তুবাদী বিজ্ঞান দর্শনে, একটি কথা আছে নেতিবাচকের নেতিবাচকতা যা ইতিবাচকতার অগ্রগতি ঘটায়। 'মেটামরফোসিস' সম্পর্কে ওই কথাটি বলা যায়। কাফকা ওই চিঠিতে একটি কথা ব্যবহার করেছেন, 'নায়কের Tragic Death দেখার পর সকলকে শুধরে দিয়ে অবশেষে সে শান্তির মৃত্যু পেয়েছে'। শুধরে দেওয়াটাই সামাজিক অগ্রগতি। এটাই ইতিবাচকতার লক্ষণ, এ যেন শহিদের মৃত্যুকে স্মরণ করে

শপথ গ্রহণ করা। পরের বক্তব্যটি হচ্ছে, ছোটোগল্প লেখা অতো সহজ ব্যাপার নয়, সেটা শিখতে হবে আমাদের ফ্রানৎস কাফকার কাছ থেকে। তিনি বলেন যে, পরিচ্ছন্নতাকে বজায় রাখতে গেলে গল্প গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এবং এটা একজন গল্পকারের কাছে মারাত্মক যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠতে পারে। কাফকা আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছেন যে বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পরিচ্ছন্নতার কথা ভেবে ছোটোগল্পকে গুরুত্বহীন করা ঠিক কাজ নয়। কাফকা সে জন্য বলেন, 'একথা বলাই ঠিক যে বাস্তবতা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থাকে যুক্তি হিসেবে এর পেছনে খাড়া করা যাবে না'। আর এখানেই সৃষ্টিশীল ও ব্যতিক্রমী ছোটোগল্পের সঙ্গে বিনোদন-মার্কা এবং এক সিটিং-এ টানা লেখা ছোটোগল্পের বিরোধ এবং সংঘাত।

এবার 'মেটামরফোসিস'-এর শেষ পর্বে নায়ক গ্রেগরের মৃত্যু দৃশ্যটা তুলে ধরছি যেখানে বাস্তবতা, কান্না এবং পরিচ্ছন্নতার অভাব মিলেমিশে এক হৃদয়বিদারক রসায়ন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন ফ্রানৎস কাফকা, 'The charwoman noticed nothing unusual as she took her customary peep into Gregor's room. She thought he was lying motionless on purpose, pretending to be in the sulks; she credited him with every kind of intelligence. Since she happened to have the long-handled broom in her hand she tried to tickle him up with it from the doorway. When that too produced no reaction she felt provoked and poked at him a little harder and only when she had pushed him along the floor without meeting any resistance was her attention aroused. It did not take her long to establish the truth of the matter, and her eyes widened, she let out a whistle, yet did not waste much time over it but tore open the door of Samsa's bedroom and yelled into the darkness at the top of her voice : "Just look at this it's dead; it's lying here dead and done for!"

"Dead?" said Mrs. Samsa, looking questioningly at the charwoman... although she would have investigated for herself, and the fact was obvious enough without investigation. "I should say so", said the charwoman, proving her words by pushing Gregor's corpse a long way to one side with her broomstick. Mrs. Samsa made a movement as if to stop her, but checked it. "Well", said Mr. Samsa "now thanks be to God". He crossed himself, and the three women followed his example.

এই দৃশ্য আমাদের সততই মনে করিয়ে দেয় বাবাকে লেখা কাফকার এক দীর্ঘ চিঠি। সেই চিঠির একটি অংশ যা তিনি বাবাকে লিখেছিলেন, 'যদিও তা মনে করিয়ে দেয়, পায়ের তলায় পিষ্ট কোনো মেরুদণ্ডহীন কীটের লেজের অংশটুকু হারিয়ে শরীরটুকু নিয়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে পাশে সরে উলটে পড়ে থাকার দৃশ্য'।

এ ভাবেই মি. সামসার ভিতর কাফকা এই নিজের বাবাকে আবিষ্কার করেছিলেন। ফলতঃ 'কাঁদো, প্রিয়তমা কাঁদো', এই গল্পের যথার্থ উন্মোচন।

(চ) রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ফ্রানৎস কাফকা

ফ্রানৎস কাফকার চিঠিপত্রে এবং ডায়েরিতে রাজনীতি-সচেতন কাফকার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রসঙ্গ ধরা আছে। ইহুদি জাতীয়তাবাদ, জার্মান-রাজনীতি, সমাজতন্ত্রবাদ ও রাশিয়া, রুশবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লব—এসবের কথা এসে গেছে। বাবার ওপর যে একটা তীব্র ইহুদি-প্রভাব কাজ করত সেই প্রসঙ্গে তিনি বাবাকে এক দীর্ঘ চিঠিতে জানাচ্ছেন, "তোমার ছেলেমেয়েদের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ কর তা মধ্যবিত্ত ইহুদি-মানসিকতা উদ্ভূত। কেননা, ওই মানসিকতাই তোমার সমস্ত কর্ম-প্রক্রিয়ার উৎস।" তিনি বাবাকে বলেছেন স্বৈরাচারী শাসক। স্বৈরাচারী শাসক শব্দটিও রাজনৈতিক শব্দ, রাজনৈতিক সচেতনতার মানসিক পরিচয়। তিনি লেখেন 'কোনো এক স্বৈরাচারী শাসক তার নিজের দেশ ছেড়ে বাইরে কোথাও গেলে যেমন তার আর যা-খুশি তা করার কোনো অবকাশ থাকে না, ফনা নেমে আসে এবং সকলের সঙ্গে যতটা সম্ভব ভালো ব্যবহার করতে বাধ্য হয় ঠিক সেরকম তুমি আর কি।' এখানে স্বৈরাচারী শাসকদের একটি বৈশিষ্ট উদ্ঘাটিত হয়েছে ফ্রানৎস কাফকার মেধা কলমে।

পল ক্লদেলের একটি নাটক 'ফাৎল তেইতে দোর' পাঠ করার পর একটি রাজনৈতিক বক্তব্য ফ্রানৎস কাফকাকে নাড়া দেয়, 'বন্দুকের নল থেকে সজোরে নিক্ষিপ্ত করার মতো শত্রুদের নিক্ষিপ্ত করলেন'। তারপরেই কাফকা ডাইরিতে মন্তব্য লিখে রাখছেন, 'অনিশ্চয়তা অনুর্বরতা, শাস্তি—সমস্ত কিছুই এর মধ্যে মিলে যাবে এবং এক সময় অতিক্রমও করা যাবে।' তারপর ইহুদি জাতীয়তাবাদ নিয়ে লিখেছেন, 'ইহুদিদের কি কি এমন আছে যা আমার মধ্যেও আছে? না, আমার মধ্যে এমন কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না যা অন্যের সঙ্গে মিলে যেতে পারে।' কাফকার এই স্বীকৃতির ভিতর দিয়ে বুঝতে পারা যায় ইহুদি জাতীয়তাবাদ কাফকাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তবু এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, কাফকার এক বোন এলি, এলির ছেলে ও মেয়ে ফেলিস ওগের্তি এবং এলির স্বামী কার্ল হেরমান নাৎসি বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন। এই দুঃসহ মৃত্যু কাফকার মানসিকতাকে আহত করেছিল এবং তাঁর সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল।

১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল সেই সংবাদ কাফকা রাখতেন। কাফকার রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। কাফকা একবার ছোট্ট রেলওয়ে কোম্পানিতে চাকরি করতে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। কাইজার, প্রুশিয়ার উইলহেম, তাঁর মন্ত্রী, পরামর্শদাতা রাতে এদের স্বপ্ন দেখতেন। রাজনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা না করলে এ ভাবে তিনি স্বপ্ন দেখতেন না। ১৯১৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারির ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন 'রাশিয়ার প্রতি সীমাহীন টান'। আবার ইহুদিদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, 'পূর্ব এবং পশ্চিমের ইহুদিদের মিলনসভা। পূর্বের ইহুদিদের প্রতি এক ধরনের ঘৃণা ও অবজ্ঞা রয়েছে। এই অবজ্ঞার পেছনে অবশ্য কারণও আছে। পূর্বের ইহুদিরা তাদের অবজ্ঞার কারণটুকু বোঝে, কিন্তু পশ্চিমের ইহুদিরা বোঝে না।" পূর্বের ইহুদিরা বড়বেশি ধর্মীয় আইন মেনে চলে। ফ্রানৎস কাফকা নিয়মিত সংবাদ-পত্র পড়তেন। সরকারের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটত। তিনি সে

সময়ের ঘটনা ডাইরিতে লিখে রাখতেন, যেমন লিখে রেখেছিলেন 'বোরোদিনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন। ওখানে আচ্ছাদিত উদ্যানপথ ছিল। সেটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালে, ১লা আগস্টে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রানৎস কাফকার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রখরতার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে ১৯১৫ সালের ১লা অক্টোবরের ডায়েরিতে। সেখানে জার্মান অধিপতি লুই নেপোলিয়নের ১৭টি ভুল সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্ত হচ্ছে—

(১) যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত। রাশিয়ার মহাদেশীয় অবরোধের কড়া প্রয়োগ। তা অসম্ভব ছিল। আলেকজান্দারের নিজের অবস্থানটিকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়াটাকে কাফকা ঠিক মেনে নিতে পারেননি।

(২) লুই নেপোলিয়ন প্রুশিয় রাজকুমারকে অনুরোধ করেও তাঁকে হেডকোয়ার্টার স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। খুব বেশি পরিমাণে সৈন্য চেয়ে অস্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়াকে দুর্বল করে দেওয়া তার উচিত ছিল।

(৩) লুই নেপোলিয়ন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছিলেন তুর্কি, সুইডেন এবং পোলাণ্ডের ওপর।

(৪) ভিল্‌না থেকে নেপোলিয়ন, জয় করা লিথুয়ানিয়াকে নিজের সুবিধার্থে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি আসলে প্রুশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক না কেন নেপোলিয়ন পোলিয় আর্মিদের কখনও সাজ-সরঞ্জাম দিতে পারেননি, দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না।

(৫) জেরোম বোনাপার্টকে লুই নেপোলিয়ন ৬০,০০০ সৈন্যের একটি সেনা দল পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন অথচ কোনো ফৌজি অভিজ্ঞতাই জেরোম বোনাপার্টের ছিল না।

(৬) সিভিল গভর্নর বাসানোর ডিউক এবং লিথুয়ানিয়া অঞ্চলের মিলিটারি গভর্নর জেনারেল হোগেনড্রপকে তিনি নিয়োগ করেন। এই দুজনের কেউই সৈন্যদের রিজার্ভ ফোর্স কিভাবে তৈরি রাখতে হয় তা জানতেন না। কারণ ডিউক ছিলেন প্রশাসনিক আমলা, অন্যজন ছিলেন সম্পূর্ণ অদক্ষ এবং অজ্ঞ।

(৭) নীতিগত দিক থেকে, মস্কো থেকে পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত অতি দ্রুত নিয়ে ফেলা হয়। এ সত্ত্বেও কিন্তু এই নেপোলিয়নই ১৫ থেকে ১৯ শে অক্টোবর পর্যন্ত মস্কোয় থেকে যান। কারণ তাঁর আশা ছিল আলেকজান্দারের সঙ্গে কিছু একটা বোঝাপড়া হতেও পারে।

(৮) স্তুজিয়ানকারে দুটি সেতু, যা ধ্বংস হয়ে যায় এটা অতিক্রম করার কাজটুকু তিনি সুসংহতভাবে করতে পারেননি।

(৯) দো-ভাষীর অভাব ছিল।

আরও কিছু ভুল ছিল। এখানে মোটামুটি কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল। ফ্রানৎস কাফকা রাজনীতিটাও যে মেধা দিয়ে বুঝতেন এবং গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করতেন তা প্রমাণ করে জার্মান-অধিপতি লুই নেপোলিয়নের ভুল

সিদ্ধান্তগুলিকে চিহ্নিত করার ভিতর দিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির মৈত্রী বা পঙ্ক্তি বিন্যাস ঘটেছিল এইভাবে : একদিকে ছিল জার্মান-অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি-ইতালি, অপরদিকে ছিল ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া। পরে অবশ্য জার্মান আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল রাশিয়াকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে এবং ফ্রান্স চেষ্টা করেছিল ইতালিকে সরিয়ে আনতে।

প্রথম মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সমাজে তার প্রতিফলন কাফকার গল্প উপন্যাসকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ডিসেম্বর, ১৯১২ সালের একটি চিঠিতে কাফকা ফেলিস বাওয়ারকে ফরাসি বিপ্লবের কথা উল্লেখ করেছিলেন, 'সম্ভবত ফরাসি বিপ্লবের ওপর একটি বইয়ের কারণে সেখানে সমসাময়িক চিত্র ভারি সুন্দরভাবে অঙ্কিত।' বিপ্লবী বইয়ের পাঠের প্রতি এবং চিত্রকলার প্রতি কাফকার যে আকর্ষণ বোধ করতেন তাঁর একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখানে। রাশিয়া এবং রাশিয়া বিপ্লব তাকে আকর্ষণ করত। এছাড়া কাফকা যুদ্ধের বই ও আর্টিকল পড়তে ভালবাসতেন। এ বিষয়ে তিনি ডায়েরিতে লিখছেন, 'ফরস্টার ফ্রেক ইন্ রুজল্যান্ড পড়লাম। বোরোদিনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন। ওখানে আচ্ছাদিত উদ্যানপথ ছিল। সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' যুদ্ধের বিভীষিকা কাফকাকে আহত করত।

রাজনৈতিক বোধ এবং সচেতনতা, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতা একজন কথা-সাহিত্যিকের ভেতরের আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখে। কাফকারও রেখেছিল। সেজন্যই তিনি ডাইরির পাতায় লিখে রেখেছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, 'আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে অথচ বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না তার অস্বস্তিকর অনুভূতিতে একটি বাক্য গঠিত হয়ে গেছে, 'ক্ষুদে বন্ধু ঢেলে দাও, উগরে দাও—একটি বিশেষ সূত্রে তা ক্রমাগত গুঞ্জরিত হচ্ছে'।'

উৎস : ইংরেজিতে এবং বাংলায় অনূদিত ডাইরি এবং চিঠিপত্র/কয়েকটি গল্প-উপন্যাস/কাফকার ওপর প্রবন্ধ পাঠ/ইন্টারনেট।

লাতিন আমেরিকার ছোটোগল্পে পর্ব-পর্বান্তর

তৃতীয় বিশ্বের দেশ এই লাতিন আমেরিকা। এই দেশের মধ্যে আছে উরুগুয়ে, ভেনিজুয়েলা, কোস্টারিকা, মেক্সিকো (মেহিকো), গুয়াতেমালা, কিউবা, ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, কলম্বিয়া, পানামা, পেরু, নিকারাগুয়া—মূলত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি। একটি বইয়ের ভূমিকা থেকে গৃহীত বক্তব্য (যাদুবাস্তবতার গাথা : লাতিন আমেরিকার গল্প / আলম খোরশেদ) : 'উত্তর আমেরিকার সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল, গোটা দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবিয় দীপাঞ্চলের মোট কুড়িটি স্প্যানিশভাষী ও একটি পর্তুগিজভাষী দেশ ব্রাজিলকে নিয়ে যে বিশাল ভূখণ্ড তার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতার অভিন্নতা তাকে দিয়েছে একক ও স্বতন্ত্র একটি ভৌগোলিক অভিধা, লাতিন আমেরিকা।' নয়া-উপনিবেশবাদ, নয়া-সাম্রাজ্যবাদ ওইসব দেশের শাসনে-শোষণে-অত্যাচারে বন্দি করে রেখেছিল, এখনও। তবে অনেক দেশই এখন মুক্ত, সম্পূর্ণ এবং অর্ধ। কোনো কোনো দেশে লড়াই এখনও চলছে। এই লাতিন আমেরিকাই এখন বিশ্বের প্রথম সারিতে অবস্থান করছে ছোটোগল্পে-উপন্যাসে। একমাত্র মুক্তি-সংগ্রামের লড়াই তাদেরকে দেখিয়েছে ছোটোগল্পে-উপন্যাসে সামাজিক অগ্রগতির পথ।

তারই কণ্ঠস্বর শোনা যায় মেক্সিকোর কথা-সাহিত্যিক কার্লোস ফুয়েন্টেসের, একজন লাতিন আমেরিকার প্রথম সারির ছোটোগল্পকার এবং ঔপন্যাসিক, এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি আপনি যদি বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক পরিবেশ থেকে আসেন যেমন আমি এসেছি এবং আপনি একজন লেখক হবার জন্য প্রস্তুতি নেন, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, আপনার প্রকৃত জীবনের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, পরিবারের অস্তিত্বের সঙ্গে আপনাকে লড়তে বাধ্য করবে। লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ লেখক এইরকম সামাজিক পরিবেশ থেকে এসেছেন।'

লাতিন আমেরিকার সাহিত্যেও উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে আগে, ছোটোগল্প দেখা দেয় অনেক পরে। উনিশ শতকের শেষে লাতিন আমেরিকার উপন্যাস লেখা শুরু হয়। বিশেষত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ছোটো ছোটো ঐতিহাসিক কাহিনি নিয়ে স্বতন্ত্র রচনা। পেরুতে এরকম লেখার সূত্রপাত। এবং এগুলোর মধ্যেই ছোটোগল্পের লক্ষণ প্রথম ধরা পড়ে। এইসব লেখার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দেশাত্মবোধক এবং রোমান্টিক। উনিশ শতকে ইউরোপে Liberalism (ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে উদার মত স্বাতন্ত্রবাদ) এবং Positivism (ফরাসি দার্শনিক আগস্ট কোরৎ প্রবর্তিত দর্শন। মূলকথা ইন্দ্রিয়াসত্তি, অস্বীকৃত অতীন্দ্রিয়তা) নামে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার ঢেউ এসে লাগে লাতিন আমেরিকায়। তবে এই আন্দোলনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যনীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

কিন্তু লাতিন আমেরিকার বাণিজ্যনীতির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। লাতিন আমেরিকায় লিবারেলিজমের প্রকাশ ঘটল চার্চের বিরুদ্ধে। প্রচুর বিত্তের অধিকারী চার্চ ছিল সামন্ততান্ত্রিকতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সুতরাং চার্চের কর্তৃত্ব ধ্বংস করাই সমাজ প্রগতির প্রথম সোপান।

পজিটিভিজমের চিন্তাধারাকে লাতিন আমেরিকার লেখকেরা গ্রহণ করেছিলেন প্রগতির তত্ত্ব হিসেবে, দৈবী ব্যাখ্যার বদলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার স্বীকৃতি হিসেবে। লাতিন আমেরিকার ছোটোগল্পের ধারাবাহিকতাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম পর্ব : এই সময়কার একজন ছোটোগল্পকার রবার্টো পেরো (Roberto Payro 1867-1928) তৎকালীন সমাজের দুর্নীতির ওপর কয়েকটি বড়ো গল্প লিখেছিলেন। তারই একটি বিখ্যাত গল্প Pago Chico। এই গল্পে দেখানো হয়েছে কী করে সরকারি দল নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বিপক্ষ দলকে ভয় দেখাবার জন্যে এক পেশাদার খুনিকে নিয়োগ করেছিল।

চিলির ছোটোগল্পকার বাল্ডোমেরো লিলো (Baldomaro Lillo 1867-1923)। তাঁর দুটি ছোটোগল্পের নাম Sub-Terra এবং Sub-Sole। খনি অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন। যে জনজীবনের কথা তিনি লিখেছেন তিনি ছিলেন তাদের খুবই কাছাকাছি। কারণ লিলো ছিলেন নিম্নবিত্ত পরিবারের লোক। তাঁর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ ও মর্মস্পর্শী। ছোটোগল্পটির নাম Gate No. 12। পিতা তার ছেলেকে খনির কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। সে ভয়ে পালাতে চেষ্টা করলে তাকে পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে বেঁধে রাখে। বাবা ছেলের এই দৃশ্য দেখে মর্মযন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারে না। বেঁচে থাকাব করুণ দৃশ্য। বাল্ডোমেরো লিলোর 'The Devil's Cane' গল্পটিও খনি-কর্মীকে নিয়ে। কাজ নেই, ফলে শ্রমিকটি বিপদজ্জনক খনিতে কাজ নিতে বাধ্য হয় এবং ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মারা যায়।

চিলির অন্যতম ছোটোগল্পকার ম্যারিয়ানো লাটোর (Mariano Latorre 1861-1955)। তাঁর গল্পের মূল বিষয়বস্তু হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। ফলে সামুদ্রিক জীবনযাত্রা তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'The Epic of Mori'-র বিষয়বস্তুটি হচ্ছে কি করে এক তরুণ মেষপালক শকুনের সঙ্গে লড়াই করে মারা যায়। শকুনটি কন্ডোর জাতীয় শকুন। চিলিতে দেখা যায়। ভেনিজুয়েলার শক্তিশালী লেখক টোমাস কারাস্কুইলারের বিখ্যাত ছোটোগল্পটির নাম 'On the Right Hand Side of God'। তিনি তাঁর গল্পে লোককথা ব্যবহার করেন। এই গল্পে সেন্ট পিটার যিশুখ্রিস্টের ছদ্মবেশে গল্পের প্রধান চরিত্র পেরাল্টাকে সাক্ষাৎ দেন। ফলে পেরাল্টা পরিত্যক্ত অর্থ ছদ্মবেশী সেন্ট পিটারকে ফেরৎ দিতে গেলে লোককথার ঢঙে পেরাল্টার সততায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনটি বর দেন।

মূলত সেকালের লাতিন আমেরিকার ছোটোগল্পে প্রতিভাসিত হয়েছে বাস্তব জীবনের কঠোরতা-তির্যকতা, সমাজ-রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা, এবং মানবিক সহানুভূতি। সেখানে লক্ষ্য করা যায় না প্রতীক, বৃহত্তর ব্যঞ্জনা, চিত্রকল্প। মিথ, পুরাণ, রূপকথা এসবের যথার্থ

প্রয়োগ বা ব্যবহার সেকালের গল্পে ছোটোগল্পের শর্ত মেনে আসেনি, সামাজিক ধারাবাহিকতায় এসেছে যা একালের ছোটোগল্পে ব্যবহার করে অন্য এক মাত্রা এনে দিয়েছে ছোটোগল্পে। সেসময় ছোটোগল্পে সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাটা ছিল ধোঁয়াটে।

দ্বিতীয় পর্ব : এ সময়ে, বিংশ শতাব্দীর দশের দশকে, সারা বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ঘটতে থাকে এবং মানুষের অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে নাড়া দেয়। মেক্সিকো বিপ্লব (১৯১০-১৯১৯); রাশিয়া বিপ্লব (১৯১৭); এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) প্রভৃতি ঘটনায় লাতিন আমেরিকায় জন্ম নিল এক স্বাতন্ত্র চেতনা। এই স্বাতন্ত্র চেতনার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠল বিভিন্ন রকমের সাহিত্য আন্দোলন যেমন Modernismo Movement; Vanguardist Movement; Regionalism Movement, অনেক পরে এল Maju Realism। মডার্নিজমো আন্দোলন হচ্ছে শব্দের শুচিতা, প্রতীকের আশ্চর্য ব্যবহার, ভাষার লিরিসিজম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, দৃশ্যময় বর্ণনা, বিচ্ছিন্নতা-বিষণ্নতা ইত্যাদি। ব্রাজিলের Vanguardist Movement-এর মূলধারা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠা। Regionalism Movement-এর মূলধারা আদিবাসী চাষিদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অঞ্চল বিশেষে; সামাজিক বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের প্রতিবাদ, আঞ্চলিকতা ও লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতির বাস্তবতা। ছোটোগল্পের-উপন্যাসের আঙ্গিকেও ব্যবহার করা হয় আঞ্চলিক ভাষা এবং লোককথার পৌরাণিকতার উপকরণ। ১৯৩০ সালের পূব যে বাস্তবতার সাহিত্য জন্মলাভ করে তা উনিশ শতকীয় বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই সময়ে, এ কালে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিপ্লবী চেতনায় অনুপ্রাণিত এক নতুন শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের মধ্যে শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও ছিলেন। তাঁরাই জন্ম দিলেন Regionalism Movement-কে। এই আন্দোলনের ফলে তাঁরা, ছোটোগল্পকারেরা সমাজের নিম্নতর শ্রেণির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। উরুগুয়ের হোরেসিও কুইরোগা (Horacio Quiroga : 1878-1937) আঞ্চলিকতাধর্মী একজন যশস্বী ছোটোগল্পকার। তাঁর দুটি উচ্চমানের ছোটোগল্প Drifting এবং The Charcoal Burners। Drifting গল্পে বিষাক্ত সর্পদংশনে যন্ত্রণা-কাতর একব্যক্তি অসহায়ভাবে নদীর স্রোতে ভেসে চলেছে। সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। তা শুনে একজন প্রতিবেশী তাকে সাহায্য করতে পারত, কিন্তু সে এগিয়ে এল না, কারণ কয়েক বছর আগেই সাপে কামড়ানো লোকটার সঙ্গে তার ঝগড়া হযেছিল। The Charcoal Burners গল্পে দুই ব্যক্তি সুচতুর পরিকল্পনা নিয়ে একটি কাঠকয়লা পোড়ানো বার্নার তৈরি করে। তাদের সুচতুরতায় গল্পে পরিণতি টেনেছেন লেখক আশ্চর্য কৌশলে।

জ্যোস দ্য লা কুয়াডা (Jose de la Cuada : 1904-1941) ইকুয়াডোরের একজন ছোটোগল্পকার। তাঁর একটি অত্যন্ত সার্থক ছোটোগল্প The New Saint। গল্পে আছে, একজন কমিউনিস্ট মালিক-পুত্রের সঙ্গে বিরোধে জয়লাভ করেছিল। তা দেখে এক চাষি লেনিনের প্রতিকৃতির সামনে এক মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। এনরিক লোপেজ আলবুজাব (Enrique Lopez Albuzer : 1872) পেরুর ছোটোগল্পকার। তাঁর অনবদ্য

ছোটোগল্পটির নাম Vshanan Jampi। সেই গল্পে তিনি দেখিয়েছেন কি করে ইন্ডিয়ান সমাজ থেকে এক চোরকে তাদের সমাজ থেকে বের করে দিল এবং প্রতিশোধ নিল। গল্পটি সাধারণ হলেও স্বাজাত্যবোধ আছে। বরং আলবুজারের বিখ্যাত ছোটোগল্পটির নাম : The Lawyer Aponte। এই গল্পে একজন ইন্ডিয়ান দীর্ঘকাল সেনাবাহিনীতে কাজ করার পর নিজের ইন্ডিয়ান সমাজে ফিরে এসেছে। কিন্তু সে সমাজ-জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না। ফলে সে হয়ে ওঠে সমাজ-বিরোধী। আলবুজার দেখিয়েছেন, শ্বেতাঙ্গ জাতিদের সঙ্গে তুলনায় জীবনযাত্রা সম্পর্কে ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য ধর্ম ও নীতিবোধ বর্জিত হয়েও তারা একধরনের খাঁটি জীবনযাপন (authentic life) করে। এই ইন্ডিয়ান অর্থে ভারতীয় (Indian) নয়।

আরেকজন আছেন ইন্ডিয়ানিস্ট আন্দোলনের ছোটোগল্পকার। তাঁর নাম জোস মারিয়া আর্গুয়েদাস (Jose Maria Arguedas)। তিনি পেরুর ছোটোগল্পকার। তাঁর বিখ্যাত ছোটোগল্পটির নাম Agua। গল্পে আছে, এক জমির মালিক ইন্ডিয়ানদের সেচের জল দিতে অস্বীকার করায় গল্পের একজন তরুণ বিদ্রোহ করে।

তৃতীয় পর্ব : এক সময়ে, বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্বে, দক্ষিণ আমেরিকা বৈপ্লবিক বাস্তবতাবাদের চিন্তায় মগ্ন ছিল, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিল, সামন্ততান্ত্রিকতা ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কলম ধরেছিলেন। কিন্তু দিন যেতে লাগল আর এক-এক করে বিপ্লবের আশা আর বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হতে লাগল। তখন লেখকেরা, ছোটোগল্পকারেরা বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে সরে আসতে লাগলেন। তবে সবাই নয়, কেউ কেউ। এটাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির বা বুর্জোয়া শ্রেণির সংস্কৃতি বা স্বাতন্ত্র্যবোধ। স্বপ্ন গড়ছে, স্বপ্ন ভাঙছে। আবার স্বপ্ন জন্ম নিচ্ছে। মোহ এবং মোহহীনতা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হল লাতিন আমেরিকাব ছোটোগল্পে নতুন বাস্তবতা, তৃতীয় পর্ব। Regionalism এবং Realism-এর যোগসূত্রে গড়ে উঠল Magic Realism। অনেক সমালোচক বলেন, Marvellous Reality। Magic Realism-এর লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় রাফেল আরিভালো মার্টিনেজের গল্পে, The man who was looked like a horse. তিনি গুয়াতেমালার একজন উজ্জ্বল মর্ডানিস্ট ছোটোগল্পকার। তাঁর সৃষ্ট ওই গল্পে তিনি দেখিয়েছেন মানুষের আত্মিক ও পাশবিক বৃত্তির দ্বন্দ্ব। কেন্দ্রিয় চরিত্রটি প্রতীক, সে ঘোড়ার আকৃতি গ্রহণ করেছে এবং কাহিনির শেষে দুলকি চালে দৌড়ে চলে গেল। মার্টিনেজ পরবর্তীকালে কিছু রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক কাহিনিও এইরূপ ফ্যান্টাসির আকারে লিখেছিলেন। ফ্যান্টাসিকে সামাজিক ব্যঙ্গের ধারক-বাহক রূপে গ্রহণ করেছেন আর্জেন্টিনার সাহিত্যিক রবার্টো আলর্ট্ (Roberto Arlt : 1900-1942)। The Seven Matman নামে একটি বড়ো গল্পে ফ্যান্টাসির মাধ্যমে আধুনিক সমাজের ওপর নিদারুণ কশাঘাত করেছেন। Jorge Louis Borges-এর উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প Death and Compan। তিনি গল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি ছোটোগল্প লিখতে-লিখতে ফুটনোট এবং কোটেশান ব্যবহার করেন। জর্জ লুই বোর্জেসের রচনা মূলত নেতিবাচক। সাহিত্যে সামাজিক উদ্দেশ্যকে তিনি অস্বীকার করেন। এর দ্বারা প্রভাবিত বাংলা লিটলম্যাগের অনেক ছোটোগল্পকারেরা।

১৯৪০ সালের পর থেকে লাতিন আমেরিকায় ফ্যান্টাসি ছাড়াও চেতনা-প্রবাহকে (Stream of Consciousness) গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছোটোগল্পে এসেছে জটিলতা এবং প্রতীকের ব্যবহার। চল্লিশের দশকে লাতিন আমেরিকার এক দল লেখক এই নতুন রীতিকে অবলম্বন করে লিখতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে আছেন আর্জেন্টিনার এডুয়ার্ড ম্যালিয়া, কিউবার আলেহো কার্পেন্তিয়ার, মেক্সিকোর (মেহিকো) হুয়ান রুলফো, কলম্বিয়ার গাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেস, আর্জেন্টিনার হুলিয়ো কর্তাজার, লোপেজ ফুয়েন্তেস, উরুগুয়ের জুয়ান কার্লোস ওনেও, মেক্সিকোর (মেহিকো) কার্লোস ফুয়েন্তেস আরও অনেকে।

আর্জেন্টিনার ব্যতিক্রমী ছোটোগল্পকার এডুয়ার্ডো ম্যালিয়া (Eduardo Mallea : 1905) ব্যতিক্রমী কিছু ছোটোগল্প লিখেছেন Chaves and other stories নামক বইয়ে। সেই বইয়ের শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পটির নাম The Heart Reason। গল্পে আছে স্বামী-স্ত্রীর প্রতি সন্দেহপরায়ণ, তারই অনুসন্ধান। শ্রেষ্ঠ গল্প নয়, সাধারণ গল্প। The Shoes গল্পে একজোড়া শৌখিন জুতো কি করে এক দম্পতিকে তাদের পরিচিত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল তারই এক বিচিত্র কাহিনি। বরং এই গল্পটি অন্য ধরনের, দুশ্চিন্তা (Anguish) এবং বিচ্ছিন্নতার (Alienation) উপর দাঁড় করানো।

জুলিও বা হুলিও কোর্তাজার (Julio Cortazar : 1916-1984)। আর্জেন্টিনার (আর্হেন্তিনা) ছোটোগল্পকার। তিনি কিউবা (কুবা) বিপ্লবের সমর্থক এবং নিকারাগুয়ার বিপ্লবের একজন সক্রিয় সমর্থক। তাঁর বিখ্যাত ছোটোগল্পের বইটির নাম 'All Fires The Fire'। কোর্তাজারের গল্পে বাস্তবতার সঙ্গে ফ্যান্টাসির উপাদান লক্ষণীয়। তাঁর বিখ্যাত ছোটোগল্প Bestiary গল্পে একটি মেয়ে গ্রামের বাড়িতে আত্মীয়দের মধ্যে বাস করতে এসেছে। বাড়িটার চারপাশে রহস্যময় একটি বাঘ ঘুরে বেড়ায়। একদিন মেয়েটি ইচ্ছে করে বাঘটাকে পালিয়ে যেতে দেয়। তাঁর ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য চেতনাপ্রবাহ। এই ফর্মটাকেই উপন্যাসে ছোটোগল্পে ব্যবহার করেন। একটি ২০/২৫ লাইনের অনুচ্ছেদে কোথাও দাড়ি-কমা থাকে না। বলা যায় ২০/২৫ লাইনের পুরো একটি বাক্য রচনা। এরও প্রভাব বাংলা অন্যধারার ছোটোগল্পে পড়েছে।

মেক্সিকান বিদ্রোহের পটভূমিকায় বেশ কয়েকটি ছোটোগল্প লিখেছেন হুয়ান রুলফো। রুলফোর Tell Them not to Kill me গল্পে আছে এক পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের গল্প যেখানে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পুত্র বদ্ধ পরিকর, কিন্তু তার পাপবোধ তাকে পিছু টেনে নেয়। 'তালপা' তার একটি বিখ্যাত গল্প। খারাপ রোগে আক্রান্ত এক রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তালপা গ্রামের তালপা-কুমারীর কাছে। 'কুমারী মায়েরাই পারে সারাতে। কিন্তু পারেনি এটাই গল্পের ইতিবাচকতা।

আলেহো কার্পেন্তিয়েব (1904-1940) কিউবার (কুবা) একজন প্রতিষ্ঠিত ছোটোগল্পকার। ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কিউবার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটিকে গড়ে তোলার কাজে যুক্ত ছিলেন। তার বিখ্যাত ছোটোগল্পটি হচ্ছে, Journey Back To The Source, ম্যাজিক রিয়ালিজমের নিদর্শন এই গল্পটি। এই ছোটোগল্পে সময়ের স্রোতকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। গল্প শুরু হয় নায়কের মৃত্যু থেকে এবং শেষ

হয় তার মায়ের গর্ভে পুনরায় ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত ছোটোগল্প 'রাজনৈতিক আশ্রয়'। এই গল্পে তিনি ছোটোগল্পের ফর্মকে ভেঙে দিয়েছেন এবং ভাষায় চেতনা-প্রবাহকে গ্রহণ করেছেন।

হোর্হে লুই বোর্হেস (1899-1989) আর্জেন্টিনার (আর্হিন্তিনা) যশস্বী এবং বিশ্বখ্যাত একজন কথা-সাহিত্যিক। তাঁর সময়ে এবং পরবর্তীকালে লেখকদের ওপর বোর্হেসের প্রভাব প্রবল। বোর্হেসের গল্প লাতিন আমেরিকার আঞ্চলিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ, এমনকি Realism Movement-কেও তিনি অস্বীকার করেন। বিশ্বের এক বিশেষ শ্রেণির কাছে বোর্হেস বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। সুতীব্র শ্লেষ এবং রোমান্টিকতা আবার ফিরে এসেছে বোর্হেসের হাত ধরে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে। তাঁর 'The Circular Ruins' গল্পে রোমান্টিকতার প্রভাব ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'ব্যাবিলনের লটারি' তাঁর বিখ্যাত ছোটোগল্প। বিশ্বের নানা ভাষায় গল্পটি অনূদিত। 'দ্য গার্ডেন অব ফোর্কিংপাথ' গল্পে লেখক প্রশ্ন তোলেন বাস্তবতা ও ভাবপ্রবণতার দ্বন্দ্ব নিয়ে। তিনি Regionalism Movement ও ছোটোগল্পের কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে কলম ধরে ছোটোগল্প লিখেছেন, টিলন, উকবার, অরবিস টারটিমাস। আঞ্চলিক লেখকদের প্রাদেশিক প্রবণতাকে এই গল্পে কশাঘাত করেছেন বোর্হেস। তিনি পশ্চিমি সভ্যতার ব্যক্তির দ্বৈত সত্তাকে তিনি তাঁর লেখায় স্থান দিয়েছেন, অনুসন্ধান করেছেন। "ব্যাবিলনের লটারি" ছোটোগল্পের প্রথম বাক্যটি পাঠকের মনে নাড়া দেয় : 'ব্যাবিলনের আর সবার মতোই আমিও রাজদূত ছিলাম, আবার সবার মতোই সমান ক্রীতদাস'।

১৯৬৭ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন প্রথম লাতিন আমেরিকান সাহিত্যিক মিগেল আনহেল আস্তুরিয়াস। তিনি গুয়াতেমালার অধিবাসী। তাঁর বিখ্যাত রাজনৈতিক গল্পের সংকলন 'Week End in Guatemala'। এই সংকলনের উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পটির নাম : মুক্তা। তবে অসাধারণ বা বলিষ্ঠ নয়। সমুদ্রের কাছেই থাকে জন চালা ঘরে। ঘরে বউ আছে, সেলেস্তি। সবাই জানে জন ভাঙা ঘোড়ার গাড়ি করে ভাঙা মোটর গাড়ির পার্টস সংগ্রহ করত, সমুদ্রের ধারে জলাশয়ে জড়ো করত। আসলে জন ঝিনুক খুঁজত, যদি মুক্তো পাওয়া যায়, দিনের পর দিন বছরের পর বছর। আর বউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতো ভালো থাকার, ভালো খাবার। একদিন সে একটা মুক্তো পায়। বউয়ের কথা ভাবে, বউয়ের স্বপ্নের কথা ভাবে। ভাবতে-ভাবতে বাড়িতে ঢুকে দেখে, 'সেলেস্তিকে তার বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। আপাদমস্তক একটা সাদা চাদরে ঢাকা'। তার একটি অনুচ্ছেদের পরেই গল্পের শেষ।

দ্বিতীয়বার লাতিন আমেরিকার আরেকজন কলম্বিয়ার কথা-সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পান ১৯৮২ সালে। তাঁর নাম গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস। এখনও বেঁচে আছেন। বাংলা এবং বাংলাদেশে ভীষণ পঠিত এই কথা-সাহিত্যিক। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় তাঁব ছোটোগল্প-উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। Magic Realism Movement তাঁর হাতেই প্রসার ঘটে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গার্সিয়া মার্কেস লেখক-জীবনের প্রথম পর্বে বাম-মনোভাব সম্পন্ন লেখক ছিলেন। সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই পর্বে তাঁর ছোটোগল্পে সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াই, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, মানুষের লোভ

আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা দখলের ব্যাকুলতা, রাজনৈতিক সফলতা-ব্যর্থতা-ভণ্ডামি এসেছে। এই পর্বের একটি ছোটোগল্পের নমুনা : 'প্রতিদিনের এমন একদিন (one of these days)' এই ছোটোগল্পটিতে দেশপ্রেমের এক টুকরো নমুনা গার্সিয়া মার্কেস তুলে ধরেছেন শহরের মেয়র, যে পরাজিত বিপক্ষ দলের কুড়ি জন লোককে হত্যা করেছিলেন, তিনি এসেছেন দাঁতের ডাক্তার অরেলিওর কাছে একটি আক্কেল দাঁত তুলতে। অরেলিও এই মেয়রের দাঁত তুলতে চায় না। ছেলে বাবাকে বুঝিয়েছে, দাঁত তুলে না দিলে মেয়র বাবাকে মেরে ফেলতে পারে। দাঁতের ডাক্তার অরেলিও ভয় পায় না। তবে তুলতে রাজি হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর মেয়র আসেন ফোলা মুখ নিয়ে। দাঁতের ডাক্তার বোঝালেন, অবশ না করে দাঁতটা তুলতে হবে ব্যথার মধ্যেই। মেয়র রাজি হলেন। আক্কেল দাঁতটি তোলার সময় অরেলিও বললেন, 'You will pay for our twenty deadman'। দেশপ্রেম রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সামান্য প্রকাশ, যাদু-বাস্তবতা নয়। সে সময় হিংসার রাজত্ব চলছিল কলম্বিয়ায় পরবর্তী-পর্বে Majic Realism Movement তাঁর চিন্তা-ভাবনা, লেখনির ধারা, আঙ্গিক সৌষ্ঠব পালটে দেয়। তাঁর অসাধারণ বলিষ্ঠ কয়েকটি ছোটোগল্প : The Third Resignation, Eva is inside her cat, Dialogue with the mirror, There are no thieves in this town, The last voyage of the ghost-ship, The sea of lost time.

লাতিন আমেরিকার ছোটোগল্পকারেরা মূলত পশ্চিমি বুর্জোয়া সাহিত্যের আগ্রাসী মনোভাব প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে যাদু-বাস্তবতাকে সংগ্রামী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাদের নিজস্ব লোকাচার-সংস্কৃতি-মিথ অনেকাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে যাদু-বাস্তবতার মাধ্যমে। অনেক সমালোচক মনে করেন, আমরাও করি, Magic কোনো বস্তুকে দেবে ছোটোগল্পের গঠনরীতির এক আলাদা dimension, আর Realism সামাজিক অভিজ্ঞতার পটভূমিতে বৈষম্যের প্রতিরোধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। কারণ বাস্তব-অভিজ্ঞতা এটাই, দ্বন্দ্ব-মূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শিক্ষা এটাই। বিজ্ঞান চৈতন্যে জাগ্রত জনগণের হাতেই থাকে যাদু। ফলত এটাই ঘটনা, পশ্চিমি দুনিয়ার সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজ লাতিন আমেরিকার ছোটোগল্প বিশ্বসেরা।

সর্বশেষে গার্সিয়া মার্কেসের কথাতেই ফিরি : 'আমি মনে করি মানুষের কাছে দুর্বোধ্য সংস্কৃতির টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই। এলিটস কালচারের ব্যাপার-স্যাপার আমি বুঝি না। তবে এ-ধরনের ব্যাপার থাকবেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার ইতিহাসের নিরিখেই তারা কদাচিৎ-ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিটি সংস্কৃতির ভিত্তি থাকবে জনগণের মধ্যে। সংস্কৃতি হবে সমাজের জন্যে।'

সত্যি কথা বলতে কি আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে কবি যে জনগণই জাতীয় সংস্কৃতির আসল উৎস। এ কথা যতদিন বুঝিনি ততদিন আমি প্রকৃত লেখকই হয়ে উঠতে পারিনি।

আরবি ছোটোগল্পে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সহ-অবস্থান

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই প্রাচীনকালে আরবি গদ্য সাহিত্যে ছিল ধর্মের প্রভাব। কোরান এবং হাদিসই আরবি গদ্যের প্রথম পুরুষ। পরবর্তীকালে সামাজিক প্রভাবের ফলে আরবি সাহিত্য থেকে ধর্মের প্রভাব ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। ৭৬০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে রচিত হয় পশু-পক্ষী কেন্দ্রিক বিচিত্র ধরনের কাহিনি 'কালিনা ওরা দিমনা'। এটি রচনা করেন ইবনআল্-মুকাফ্ফা। এটি তাঁর মৌলিক রচনা নয়। এটি সংস্কৃতে লেখা এ উপকথার অনুবাদ।

এরপরে অর্থাৎ ১০০৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ধর্মীয় আরব সমাজে যে গদ্য-কাহিনিমূলক কটি ধর্মের বিপক্ষে নাড়া দিয়েছিল, সেটির নাম হচ্ছে 'মাকামাত'। 'মাকামাত'-এর ভধানিক অর্থ 'বৈঠক'। সাহিত্য-বৈঠকের মাধ্যমে লেখক তাঁর রচনা পড়ে শোনাতেন , প্রত্যেকটি রচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি গল্প। গল্পগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে সামাজিক বনের দুঃখদুর্দশা, সাহস-দুঃসাহস, বাদ-প্রতিবাদ, সামাজিক শোষণ, দারিদ্রতা, ভণ্ডামি, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ ইত্যাদি। তবে এসবের মূলে আছে মানুষের ভাগ্য। তবে ব্যক্তি-মানুষের হাতেই আছে এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার চাবিকাঠি। 'মাকামাত' পড়ে মূল-ধারণা পাঠকের এটাই হবে। 'ভাগ্যই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে' এরূপ ধারণা আরবি সাহিত্যে মধ্যযুগে গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীর অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেও নিয়তিবাদের ওপর আধুনিক ভাষার কোটিং (Coating) লাগিয়ে সাহিত্য প্রচার করেন এবং অন্যান্য দেশের পাঠকের ভাবনা-চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। 'মাকামাত' থেকে একটি গল্পের উদাহরণ দিলে, বোঝা যাবে এসব কাহিনি এখনও লেখা হয়। কাহিনিটি এরকম : একজন উস্কোখুস্কো মোটা অন্ধ লোক শহরের এক বিরাট হলঘরের সামনে একটি ঘুঙুর বাঁধা লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করছিল আর তালের সঙ্গে সঙ্গে গান করছিল। একদল লোক ওকে ঘিরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে গান ও লোকটির কথা শুনছিল। লোকটি গানের শেষে বলছিল : "ভদ্রমহোদয়গণ, আমার পৃষ্ঠদেশ যে বাঁকা দেখছেন, এটা এমনি হয়নি, ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে আমার পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে। সেজন্য আমার স্ত্রী আমার কাছে তালাক প্রার্থনা করে এবং সমস্ত পণের টাকা ফেরত চায়। এককালে আমার ঘরেও ধনদৌলতের প্রাচুর্য ছিল। এখন দারিদ্র আমার নিত্য সঙ্গী। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। দারিদ্র, আমার সম্মানের পোষাক টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে। তখন ইসা নামে একটি ভবঘুরে লোক অন্ধ লোকটির দুঃখে কাতর হয়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। এরপর ইসা তাকে অনুসরণ করলেন এবং জানতে পারলেন যে লোকটি একটি ভিক্ষুকমাত্র এবং সে যে অন্ধ এটা তার ভাণ। অবশেষে লোকটি ইসাকে বলল "যে কোনো বৃত্তি গ্রহণ করতে দ্বিধা করো না, তোমার ভাগ্যের গন্তব্যস্থল তোমার হাতেই নিশ্চিত"।

দশম শতাব্দীর আরবি গদ্য-সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হচ্ছে 'আরব্যরজনী'। বইটির আরবি নাম 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা'। এই বইটি সম্পর্কে আমাদের দেশের পাঠক খুবই পরিচিত। অনেকের মতে 'কালিলা ওয়া দিমনা'র মতো 'আরব্যরজনী'ও ভারতীয় সংস্কৃত উপকথার দ্বারা প্রভাবিত। 'আরব্যরজনী'র গল্পগুলোর পটভূমি সিরিয়া, পারস্য ও মিশর হলেও বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অনেক গল্পে আছে। 'আরব্যরজনী' গল্পগুলিতেও সামাজিক অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তবে সেখানে দয়াদাক্ষিণ্য, মহানুভবতা, উপদেশধর্মিতা, প্রেম-বিরহ ইত্যাদির পরিমাণ বড্ড বেশি। সেখানে সামাজিক শোষণ, প্রতিবাদ, সাহসিকতা এসব বড়ই নিষ্প্রভ। 'আরব্য-রজনী'র গল্পগুলোতে মানবিক আবেদন সবচেয়ে বেশি। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এইসব একহাজার এক রাত্রির গল্পগুলো বলার ভিতর দিয়ে রানী রাজাকে নারী হত্যা থেকে বিরত করতে পেরেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর দুটো যুদ্ধের প্রভাব আরবি-কথা-সাহিত্যকে প্রগতিশীল বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজসচেতন করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাকে মুক্ত করল চারশো বছরের তুর্কিশাসন থেকে, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাকে মুক্ত করল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে। এসব কারণে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যে নিয়তিবাদ, রক্ষণশীলতা, ধর্মান্ধতা ছিল সেসব অপসারিত হতে লাগল। প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হলেও পরোক্ষভাবে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, যে আরব জগতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধেও আরব অধিবাসী এখন সচেতন। শুধু সচেতন নয়, প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে এখন প্রস্তুত। তার প্রভাবও পড়েছে আরবি ছোটোগল্পে। এমত প্রভাবের ফলে ছোটোগল্পও দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল সাহিত্যিক ভাববাদী দর্শন ও উদারনৈতিক মানবতাবাদে বিশ্বাসী। অন্যদল সমাজদর্শন ও বস্তুবাদে বিশ্বাসী। লেবাননের দার্শনিক কবি জীবরান খলিল (১৮৮৩-১৯৩১), ইরাকের ইব্রাহিম হিলমি (১৮৯৫-১৯৪১), মিশরের তাহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩), মিশরের নাজিব মাহফুজ (জন্ম : ১৯১১), মোহাম্মদ তাইমুর (১৮৯২-১৯২১), ইত্যাদি এঁরা হলেন প্রথম দলভুক্ত। এঁরা সবাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পারদর্শী, জীবরান খলিলের লেখা 'শয়তান' গল্পটি এখানে উল্লেখযোগ্য। এই ছোটোগল্পে ধর্মের মুখোশকে খুলে ধরা হয়েছে মানবতার পক্ষে। মিশরের তাহা হোসাইন 'আল-মুয়াজ্জাবুন ফিল আরদ (ঘামে ভেজা মাটি)' ছোটোগল্প সংকলনে তুলে ধরেছেন আরব পল্লী গ্রামের আপামর জনসাধারণের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ। এই বইটিকে মিশর সরকার একবার বাজেয়াপ্ত করেছিল। তাহা হোসাইন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধ। মোহাম্মদ তাইমুর রচিত 'নাজারতু শাইয়্যান (সব কিছু দেখেছি)' ছোটোগল্প সংকলনের ছোটোগল্পগুলোতে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করে সামাজিক বিশ্লেষণ করেছেন। মিশরের নাজিব মাহফুজ-এর ছোটোগল্পে দেখা যায় আধুনিক মানবতাবোধের দৃষ্টিতে প্রাচীন ঐতিহ্যের সংস্কার-বর্জিত পুনরুজ্জীবন। 'পাগল' নামে তাঁর লেখা একটি গল্পের কথা বলা যাক। সে যথার্থ পাগল কিনা পাঠক বিচার করবেন। চরিত্রটির নাম নেই। সে একজন মানুষ। সে হোটেলের বাসিন্দা। সে স্বাধীন ভাবনা-চিন্তা নিয়ে থাকতে চায়। সে দেখল একজোড়া দম্পতি মুরগির রোস্ট খাচ্ছে। রাস্তায়

ছেলেমেয়েরা ময়লা-নোংরা-ছেঁড়া কাপড় পরে ওদের খাবারের দিকে তাকিয়ে আছে। সে এই দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। সে স্বাধীন। দম্পতির প্লেট থেকে হঠাৎই মুরগির রোস্টটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নোংরা ছেলেমেয়েদের মাঝখানে। সে মার খেল। আরেক দিন সে রাস্তায় দেখল প্রেমিক-প্রেমিকাকে। হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে। পাতলা জামার ভিতর দিয়ে স্তনের বোঁটা ফুটে উঠেছে। সে এই দৃশ্য সহ্য করতে পারল না, সে মহিলার পথ আগলে দাঁড়ালো এবং তড়িৎ বেগে বেহায়া উচ্চারণ করে হাত দিয়ে স্তনের বোঁটা থেঁতলে দিল। সে মার খেল। একদিন সে বুঝতে পারল। শরীরে পোষাকের আবরণ থেকে সে মুক্ত হবে। সে ভাবল, কি প্রয়োজন এসব কাপড়-চোপড়ের? কেন এসবের অন্তরালে নিজেকে বন্দি করে রাখা? দু-হাতে শরীরের সমস্ত কাপড়-জামা ছিঁড়ে ফেলে দিল ডাস্টবিনে।

ছোটোগল্পকারের শেষ সঙ্কেত, 'এখন সে স্বাধীন। মুক্ত। রাস্তায় নেমে অট্টহাসি হাসতে আর কোনো বাধা নেই।...' এ যেন পরাধীন মানবসভ্যতার অট্টহাসি। এই গল্পে গল্পের প্রয়োজনে নাটকীয়তা থাকলেও, এই 'অট্টহাস্য' জীবনের ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রিয় পুরস্কার পান 'রায়লাল কাসরাইন (দুই প্রাসাদের মাঝখানে)' বারোশো পৃষ্ঠার উপন্যাসটি লিখে।

যাঁরা সমাজ-সচেতন, যাঁরা art for art's sake-এ বিশ্বাস করেন না তাঁরা হলেন মাহমুদ তাইমুর (জন্ম : ১৮৯৪), তাওফিক্ আল-হাকিম (জন্ম : ১৯১২), জুননুন আইয়ুব (জন্ম : ১৯০৯), মাহমুদ সাদানি (জন্ম : ১৯২৮) ইত্যাদি। এরা দ্বিতীয় দলভুক্ত।

মাহমুদ তাইমুর ইজিপ্টের লোক। তিনি লেখায় সমাজতান্ত্রিক বস্তুচেতনায় বিশ্বাসী। মৃত্যুচেতনা তাঁর অনেক ছোটোগল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'মৃত্যুর দূত' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প, মৃত্যুর দূতকে নিয়ে গল্প। যে মারা যাচ্ছে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে কোরান পড়ে, খোদার করুণা ভিক্ষা করে। আত্মার মুক্তি কামনা করে। এরাই আজরাইল বা ইজরাইল (মৃত্যুর দূত), মৃতের কাজ করে। শেখ ঘুনাইস এই কাজ করে। সে বৃদ্ধ, ওর এক যুবক বন্ধু আছে, ওর নাম ওম্মর। মাহমুদ তাইমুর লিখছেন, 'কি অদ্ভুত মানিক জোড়! একে অপরের ঠিক বিপরীত। একজন মৃত্যুর দূত আর একজন জীবেনর দূত।' গল্পের দ্বান্দ্বিকতা এখান থেকেই। নানারকম ঘটনার ভিতর দিয়ে শেষ হল মৃত্যু দিয়ে। ওম্মরের হাতে মৃত্যুর দূতের মৃত্যু হয়। কিন্তু ওম্মর আলনামিনার অধিবাসীদের কথায় সে কাজটাই গ্রহণ করল। খেত-মজুরের কাজ ছেড়ে দিল।

আরবি ছোটোগল্পের নবরূপায়নে মিশরের বিখ্যাত কথাশিল্পী আল-হাকিম উল্লেখযোগ্য। জীবন সত্যের মুখোমুখী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর ছোটোগল্পগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অন্যতম গল্প 'ইরাদাতিল আবেদ (পীর সাহেবের অভিপ্রায়)' একটি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প। ধোকাবাজ পীর-দরবেশ ধর্মের ছদ্মবেশে নিরক্ষর অশিক্ষিত গরিব দুঃখীকে চুষে খাচ্ছে এবং ধর্মের নামে অশ্লীলতার রূপায়ণ ফুটে উঠেছে এই গল্পে। সমাজের নির্যাতিত মানুষদের নিয়ে এবং সরকারের প্রতি কটাক্ষ করে লেখা তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নাম হচ্ছে 'আদ দাকতোর ইবরহীম'। তিনি একটি সমাজতান্ত্রিক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন, নাম 'আল মাজাল্লা' (সবার পত্রিকা)। ইরাকের কথাশিল্পী জুননুন

আইয়ুব একজন স্কুল-শিক্ষক। সমাজ-জীবনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর ছোটো গল্পগুলো প্রতিবাদস্বরূপ। সমাজের দূষিত ক্ষত, অন্যায়-আচরণ তিনি তাঁর ছোটোগল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। জুননুন আইয়ুবকে সরকারি নির্যাতনের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে কয়েকবার। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প বইয়ের নাম 'আল-কাদিবুন' (নিম্নশ্রেণি)।

সৈয়দ মোস্তফা লুত্‌ফী আলমান ফালুতী (জ. ১৮৭৬) মিশরের একজন উল্লেখযোগ্য গল্পকার। সংক্ষেপে তাঁর নাম আলমান ফালুতী। 'শিল্প জীবনের জন্য'—এই আদর্শে বিশ্বাস রেখেই তিনি কলম ধরেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ছোটোগল্প : কবরের কান্না, শহীদান, অনাথ, স্বপ্নশেষ ইত্যাদি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পটি হচ্ছে 'স্বপ্নশেষ'। গল্পটির শুরু হচ্ছে দুই বন্ধুর কথাবার্তা দিয়ে : বিষয় মেয়েদের পর্দা-প্রথা নিয়ে। এক বন্ধু লন্ডন-ফেরৎ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, অন্যবন্ধু দেশেই থাকত। পর্দা-প্রথা বিরোধী শিক্ষিত বন্ধুটির বক্তব্য, সে তার স্ত্রীকে পর্দা-মুক্ত করতে চায়। কিন্তু স্ত্রী পর্দা-মুক্ত হতে চায় না। পর্দা-প্রথার পক্ষে অন্যবন্ধুটি স্ত্রীর পক্ষ নেয়। কিন্তু শিক্ষিত বন্ধুটি স্ত্রীকে পর্দা-মুক্ত করেই ছাড়বে। বন্ধুর জেদ দেখে অন্যবন্ধুটি বন্ধুত্ব থেকে সরে আসে। একদিন অন্যবন্ধুটি জানতে পারে লন্ডন-ফেরৎ বন্ধুটিকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে। সেখানে সে জানতে পারে শিক্ষিত বন্ধুটির স্ত্রী পর্দা-মুক্ত হয়ে পরপুরুষের সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিল। তবু সে স্ত্রীকে ঘরে ফিরে নিয়ে যায় এবং সে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়। তার শিয়রের পাশে বসে স্ত্রী জানায় 'একটি শিশু-সন্তানের জন্য এ রকম ঘটনা ঘটেছে। সে মা হতে চায়।' সর্বশেষে পাঠক জানতে পারে, ওরা ছিল নিঃসন্তান। 'শিল্প যে জীবনের জন্য' এই বলিষ্ঠ বার্তাটি পৌঁছে দিতে পেরেছে ছোটোগল্পটি।

প্রাথমিক পর্যায়ে এদের রচনায় ফরাসি ও রুশীয় সাহিত্যের প্রভাব পড়লেও পরবর্তীকালে এই প্রভাব তারা কাটিয়ে ওঠেন। ফলত ফিরে তাকান স্বাজাত্যবোধের দিকে, ঐতিহ্যচেতনা এবং দেশপ্রেমের দিকে। এরই মধ্যে আধুনিক জীবন বোধ গড়ে ওঠে, সেখানে প্রকাশ পায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও যৌন সম্পর্কিত জীবন যন্ত্রণা। এইভাবে আরবি ছোটোগল্প ধর্মীয় প্রভাব ও নিয়তিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে মানবতার ও জীবনের পথ ধরে সমাজ-চেতনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আফ্রিকান ছোটোগল্পে উপনিবেশবাদ বিরোধিতা ও শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ

যেহেতু আফ্রিকার জীবন উপনিবেশবাদীদের বর্বরতায় ও বর্ণবৈষম্যের অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সেহেতু আফ্রিকার ছোটোগল্পকারদের লেখায় ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা, জ্বালা, প্রতিরোধস্পৃহা ও সংগ্রাম প্রকাশ পেয়েছে।

উপনিবেশবাদী বর্বরতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের সংগ্রাম প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই তীব্র আকার ধারণ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ভাবনার দিকে চালিত হয়। আফ্রিকার জনগণের এই সময়ের মুক্তি সংগ্রাম আফ্রিকানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার প্রসার ঘটাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এই সমস্ত সংগ্রামগুলি প্রচলিত শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রায় সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিক উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের শিল্পকর্ম জনগণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হতে থাকে। তাঁদের মধ্যে গুজে দেওয়া কিছু পদলোভী-অর্থলোভী প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীও ছিলেন।

আফ্রিকান ছোটোগল্পকারদের মধ্যে অনেকেই ফরাসি, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, তথাপি তাঁরা স্বদেশিবোধগুলোকে কাটিয়ে ওঠেননি এবং উঠতে পারেননি। আফ্রিকার ছোটোগল্পকারগণ ছোটোগল্পের তালিম নিয়েছেন ফরাসি, ইংরেজি ও রাশিয়ান ছোটোগল্প থেকে। সেজন্য আফ্রিকান ছোটোগল্পকারদের ছোটোগল্পের আঙ্গিকে আছে পশ্চিমী প্রভাব। কিন্তু বিষয় আফ্রিকান জীবনের মুল থেকে উৎপাটিত।

কঙ্গোর অধিবাসী সিলডেন বেম্বা 'অন্ধকার ঘর' নামে একটি ছোটোগল্পে উপনিবেশবাদের প্রতি তীব্র ব্যক্তি-ঘৃণা ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি যুবক কঙ্গো থেকে প্যারিসে এসেছে লেখাপড়া শিখতে ও ভাগ্যের অন্বেষণে। অবশেষে লেখাপড়া শেষে সে প্যারিসেই কোনো এক দৈনিক পত্রিকায় ফটোগ্রাফারের কাজ গ্রহণ করেন।

এই যুবক দেশকে ভালোবাসতেন অথচ রাজনীতি আবহাওয়ার বাইরে থাকতেন। একদিকে প্যারিসের সৌন্দর্য ও ভোগলিপ্সার প্রতি আকর্ষণ অপর দিকে দেশের উপনিবেশবাদের অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের প্রতি তীব্র ঘৃণা—এই দুয়ের দ্বন্দ্ব শিথিলভাবে গড়ে উঠেছে গল্পটিতে। প্যারিসের রাস্তায় শ্বেতাঙ্গদের দুর্ঘটনা দেখলে তিনি আনন্দিত হন। শ্বেতাঙ্গ রমণীদের ধর্ষণ করে ও অশ্লীল ছবি তোলে এই ভেবে যে শ্বেতাঙ্গরাও আফ্রিকান রমণীদের ধর্ষণ করে ও দারিদ্রের ছবি তোলে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি আক্রোশ এতো তীব্র হয় যে ধর্ষণ করার পর শ্বেতাঙ্গ রমণীকে হত্যা করে।

যেহেতু সঠিক রাজনৈতিক চিন্তা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, সেহেতু শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ তাকে পাগল করা সত্ত্বেও মুক্তির সঠিক পথ দেখাতে পারে না। তাই সে বলে—'এমন একটা যাদুবিদ্যা আফ্রিকানদের জানা প্রয়োজন যেন ইচ্ছা করলে তারা পাহাড় টলাতে পারে।' এখানে যাদু-বাস্তবতার প্রশ্ন এসে যায়। গল্পটায় শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষের প্রতি ঘৃণাবোধ থাকলেও পাঠকমনে ঘৃণাবোধ নাড়া দেয় না।

রিচার্ড রাইভ-এর লেখা 'প্রত্যাবর্তন' ছোটোগল্পটি খ্রিস্টধর্মের শূন্যতাবোধকে তুলে ধরে। কৃষ্ণাঙ্গরা ভাবে, খ্রিস্টানদের মতে যেখানে সবাই ঈশ্বরের সন্তান, সেখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে তফাৎ কেন? কেন শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের ঘৃণা করে? এই গল্পটির নায়ক একজন নিগ্রো পথিক। সে হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় এসে তৃষ্ণা মেটাবার জন্য জল চেয়েছিল কয়েকজন যুবকের সামনে। তার সাহস দেখে একজন যুবক তাকে ঘুষি মারে। তারপর পথিকটি মার খেয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের এলাকায় গিয়ে তৃষ্ণা মেটায়। তৃষ্ণা মিটিয়ে সে পুনরায় শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় এসে গির্জায় প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশিনী গির্জার দারোয়ানকে বলে নিগ্রোটিকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে। সেসময় নিগ্রোটি প্রতিবাদ করে। বলে, "যিশু সমস্ত মানুষকে উদ্ধার করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্য নয়।" কথা শেষ হতেই কৃষ্ণাঙ্গ পথিক দারোয়ানের হাতে গলাধাক্কা খায়। আর সে সময় গির্জায় ধর্মযাজক শ্বেতাঙ্গদের সামনে আলোচনা করছেন 'প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য—'

দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালের ছোটোগল্পকার লুই এককোসী দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামী পটভূমিকায় লিখেছেন 'কয়েদি' নামে একটি ছোটোগল্প। এই গল্পে একজন নিগ্রো বুদ্ধিজীবী কি ভাবে কয়েদি থেকে জেলার হল এবং একজন অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ জেলার থেকে কি ভাবে কয়েদী হল তারই আত্মবিশ্লেষণধর্মী একটি নতুন আঙ্গিকের ছোটোগল্প।

দক্ষিণ আফ্রিকার আরেকজন ছোটোগল্পকার গোয়ালা লিখেছেন নিগ্রো মহিলাদের মিছিলের ওপর একটি ছোটোগল্প। আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা ভয়ংকর বেকারিত্বের বিরুদ্ধে মিছিল করে প্রতিবাদ লিপি দিতে গেল কোর্টের দেশি কমিশনারের কাছে। এবং মহিলাদের মিছিলের সঙ্গে সরকারি পুলিশের রক্তাক্ত সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে এই গল্পে। শুধু সমাজ-জীবনের দারিদ্র নয়, মানসিক দারিদ্রও কৃষ্ণাঙ্গদের সংগঠিত করতে পারছে না তারও উদাহরণ এই গল্পটি। সংগঠনের প্রশ্নে বুদ্ধিজীবী নেতাদের মনে সংশয়, দ্বিধা কত যে ক্ষতিকর এই গল্প তার উদাহরণ। বিক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, বিপ্লবী আফ্রিকান মহিলাদের সংগঠনের প্রশ্নে নেতাদের মন যে সংশয়, দ্বিধা তা এই গল্পে স্পষ্টভাবে লেখক দেখিয়েছেন। এই গল্পে একজন মহিলা নেত্রী বলেছেন '—গতবারের আলু বয়কটের ঘটনা থেকে তোমাদের কি কিছুই শিক্ষা হয়নি? সেবার তো তোমাদের জন্য, আমাকে অনেক উকিল খরচ দিতে হয়েছে। আর কেন?' তবুও নেত্রীর কথাকে অস্বীকার করে আফ্রিকান নিগ্রো মহিলারা মিছিল সংগঠিত করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রতিবাদের জন্য।

মোজাম্বিকের ছোটোগল্পকার লুই বারনারডো হনওয়ানা লিখেছেন 'মধ্যাহ্নভোজ' নামে এক ছোটোগল্প। শ্বেতাঙ্গ মালিকের মধ্যাহ্নভোজ শুধু মদসহ ভালো খাবার নয়, কৃষ্ণাঙ্গ কুমারীর সতীত্ব-হরণের ভোজও তার সঙ্গে চাই। এবং সেটা সকল কৃষ্ণাঙ্গ

শ্রমিকদের সামনেই। কেউ প্রতিবাদ করতে এলে চাকরি যাবে। এবং রক্তাক্ত অত্যাচারের কাছে কালো শরীরটাকে নিবেদন করতে হবে। তবু প্রতিবাদ করেছিল এক যুবক, কালো শ্রমিক। চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটতে দেখে তার একক তাজা রক্তে দাবানল সৃষ্টি করেছিল। আর কুমারী মেয়েটির বৃদ্ধ পিতার আদেশের অপেক্ষায় ছিল অন্য সকল কালো শ্রমিক। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা মাদাসা আদেশ দেননি মানসিক বিপর্যয়ের।

পশ্চিম আফ্রিকার ছোটোগল্পে উপনিবেশবাদ বিরোধিতা ও শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষের প্রভাব তুলনায় কম। সমাজ-জীবনের দুঃখ, দারিদ্র, ধর্মীয় প্রভাব ইত্যাদি ছোটোগল্পে দেখা যায়। নাইজিরিয়ান লেখক ওয়োইয়েলের একটি ছোটোগল্প 'আল্লার দোয়া'। পাপের শাস্তি মৃত্যু—এরকম একটি অবৈজ্ঞানিক সনাতন চিন্তাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে গল্পটি। গল্পের প্রধান চরিত্র সুলে চুরি করে ক্ষুধা মেটায়। সে জজসাহেবকে বলে 'তোমার মতো অসৎ প্রকৃতির লোকের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।' সেই সুলে কোনো এক বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে কেউটের ছোবলে প্রাণ হারায়। দক্ষিণ আফ্রিকার তুলনায় পশ্চিম আফ্রিকার ছোটোগল্প পেছিয়ে আছে মনে হয়। পশ্চিম আফ্রিকার আরেকজন ছোটোগল্পকার হচ্ছেন ঘানার আয়য়োনর উইলিয়ামস্। তাঁর লেখা 'খোরাকি' গল্পে আছে স্বামীহারা মা কিভাবে একটি আট মাসের অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তার কাহিনি। অবশেষে যখন সে খোকার জন্য ওষুধ ও খোরাকি মাদুর বিক্রি করে সংগ্রহ করল তখন দেখল তার খোকা মারা গেছে। নিয়তিবাদের প্রভাবে এসেছে গল্পের নাটকিয়তায়।

পূর্ব আফ্রিকার ছোটোগল্পকারদের কাহিনি রচনাতেও ছড়িয়ে আছে উপনিবেশবাদ বিরোধী মনোভাব ও তীব্র শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষ। শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পুলিশের বেপরোয়া গুলি ও গণহত্যা, মুক্তিবাহিনীর সংগ্রাম ও শ্বেতাঙ্গ হত্যা, ইত্যাদি বিষয় ছোটোগল্পগুলিকে চিরস্মরণীয় করে তুলেছে। তবে এসব গল্পে প্রতিবাদের চেয়ে এবং রাজনৈতিক চেতনবোধের চেয়ে মানবিকতার দ্বান্দ্বিক প্রতিধ্বনি আরও বেশি সোচ্চার। যেমন কেনিয়ার তরুণ সাহিত্যিক জেমস নগুগি 'শহিদ' নামে একটি নেতিবাচক ছোটোগল্প লিখেছেন। ছোটোগল্পটির প্রধান চরিত্র একজন মনিবের কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য, নাম নজওরগ। মনিবটি হচ্ছেন স্বামীহারা একজন শ্বেতাঙ্গ চা-বাগিচার মালকিন। নাম মিসেস হিল যার বংশধর নরওরগদের সম্পত্তি দখল করে নিয়ে বংশপরম্পরায় ভোগ করে আসছে। মুক্তি-বাহিনী সেই শ্বেতাঙ্গ এলাকায় ঢুকে এক শ্বেতাঙ্গ স্বামী-স্ত্রীকে খুন করেছে। খুনের পদ্ধতি ছিল বাড়ির চাকর দরজা খোলার জন্য মনিবদের ডাকেন এবং তখন মুক্তি-বাহিনী ভিতরে ঢুকে খুন করে। নজওরগও চেয়েছিল মনিব মিসেস হিলকে খুন করতে এবং খুন করে মুক্তি-বাহিনীতে যোগ দিতে। তার মনে দেখা দিল তীব্র শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ। যেমন নজওরগ বলে—'আমি ওদের (শ্বেতাঙ্গদের) ঘৃণা করি, ওদের সব্বাইকে ঘৃণা করি'। মিসেস হিলের ভৃত্য এই নজওরগের পরে মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তার মধ্যে মানবিকতার আধিক্য দেখা যায়। সে ভাবে মিসেস হিল একজন মা এবং তার দুটি সন্তান আছে। সে কিছুতেই খুন করতে পারবে না। কিন্তু ছোটোগল্পকার এই গল্পে বলেন, 'সবচেয়ে ভাল হত নজওরগ যদি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিসেস হিলকে বিচার না

করত।' এতেই বোঝা যায় নজওরগের মধ্যে চিন্তার জটিলতা। গল্পের শেষে নজওরগ গভীর রাতে ছুটে আসে মিসেস হিলের বাড়িতে তাকে বাঁচাতে মুক্তি-বাহিনীর হাত থেকে। আর মিসেস হিল ভাবে পরিচিত পদ্ধতিতে বাড়ির চাকর তাকে ডেকে তুলছে এবং দরজা খোলা হলে মুক্তি-বাহিনী ঢুকে তাকে হত্যা করবে। এমত ভাবনার বশবর্তী হয়ে সে হাতে পিস্তল নেয় এবং দরজা খুলে নজওরগকে হত্যা করে। এবং ছোটোগল্পকার গল্পের নাম রাখেন 'শহিদ'।

আলজেরিয়া কমিউনিস্ট মুক্তি-বাহিনীর একজন সংগ্রামী বন্দির ইচ্ছাশক্তির ওপর লেখা একটি বলিষ্ঠ ছোটোগল্প 'এল বিয়ার ক্যাম্প'। লিখেছেন হেনরী অ্যালেগ। তিনি অ্যালজেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। বন্দির মুখ থেকে কথা বের করার জন্য বন্দিকে টর্চার রুমে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে তাকে 'ট্রুথ ড্রাগ' দেওয়া হয়েছে। 'ট্রুথ ড্রাগ' বন্দিদের ওপর প্রয়োগ করে কথা বের করা হয়। বন্দিদের ওপর এটা এক ধরনের বৈজ্ঞানিক উপায়ে অত্যাচার। তবে যদি কোনো বন্দির ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে তবে ট্রুথ ড্রাগে কাজ হয় না। এখানে কিছুতেই বিরোধী অত্যাচারী দল মুক্তি-সংগ্রামী সেই কমিউনিস্টের মুখ থেকে ট্রুথ ড্রাগ প্রয়োগ করেও কোনো কথা বের করতে পারেনি। বন্দি অজেয় রইলেন। বন্দিটি হচ্ছেন লেখক নিজে। তাঁর বন্দি জীবনের একটি ঘটনা হলেও ঘটনাটি ছোটোগল্প হিসেবে বলিষ্ঠতার দাবি করতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার 'অ্যানড্রু' ছোটোগল্পটি এখানে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এই গল্পে রিচার্ড রাইভ বলতে চেয়েছেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে আফ্রিকানদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গ জনগণের প্রতি বিদ্বেষ-বিষ না রেখে নিগ্রো অ্যানড্রু ভালোবাসে রুথ নামে এক শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে অ্যানড্রু সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে আসে রুথের কাছে। তখন অ্যানড্রুর মনে অনেক প্রশ্নের জটিলতা আবর্তিত হয় যথা, রুথের সঙ্গে বন্ধুত্ব অনুচিত? না কোনো সাদা চামড়ার মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক আছে বলে? বা ব্যাপারটা এভাবেও ভাবা যায় যে কোনো কালো চামড়ার মানুষের সঙ্গে সাদা চামড়ার মেয়ে রুথের ভালোবাসা আছে বলে? বা কোনো নিরাপত্তার ঝুঁকি? এরপর রুথ আর অ্যানড্রুর প্রতি ভালোবাসার ঝুঁকি নিতে সাহস পায়নি। গল্পের শেষ লাইন : রুথ কিন্তু আর ফিরে আসেনি।

পূর্ব আফ্রিকার উগাণ্ডার লেখিকা ভায়োলেট কোকুণ্ডা লিখেছেন, 'কেফা কাজানা' নামে একটি খেতে-না-পাওয়া নিগ্রো বালকের গল্প। একটি সুখী পরিবারে এই নিগ্রো বালকটি এসেছে খাবারের আশায় বিকেলবেলায়। সবার খাবার হয়ে গেছে। চা ভরতে এসেছে ওই পরিবারের বড়ো মেয়ে। সে ওর সঙ্গে আলাপ করে জেনে নিয়েছে ওর থাকার জায়গা নেই। মা-বাবাও নেই। একটা বালকের পক্ষে এটা কি করে হয় সে ভেবে এর সমাধান খুঁজে পায় না। হঠাৎ সে রান্নাঘরে দেখে ক্ষুধার্ত নিগ্রো ছেলেটি থালার চারপাশে ফেলে দেওয়া এটোগুলি খুটিয়ে-খুটিয়ে খাচ্ছে এবং সে জানতে পারে সে এভাবেই কুকুরের খাবার, এটো খাবার খেয়ে খিদে মিটিয়ে এসেছে। সে দুঃখ পায়, বেদনা বোধ করে যখন নিগ্রো ছেলেটি ওদের পরিবারের একটি পুরুষ মানুষকে দেখে

অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে চা না খেয়েই ভয়ে পালায়। এই গল্পের মানবিকতা পাঠককে বেদনার্ত করে তোলে।

দক্ষিণ আফ্রিকার আরও একটি ছোটোগল্প 'কাগুজে হুকুমনামা' এখানে উল্লেখযোগ্য। রণশৌলি একজন দরিদ্র দর্জি। সারা জীবন সে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করে এসেছে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সে একটি সরকারি কাগুজে হুকুমনামা পেয়েছে যেখানে লেখা আছে যে তাকে একা দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার সংসার রয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকায়। বৃদ্ধ রণশৌলি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তবে একটা চিন্তাই তার মানসিকতাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে যে শ্বেত-সরকার একজন বুড়ো নিগ্রোকেও ভয় পায়।

উত্তর আফ্রিকার সোনাল্লা ইব্রাহিম কায়রোর লেখক, ১৯৩৭ সালে কায়রোয় জন্মগ্রহণ করেন। যুদ্ধের পরিবেশে শান্তিপ্রিয় একটি পরিবারের ছবি তুলে ধরেছেন 'সান্ধ্যসংগীত' ছোটোগল্পটিতে। সন্ধ্যার পর কায়রোয় চলে যুদ্ধের প্রস্তুতি যথা, সাইরেন, বোমা, ইজরাইলদের এরোপ্লেন, নানানরকম সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শব্দ। এরই মধ্যে বেঁচে থাকার গান যথা, বাবার আদর, শিশুদের খেলাধূলা, স্বামীর জন্য স্ত্রীর অপেক্ষা, স্বামী-স্ত্রীর আদর, ছেলে-মেয়েকে নিয়ে নিঃসঙ্গ বাবার বেঁচে থাকার স্বপ্ন। এই বৈপরীত্য ছোটোগল্পটিকে সজীব এবং প্রাণময় করে তুলেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ছোটোগল্পকার অ্যালয় ওয়ানেনবাগ লিখেছেন শ্বেতাঙ্গ শিশুদের মানসিক অবস্থান থেকে 'শুধুমাত্র' ছোটোগল্পটি। বিদ্যালয় ছুটির পর ছোটো ছোটো মেয়েরা যখন বাড়ি ফিরত তখন পথে দেখা এক নিগ্রো বৃদ্ধাকে তারা কিভাবে বিরক্ত করত সেটাই তুলে ধরেছেন ওই ছোটোগল্পে। একজন পথিক এর প্রতিবাদ করল। পথিক বলছে 'ওহে মেয়েরা, তোমাদের আচরণের জন্য তোমাদের যথেষ্ট লজ্জা পাওয়া উচিত।' ওদের উত্তর শোনার পর পুনরায় পথিকটি বলছে, 'তোমাদের বাবা-মা যদি দেখতেন একজন গরিব অসহায় মহিলার পেছনে এইভাবে লেগেছ, তখন তাঁরা কি করতেন? জানো?' সিবিল নামে এক কিশোরী উত্তর দিল : "Nothing' said Sybil, "She is only an old coloured girl!" গল্পের শেষটা জানার পর চমকে যেতে হয়। লোকটির আর কিছু বলার থাকে না। লোকটির সঙ্গে-সঙ্গে পাঠকও বুঝে নেয় বাপ-মায়ের শ্রেণিভেদ শিক্ষাই এইসব কিশোরীরা বংশপরম্পরায় পেয়ে আসছে।

ঠিক একই জাতের দক্ষিণ আফ্রিকার আরও একটি ছোটোগল্প, 'এক গেলাস মদ'। লিখেছেন অ্যালেক্স ল্যা গুমা। মদের দোকানে মদের ঘোরে আচ্ছন্ন আর্থার। সে দেখল সেখানে একটি শ্বেতাঙ্গ ছেলে এসেছে মদের দোকানের ব্রাউন-কালার এক মহিলা-কর্মচারীর সঙ্গে প্রেম করতে। আর্থার ভাবছে এদের ভালোবাসা সফল হবে। এরা বিয়ে করবে, ছেলে-মেয়ে হবে এবং সুন্দর সংসার পাতবে। কিন্তু আর্থারের বন্ধু যে পরিমাণ মতো মদ খেয়ে শরীর মনকে সুস্থ রাখে, সে বলে, এই ধারণা ভুল। এটা হতে পারে না। সে ওদেরকে অনেক দিন ধরেই লক্ষ্য করছে। ওরা শুধু ফস্টিনস্টিই করে থাকে। সে আর্থারকে বলে, "you know that white boy can't marry the girl, even

though he may love her. It isn't allowed." "Jesus", Arthur said in the dark, "Jesus, what the hell."

মদের নেশায় এ রকম রঙিন ভাবনা এবং নেশার বাইরে যে কঠোর বাস্তব তা হচ্ছে 'what the hell'। এটাও একটা উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প যা দক্ষিণ আফ্রিকার Cross-Culture-এর সঙ্গে আমাদের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়। হারবার্ট লি সোর 'Come Back Africa' বইয়ের ভূমিকায় লিখে আমাদের জানিয়ে দেয় 'The African is forging a culture that is a synthesis of black and white and brown, of traditional and modern. All the arts show evidence of the cross-cultural impact of the last 300 years.'

দক্ষিণ আফ্রিকায় এখন যে লেখালেখি হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, "Oppression and repression grew more intense. Urbanisation increased, and did literacy and organised political action. Nostalgia turned to protest, romance to realism and a literature of struggle came into being."

আফ্রিকার বেশির ভাগ প্রচারিত ছোটোগল্প সংগ্রামী, প্রতিবাদী বা বর্ণবৈষম্যভিত্তিক হলেও কিছু ছোটোগল্প আছে মনস্তাত্ত্বিক যা ব্যক্তির অন্তর্গত মানসিকভূমি কাঁপায়। এম. এম. হাজির. 'দেয়াল যখন ধ্বসে পড়ল' এরকম একটি পূর্ব আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প। কিভাবে এষা ভালোলাগা এবং বাক্‌বদ্ধ কাশিমের জীবন থেকে সরে যায়, এবং তারই আবর্তে কিভাবে কাশিম অন্যদের সাহায্যে বেঁচে থাকার বিষণ্ণতাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে তারই শৈল্পিক বিশ্লেষণ দেখতে পাওয়া যায় এই সুন্দর ইতিবাচক ছোটোগল্পটিতে। এখানেও অন্তর্গত নদীর মতো শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ প্রবাহ বয়ে যায়।

আফ্রিকার ছোটোগল্পগুলোতে বেশ দক্ষতার সঙ্গে ছোটোগল্পকারগণ শ্বেতাঙ্গদের নির্মম অত্যাচার, উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের কঠোর শোষণ, নির্মম-নিপীড়ন, আফ্রিকানদের প্রতিহিংসা ও শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ, তাদের দারিদ্র, বেকারিত্বের নারকীয় যন্ত্রণা গঠন-সংগঠনের দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা, বিদেশি শিক্ষা ও চালচলনের প্রতি কৃত্রিম মোহ ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলেছেন। ছোটোগল্পের যে একটি সনাতনী ব্যাকরণ আছে সেটাও ছোটোগল্পকারগণ ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছেন। এমনকি ভেঙে নতুন ব্যাকরণও সৃষ্টি করেছেন, এমন ছোটোগল্পের নজীরও আছে। তবে যেটা একান্ত অভাব সেটা হচ্ছে আফ্রিকান ছোটোগল্পকারদের সঠিক রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব যে সঠিক রাজনৈতিক সচেতনতা নির্ভর করে জাতীয় উৎপাদনের ওপর এবং এই জাতীয় উৎপাদনই একটা গোটা দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এমত অভাবের জন্যই কোনো ছোটোগল্প প্রতিবাদী হয়েও পাঠকের চিন্তাকে কোনো লক্ষ্যের দিকে আঙুল দেখাতে পারেনি অথবা রাজনৈতিক ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কের দিকে পাঠকের বুদ্ধিকে চালনা করতে পারেনি।

চেক-ছোটোগল্পে স্বদেশপ্রীতি ও সমাজ-সম্পর্ক

আধুনিক ইউরোপিয় সংস্কৃতির অন্যতম উত্তরাধিকারী চেকোস্লোভাকিয়া যন্ত্রশিল্পের মতো শিল্প-সাহিত্যেও খুবই উন্নত। শৈল্পিক মগ্ন চেতনায় এবং আঙ্গিক উৎকর্ষতায় চেক-সাহিত্য এবং ছোটোগল্প এখন অনেক উন্নত। এর পেছনে আছে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণ। ইউরোপের এই ক্ষুদ্র দেশটি বারবার বিদেশি শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শিকার হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে চেক ও স্লোভাক জাতি অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির প্রভুত্ব মেনে চলেছিল। সমস্ত প্রধান শিল্প-বাণিজ্যের মালিক ছিলেন অস্ট্রিয়ানরা। ফলত নিজের দেশেই চেকরা ক্রীতদাসের জীবনযাপন করতো। অতীতে সে কারণে চেক-সাহিত্যে দুটি ধারা দেখা যায়। যথা (১) নিসর্গ চেতনা (২) নিয়তিবাদ। অত্যাচারিত, শোষিত ও নিপীড়িত মানবসমাজ যখন চোখের সামনে পরিত্রাণের কোন পথ দেখতে পায় না, তখন স্বভাবতই নিয়তিবাদ তাকে ঘিরে ফেলে এবং নিসর্গের কাছে যায় আনন্দ পেতে, শান্ততার খোঁজে।

উনিশ শতকে ইউরোপে যে জাতিয়তাবাদের হাওয়া উঠেছিল, তাঁর স্পর্শ লেগেছিল চেকোস্লোভাকিয়াতেও। এ সময় চেক-সাহিত্যিকরা তাদের সাহিত্যে জাতির অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। সাহিত্য, তাঁরা তখন মনে করতেন, শুধুমাত্র সাময়িক আনন্দ বিতরণের জন্য নয়। এই সময়কার চেক-লেখকেরা হলেন বোজেনা নেমকোভা, ইয়ান নেরুদা, কাবেল হাইনেক মার্চা। মিসেস্ নেমকোভা হলেন তখনকার চেক-সাহিত্যের অন্যতম স্তম্ভ। ছোটোগল্পকার হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন ইয়ান নেরুদা। পরবর্তীকালের অনেক ছোটোগল্পকারদেরকে ইয়ান নেরুদা প্রভাবিত করেছিলেন তাঁর লেখার গুণে। নেরুদা ছিলেন সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক একই সঙ্গে। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্তরাই ছিল তাঁর ছোটোগল্পের কুশীলব। একই সঙ্গে সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের ধারাটিকে পরবর্তীকালের অনেক চেক-লেখকেরাই গ্রহণ করেছেন। লেখক কারেল চাপেক, ইয়ারোস্লাব হাসেক, ইগনাৎ হারম্যান, এরা পেশায় ছিলেন জার্নালিস্ট।

তির্যকতা এবং হাস্যরস ছোটোগল্পকার কারেল চাপেকের লেখনীর প্রধান উপাদান। বিদেশি শাসকগোষ্ঠির ওপর তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হাস্যরস সমৃদ্ধ লেখাগুলিকে শাণিত করেছে। এসব হাস্যরসের মধ্যে চেক কৃষকের বিষয় বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময় কারেল চাপেকের সঙ্গে সার্ত্রের তুলনা করা হয়। অনেক লেখায় অ্যাবসার্ডিটির প্রতি কারেল চাপেকের প্রিয়তা বুঝতে পারা যায়। বিদেশি শাসকগোষ্ঠির প্রতি সরাসরি ঘৃণা এবং ক্ষোভ দেখাবার অসুবিধা আছে বলেই হয়তো অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণ দেখা যায়।

দুটি যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়। ত্রিশের দশকে শুরু হয় নাৎসি অক্রমণ। ফলত স্বদেশ উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়। আর এ

সময়ে চেক ছোটোগল্প সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পকাররা হলেন ভ্ল্যাডিস্লাভ ভাংকুরা, মারিয়েপুজো মানোভা এবং ইভান ওলব্রাক্ট। ইভান ওলব্রাক্ট ছিলেন পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উল্লেখযোগ্য লেখক। প্রোলেতারিয়ান জীবনবোধ তাঁর ছোটোগল্পগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তাঁর লেখায় বস্তি জীবনের ছবি গোর্কিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বর্তমানে চেকোস্লোভাকিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা স্লোভাক ভাষায় লিখছেন। চেক-সাহিত্যের অনেক পরে স্লোভাক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘেটেছিল। শ্লোভাক সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক হলেন মার্টিন কুকুটিন। জীবিকায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক। বিদেশি শাসকগোষ্ঠির রোষে পড়ায় যুবক কুকুটিনকে অন্যদেশে অনেক বছর কাটাতে হয়েছিল। সোভিয়েত গ্রামের জীবনভিত্তিক ছোটোগল্পগুলো তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এসব গল্পগুলো শিক্ষা বিস্তারের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্লোভাক ভাষায় যে সকল চেক-সাহিত্যিক ছোটোগল্প ও উপন্যাস লিখে নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডোমিনিক টাটারকা ভ্ল্যাডিমির মিনাচ ও আলকনজ বেগুনার।

মিসেস বোজেনা নেমাকভা (১৮২০-১৮৬০) লিখেছেন যে বিখ্যাত গল্পটি তার নাম The Sisters। গল্পের নায়িকা এক চাষির মেয়ে। মেয়েটির নাম হেডভিকা। হেডভিকার প্রতি আসক্ত হয় একজন কাউন্ট, শিকারির ছদ্মবেশে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে চাষির মেয়েকে প্রলুব্ধ করে। এমনকি দেহদানের পর হেডভিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সেই অঞ্চলের কাউন্টেসের জন্মদিনে তাদের বিয়ের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে বলে কথা দেয় হেডভিকাকে। জন্মদিনের উৎসবে হেডভিকার আনন্দ ধরে না।

অনেক কুমারী এসেছে সেই জন্মদিনের উৎসবে। কিন্তু হেডভিকার সৌন্দর্য ও দেহ লাবণ্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার নাচ দেখে সবাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়। কিন্তু হেডভিকার দৃষ্টি খুবই চঞ্চল। তার দৃষ্টি খুঁজে বেড়ায় শিকারিবেশি কাউন্টকে সেই নাচের আসরে। অবশেষে সুন্দরী চাষির মেয়ের চোখে কাউন্ট ধরা পড়ে, তবে শিকারির পোশাকে নয়। কাউন্টের পাশে কাউন্টেস, কাউন্টের ভাবি স্ত্রী। হেডভিকা এই দৃশ্যে অবাক হয়। আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'কিন্তু তুমি যে শপথ করেছিলে।' চাষির মেয়ের প্রতি সামান্যতম বিচলিত না হয়ে কাউন্ট ঘৃণ্যভাব দেখিয়ে কাউন্টেসের প্রশ্নের জবাবে উত্তর দিয়ে জানাল যে সে এই প্রথম ওই মেয়েটিকে দেখছে। ব্যর্থ এবং লালসার শিকারে ধরা-পড়া হেডভিকা অবশেষে অবৈধ মৃত সন্তান প্রসব করে। তাকে কবর দেয়। এসব কাজে তার বোন জোহান্না সাহায্য করে। অবৈধ সন্তান জন্ম দেওয়া এবং লুকিয়ে কবরস্থ করার জন্য দুজনকেই জেলে যেতে হয়। জেলে হেডভিকা মারা যায়।

এই গল্পটিকে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায় পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের অধীনে এই কাউন্ট। এবং তার নগ্নরূপ তুলে ধরে লেখিকা বলতে চাইছেন যে সাম্রাজ্যবাদী আইন শোষকের হাজার অন্যায়কে রক্ষা করে এবং শোষিতদের অন্যায় না থাকা সত্ত্বেও জেলে পাঠায়।

কারেল ভ্লাকাভ রাইজের স্মরণীয় ছোটোগল্পটি হচ্ছে The Newspaper। ফর্মের

দিক থেকে একটি নিখুঁত ছোটোগল্প। কোন এক দর্জির একদিনের জীবনযাপন এই গল্পের বিষযবস্তু। দর্জির নাম মেজকোরা। দর্জিটির মস্ত গর্ব সে পড়তে পারে এবং পড়াশোনাকে খুবে ভালোবাসে। সে ইস্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। সে শুধু খবরের কাগজটাই পড়তে পারে। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়া তার নেশা। কাজের দিনেও সে দুর্গম পথ অতিক্রম করে পোস্টাফিসে যায় খবরের কাগজ আনতে। অথচ সে কাগজ পড়ার সময় পায় রাত এগারোটায়, পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পড়লে। কারণ সংসারে তার অনেক কাজ থাকে। খদ্দের, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী এসব ঝামেলা নিয়ে তার দিনটা ফুরিয়ে যায়। সেজন্য রাত এগারোটায় সকালে আনা খবের কাগজের সংবাদ গোগ্রাসে গিলতে থাকে। সে আগ্রহ নিয়ে পড়ে দেশের আভ্যন্তরীণ স্বদেশি আন্দোলন, শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা, বিদেশের খবর। পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে এই ছোটোগল্পটি পাঠককে এক দরিদ্র দর্জির যে খবরের কাগজ পড়ে দেশের খবর জানতে চায়, স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। Newspaper নামকরণটি সার্থক।

আইভান ওলব্রাক্টের লেখা The Good Judge একটি বলিষ্ঠ ছোটোগল্প। দ্য গুড জাজের নাম হচ্ছে এঙ্গেলবার্ট। তিনি হচ্ছেন সৎ এবং ন্যায়বান বিচারক। ফলে তার প্রমোশন আটকে ছিল। অন্যান্য বিচারকের তুলনায় তাঁর অবস্থা ছিল অনেক খারাপ। তিনি একবার এক জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। ফলত বদলির আদেশ এল অসন্তুষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। এমন একটি জায়গা যেখানে কেউ যেতে চায় না। এক সংবাদপত্রের রিপোর্টার বিচারক সম্পর্কে খবরের কাগজে লেখেন যে বিচারক সরকারের গুপ্তচর এবং দেশদ্রোহী। তারপরেই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বদান্যতায় বিচারকের চাকরিতে দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। এই গল্পটিতে বিদেশি শাসকগোষ্ঠির ভৃত্য আমলাতন্ত্রের জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভেদী সমালোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের বিপরীত মেরুদণ্ডে আছেন এই বিচারক। বিচার ব্যবস্থা আসলে যে কার স্বার্থরক্ষা করে—তার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে এই অসাধরণ ছোটোগল্পটিতে। গল্পের দ্বান্দ্বিক পরিবেশ এবং ইতিবাচকতা ছোটোগল্পটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

কারেল পোলাসেকের বিখ্যাত ছোটোগল্প The Reformation of Felix Piscora। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থেই যে সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ সেটাকে লেখক সুন্দরভাবে এই ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন। তিনি মূলত এ কথাই বলেছেন যে নিয়মমাফিক পথে কেউ লক্ষপতি হতে পারে না।

জিরি মারেক চেক-সাহিত্যের আরেকজন বিখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক যিনি দুবার জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। 'ইটস ডে অ্যাবাভ' ও 'জয়াস মিটিং' তাঁর লেখা অসাধারণ দুটি ছোটোগল্পগ্রন্থ। ১৯১৪ সালে জিরি মারেকের জন্ম। 'একটি মায়ের কাহিনি' ছোটোগল্পের বিষযবস্তু যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা। যে যুদ্ধ স্বামীকে ছিনিয়ে নেয়, সন্তানকে শৈশব অবস্থাতেই কেড়ে নিয়ে যায় মৃত্যু মিছিলের দিকে এবং যে শিশু মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, 'সূয্যি মামা কি থালার মতোই বড়ো'? সেই যুদ্ধকে প্রতিটি নিঃসঙ্গ একাকী মা-ই ঘৃণা করে। যে মায়ের হাত ছেলেকে আদর করার কাজে আর লাগবে না, সেই হাত 'কাজে

লাগবে টুটি টিপে ধরবার জন্যে। যারা যুদ্ধের কথা পাড়বে তাদের টুঁটি টিপে ধরতে।' শেষের উদ্ধৃতিতেই গল্প শেষ করেন জিরি মারেক।

'মহান আদর্শ' ছোটোগল্পটির লেখক হচ্ছেন জাঁ দ্রদ্। তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম 'সাইলেন্ট ব্যারিকেড'। দ্রদের জন্ম ১৯১৫ সালে। নাৎসী সাম্রাজ্যবাদীরা যখন বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া দখল করে শাসনকর্তা হয়ে বসেন তখন চেকোস্লোভাকিয়ার দেশপ্রেমিকেরা একজন শাসনকর্তাকে হত্যা করে, তিনি হেইডরিখ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই 'মহান আর্দশ' ছোটোগল্পটি লেখা। গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে হেইডরিখ হত্যা কাণ্ড সমর্থন করার জন্য কোনো এক স্কুলের সপ্তম শ্রেণির তিনটি ভালো ছাত্রকে গুলি করে মারে। স্কুলের শিক্ষকেরা স্থির করলেন যে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রদের কাছে তাদের তিন সহপাঠির অপরাধের নিন্দে করে একটি বক্তব্য রাখা হবে। এই কাজটির দায়িত্ব দেওয়া হল শ্রেণি শিক্ষককে, যিনি গ্রিক ও লাতিন পড়ান এবং যাঁকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্ররা 'মহান আদর্শ' বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কারণ তিনি সকল সময় ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে সর্বদা মহান আদর্শের কথা বলতেন। 'মহান আদর্শ' কথাটা বলতে বলতে ছাত্রদের কাছে কথাটা এমন ক্লিশে হয়ে গেছে যে ছাত্ররা শিক্ষকটিকে ওই কথাটার জন্য ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। এখন এই শিক্ষকটিকে বোঝাতে হবে ছাত্রদের যে নাৎসি হত্যাকে সমর্থন করা যায় না। শিক্ষকটি ছাত্রদের সামনে বসে দায়িত্ব পালন করার আগে ভাবছেন যে তিনি ওদের কাছে ডাহা মিথ্যে কথা কি করে বলবেন? কিন্তু তাকে দায়িত্ব পালন করতেই হবে। অতএব তিনি বললেন, 'আমি নিজেও হেইডরিখ হত্যার ঘটনাটিকে সমর্থন করি।' কয়েকটি সারির পর ছোটোগল্পটি জাঁ দ্রদ শেষ করছেন এইভাবে, 'মহান আদর্শ ধীরে ধীরে তাঁর ছেলেদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। সপ্তম শ্রেণির কুড়িটি ছাত্রই তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে তাদের আগুন।'

জাঁ দ্রদের এই গল্পটি হচ্ছে চেক-সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছোটোগল্প।

'এক ঝলক খোলা হাওয়া' লিখেছেন বোহুমিল হ্রাবাল (Bohumyl Hrabal)। গল্পটি হচ্ছে একজন গ্রাম্যশিল্পীর গড়ে ওঠার কাহিনি। সিমেন্টের কারখানার জন্য গ্রামের গাছপাতা ধুলোয় ভরা। ধুলোর কুয়াশা গ্রমটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। আর আছে সামরিক শিক্ষা-শিবির থেকে বোমা ফাটাবার আওয়াজ। আর আছে বাবার যতসব অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা। এরই মধ্যে জিরকা বুরগান ছবি আঁকে ভয়ংকর ভযংকর সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। কারণ জিরকা কোনোদিন আর্ট ইস্কুলে আঁকা শেখেনি। সেই ছবি দেখতে আসে প্রাগ থেকে এক শহুরেবাবু।

প্রাগে গিয়ে জিরকা ছবি এঁকে সুনাম অর্জন করতে পারবে কিনা জিরকার মা-বাবা জানতে চায় আমন্ত্রিত ওই শহুরেবাবুর কাছে। জিরকার একটি আঁকা ছবি দেখিয়ে বাবা বলেন, 'আমাদের ছেলে এই ছবিটির নামকরণ করেছে 'শীতের দৃশ্য'। পায়ের জুতো খুলে, ট্রাউজারের পাদুটো হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে পুরো একঘণ্টা ধরে বরফ জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে, এই রকম দৃশ্য দেখতে দেখতে এই ছবিটা তার মনে দানা বাঁধে...।' কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠে

আসতে পারে এই গল্পে স্বদেশপ্রীতি কোথায়? আছে। শহুরে যে লোকটি এসেছে জিরকার ছবির মূল্যায়ন করতে সে যখন সামরিক বোমা ফাটাবার আওয়াজ শুনে জিরকার মায়ের মতো সামরিক লোকদের 'হতচ্ছাড়া' বলে গাল দেয় তখন জিরকার মা বলেন, "উঁহু, তাই বলে আপনি নয়, আপনার গাল দেওয়া সাজে না। আপত্তি জানাতে পারি শুধুমাত্র আমরাই।... ওরা তো আমাদেরই সৈনিক। ঘরের লোকদের নিয়ে এরকমটা চলে।' আসলে গ্রামের সৈন্যরা হচ্ছে ঘরের লোকদের মতো। সেজন্য পরিবারের লোক ভেবেই জিরকার মা সৈনিকদের 'হতচ্ছাড়া' বলতে পারে। শহুরে লোকের নাক গলানোটা উচিত নয়। এই ভাবে ছোটোগল্পটির স্বদেশপ্রীতি সূক্ষ্ম তুলির টানে চমৎকার ছবি আঁকা হয়েছে।

'জল-উপবাস' (The Great Catholic Water-fast) ছোটোগল্পটি লিখেছেন যোসেফ স্কভোরেসকি (Josef Skvoresky)। 'জল-উপবাস' ছোটোগল্পটি একজন ধর্মবিশ্বাসী লোককে নিয়ে গল্প যে লোকটি তিন দিন ধরে জল-উপবাস করছে। জল-উপবাস হচ্চে ক্যাথলিকদের একটা উপবাস। তাতে জল বা জলে তৈরি কোনো পানীয় গ্রহণ নিষিদ্ধ। উপবাসটা চলে তিনদিন ধরে। লোকটি হচ্ছে এই গল্পের ফার্স্ট পারসন। এই গল্পের শুরুতেই লোকটি বলছে, 'ধর্মে মৃত্যু হযেছে। আজকাল অনেক লোকই আর ধর্মে বিশ্বাস করে না।... আমার কিন্তু ধর্মে মতি ছিল।' কিন্তু লোকটি যখন কুইডোর সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিযোগিতায় জল-উপবাস করতে লাগলো, তখন দেখা গেল দুদিন যেতে না যেতেই সে পেটপুরে দুধ খেয়ে নিল, খেয়ে নিয়ে কুইডোকে যুক্তি দিয়ে বোঝালো যে জল-উপবাসের মধ্যে দুধ-খাওয়াটা পড়ে না। কারণ দুধ জলমিশ্রিত পানীয় নয়, গোরুর বাটের স্বাভাবিক ফল, ঈশ্বরের উপহার। এটাকেই বলে ধর্মীয় আপস। হিন্দু ধর্মেও এরকম আপস দেখা যায়। এ ভাবেই লোক ভণ্ড তপস্বী হয়ে ওঠে। পরোক্ষভাবে লেখক তাঁর ধর্ম বিরোধী বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে এভাবে একদিন না একদিন ধর্মের মৃত্যু হবে।

কারেল চাপেক চেক-ছোটোগল্পকারদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত চেক-সাহিত্যিক। তাঁর লেখা একটি সাধারণ ছোটোগল্প এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। ছোটোগল্পটির নাম 'একটি গোয়েন্দা কাহিনি'। গল্পে আছে দুটি চরিত্র, একটি পুলিশ অফিসার ডঃ মেয়জলিক, অপরটি একজন বৃদ্ধ জাদুকর। জাদুকর চরিত্রটি আনা হয়েছে গল্পের বক্তব্যকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এস্টাব্লিসড করার জন্য। পুলিশ অফিসারটি এমনভাবে একজন সিঁদকাটা চোরকে ধরেছে যে সে মনে করে অলৌকিক ব্যাপার। 'এমনভাবে' বলত বলা হচ্ছে যে অফিসারটি ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরতে গিযে হঠাৎই উলটোপথে যাচ্ছিল। যেতে গিয়ে একটি লোকের fire-proof জুতোয় ছাই দেখে তাকে ফলো করে 'থ্রি মেইডেন' নামে একটি হোটেলে সেই লোকটাকে ধরে এবং সত্যিই সে লোকটার কাছ থেকে ক্যাশভাঙ্গা বারো হাজার টাকা পায়। কিন্তু জাদুকর ওকে বোঝায় যে ওটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার বা দৈব ঘটনা নয়। ওটা পুলিশ অফিসারের দক্ষতা প্রমাণ করে। আসলে ধর্ম বা দৈবের প্রভাব এত জোরালো যে মানুষ নিজের দক্ষতা ও ক্ষমতাকে স্বীকার করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। এটাই ছোটোগল্পটির পজিটিভ বক্তব্য।

পরিসরের সংক্ষিপ্ততায় এটুকু বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে সংগ্রামশীলতায়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়, সমাজ সচেতনতায় এবং সুক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকতায় চেক-ছোটোগল্পকারগণ দেশিয় মানবাত্মার সঙ্গে সমাজের গভীর সম্পর্ক অকৃত্রিম অনুভবের দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই গল্পে প্রভাব ফেলতে পারেনি বিদেশি ভাবধারার আবরণ।

গোর্কির 'দ্য মাদার' : প্রসঙ্গ চিত্রকল্প ও ভাষাপ্রতিমা

বীভৎসতার পটভূমিকে চিত্রকল্প, প্রতীক, রূপক এবং ব্যঞ্জনা যে কতখানি জীবন্ত এবং সুশোভিত করে তুলতে পারে, চিরভাস্বর করে তুলতে পারে উপন্যাসে ও শিল্পে তার অমূল্য নিদর্শন রেখে গেছেন পাবলো পিকাসো, গের্নিকা ম্যুরালটিতে এবং ম্যাকসিম গোর্কি 'দ্য মাদার' উপন্যাসে।

১৯৩৬, ২৬ এপ্রিল হিটলারের নাজি বোমারু বিমান জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহযোগিতায় তিন ঘণ্টায় বোমায় বিধ্বস্ত করলো স্পেনের ব্যস্ততম বাস্ক নগরি, যার নাম গের্নিকা। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে পিকাসো ১ মে প্রথম কিছু খসড়া স্কেচ করলেন। তারপরেও নানারকম ভাবনা চিন্তার মধ্য দিয়ে তিনি আঁকলেন বিরাট আকারের মুরাল; গের্নিকা (৩৪৯.৩ x ৭৭৬.৬ সি.এম)। তিনি বললেন—'In Guernica, I am expressing my horror at the military caste which has plunged Spain into a sea of suffering and death'। আরও একটি মূল্যবান কথা তিনি বললেন গের্নিকা প্রসঙ্গে : 'ষাঁড়টা ফ্যাসিজম নয়, নিষ্ঠুরতা আর অন্ধকার, ঘোড়াটা জনগণের প্রতিভূ, গের্নিকা মুরালটি হল প্রতীকধর্মী, রূপকধর্মী'।

প্রায় ঠিক সেরকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল গের্নিকার সময় থেকে ত্রিশ/একত্রিশ বছর আগে রাশিয়ায় পিটার্সবুর্গে। ১৯০৫, ৯ জানুয়ারিতে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আদেশে প্রায় দেড়লাখ শ্রমিকের ওপর সংহারলীলা চালিয়েছিল সমর-বিভাগের হাইকম্যান্ড। এক হাজারেরও বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছিল। ১৯০২ সালে সরমভো শহরের এক কারখানার শ্রমিকেরা মে-দিবসে একটি বিরাট মিছিল বের করেছল। সেই মিছিলেও গুলি চলেছিল। খুন হয়েছিল। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শ্রমিক এবং নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারের প্রহসন হয়। নেতাকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়। এই সময়ে (১৯০২-১৯০৫) গোর্কি চোখে-দেখা নোট নিতে থাকেন, বন্দুকের গুলি বর্ষণের, অত্যাচার নিপীড়নের এবং বিপ্লবীদের প্রতিরোধের। এই ঘটনা গোর্কিকে অনুপ্রাণিত করে। অন্তরাত্মাকে আঘাত করে। তাঁকে জাগায়, নাড়ায়।

পিটার্সবুর্গে উইন্টার প্যালেসের সামনে শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণের যে সব দৃশ্য তিনি দেখেছেন, সে কথা তিনি তাঁর স্ত্রী ইয়েকাতেরিনা পেসকোভাকে লিখেছেন পিটার্সবুর্গ থেকে ১৯০৫ সালে, 'Since earlymorning today, about 150,000 st. Peterburgworkers from eleven districts have been coveraging simultaneously on the Winter Palace to present their demands for social reforms to the Tsar... At the Narva Gates they were met by the troops who fired nine rounds : 93 of the injured are in hospital, the number killed is not known... it has now been calculated that

throughout the districts up to six hundred (600) were killed or wounded, the workers stood firm under rifle fire, bared their breasts and shouted : 'Shoot, then! Our life is impossible in any case." And They were shot.

'... Let us not be too shocked by the dead—only blood can paint history in new colours.' ফিলাডেলফিয়া থেকে ১৯০৬, সেপ্টেম্বর যে চিঠি লিখলেন পেসকোভাকে সেখানে তিনি জানালেন : In 'The Mother' a story I am now writing, the heroine is a widow and the mother of a revolutionary worker.'

তারপর শাণিত কলমে, বলিষ্ঠ কলমে লিখতে শুরু করেন বিশ্ববিখ্যাত বহু-গঠিত, বহু ভাষায় অনূদিত সেই উপন্যাসটি যার উজ্জ্বল স্মরণীয় নাম 'দ্য মাদার'। শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ নয়, অত্যাচারিত-নিপীড়িত শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার কথার পাঁচালি নয়, বিপ্লবী-চেতনায় দীক্ষিত গ্রন্থ নয়—চিত্রকল্পে, প্রতীকে, রূপকে, ব্যঞ্জনায় ঠাসা এই ধ্রুপদী উপন্যাসটিকে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে ভাষায় এবং ভাবনায়। অনেক কাল ধরে উপন্যাস পাঠকের এবং সমালোচকের পূর্ব সংস্কারকে ভেঙে চুরমার করে নতুন সংস্কার গড়ে দেয়। পাঠকের এবং সমালোচকের নবজন্ম ঘটায়। তাকেই তো বলা হয় মহিমান্বিত ধ্রুপদী উপন্যাস।

চিত্রকল্প মূলত সাহিত্যের, চিত্রশিল্পের এবং চলচ্চিত্রের অলংকার যেন কল্পনার হরিণ, গতিশীলতাই এর বৈশিষ্ট। বিশেষ করে কবিতায় এবং গল্প-উপন্যাসে যথাযথ সিদ্ধ প্রয়োগে নান্দনিক উৎকর্ষ বাড়ায়। সাহিত্যের-শিল্পের craftsmanship এই চিত্রকল্প। চিত্রকল্প যেমন সাহিত্যকে ভাস্বর করে তোলে, ঠিক সেরকম চিত্রশিল্প-মুরাল-চলচ্চিত্রকে ভাস্বর করে তোলে। লাতিন শব্দ থেকে, যার ইংরেজি নাম ইমেজ (Image), আগত এই শব্দটির সঠিক অর্থ বা ভাবনাটা হচ্ছে, 'সাদৃশ্য সৃষ্টি করা।' শব্দকে, ভাষাকে, মনের ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলা। একটি চিত্রকল্পের সরল উদাহরণ টানা যাক, মহিলাটির মুখের গঠনটি কি সুন্দর। এটুকুই যদি বলা যায় তাহলে গঠন ও সুন্দর সম্পর্কে কোনো স্পষ্টতা আসে না। যদি বলা হয়, পানপাতার মতো বা ডিমের মতো সুন্দর মুখ ওই মহিলাটির, তাহলে মুখের গঠন এবং সৌন্দর্যের স্পষ্টতা পাঠকের ভাবনাকে উদ্দীপিত করে। অথবা আরও একটি কঠিন ব্যঞ্জনার উদাহরণ, নীল মেঘ মহিলার কোটর চোখে ছেয়ে আছে। এই উপমাও চিত্রকল্পের একটি বৈশিষ্ট। উপমা এবং ব্যঞ্জনা সার্থক চিত্রকল্প গঠন করতে পারে। এরপরেও নন্দনতাত্ত্বিকদের ভাবনা-চিন্তায় চিত্রকল্প বিষয়ে তত্ত্ব থেকে তত্ত্বে প্রসারিত হয়েছে। যেমন, চিত্র এবং কল্পনা দুইয়ের সহযোগিতায় এবং সমন্বয়ে চিত্রকল্প নির্মিত হয় লেখকের কলমে। চিত্রের ভিতর দিয়ে কল্পনার জাগরণ এবং প্রসার বা কল্পনার ভিতর দিয়ে চিত্রের আগমন বা মননের ছবি তুলে ধরা। এই কল্পনাকে আবার দুভাবে ভাবা যায়, বাস্তববাদী বা বস্তুবাদী কল্পনা এবং ভাববাদী কল্পনা। লেখকের শ্রেণিগত বা অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে।

Webster Dictionary থেকে তুলে আনা কিছু শব্দ চিত্রকল্পকে সহজভাবে এবং [illegible] বুঝতে সাহায্য করতে পারে:

1) A reproduction of the form of a person or a thing
2) A tangible or visible representation
3) A mental picture of something, not actually present ; Impression.
4) A mental conception of something
5) Symbolic of basic attitide and orientation
6) Something introduced to represent of something else.

Reproduction, tangible, visible, mental conception, impression, symbol ইত্যাদি শব্দগুলি চিত্রকল্পকে বুঝতে সাহায্য করে। এদের মধ্যে ব্যঞ্জনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প কর্মে ও ভাষা কর্মে কিছু-না কিছু অকথিত থেকে যায়। এই অকথিত ভাবনাটাকেই পূরণ করে ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনার মূল আবেদন বুদ্ধির কাছে, অনুভব এবং মননের কাছে। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-আশ্রিত ঘটনার বা অভিজ্ঞতার বিষয়রূপকে ঐক্যবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করে চিত্রকল্প—কখনো উপমায় কখনো বা ব্যঞ্জনায়। ভাষার সৌন্দর্যায়নের একটি বিকল্প নাম হতে পারে ভাষাপ্রতিমা। চিত্রকল্প-উপমা-ব্যঞ্জনা। এই তিনটি অলংকারের ঐক্যবদ্ধতার ভাষাই হচ্ছে ভাষাপ্রতিমা।

ম্যাকসিম গোর্কি তাঁর 'দ্য মাদার' উপন্যাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন Image Language, চিত্রকল্পের ভাষা ও ভাষাপ্রতিমাকে। কখনো মায়ের অনুভবের ভিতরে দিয়ে, কখনো বা বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ পেয়েছে সেই সব উজ্জ্বল চিত্রকল্প ও ভাষাপ্রতিমা।

আমার একটি প্রবন্ধের বই-এ 'ছোটোগল্পে নান্দনিকতা এবং সামাজিক যোগসূত্র' নামে। সেখানে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে 'গোর্কির ইতালির রূপকথা : মানবিকতার ধ্রুপদী দলিল।' সেই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে 'ইতালির রূপকথা' বইটির চূড়ান্ত সফলতা এসেছে গোর্কির চিত্রকল্পের প্রয়োগ পদ্ধতিতে। চিত্রকল্প ও বিষয়বস্তুকে একাত্ম করতে পেরেছেন গোর্কি।... ছোটোগল্পের ভাষার আরেকটি উপাদান শব্দ-প্রয়োগের পরিমিতিবোধ। গোর্কির পরিমিতিবোধ অসাধারণ, বুদ্ধিদীপ্ত। শব্দ-প্রয়োগের পরিমিতিবোধই চিত্রকল্পকে শাণিত করে, যেমন, 'আকাশের স্বচ্ছ ফিকে নীলচোখ সস্নেহে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে, সে চোখের অগ্নিময় মণিটা যেন সূর্য। (ইতালির রূপকথা)' আশ্চর্য গতিময়তা এবং প্রাণময়তা এনে দিয়েছে বিরোধাভাস দুটি শব্দের প্রয়োগ : সস্নেহ এবং অগ্নিময়। এ রকম চিত্রকল্প বা ভাষাপ্রতিমা ছড়িয়ে আছে হিরের টুকরোর মতো গোর্কির 'দ্য মাদার' উপন্যাসে।

গোর্কি উপন্যাসের শুরুতেই 'যন্ত্র-দানবে'র উল্লেখ করেন যে 'যন্ত্র-দানব' গিলে খায় শ্রমিকদের দিনগুলোকে এবং শ্রমিকদের দেহের শক্তি নিংড়ে যতটা পারে শুষে নেয়। কারখানাটাই হচ্ছে যন্ত্র-দানব। এখানে থেকে চিত্রকল্পের ব্যবহার শুরু করেছেন গোর্কি : ওদের দিনগুলাকে গিলে খায় কারখানাটা, আর দেহের শক্তি নিংড়ে নিংড়ে যতটা পারে শুষে নেয় যন্ত্রদানব। এ ভাবেই শ্রমিকদের পা এগোয় কবরের দিকে। তারপরেই আমাদের নজর কেড়ে নেয় চোদ্দ বছরের এক কিশোরের প্রথম প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ অত্যাচারী শ্রমিক বাবার বিরুদ্ধে। গোর্কি লিখেছেন : 'ছেলে পাভেলের তখন চৌদ্দো বছর বয়স। একদিন পাভেলের মদ্যপ এবং বদরাগি বাবা মিখাইল ভ্লাসব তেড়ে এসে পাভেলের ঝুঁটি

ধরতে গেলে, পাভেল তখন একটা ভারি হাতুড়ি নিয়ে বলল, 'গায়ে হাত দিয়েছো তো...।' তারপরেই গোর্কির চিত্রকল্প ভাষাকে শাণিত করে : 'বার্চ গাছের ওপর মেঘের ছায়া যেমন উদ্যত হয় তেমনিভাবে ছেলের দীর্ঘ পাতলা দেহটার সামনে খাড়া হয়ে পাভেলের বাবা বললো, 'অ্যাঁ, এদ্দুর।'

মালিকের শোষণে অনৈক্য শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে গোর্কি বলেছেন : সারা দুনিয়ার শ্রমিক ভাই ভাই। ওই মন্ত্র আমার বুকের বল, প্রাণের আগুন। ন্যায়ের আকাশে ওই সূর্যই জ্বলছে ঝলমল করে। সেই আকাশটা কোথায় জানেন নেন্‌কো? শ্রমিকের মনে, এইখানে।' এখানে আকাশ, সূর্য, আগুন শ্রমিকের মনকে চিত্রায়িত করে দিতে পেরেছে। এই চিত্রকল্পে ব্যঞ্জনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এরপরেই পাভেলের মাকে, মায়ের মনকে পাঠকের কাছে নিয়ে আসেন গোর্কি। মায়ের উত্তেজনা কমে গেলে মনের আগুন নিবে যায়। মন এবং আগুন। আগুনের ছবি পাঠকের সামনে চলে আসে। বা পাভেল যখন বলে মাকে শহর থেকে বন্ধু-বান্ধব আসবে, মা তখন ভয় পায়। মায়ের মুখে ভয়ের কথা শুনে পাভেল রেগে যায়, বলে, 'ভয়ে ভয়েই তো গেলাম সবাই। ভয় পাই বলেই তো কর্তারা আরও জুজুর ভয় দেখিয়ে কাবু করে রাখে'। তখন মা উত্তর দেয় ভয়ের ছবি এঁকে, 'সারাটা জীবন ভয় করে প্রাণটা অবধি পাষাণ-চাপা হয় আছে যে।' এই ভয়ের পাষাণটাকেই গোর্কি সরিয়ে দিতে পেরেছেন পেলাগেয়া নিলভ্‌নার মন থেকে, শ্রমিকদের মন থেকে। এখানেই 'মা' উপন্যাসটির বলিষ্ঠতা, সার্থকতা।

শ্রমিক পাভেলের কারখানার পাশে পচাপানায় ভরা একটা জলা ছিল। নতুন ডিরেক্টর ভাবলেন ওই জলাটার জল-নিকাশের বন্দোবস্ত হলে মালিকের দু'পয়সা মুনাফা হয়। ফলে শ্রমিকদের মজুরি থেকে খরচবাবদ এক-কোপেক কাটার হুকুম দিলেন। তাহলে মশার কামড়ের হাত থেকে বাঁচবে শ্রমিকেরা। শ্রমিকেরা ক্ষেপে গেল। কারখানার গেটে শ্রমিক, মহিলা-শ্রমিক প্রতিবাদ-সভায় জড়ো হল। তাদের রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিবাদ গোর্কির কলমে উঠে আসে : 'সকলের কণ্ঠ এক হয়ে মিশে শব্দের ঘূর্ণি ঝড় ওঠে। চারদিক থেকে লোক ছুটে আসে হাত নেড়ে, আগুন-ছড়ানো তীক্ষ্ণ ভাষায় পরস্পরকে উত্তেজিত করে। শ্রান্ত মানুষগুলোর পাঁজরার তলায় গোপনে যে অসন্তোষ গুমরে আছে, আজ সেটা নাড়া খেয়ে যেন আগুন হয়ে উঠেছে; জয়ের উল্লাসে হাজার শিখা নাচতে নাচতে আকাশের দিকে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে কালো ডানা; দুর্নিবার এক শক্তির টানে মানুষকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে ছিনিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে বিদ্বেষ রূপান্তরের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায়...। জটলার ঠিক মাথায় উঠেছে ধুলো আর ধুলো কালির মেঘ, ঘর্মাক্ত মুখগুলো জ্বলে উঠছে, গাল ভিজে গেছে চোখের কালো জলে, কালো কালো মুখের মধ্যে ঝলকে উঠছে চোখ আর দাঁতগুলো।' চিত্রকল্পকে কি ভাবে বিষয় ভাবনায় এবং ভাষায় প্রয়োগ করতে হয় তা দক্ষতার সঙ্গে শিখে নিতে হয় গোর্কির কাছ থেকে, চুরি করতে নয়। পাঠকের ভাবনাকে গতিশীল করে তোলে শব্দের ঘূর্ণি ঝড়, হাজার শিখা, কালো ডানা, ঝুলকালির মেঘ, চোখের কালো জল এই সব শব্দের ব্যবহার। সামাজিক অভিজ্ঞতা না থাকলে শুধুমাত্র কল্পনায় এ রকম পোয়েটিক ইমেজ নির্মাণ করা যায় না, এ-এক কঠিন কাজ, কঠিন শিল্প, অসাধারণ।

মা-উপন্যাসের অনেক সংলাপেও চলে এসেছে চিত্রকল্প, প্রবাদ দিয়ে ঘিরে রেখেছে চিত্রকল্পের বয়নকে, 'শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না হে। কষ্ট সইতে হবে, রক্ত দিয়ে কথা ভেজাতে হবে।' কি ভাবে চিত্রকল্প অনুভবকে উজ্জ্বল মহিমায় উন্নত কর দিতে পারে, তারই অনন্যরূপ : 'মায়ের বুকের মধ্যে জমে ওঠে গভীর কালো ঘৃণার মেঘ। যারা সন্তানকে কেড়ে নেয় মায়ের কাছ থেকে তাদের প্রতি ঘৃণা'। এরকমই আরও দু'একটি অনুভাবিত চিত্রকল্প পাভেলের মায়ের বুক থেকে ওঠে আসে : 'মায়ের মন ততক্ষণে পাড়ি জমিয়েছে পেছন দিকে। সেই ফেলে আসা জীবনটা যেন একটা জলা।... চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি মেয়ের ছবি, ধারালো একরোখা মুখ।... ... নানাবর্ণের এলোমেলো মেঘের মতো ওই ঘন ভাবনাগুলো এসে আঁধার করে ছেয়ে ফেলে মনটাকে।' এখানে চিত্রকল্পে মায়ের অনুভবকে বাস্তবায়িত করে তুলেছেন গোর্কি অসাধারণ দক্ষতায়। যেমন আরেকটি মায়ের মনের আবেগকে দেখাচ্ছেন যখন পাভেলের মা সন্ধেবেলায় আন্দ্রেকে দেখে চমকে উঠেছিল। গোর্কি লিখেছেন : 'আন্দ্রেইকে দেখে আনন্দেরও সীমা নেই'। চিত্রকল্পের সাহায্যে সীমা ভেঙে দিয়েছেন গোর্কি এইভাবে : 'হতাশা আর আনন্দ মিলে এক বিপুল কুলপ্লাবি আবেগের ঢল নামলো। আর উষ্ণ স্রোতের মাঝে হাবুডুবু খেতে খেতে অবশেষে ঢেউয়ের ঠেলায় উপরের দিকে উঠে ছিটকে পড়ল আন্দ্রেইয়ের বুকে।' এবং শুনল পাভেলের বিরুদ্ধে কিছুই পায়নি পুলিশ। আবার আন্দ্রেইয়ের সংলাপ এবং চিত্রকল্প : 'সবাই (পুলিশ) ভিজে বেড়ালটির মতো বোবা মনে গেছে।... আন্দ্রেইয়ের কাছ ঘেষে মা কাঠ বেড়ালির মতো হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে শোনে, লোভির মতো মনপ্রাণ দিয়ে যেন পান করে প্রতিটি কথা।' শেষ বাক্যে চিত্রকল্প ধরে রাখতে দুবার 'মতো' ব্যবহার করে তুলনা / উপমার সাহায্য-নিয়েছেন গোর্কি। অনুভব এবং রোমান্টিকতার মধ্যে একটি সুসম্পর্ক আছে, গোর্কি যাকে বলেছেন : Active Romanticism strives to strengthen man's will to live and raise him up against life around him. আবার কবিতা, পোয়েটিক ইমেজ, প্রকৃতি-প্রেম গোর্কির কলমে উঠে আসে স্বচ্ছতায়, স্বাভাবিকতায় : বুকের কপাটটা যেন খুলে গেল পাভেলের মায়ের, কলকলিয়ে কথার ঝরনা ছুটল নেচে নেচে জল ছিটিয়ে, খুশির আলোয় ঝিলমিলিয়ে।' এভাবেই চিত্রকল্পের সাহায্যে ভাষাপ্রতিমা গড়ে তোলেন গোর্কি।

[প্রিয় গোর্কি আপনি কি কবিতাও লিখতেন : আপনার কি কবিতার বই আছে? আমাদের জানা নেই। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে, 'দ্য মাদার' উপন্যাস থেকে চিত্রকল্পগুলিকে তুলে নিয়ে উপন্যাসের অলংকারগুলিকে খুলে নিয়ে একটি দীর্ঘ কবিতা বের করি।] দ্য মাদার উপন্যাসে গোর্কি নিজের লেখা কবিতা ব্যবহার করেছেন একটি চরিত্রের মাধ্যমে :

নির্দোষ যারা প্রাণ দিল
করে জীবনপণ
সত্যের বলে লভে আজ
তারা নবজীবন।

নির্মেদ সাদামাটা একটি কবিতার টুকরো। একজন ইহুদি ছেলে যে পুলিশের হাতে মারা

গেছে, এই কবিতাটি লিখেছে। পাভেলের মাকে বলেছিলেন : 'সত্যকে ও চিনেছিল, সত্যের বীজ অনেকটা ছড়িয়ে দিয়ে গেছে ও মানুষের মধ্যে'। ইহুদি ছেলেটির এই কথা শুনে 'মা অবসন্ন হয়ে পড়ে মনের মধ্যে এক ঢেউ ভাঙানিতে। বুকের মধ্যে আনন্দের এক নিঃশব্দ শান্ত উষ্ণস্রোত বয়ে চলে।' পয়লা মে'র দীর্ঘ শ্রমিক-মিছিলে কখনও কখনও গান এবং কবিতা চিত্রকল্পের সঙ্গে মিশে গেছে :

এই জীর্ণ জগৎ ত্যাগ করি
তার ভস্ম যত, দূর করি।

তারপরেই গোর্কির মন্তব্য : 'গানের গভীরে নরম ঢেউ উথলে ওঠে।' এই মন্তব্যেও চিত্রকল্পের ছাপ রেখে যায়, গানের গভীরতা বোঝাতে নরম ঢেউ-এর প্রয়োগ। পাভেলও গান গায় সঙ্গীদের সঙ্গে হাতে লালঝাণ্ডা। সূর্যের আলোয় পতাকা জ্বল জ্বল করে :

মেহনতি জন জাগারে ভাই
সংগ্রামে জাগো, ভুখা সবাই।

আবার গোর্কির মন্তব্য : 'মেহনতি জনগণের বিরাট লাল পতাকা উড়ল আকাশে বিরাট এক পাখির প্রসারিত ডানার মতো।' চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এই প্রবাদপ্রতিম উপমা-তুল্য চিত্রকল্পটি। প্রতিবাদের চির-ভাস্বর এই চিত্রকল্পটি। কখনও কখনও চিত্রকল্প-তুলনা-উপমা-ব্যঞ্জনা এক হয়ে, অভিন্ন হয়ে যায়, তখন আর চিত্রকল্প থাকে না, ভাষাপ্রতিমা হয়ে যায়। যেমন, 'ডাঙায় তোলা মাছের মতো হাঁপাতে থাকে মা।' বা খখল নামে এক শ্রমিকের উক্তি : 'আমরা সবাই বৃষ্টির মতো। বৃষ্টির-প্রতিটি ফোঁটা ফসল ফলাবার কাজে লাগে, বৃষ্টির প্রতীক নিয়ে হাজার হাজার ভাববাদী রোমান্টিকতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, কিন্তু এমনটি বস্তু-নির্ভর রোমান্টিকতার (Active Romanticism) সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই যেখানে বৃষ্টি এবং কৃষক একাত্ম হয়ে যায়।

নিজের অত্যাচারী স্বামী মিখাইল ভ্লাসভ সম্পর্কে পাভেলের মায়ের অনুভবে যে চিত্রকল্পটি ধরা পড়ে সেটা এই রকম। 'মস্ত বড়ো একটা শ্যাওলা জমা ভারি পাথর যেন, রুক্ষ কালো চেহারা।' বা মায়ের অনুভবে ধরা পড়ে, যখন মা এক মহিলা কমরেডের তড়বড়িয়ে চলার ছন্দ অনুভব করে : 'ও যেন বসন্তের ফুল, তেমনি সরস তাজা। প্রজাপতির মতোই হালকা ওর দেহ।' একেই বলে ভাষাপ্রতিমার গঠনরীতি।

আরেকটি উদাহরণ, এটা মাতৃস্নেহের। পাভেলের সঙ্গে যখন অনেকদিন পর মায়ের দেখা হল তখন গোর্কি মায়ের নিঃশব্দ কথাটা উচ্চারণ করলেন : 'পাখি-ধরা নতুন পাখি পেলে যেমন তাড়াতাড়ি তাকে ঢেকে রাখে তেমনি মা-ও এই সুখকে ঢেকে দিল ক্ষিপ্র হাতে।' মাতৃস্নেহকে আর বুঝতে কষ্ট হয় না পাঠকের। ক্লাসিক চিত্রকল্পটি কত সহজ-সরল এবং অভিজ্ঞতা-নির্ভর।

মে-দিবস পালনের প্রস্তুতি চলছে পাভেলের নেতৃত্বে। পাভেলের হাতে থাকবে ঝাণ্ডা। মায়ের ভয় ঝাণ্ডা হাতে দেখলেই পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে জেলে পুরবে। মহিলা কমরেড সাশা সেটা চায় না। সাশার মনের খবর, মনের বেদনা পাভেলের মা বুঝতে পারে। ফলে, 'ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা মায়ের বুকে।' এবার মা সরাসরি প্রশ্ন করে ছেলে পাভেলকে, 'তুমি

কি করবে, পাশা?' এক টুকরো ভাষাপ্রতিমা গড়ে দেয় মনের বেদনাকে 'ঠান্ডা জলের ফোঁটা'।

পাভেলের ডাকনাম পাশা। পাশা উত্তর দেয়, 'আমাদের ঝাণ্ডাটা মিছিলে আমিই সবার আগে বয়ে নিয় যাব। হয়তো আবার জেলে যেতে হবে।' ছেলের এই উত্তর শুনে মায়ের যে ছবিটা আমরা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে : 'মায়ের চোখে যেন কতগুলো ছুঁচ ফুটলো; মুখ শুকিয়ে গেল।' ছুঁচকে ব্যবহার করে মায়ের অন্তরাত্মার প্রকাশ ঘটালেন গোর্কি। মায়ের বুকের ভিতরের যন্ত্রণাটা আরও প্রসারিত করলেন। এভাবেই গোর্কির একটি নিজস্ব ভাষা আকার নেয় ভাষাপ্রতিমার যথাযথ প্রয়োগে।

মে-দিবসের মিছিল যত এগিয়ে আসছে, মায়ের মনের শঙ্কা তত বাড়ছে। গোর্কি লিখেছেন, 'মায়ের বুকের মধ্যে অর্থই চিন্তা তোলপাড় করে বিরাট বহ্নি-জ্বালার মতো। একটা বিপুল বেদনা-ভরা আনন্দ হৃদপিণ্ডটাকে চিরে-ফেড়ে ফালি ফালি করে দেয়।' গোর্কির কথায় চিত্রকল্পের ছন্দ, 'সারাদিন খাঁচায় পোরা কাঠবেড়ালির মতো মা কেবলি এদিক-ওদিক ছটফটিয়ে ছুটোছুটি করে।' শ্রমিকদের কথা ভাবছে মা, 'যেন দাঁত-ব্যথা হয়েছে মিছিলে যাবার জন্যে।' গোর্কি একের পর এক শব্দ দিয়ে, বাস্তবতা দিয়ে মিছিল এবং শ্রমিকদের ছবি এঁকে যাচ্ছেন : (১) ওদের মুখগুলোতে আজ যেন কুড়ালের ধার, (২) ছেলেটা যেন হাওয়ার মধ্যে মোমবাতিটার মতো জ্বলছে, (৩) সূর্য ওপরে ওঠে। উষ্ণতা ঝরে পড়ে। (৪) উড়ন্ত মেঘের ডানা এসেছে ঝিমিয়ে। না, উপমা নয়, ব্যঞ্জনা নয়, চিত্রকল্প নয়—মিলেমিশে এক কথায় ভাষাপ্রতিমার চালচিত্র।

আবার প্রবাদ-প্রতিম চিত্রকল্প : 'তেলজলে যেমন মিশ খায়না, ধনী গরিব এই দুই শ্রেণিও মিশ খেতে পারে না।... যেমন করে লেবু নিংড়োয় তেমনি করে ওরা আমাদের সব রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে।' শ্রমিকদের মে-দিবসের মিছিল দেখে প্রতিক্রিয়াশীলদের চরিত্র-স্বভাব-আচরণ পরিমিত শব্দবোধের সাহায্যে ভাষাপ্রতিমা গড়ে দেন গোর্কি : 'কালো বিদ্বেষ, দাসত্বের অন্ধ বিদ্বেষ সূর্যের আলোয় ঘুমভাঙা অজগরের মতো ফুসে ওঠে সে ভাষায়। ওদিকে কান যায় না। অশ্রাব্য ভাষা হাওয়ায় উড়ে যায়। মিছিল এগিয়ে চলেছে। চুম্বকের আকর্ষণে লোহার টুকরোর মতো সবাই ফেরে পাভেলের দিকে। মেহনতি জনগণের বিরাট লালপতাকা উড়ল আকাশে বিরাট এক পাখির ছড়ান ডানার মতো।' কালো বিদ্বেষ, ঘুমভাঙা অজগর, চুম্বকের আকর্ষণ, লোহার টুকরো, পাখির ছড়ানো ডানা মিছিলের, শ্রমিকদের মানসিক অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়। বা 'পাভেলের হাতে মেহনতি জনগণের রক্ত-পতাকা আকাশের পটে ফুটে উঠেছে', কিংবা 'মিছিলটাকে দেখাচ্ছ যেন একটা বিরাট দেহ কালো পাখি। সচকিত হয়ে উড়বার জন্য ডানা দিয়েছে মেলে। পাভেল সেই পাখির ঠোঁট... ...।' ফলক, রক্তপতাকা, কালো পাখি, আকাশের পট, পাখির ঠোঁট—এসব শব্দ বাস্তব ঘটনার সাথে (যেমন কালো পাখি শ্রমিকদের কালো পোশাক) একাত্ম হয়ে সৃষ্টি করেছে ধ্রুপদি শিল্পকলা। স্রষ্টা মাকসিম গোর্কি, এ যুগের, অন্য যুগের।

মিছিলের একটা গান 'এই জীর্ণ জগৎ ত্যাগ করি.../তার ভস্ম যত দূর স্মরি।.../মেহনতি জনগণ, জাগোরে ভাই,/সংগ্রামে জাগো ভুখা সবাই। ফিওদর গাইছে।' গোর্কি লিখছেন, 'গানের গভীরে নরম ঢেউ উথলে ওঠে। ফিওদরের সংকল্প-কঠিন কণ্ঠ

যেন উজ্জ্বল রঙের ফিতের মতো খুলতে খুলতে চলে। এবার আক্রমণ, পুলিশের আক্রমণ শ্রমিকদের মে-দিবসের মিছিলের ওপর। খুদে অফিসার পাভেলের দিকে ছুটে আসে। কিছু শ্রমিক পাভেলকে ঘিরে দাঁড়াল।' তারপরেই গোর্কি বলিষ্ঠ হাতে কলমের ফলক দিয়ে লেখেন : 'যেন ওপর থেকে ঝরে পড়া স্তব্ধতার স্বচ্ছ মেঘখানি গোটা ভিড়টাকে আচ্ছন্ন করে দিল।... রক্ত পতাকা আকাশের পটে অগ্নি-শিখার মতো কাঁপতে থাকে দীপ্ত।' অনেক ছোটোগল্পে, উপন্যাসে মিছিলের বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু গোর্কির হাতে চিত্রকল্পের ব্যবহারে মিছিল জীবন্ত চরিত্র হয়ে পাঠককে জাগিয়ে রাখে।

'দ্য মাদার' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমেই গোর্কি নিলভ্না পেলাগেয়ার (পাভেলের মা) স্বপ্নের দৃশ্য আঁকেন। মনস্তাত্ত্বিক স্বপ্নের দৃশ্য মাতৃস্নেহের অনুভাবনা থেকে জন্ম নেয়। স্বপ্ন এক : পাভেলের গ্রেপ্তার—প্রহসনিক বিচার-সাইবেরিয়ায় চালান। স্বপ্ন দুই : নিলভ্না পেলাগেয়া অন্তঃসত্ত্বা—কোলে একটা শিশু—ছেলের দল বল খেলছে—বলের রং লাল—সৈন্যরা মা'র দিকে বন্দুক তাক করে আছে—মা ছুটতে ছুটতে একটা গির্জায় ঢুকে পড়ে। এরপরেই গোর্কির কলম শব্দের ছবি আঁকে 'ধবধবে সাদা গির্জা বিরাট উঁচু যেন মেঘ দিয়ে গড়া, সারা অঙ্গ মেঘের।... গির্জার গম্বুজটার ভিতর দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে, যেন কারও শুভ্র উত্তরীয় উড়ছে। যিশু নিয়ে এসেছে জীবনের শুভ্রতা। পাভেলের বন্ধু খখলের গান, 'মরণ থেকে যিশুর পুনরুজ্জীবন'। স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যিশু সামাজিক চরিত্রে পরিণত হয়ে যায় যেমন পাভেল। শ্রমিকেরা পুনরায় শুভ্র পবিত্র জীবন পাবে। মে-দিবসের মিছিল, তারই ব্যঞ্জনা শুভ্র উত্তরীয়।

এরপর কঠিন বাস্তবতা, শ্রমিক-জীবনের দারিদ্র, গির্জা প্রভাবিত দরিদ্র-জীবনের ঘন যন্ত্রণা চিত্রকল্পের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তারই চিত্রকল্প এবং ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে 'পাভেলের মায়ের অনুভবে, যখন মা জীবনের সুদীর্ঘ কাটানো শ্রমিক-বস্তি ছেড়ে শহরে যাচ্ছে নিকলাই-এর বাড়িতে : মাটির বুকে কারখানাটা ছড়িয়ে আছে তার চিমনীগুলো উঁচিয়ে, যেন একটা বিরাট মাকড়সা। তার গা ঘেষে, জলার ধারে ধারে শ্রমিকদের একতলা বাড়িগুলো কুঁজো হয়ে গায়ে গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ধোঁয়ায় কালো তাদের আলো-প্রাণহীন জানালাগুলো করুণচোখে পরস্পরের দিকে যেন তাকিয়ে আছে। বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে দেখা যায় গির্জাটা। কারখানার মতোই ওটার গাঢ় লাল রং। কিন্তু তার চূড়ো চিমনির মতো অতদূর উঠতে পারেনি।' শব্দগুলোর প্রয়োগ লক্ষণীয় : মাটির বুকে/বিরাট মাকড়সা/কুঁজো হয়ে যাওয়া/গায়ে গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা/করুণ চোখে/গাঢ় লাল রং ইত্যাদি। এই সব সামাজিক শব্দ প্রয়োগ চিত্রকল্পের মোটিফকে স্পষ্ট করে তুলেছে, a tangible or visible representation of the motif. একেই বলে ভাষাপ্রতিমা।

পয়লা মে-দিবসের মিছিল থেকে পাভেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিচার হবে জারের বিচারালয়ে। বিচারের নামে পাভেলকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হবে। মায়ের এরকম মনের অবস্থায় সোফিয়া (নিকলাই-এর বিধবা বোন) বলছে : 'সংগীতই আপনাকে সান্ত্বনা দেবে। বিশেষ করে দুঃখের দিনে... বলেই পিয়ানোর একেবারে মর্মস্থলে আঘাত করে।

আচমকা রিডগুলো ঝনঝনিয়ে ওঠে, যেন হঠাৎ দুঃসংবাদ পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল কেউ। মর্মভেদী কান্নার স্বর।' দুঃসংবাদ এবং আর্তনাদ মায়ের অনুভবের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা এক বিমূর্ত ছবি।

গ্রাম্য-প্রবাদের ব্যবহার 'দ্য মাদার'-উপন্যাসে গোর্কি অনেকবার করেছেন। চিত্রকল্পের মান্যতা পেয়েছে সেই ব্যবহৃত প্রবাদগুলোতে যেমন, তেলে আর জলে বুঝলেন কিনা মিশ খায় না। অথবা জলের বাইরে থাকলে চিংড়ি মাছও যেন লাল হয়ে ওঠে।

বত্রিশ বছর বয়সের বিধবা সোফিয়াও একজন বিপ্লবী, রাজনৈতিক কর্মী, শহরে থাকে। ওর স্বামীও ছিল একজন বিপ্লবী। সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে সে পালিয়ে আসে। পরে যক্ষ্মায় মারা যায়। সোফিয়া গান-কবিতা ভালোবাসে। সিগারেট খেতে ভালোবাসে। মায়ের সঙ্গে তার অনেক কথোপকথন হয়। সেসব কথাবার্তায় অনেক ভাষাপ্রতিমা বেরিয়ে আসে। যেমন, 'মানুষটা আগুন হয়ে গেছে'—পাভেলের মায়ের মুখে কথাটা শুনে সোফিয়া উত্তর দিচ্ছে, 'সত্যি আগুন। এ রকম মুখ কখনো দেখিনি আমি, যেন শহিদ।'

একদিন শ্রমিক রীবিনের কথা মা শোনে। রীবিনের লোহার মতো শক্ত শরীরটাকে কঙ্কালসার করে তুলেছে কারখানার মালিকেরা। শোনে রীবিনের রাগ ও ক্রোধের ভাষা : 'মালিকেরা চল্লিশটা বছর চুরি করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে...।' তারপরেই গোর্কি ভাষাপ্রতিমা গড়েন : 'আবার দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে, এবার একটু বেশি জোরে। ছায়ারা আবার ছুটে পালায় পালায় বনের দিকে, আবার নাচতে নাচতে ফিরে আসে নিঃশব্দে এক উন্মত্ত শত্রুতার নৃত্যে। ভিজে কাঠ ফটাস ফটাস করে ফাটে আর শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে। হঠাৎ উষ্ণ হাওয়ার ছোঁয়ায় মাতন লাগে পাতার দলে। লাল হলদে শিখার দল পরম উল্লাসে পরস্পরের অঙ্গ জড়িয়ে ধরে খেলায় মাতে। জ্বলন্ত পাতা উড়ে যায়। নৈশ আকাশে তারারা মৃদু হাসে, হাতছানি দিয়ে ডাকে পৃথিবীর বুকের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গদের। রাতের প্রকৃতি এবং শ্রমিকের জীবন এক হয়ে যায় এক দীর্ঘ-চিত্রকল্পের ধারাবাহিকতায়।' সরাসরি শ্রমিক জীবনের যন্ত্রণার ভাষা চিত্রকল্পের প্রাকৃতিক গাঢ়তায় ফুটে উঠেছে এখানে, প্রকৃতি-সচেতন গোর্কির কলমে।

সোফিয়া কারখানার লোকজনদের নিয়ে গল্প করে। শোনায় দেশ-বিদেশের বৈপ্লবিক কাহিনি, প্রতিরোধের প্রতিবাদের কাহিনি—বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে সংগ্রামের ইতিহাস। কিভাবে সেই ইতিহাস শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করছে গোর্কি তার প্রতিমা গড়েন শব্দের রং দিয়ে, ভাষার রেখা টেনে : 'আগুনের চঞ্চল আলো নাচছে আঁধার মূর্তিগুলোর ওপর। ওদের কথাবার্তার সুর জ্বলন্ত আগুনের মন্থর শোঁ শোঁ শব্দের সঙ্গে গম্ভীর ভাবে মিশে যায়।' এভাবেই সোফিয়া পাভেলের মায়ের মধ্যেও জীবন-সংগীতের নেশা ঢুকিয়ে দিয়েছে। কি ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে গোর্কির-ভাষায় সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় : 'প্রচুর জল পেলে গভীর মাটির তলাকার বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়, তেমনি সংগীতের স্পর্শে মায়ের মনের ভাবনারাও অনায়াসে অঙ্কুরিত হয়ে অবিলম্বে ডালপালা মেলে ভাষার ফুলে ফুটে ওঠে।' সংগীতের প্রতি মহামান্য গোর্কির গভীর অনুরাগ বুঝতে পারা যায়।

কমরেড ইয়েগার মারা যায়। মিছিল করে নিয়ে যায় নাস্তিক ইয়েগারকে সমাধিক্ষেত্রে। নিঃশব্দ মিছিল, ধর্মযাজক নেই, শোক-গাথা নেই। সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছে যায় মিছিল। পুলিশের দল তাদের সর্দারের দিকে তাকিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিছিলের শ্রমিকেরা কমরেডরা একটা খোঁড়া কবরের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। সকলেই চুপ। সেই নীরবতার চিত্র আঁকেন গোর্কি : 'মৃতের রাজ্যে জীবিত মানুষের এই কঠিন নীরবতা যেন সাঙঘাতিক কিসের প্রতীক্ষায় থমথম করছে।... পাগল বাতাস হেঁকে হেঁকে যায় কফিনের ছেঁড়া ফুলগুলিকে নাড়া দিয়ে। সমাধির ফাঁকে ফাঁকে ওঠে তার দীর্ঘশ্বাস।' এই চিত্রকল্পটি পাটিগণিতের ভাষায় বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, (১) মৃতের রাজ্যে জীবিত মানুষ = শোষিত - নিপীড়িত কারখানার শ্রমিকেরা; (২) সাঙঘাতিক কিসের প্রতীক্ষা = আক্রমণের প্রতীক্ষা; (৩) পাগল বাতাস হেঁকে হেঁকে যায় = প্রতিবাদের + প্রতিরোধের শোঁ শোঁ শব্দের মতো আওয়াজ; (৪) ছেঁড়া ফুলগুলো = শ্রমিকের ছিন্নভিন্ন পোশাক।

সমাধিক্ষেত্রে এরপরেই শুরু হয় পুলিশী অত্যাচার। পুলিশের তলোয়ারের আঘাতে রক্তাক্ত এক টিনমিস্ত্রিকে, নাম ইবান, তুলে নিয়ে যায় পাভেলের কাছে সমাধিক্ষেত্রের ছোটো দরজাটার দিকে। সেখান থেকে লুকিয়ে মা দেখে। গোর্কি লিখছেন, 'হেমন্ত গোধূলির ধূসর পর্দায় ঢাকা খোলা মাঠ বুক পেতে আছে। নিস্তব্ধ নির্জন শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বুকে শান্তি আসে।' আমরা আবার এখানে প্রকৃতি প্রেমিক গোর্কিকে পেয়ে যাই। কমরেডের ক্ষতটাকে বেঁধে দিতে দিতে মা অনুভব করে, 'ভেজা উষ্ণতা স্পর্শ করতেই সারাটা দেহ শিউরে ওঠে আতঙ্কে।' এভাবেই ধ্রুপদি ঔপন্যাসিক গোর্কি পাঠককে জাগিয়ে রাখেন শুধু বৈপ্লবিক চেতনা দিয়ে নয়, ভাষাপ্রতিমা দিয়েও।

সন্তান পাভেলের কথা ভাবতে ভাবতে এক এক সময়ে মাতৃসুলুভ বাৎসল্যে, গর্বে উছলে ওঠে মা। 'মায়ের ভাবনার শিখায় ছাই হয়ে পুড়ে যায় মানুষের জন্য ভাবনা আর সেই ছাইয়ের মধ্যে একটা ব্যথা ছটফট করে।' মায়ের ব্যথাটা গোর্কি এভাবে বর্ণনা করেছেন : 'মারা যাবে, পাভেল শেষ হয়ে যাবে।'—এইরূপ চিত্রকল্পের অবস্থানটা হচ্ছে, a mental picture of something not actually present, a mental conception of something. যেমন আরেকটি উদাহরণ, 'হলদে ঘাসে ঢাকা ছোটো একটা মাঠের দিকে তাকিয়ে পাভেলের মা ভাবছে : স্তরে-স্তরে পুঞ্জিত কালো মেঘের চাপ। চারদিকে নিঃশব্দ আঁধার, বিরস জীবন যেন গা ঢাকা দিয়ে কিসের প্রতীক্ষায় আছে।'

ইয়েগরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অবস্থানের অনুভাবনা। এরপরেই মায়ের মুখে উঠে আসে ভাষা-চিত্রের স্পষ্টতা : 'দিন আসবে হে। সেদিন আগল ভেঙে মুক্ত আকাশে ডানা মেলবে ইগল পাখি। সোজা হয়ে দাঁড়াবে মানুষ।'

পাভেলের মায়ের সারা শরীরটা যেন ভয় আর অত্যাচারের আশঙ্ককায় থম থম করছে। একদিকে পাভেলশূন্য মায়ের অন্তর এবং অন্যদিকে কমরেডদের প্রতি নির্মম অত্যাচার—এরকম একাকিত্বের মানসিক অবস্থানটাকে গোর্কি বেশ কয়েকটি চিত্রকল্পে ধরে রেখেছেন : (১) একাকিত্বের অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে ছাই-এর মতো ধূসর কোমল। প্রদোষের ছায়ায় চিত্ত ভরিয়ে দেয়। (২) তামসী রাত্রি একটা অতল কালো গহ্বরের মতো

মাকে গ্রাস করবে বলে যেন জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। (৩) মা নিথর নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে শুয়ে নিঝুম অন্ধকারের অলস শব্দ শোনে। এইসব শব্দের জাদুময়তা 'তামসী রাত্রি বা জাদুবাস্তবতা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে' বা 'নিঝুম অন্ধকারের অলস শব্দ' বা 'ছাই-য়ের মতো ধূসর কোমল' একজন মনস্ক পাঠককে বা সমালোচক-প্রবন্ধকারকে ধ্যানস্থ মহিমায় মুগ্ধ করে তোলে। চিত্রকল্পের বা ভাষাপ্রতিমার জন্য কি নিখুঁত শব্দচয়ন।

মা যখন নিকলাই-য়ের নিজের বাড়িতে অস্থায়ী আস্তানায় ফিরে এসে দেখে, তার ঘরে পুলিশ এসে খানাতল্লাশি করে গেছে, তখন মায়ের মনের কথা বোঝাবার জন্য গোর্কি লেখেন : 'ঘরখানার দিকে তাকালে মনে হয় কোনো একটা দানব এসে হঠাৎ খেয়ালে ঘরের পাঁচিল ধরে রাম-ঝাঁকানি দিয়েছে। তাই অমন লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা।' তারপর নিকলাইয়ের পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করে মা : 'ধীরে ধীরে চশমাটা খুলে রেখে হাত বুলায় মুখে, যেন অদৃশ্য একটা মাকড়সার জাল এসে পড়েছে, সেটা মুছে ফেলতে চায়... নিকলাইয়ের মনের আগুনের আঁচ এসে লাগে মায়ের মনেও।... ... নিকলাই বলে, এই পশুসুলভ সমাজ-ব্যবস্থায় বাধ্য হয়ে আপনা থেকেই মানুষকে জানোয়ার হতে হয়।' গতিশীল ভাষার জাদুতে এবং সমাজে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয় যেমন আগুনের আঁচ, পশুসুলভ, দানব জানোয়ার এই সব সামাজিক শব্দের যথার্থ প্রয়োগে চিত্রকল্পের সাহায্যে স্পষ্ট করে তুলেছে ভাষাপ্রতিমাকে পাঠকের মনে।

নিকলাইয়ের কথা শুনতে শুনতে পাভেলের মায়ের মনে হয়েছে, নিকলাইয়ের চোখে মাখানো আছে দুনিয়ার ওপর গভীর ঘৃণা আর অবিশ্বাস। চোখদুটি থেকে যেন একটা উষ্ণ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই আলোয় মা'র কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। নিকলাইয়ের সহযোগিতায় পাভেলের সঙ্গে মায়ের দেখা হয় জেলে। সেখানে পালাবার কথা উঠলে পাভেল জানিয়ে দেয় সে পালাবে না। এরপর আদালতের কথা ওঠে। আদালতের কথা শুনে 'মায়ের বুকটা বিপদের কুয়াশায় ছেয়ে যায়।' কারণ মা এটা ভালোভাবেই জানে জারের আদালতের বিচার মানে প্রহসন (Farce), মানে সাইবেরিয়ায় চালান দেওয়া। সেজন্য বিষাদের কুয়াশা মাতৃস্নেহ ঢেকে দেয়। মা আদালতে বসে আছে। বুকের ভিতর ভয়। কি রকম ভয়? গোর্কি লেখেন : 'গলায় যেন ছ্যাৎলার মতো ভয়টা জমে আছে। দম বন্ধ হয়ে আসে। মামলার দিন বুকের উপরকার জগদ্দল পাথরটাকে নিয়েই ধুকতে ধুকতে মা আদালতে আসে।' যে আদালতে, চীনে মাটির মতো মুখওয়ালা লোকটি একঘেয়ে স্বরে কী একটা কাগজ পাঠ করে গেল।... চারজন উকিল চাপা স্বরে, উত্তেজিতভাবে আসামিদের সঙ্গে আলোচনা করছে। ওদের চলনবলন দৃঢ়, চেহারা মস্ত কালোপাখির মতো'।... এবার সরকারি উকিল বলতে শুরু করলো, 'একঘেয়ে টানা সুরে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ যেন চিনির ডেলার সামনে মাছির-ঝাঁকের মতো ভন্‌ভনিয়ে ওঠে।... বরফের মতো হিম, ছাঁইয়ের মতো ধূসর কথার স্রোত ভেসে বেড়ায় ঘরের মধ্যে। আবহাওয়াটা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, মনে হয় সূক্ষ্ম ধুলোর জালে যেন ভরে গেছে ঘরখানা।... যেন সব্বাইকে ভালো করে গুছিয়ে গাছিয়ে এক বস্তায় গাদা করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে উকিল সাহেব।... ... সরকারি উকিলের কথা ঘরের হাওয়ায় এক অদৃশ্য

কুয়াশার জাল বোনে, ঔদাস্য আর ক্লান্তিকর প্রতীক্ষার মেঘ ঘিরে ফেলে বিচারকদের। খাড়া কাঠের মতো বসে আছে প্রধান বিচারক।'

ছ্যাৎলার মতো ভয়/ জগদ্দল পাথর/ চীনে মাটির মতো মুখ/ মস্ত কালো পাখির মতো চেহারা/ চিনির ডেলা ও মাছির ঝাঁক/ বরফের মতো হিম/ ছাঁইয়ের মতো ধূসর কথার স্রোত/ সূক্ষ্ম ধুলোর জাল/ বস্তার গাদা/ কুয়াশার জাল ইত্যাদি শব্দের বাস্তবতার মোড়কে বুর্জোয়া আদালতের একটা স্পষ্ট ধারণা পাঠকের মনে গেঁথে দিতে পেরেছেন গোর্কি। এখানে কল্পনার স্থান নেই, ভাবাবেগের স্থান নেই।

অবশেষে পাভেল ভ্লাসভকে বলার সুযোগ দেওয়া হল বুর্জোয়া আদালতে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হল, 'বিষয়ের বাইরে একটিও কথা বলবেন না।' সর্ত-উচ্চারণ কানে যেতেই মা পাভেলের মুখের দিকে তাকায়। লক্ষ করে 'পাভেলের নিষ্প্রভ বাঁ চোখটায় একটা লুব্ধ হিংস্র আগুন ধক ধক করে জ্বলছে।' মা ভাবছে যে বিচারকদের আবিল দৃষ্টির স্পর্শে সন্তানের দেহটা যেন কলুষিত হয়ে উঠেছে। মা এবার লক্ষ করছে বন্দিদের, 'বন্দিরা নিবিষ্ট চিত্তে পাভেলের বক্তৃতা শুনছে। তাদের ছায়া-পাণ্ডুর মুখে চোখগুলি সুখে ঝলমল করছে।...' 'আর মা গণ্ডুষ ভরে ছেলের কথা পান করছে'। এখানে বাক্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চারটি ব্যঞ্জনাময় শব্দে, ১। দেহটা যেন কলুষিত; ২। ছায়া-পাণ্ডুর-মুখ; ৩। গণ্ডুষ ভরে; ৪। লুব্ধ হিংস্র আগুন।

বিবেকশূন্য, অমানবিক এবং যান্ত্রিক কলকব্জা কলুষিত বিচারকদের সম্পর্কে মায়ের অন্তঃস্থ অনুভবকে স্পষ্ট করে তোলে symbolic of basic attitude : (১) একদা বহু রক্ত পান করেছে এই হিংস্র জানোয়ারের দল। (২) নিষ্প্রভ চোখগুলোর লালা-সিক্ত, ক্লেদাক্ত দৃষ্টি; তার ক্লিন্ন স্পর্শ লাগছে ছেলের বুকে-মুখে-কাঁধে-বাহুতে। (৩) ওদের শ্রমিকদের প্রাণ-সমৃদ্ধ তরুণ সজীব দেহের সঙ্গে বিচারকেরা তাদের স্থবির ধমনীর হিম রক্ত-প্রবাহ আর নিষ্ক্রিয় পেশিগুলোকে উষ্ণতায় সঞ্জীবিত করে তুলতে চায়।... বিদ্বেষের কাঁটার খোঁচায় মরা মানুষগুলো যেন চাঙ্গা হয়ে উঠছে।

পাভেলের বক্তৃতা, পাভেলের সত্য ভাষণ, সোস্যাল ডেমোক্রেসির আদর্শ যেন বুর্জোয়া বিচার ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া বিচারকদের প্রতি বিদ্বেষের কাঁটার খোঁচা। বুঝতে পেরে মা ভয়ে শিউরে ওঠে। ভয়, ছেলেকে ওরা নিশ্চিত সাইবেরিয়ায় চালান করে দেবে। 'ভয়ের একটা গুমোট অবসন্নতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে মাকে।'

এরপর মা একদিন লুদমিলার ঘরে আসে। লুদমিলা একা থাকে। কমরেড লুদমিলাকে দেখে পাভেলের মা'র মনে হয়েছে, সন্ন্যাসিনী মূর্তি : 'গৃহকর্ত্রীর সন্ন্যাসিনী মূর্তিখানি থেকে একখানি হিম-ছায়া উঠে এসে যেন ছড়িয়ে আছে সব কিছুর ওপর।' লুদমিলার কণ্ঠস্বরকে মায়ের মনে হয়েছে : 'স্টোভে গনগন করছে আগুন; শোঁ শোঁ শব্দে ঘরের বাতাসকে শুষে নিচ্ছে। কাঠপোড়ার ফট ফট শব্দ তার সঙ্গে মিশে আছে। সমান লয়ে বয়ে চলেছে লুদমিলার কণ্ঠস্বর।' লুদিমিলার কণ্ঠস্বরটা কি রকম, সেটা পাঠকমনে স্পষ্ট করে দিয়েছে চিত্রকল্পের ব্যবহারে। চিত্রকল্পে সামাজিক শব্দের অর্থাৎ শ্রমিক পরিবারে ব্যবহৃত শব্দাবলির যথার্থ প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সেটাও ম্যাকসিম গোর্কি করেছেন।

আদালতে পাভেলের বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি পড়ে লুদমিলা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মাকে প্রশ্ন করে, 'এমন ছেলে পেটে ধরে মায়ের কি সুখ?' তা শুনে শ্রান্তিতে মায়ের মাথা ঘুরতে থাকে। সেই অবস্থায় গোর্কির কলম কথা বলে : 'চারদিকে যেন একটা কোমল স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত। সেই আলোয় অভিস্নাত মায়ের আত্মা'। পাভেলের মায়ের এই আত্মাকে গোর্কি আরও গভীরভাবে বোঝাতে পেরেছেন : 'আত্মার গভীরে এই যে এতো রাগ, এতো রস, এই যে অস্ত রাগের আলোয় রাঙা হয়ে আছে তার দিক-দিগন্ত।' এ ভাবেই মা'র হয়ে গোর্কি লুদমিলার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন চিত্রকল্পের ভাষায় 'মায়ের কি সুখ?' এই প্রশ্নের। চিত্রকল্প রচনায় তিনি আত্মাকেও ধরেছেন। এমত আত্মার অবস্থান থেকেই মায়ের অন্তরের মনের জগৎটাকে উন্মোচিত করে নানা রকম চিত্রকল্প এ যেন ভাষাপ্রতিমার চালচিত্র :

(১) কমরেডদের আনন্দসিদ্ধ চোখ, বিব্রত চোখ, কালো মূর্তি এবং পাভেলের ব্রোঞ্জ রঙের কঠিন মুখে একাকার হয়ে বক্ষমথিত হালকা দীর্ঘশ্বাস হয়ে মিলিয়ে যায় রামধনু রঙের মেঘের স্বচ্ছতায়, যা মায়ের সমস্ত চিন্তার জগৎকে ছেয়ে ফেলে এক অসীম শান্তিতে মন ভরিয়ে তোলে।

(২) ভুলে যাওয়া উপাসনার মন্ত্র মনে পড়ে যায়। আগুনের ফুলকির মতো বুকের তলা থেকে উছলে ওঠে নতুন বিশ্বাসের আলোর উদ্ভাসিত সেই মন্ত্র।

(৩) নতুন জীবন জন্ম নিচ্ছে সেই প্রেমের আগুন থেকে। মাটির বুক থেকে উঠেছে সেই আগুন।

(৪) মনের ভিতরটা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, যেন সূক্ষ্ম আগুনের তন্তু দিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে কেউ শতছিদ্র করে দিচ্চে।

(৫) পাহারাদারের মুখে 'চোর মাগি' কথাটা শুনে এবং কথাগুলোর স্থূল আক্রোশের ছোবলে মা'র দৈহিক কষ্ট হতে লাগল।

(৬) মায়ের অমায়িক মস্ত বড়ো মুখখানায় একটা শিহরণ বয়ে যায়। চোখ জ্বলে ওঠে; ভুরু-জোড়া কাঁপতে থাকে—যেন ডানা মেলে চোখ দুটির আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

(৭) ক্ষণিকের জন্য একটা ভয়ের কালো মেঘ ছেয়ে আসে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মেঘের বুককে শত দীর্ণ করে হৃদয় জ্বলে ওঠে সহস্র-শিখায়।

(৮) মায়ের পিঠে ঘাড়ে ধাক্কা মারে; মাথায় কাঁধে আঘাত পড়ে। চিৎকার, আর্তনাদ, হুইসিলের শব্দ, সব মিলে প্রচণ্ড ঘূর্ণি ওঠে মা'র চারপাশে।

শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় : রাম ধনু রঙ/ উপাসনার মন্ত্র/ প্রেমের আগুন/ আগুনের তন্তু/ আক্রোশের ছোবল/ ডানা মেলে/ সহস্র শিখা/ প্রচন্ড ঘূর্ণী।

'আরে লোকের মন তো আর রক্তে ডুবিয়ে দিতে পারবে না', শ্রমিকদের কোলাহল থেকে বেরিয়ে আসা এই বক্তব্য যেন মায়েরই আত্মভাষণ, অন্তরভাষণ। উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে পাভেলের অত্যাচারিত, নির্যাতিত মায়ের মানসিক অবস্থানকে বোঝাবার জন্য প্রতিবাদের চিত্রকল্প পাঠকের মনে এক রিয়ালিটির জন্ম দিয়েছে : 'পুলিশ টিকটিকি এক থাপ্পড় মারে মা'র মুখে, রক্তের লবণাক্ত স্বাদে মায়ের মুখ ভরে যায়।' মুখ কেটে বা ফেটে গেছে নয়, গোর্কি ব্যবহার করলেন 'রক্তের লবণাক্ত স্বাদ'।

এত অত্যাচারে চল্লিশ বছরের মায়ের গলা আটকে যায়, দমবন্ধ হয়ে আসে, সারা শরীর তীব্র ব্যথায় কাঁপতে থাকে, হাঁটু অবশ হয়ে আসছে, পায়ের তলা থেকে জমি সরে যায়। কিন্তু মায়ের চোখ তেমনি জ্যোতিষ্মান। জনতার চোখের সঙ্গে চোখ মিলে যায়, মা দেখে 'ওই দুঃসাহসী চোখগুলিতে ধক ধক করে আগুন জ্বলছে। এ, আগুন মা চেনে—ভালোবাসে—এ যে তার—অন্তরের প্রিয়তম বস্তু।' এখানেই উপন্যাসের শেষ, সেই অসাধারণ চিত্রকল্পের রিয়ালিটি দিয়ে মাক্‌সিম গোর্কি ভাষাপ্রতিমা গড়ে দিয়ে, শেষ করেছেন যেখানে পাভেলের মায়ের অন্তরের এবং আত্মার অবস্থানকে মনোযোগী পাঠক সহজেই বুঝে নিতে পারেন।

লক্ষ্য করা যায় 'দ্য মাদার' উপন্যাসে গোর্কি বিভিন্ন ধরনের হাসির চিত্রকল্প এবং ব্যঞ্জনা ব্যবহার করেছেন :

১) জিজ্ঞাসা করার ধরনটা মমতাভরা, চোখে স্নিগ্ধ হাসি।

২) মায়ের কথার হাসিতে স্নেহ ঝড়ে পড়ল।

৩) কোমল হাসি হেসে মা আওড়ায় কথাটা।

৪) অগ্রগামী পতাকার দিকে বন্দুকধারী পুলিশের ইস্পাতি চতুর হাসি।

৫) ওদের হাসি হাসি প্রাণবন্ত মুখগুলোয় এজলাস ঘরের গুমোট কেটে হালকা হয়ে যায়।

৬) লুদমিলা হাসে, মখমলের মতো কোমল তুলতুলে হাসি।

৭) বেশ দরদভরা হাসিখুশি মানুষটা।

৮) ওর নিশ্চল মুখের ওপর চলছে উষ্ণ হাসির নাচ।

চিত্রকল্প-ব্যঞ্জনা-উপমা একত্রিত হয়ে গঠন করে ভাষাপ্রতিমা, ভাষাপ্রতিমার চালচিত্র :

১) আস্তে আস্তে মাকড়সার জাল বোনার মতো করে আলাপের জাল বুনে যাচ্ছে।

২) জীবন তো ঘোড়া নয় যে চাবুক কষে ছুটানো যাবে।

৩) যতদূর বুঝি, হাতে হাতিয়ার তোলবার আগে মগজগুলোকে সশস্ত্র করতে হবে।

৪) প্রাণের মধ্যে আগুনটা যখন ভাল্লো করে জ্বলে না, তখন অনেক কালিঝুলি দেখা যায়।

৫) কিন্তু কারখানার মজুর—পাখি! পাখি! ঘর নেই, বাড়ি নেই, দেশ-মাটি কিছু নেই... ... আজ হেথা, কাল হোথা।

৬) ভালোই তো রে, আবর্জনা জমে ছিল, ফুঁ দিতেই উড়ে গেছে।

৭) মার এড়াবার জন্য দুবছরের ছেলেটাকে তুলে ধরল সামনে ঢালের মতো করে।

৮) আমি পাথর নই মা, সেদ্ধ গাজরের মতো নরম তুলতুলে।

৯) সূর্যকিরণের সরু সরু ফালিগুলো সিল্কের ফিতের মতো বায়ুমণ্ডলে দোলে।

১০) জীবনের ভারি কলটা কি নির্মম ভাবে মানুষকে পিষে গুঁড়িয়ে টাকা তৈরি করে।

১১) ভেজা উষ্ণতা স্পর্শ করতেই সারাটা দেহ শিউরে ওঠে আতঙ্কে।

১২) মা'র মনে হয় বিচারকের নিষ্প্রভ বাঁ চোখটায় একটা লুব্ধ হিংস্র আগুন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

১৩) জনতার মধ্যে ক্রোধের গুঞ্জন ওঠে, কালো মেঘের মতো তারা এগোয়।

১৪) ওর সবুজ চোখ দুটি একটা হিম দীপ্তিতে জ্বলছে।

১৫) মা'র মনে হয় জীবনটা যেন অচষা পাহাড়ি জমি। শ্রমিকদের বুকগুলোকে চষে চষে তার মধ্যে ঘেন্নার বীজ বুনে দিয়েছে।

প্রাত্যহিক শ্রমিক-জীবন থেকে উঠে আসা চলমান জীবনের টুক-টাক শব্দ গ্রাম, শহর থেকে উঠে আসা বৈপ্লবিক মানস-চেতনায় সমৃদ্ধ সংগ্রামী জীবনের টুকরো ছবি. অত্যাচারিত জনগণের প্রতি পুলিশের অশালীন কথার খণ্ডচিত্র, সুখ-দুঃখ-বেদনা তাড়িত নারী-জীবনের অন্তর্লোক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রকৃতি-চেতনা এইসব নিয়েই (পুনরায় স্মরণ করা যায় : 'Thought follows the fact'—Maxim Gorky) গোর্কি নির্মাণ করেছেন চিত্রকল্পের সৌধ, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাপ্রতিমা।

এইসব চিত্রকল্প ও ভাষাপ্রতিমা থেকে যেমন আমরা গোর্কির মানবিকবোধ এবং বোধের অন্তর্লোক বুঝে নিতে পারি, ঠিক সেরকম প্রকৃতি সচেতন বা প্রকৃতি-প্রেমিক গোর্কিকে চিনে নিতে পারি। স্বভাবতই গোর্কি-নির্মিত চিত্রকল্পে ব্যবহৃত শব্দ ও সমষ্টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : (১) Realism (২) Active romanticism তিন) Inner world.

(১) Realism-এর শব্দাবলি যা মূলত অনেকভাবে, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চিত্রকল্প নির্মাণে এবং ভাষাপ্রতিমা গঠনে ব্যবহৃত হয়েছে 'দ্য মাদার' উপন্যাসে : পিয়ানো/ স্টোভ/ মোমবাতি/ মাছির ঝাঁক/ চিংড়ি মাছ/ নিংড়ানো লেবু/ পাথর, পাষাণ চাপা/ মেশিনের আওয়াজ/ বাষ্পের ভসভসানি/ চায়ের পেয়লা/ অগ্নি-শিখা/ স্ফুলিঙ্গ/ ধুলো/ গির্জা-গম্বুজ/ ঝুলকালি/ কফিন, সমাধি/ হাতুড়ি/ খাঁচা/ চাবুক/ ঘোড়া/ হাতিয়ার/ অস্ত্র, কুড়ুল/ তলোয়ার, ঢাল/ খিদে/ দাউদাউ, অগ্নিকুণ্ড/ চুম্বক/ ছাঁই/ ভাঙাচোরা বস্তি/ মাকড়সার জাল/ সেদ্ধ গাজর/ ঘর্মাক্ত শরীর/ ডাঙ্গায় তোলা মাছ/ কুকুর-বেড়াল-ইঁদুর/ আবর্জনা/ কবরখানা ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) Active romanticism বা সক্রিয় মনের আবেগ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিপ্রেক্ষিতে : বার্চ গাছ/ পাইন গাছ/ ফার গাছ/ আমপেন গাছ/ ঘানি গাছ/ লাইম গাছ/ উড়ন্ত মেঘ/ ইগল পাখি/ হেমন্ত গোধূলি/ মেঘের ছায়া, মেঘ-গর্জন, রামধুন রঙের মেঘ/ সূর্য, আকাশ, বৃষ্টি, বায়ুমণ্ডল/ ঘূর্ণি, ঝড়/ জলাভূমি/ কাঠবেড়ালি/ ঝরনা/ নদীরস্রোত/ ক্যানারি পাখি/ কাক/ প্রজাপতি/ ছায়া/ পাখির ডানা, ঠোঁট/ বসন্তের ফুল/ বুনোফুল/ পাপড়ি/ গাছের শেকড়/ রিক্ত খেত/ ধূসর কুয়াশা/ প্রদোষের ছায়া/ তামসী রাত্রি/ পাহাড়ি জমি/ কনকনে পাগলা হাওয়া/ জগদ্দল পাথর/ কালো ডানা/ ফসল বীজ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

Inner world যা নারী জীবনের বিশেষ করে পাভেলের মায়ের অন্তর্লোকের পরিচয় বহন করে যেন মনস্তত্ত্বের শাখা-প্রশাখা : জ্যোতির্ময়/ মনের আগুন/ ভেজা রক্ত/ মাতৃত্ব

বিষাদ/ বুকের মধ্যে উষ্ণ স্রোত/ কালো বিদ্বেষ/ অন্ধ বিদ্বেষ/ অশরীরী সংগীত/ নিস্তব্ধতা/ বিষণ্ণ গান/ বিবস জীবন/ কলুষিত মন/ তিক্ত স্বাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়াও চিত্রকল্পে লাল/ সবুজ/ কালো/ হলুদ এই চারটি ইতস্তত ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

এভাবেই গোর্কির-উপন্যাস 'দ্য মাদার' বলিষ্ঠতার চরমতম শীর্ষে উঠতে পেরেছিল। চিত্রকল্প নির্মাণের এবং ভাষাপ্রতিমা গঠনরীতির দক্ষতার জন্য এখনও পর্যন্ত, একশো বছরের পরেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, পড়তে হয়। এই সময়ে গোর্কি সম্পর্কে জানতে Internet-এ ধরা আছে একটি মূল্যবান বক্তব্য : Away from political movements and social portrayal 'The Mother' is also an excellent lyrical beauty. The events created and the detailed explanation of the backdrop in which the events occur represents creative and poetic story telling capabilities of Gorky. এই 'lyrical beauty' এবং 'poetic story'-র (যার ভাল বাংলা 'সৌন্দর্যায়ন') কথাটাই আমি চিত্রকল্পের ও ভাষাপ্রতিমার মাধ্যমে বলতে চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়েছিলেন গোর্কি-পাঠে এবং এই স্নিগ্ধতা এবং মুগ্ধতা এসেছিল গোর্কির ব্যবহৃত চিত্রকল্প থেকে। অনুমান হলেও সত্যির ধারণাটা অস্পষ্ট হয় না। এ কথার স্পষ্টতা মেলে রানি চন্দের স্মৃতি কথায়, সেখানে তিনি লিখেছেন : সকালে প্রায় রোজই আমাকে খানিকক্ষণ ইংরেজি পড়ান। আজ কয়েক দিন থেকে পড়ছিলাম ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাই ইউনিভার্সিটি ডেজ' বইখানি। এই বইখানি হাতের কাছে ছিল, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বললেন, 'ভালোই হল এখানা আমার পড়া হয়নি, তোকে পড়াতে পড়াতে আমারও পড়া হয়ে যাবে।' (উৎস : Calcutta Review, 1871, P 301. রবীন্দ্র-উপন্যাসে পাশ্চাত্য অভিঘাত/শিবানী রায়)